৬০ তম সংখ্যা
৩৭ নং ইনটারনেট সংখ্যা
বসন্ত ২০১৭

জয়ঢাক



আমরা করব জয় (গজাবুরু ক্যাম্পের খুদে পর্বতারোহীকে সেলাম জানিয়ে।)

জয়ঢাকের এই সংখ্যার দলবল

সহ-সম্পাদকমন্ডলী



উমাদিদি

বিশ্বের জানালা, সেই মেয়েরা, দেশ ও মানুষ, স্মরণীয় যাঁরা



তাপস মৌলিক

অন্নপূর্ণা, বিজ্ঞাপন, নতুন বই
কার্যনির্বাহী সম্পাদক- শব্দগল্পদ্রুম

জয়ঢাকের ইউনিকোড কম্পোজিটর টিম



মনস্বিনী



দেবপ্রিয়া



ঋত্বিক



মহুল

এই সংখ্যার আঁকিয়েরা



শিবশংকর ভট্টাচার্য



অর্ক



শিমুল



তন্ময় বিশ্বাস



অংশুমান



শ্রীময়



শ্রীময়ী



নির্মাণ সহায়তায়
রাজীবকুমার সাহা

জয়ঢাক-৬০ নং সংখ্যা (৩৭নং ইনটারনেট সংখ্যা) বসন্ত ২০১৭

সূচিপত্র(পার্ট০১)

লেখার নামে ক্লিক করে লেখায় পৌঁছোন

সম্পাদকীয়	জয়ঢাকি বোল	সম্পাদক
জয়ঢাকি বিজ্ঞাপন	বিজ্ঞাপন	তাপস মৌলিক, ইন্দ্রশেখর
বসন্ত স্পেশাল	আমার বাবা	চুমকি চট্টোপাধ্যায়
বসন্ত স্পেশাল	গানের গরু গানের সিংহ	সুলেখ ভট্টাচার্য
বসন্ত স্পেশাল	বন্দনা গাই পলাশ ফুলে	ইন্দ্রশেখর
নাটক	হাবুদের ডালকুকুরে	তাপস শঙ্কর ব্রহ্মচারী
ধারাবাহিক গ্রাফিক নভেল	দুর্জয়	দেবসেনা নন্দী
ধারাবাহিক গ্রাফিক নভেল	তারানাথ তান্ত্রিক	দেবসেনা নন্দী
কমিকস	খুশিয়াল কুতুয়া--মরশুমের শিকার	ভাষান্তর সুমিত রায়
কমিকস	টোটা আর টিটো-ব্রিজবিভ্রাট	রুডলফ ডার্কস। অনুঃ তাপস মৌলিক
কমিকস	রাশিয়ান কমিকস-খোকা বরফ বুড়ো বরফ	লিথুয়ানিয়ার লোককথা
কমিকস	পিঁপড়ির সাধপূরণ	অমৃতা রায়
আজব খাতা	হুমোর ডায়েরি	তপোব্রত মুখার্জি
উপন্যাস	আমি মানুষ হব	আইজাক অ্যাসিমভ ভাবানুবাদ রণেন ঘোষ
প্রতিযোগিতার গল্প	ভিনগ্রহীদের হাতের পুতুল	সুমিত নাগ
প্রতিযোগিতার গল্প	দূর আকাশের দোসর	শুভময় মিশ্র
গল্প	আয়না	শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য
গল্প	যাত্রাপালার রাজা	রতনতনু ঘাটী
গল্প	পিসি সরকারের ম্যাজিক	অমর মিত্র
গল্প	জীবরত্নের ডায়েরি	রাজকুমার রায়চৌধুরী
গল্প	আমাজনের আতংক	পুষ্পেন মণ্ডল
গল্প	পুরোহিতমশাই	সাগরিকা রায়
গল্প	সত্যকাকুর গল্প	অর্ক পৈতণ্ডী
গল্প	মায়া কাজল	সিদ্ধার্থ সিংহ
গল্প	রানিচরি	অনিরুদ্ধ দেব
গল্প	চিরন্তন যাত্রী	মিথিল ভট্টাচার্য
গল্প	হেডস্যার	উপাসনা পুরকায়স্থ
গল্প	চেন স	সোমঙ্কর লাহিড়ী
গল্প	গলাকাটা সাগরেদ	সুব্রত রুজ
গল্প	ভাই ভাই	শুভ্রা ভট্টাচার্য
গল্প	কুলফিমালাই আর আজব ফেরিওয়ালা	সোনালি
ভ্রমণ	যেদিন উড়েছিলাম	ঊর্মী মুখার্জি
ভ্রমণ	হাঁটছি	অর্ণব চক্রবর্তী
ভূতের আড্ডা	দেশবিদেশের ভূতেরা-দিওজেন ও ভির	ইন্দ্রশেখর
ভূতের আড্ডা	ভূতের বাড়ি- স্যালি হাউস	ইন্দ্রশেখর
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	অংকের বিচিত্র জগত	বৈজ্ঞানিক
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	মহাবিশ্বে মহাকাশে-মহাকাশের ভূতুড়ে আলো	কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	কিং সলোমন্‌স্ মাইন্‌স্	ঋজু গাঙ্গুলী
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	টেকনো টুকটাক-মুদ্রা থেকে নোট	কিশোর ঘোষাল
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	প্রতিবেশী গাছ-বনতুলসী	অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	ভারতের বৈজ্ঞানিক-অশোক দাস	সংহিতা
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	আবিষ্কারের কাহিনি	রাজীব কুমার সাহা
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	সহজ বিজ্ঞান-দুর্লভ ইলিশ	অরূপ ব্যানার্জি
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	সহজ বিজ্ঞান-হাতির চেয়ে বড়ো স্থলচর প্রাণী নেই কেন	সুজিতকুমার নাহা
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	দুমুখো দর্পন	সুমন পাল
বৈজ্ঞানিকের দপ্তর	কেম্যাজিক-রুমালে দাউদাউ	পান্নালাল গোস্বামী
লোককথা	আইওই বৃক্ষের কিংবদন্তি	রাখি পুরকায়স্থ 8372087982
বিদেশী গল্প	ইংরিজি গল্প-ভয়ানক এক রাতের গল্প	অনু অমিত দেবনাথ
বিদেশী গল্প	রাশিয়ান গল্প-ভেলরিওকা	অনুবাদঃ দেবজ্যোতি
বিদেশী গল্প	জাপানি-জাদু চটি	সোনালী ঘোষাল
বিশ্বের জানালা	অচেনা ঈশান	মালিনী ভট্টাচার্য
বিশ্বের জানালা	আঙ্কল স্যাম	সংহিতা
বিশ্বের জানালা	হিরোশিমা	উমা ভট্টাচার্য
লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	বইমেলার ছবি	
লিখিব খেলিব আঁকিব সুখে	সকালবেলার গল্প	
ধাঁধা মজা রহস্য	ধাঁধা	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	ড্রুড্‌ল	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	অবিশ্বাস্য	ইন্দ্রশেখর
ধাঁধা মজা রহস্য	কীসের ফটো	সংগৃহীত
ধাঁধা মজা রহস্য	মগজ ধোলাই	রণিত পাল
ধাঁধা মজা রহস্য	গত সংখ্যার উত্তর	ইন্দ্রশেখর
ধারাবাহিক উপন্যাস	অন্তিম অভিযান	পিটার বিশ্বাস
ধারাবাহিক উপন্যাস	জাদু রাজ্য	মুরাদুল ইসলাম
ছড়ার পাতা	করাতদেঁতো	রোয়াল্ড ডাহল অনুবাদ কৌশিক ভট্টাচার্য
ছড়ার পাতা	হালুমবা	টি এস এলিয়ট অনুবাদ আবু হোসেন
ছড়ার পাতা	র‍্যাপিডেক্স সমাস শিক্ষা	অমিতাভ প্রামাণিক
ছড়ার পাতা	মুরগি চুরি	সঞ্জয় মিত্র
ছড়ার পাতা	জাগ্‌লিং থট	দেবীস্মিতা দেব
ছড়ার পাতা	মনের কথা	প্রিন্স মাহমুদ হাসান
ছড়ার পাতা	শৈশবের দিনগুলি	রওশন মতীন
ছড়ার পাতা	ভালো লাগে	দেবাশিস বসু
ছড়ার পাতা	লেজকাহিনী	পার্থ চট্টোপাধ্যায়
কাতুকুতু	ইংলিশ চ্যানেল ও অন্যান্য	রসিকলাল দাস
টাইম মেশিন	ঠগির আত্মকথা	অলবিরুণী
টাইম মেশিন	ভারতভ্রমণ	দীন মহম্মদ -অনুঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়
টাইম মেশিন	সীমান্তের অন্তরালে	সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
টাইম মেশিন	ইতিহাসের খন্ডচিত্র-প্যারীচরণ সরকার	অতনু প্রজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মরণীয় যাঁরা	কান্‌হোজি আংরে	উমা ভট্টাচার্য

এস গান শুনি	সুরঢাক	প্রদীপ মুখোপাধ্যায়
সেই মেয়েরা	লিজে মাইটনার	উমা ভট্টাচার্য
বনের ডায়েরি	ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প - বিস্ট অ্যান্ড মেন ইন ইন্ডিয়ার বঙ্গানুবাদ	পিয়ালী চক্রবর্তী, (মূল লেখাঃ জন লকউড কিপলিং)



এসে গেল বসন্ত। পরীক্ষা শেষ। বেড়াতে যাবে তো? বাবা মায়ের সাথে তো বটেই, কিন্তু সে ছাড়াও আরো একরকমের বেড়ানো হয় শীতকাল থেকে শুরু হয়ে বসন্তের প্রথম অংশটা পর্যন্ত।

সারা দেশ জুড়েই এমন অনেক দাদাদিদি রয়েছেন তোমাদের যাঁরা বড়ো হয়ে গেলেও, কী আশ্চর্য, আজও ভালোবাসেন পাহাড় চড়তে, লম্বা পথে পিঠে ঝোলা চাপিয়ে একলা একলা যেতে যেতে আকাশবাতাসের সঙ্গে গল্প করতে, পাখি দেখতে অথবা চিনে নিতে আকাশের তারাদের।

এই দাদাদিদিরা গোটা এই সময়টা জুড়েই বাড়ি থেকে দূরে আকাশ-বাতাস-পাহাড়-নদীর কাছে ঘুরে বেড়াবার ডাক দেন সব ছোটোদের। নির্জন কোন পাহাড়ের ঢালে ম্যাজিকের মত গজিয়ে ওঠে ক্যাম্পের তাঁবু। তারপর তোমাদের একটা বড়ো দলকে নিয়ে তিনচারদিনের ক্যাম্পজীবনের পালা। পাখি চেনা, গ্রামজীবনকে চেনা, লম্বা হাঁটার আনন্দ, রাতের অন্ধকারে তারা চিনে ফিরে এসে গল্পের আসর, আর সবচেয়ে জরুরি, পাহাড় চড়বার গোড়ার শিক্ষা।

একটা ম্যাজিক বলে দি চুপিচুপি। যদি তুমি একবার জেনে ফেল, কেমন করে পাথরের খাঁজ আঁকড়ে ধরে আকাশে মাথা উজিয়ে উঠে যাওয়া যায় একটা পাহাড়ের মাথায়, তাহলে যেদিন তুমি সেইটে করে ফেলতে পারবে সেদিন থেকে জীবনের সব ভয় তোমায় ছেড়ে পালাবে। পরীক্ষা হোক কি রাগী বাবা, কাউকেই আর ভয় লাগবে না তখন দেখে নিও। ভয়গুলো আসলে সবচেয়ে ভয় পায় পাহাড়কে। তাকে যে জয় করে তাকে তাই ভয়ও ভয় পায়

জানবে। যেমন এবারের জয়ঢাকের মলাটের ওই ছোট্টো মেয়েটাকে। পুরুলিয়ার গজাবুরুতে যেদিন সে ওই লম্বা পাথরটার মাথায় নিজে নিজে চড়ে গেল, সেদিন থেকে সে একজন বেজায় সাহসী মানুষ।

যাবে নাকি? এই বসন্তে পাহাড় চড়তে? না পার যদি তাহলেও পরের শীতবসন্ত তো রইলই। ম্যাজিকটা একবার পরখ করে দেখতে হবে তো!

ভালোবাসায়,
তোমার জয়ঢাকি দাদাদিদিরা

বিজ্ঞাপন

পাগলদের জুতো

পাগলদের গোল গোল পায়ে যে গোল গোল জুতো লাগে সে আর কে না জানে! তাদের জুতো তো আর সাধারণ জুতোর দোকানে পাওয়া যায় না! আমরা বানাই সে জুতো।







MADSHOES, MADAGASCAR

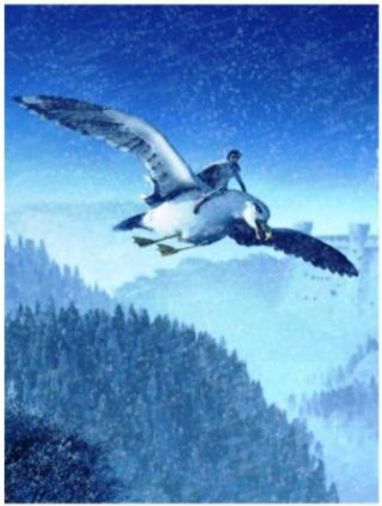
আসুন দুনিয়ার পাগলেরা, হরেকরকম আকর্ষণীয় ডিজাইন থেকে বেছে নিন

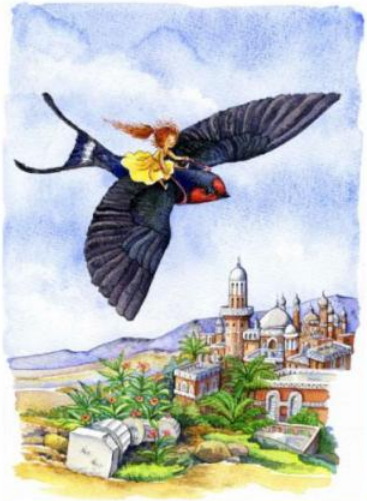
™

বিজ্ঞাপন

দিল্লি – মুম্বই – চেন্নাই - বেঙ্গালুরু দৈনিক উড়ান

জয়ঢাকিদের জন্য আকর্ষণীয় ছাড়









নাইট সার্ভিস অর্থাৎ
নৈশ উড়ানের জন্য
আছে প্যাঁচা

যাও পাখি

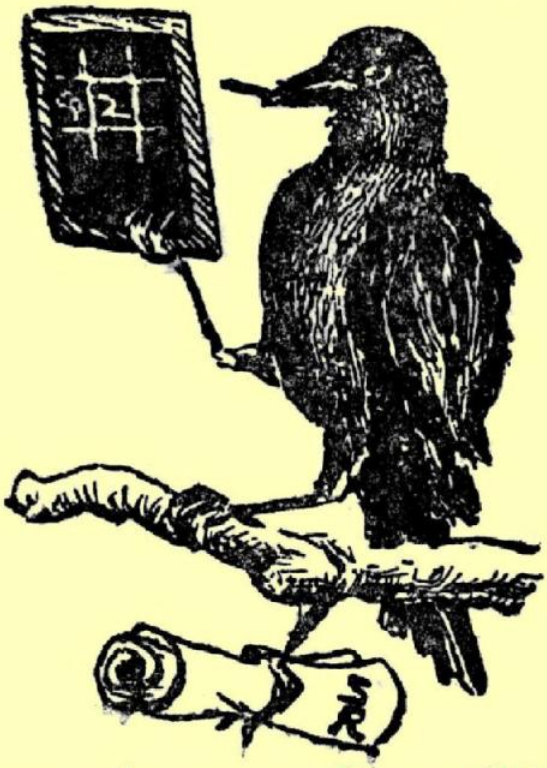
আকাশে ওড়ার প্রকৃত বিশেষজ্ঞদল পরিচালিত
দূষণমুক্ত উড়ান পরিসেবা

TM

বিজ্ঞাপন

সহজ অঙ্কশিক্ষা

প্রফেসর কাক্কেশ্বর কুচকুচে



অঙ্কে কাঁচা? অঙ্ক পরীক্ষায় ভীতি?
আর কোনও ভয় নেই। চলে এসো আমার কাছে।
ত্রৈরাশিক, ভগ্নাংশ, সুদকষা, চক্রবৃদ্ধি, চৌবাচ্চা, তৈলাক্ত
বাঁশ ও বাঁদর ইত্যাদি যাবতীয় অঙ্ক সহজে শেখানো হয়।
রেটঃ মাসে এক ইঞ্চি আড়াই সের
ঠিকানাঃ ৪১ নং গেছোবাজার, কাগেয়াপটি

™

দাঁতের ক্ষয়?

আর নেই ভয়

টির‍্যানোসরাসের দাঁতের ডিএন এ হইতে প্রস্তুত

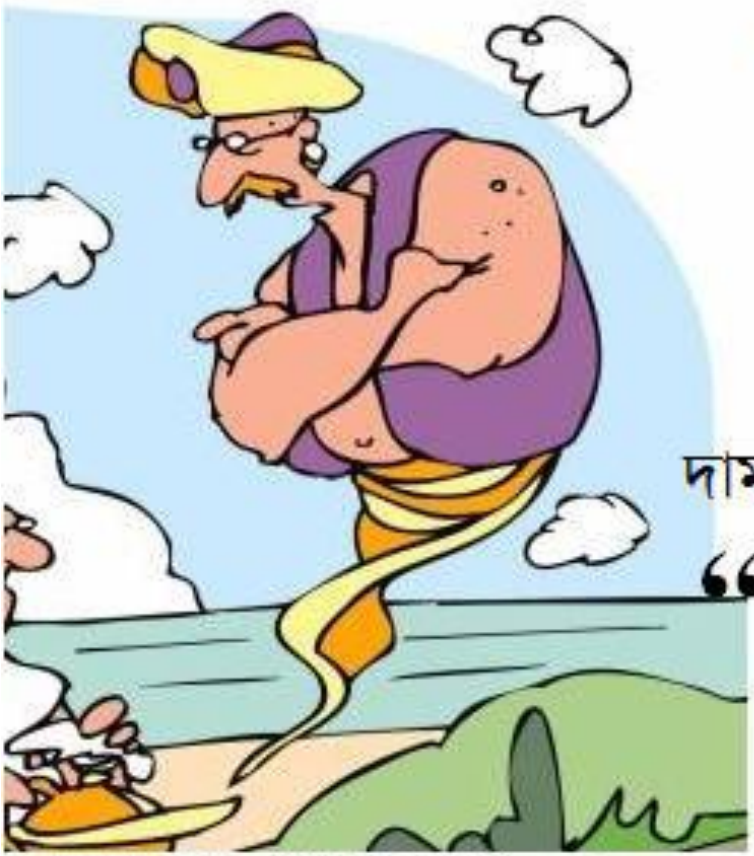






পনেরোদিন ব্যবহারে

নিশ্চিত ফল



আপনার তিনটি উইশ নথীভূক্ত হয়েছে।
আমাদের কাস্টমার সাপোর্ট টিম
শীঘ্রই আপনার সাথে–

তোমার ইচ্ছে আমার জিন



ইচ্ছাপূরণের অব্যর্থ যন্ত্র
দামাস্কাসের মন্ত্রমুগ্ধ মাটিতে প্রস্তুত

"Genie-us"

প্রদীপ।

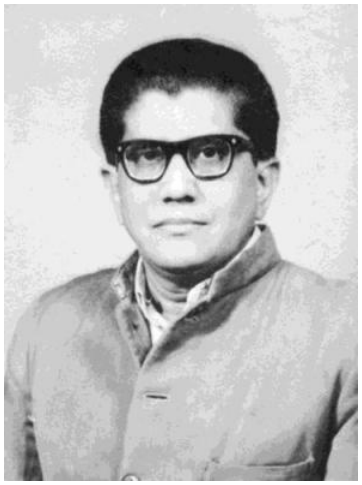
বিশদ জানতে
হেল্পলাইনে ফোন করঃ
১৮১২১২১৮০৮১২১

বসন্ত স্পেশাল–শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

আমার বাবা

চুমকি চট্টোপাধ্যায়





"একী বাবা? তোমার চটিটা তো যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে! কিনে আনি এক জোড়া?"

"আরে ব্যস্ত হয়ো না মা। এখনো তো অর্ধেকটা ছেঁড়া বাকি। চলবে আরও কদিন। সুবিধেমত আনলেই হবে।"

স্যান্ডাকের চপ্পল। বাড়িতে পরতেন। হঠাৎই চোখে পড়ে, ডান পায়ের পাটির ওপরের ফ্ল্যাপটা অর্ধেকের বেশি খুলে এসেছে। কিন্তু শুনলে তো কিনে আনব বলাতে কী উত্তর দিলেন।

কে পরতেন? কার কথা বলছি?

আমি বলছি স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। বিবাহসূত্রে যিনি ছিলেন আমার শ্বশুরমশাই। কিন্তু এই সম্পর্কে না বিশ্বাসী ছিলেন তিনি, না আমি। আমি ছিলাম ওঁর মেয়ে আর উনি আমার বাবা। আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন।

উনি বলতেন, "দেখ মা, মেয়েরা পারে না এমন কোন কাজ নেই। এই যে অন্য পরিবেশ থেকে, বাবা-মাকে ছেড়ে তুমি আমার বাড়ি এসে কেমন সুন্দর মানিয়ে নিয়েছ, আমাকে বাবা বলে ডাকছ... এর থেকেই বোঝা যায় ' অ্যাডাপ্টিং কেপেবিলিটি' মেয়েদের অসামান্য।"

আমি বললাম, " আমার বাবাকে তো আমি 'বাপী' বলি তাই তোমাকে বাবা বলতে কোন বাধা নেই। যদি আমার বাবাকেও 'বাবা' বলতাম তাহলে তোমাকে বাবুজি বলে ডাকতাম।"

এই শুনে হো হো হো হো করে উদাত্ত হাসি হাসলেন বাবা। গলির মোড় ছাড়িয়ে সে হাসি ভেসে গেল বহুদূর। বাবার গলার স্বর এত জোরালো ছিল যে তা শোনা যেত বেশ দূর থেকে।

বাবাকে যেমন দেখেছি তার কিছু ঝলক এখানে তোমাদের জানাচ্ছি। অমন মানুষ সম্পর্কে গুছিয়ে বলা আমার কর্ম নয়। তাই অল্প কিছু গল্পকথায় বলি কেমন?

যে ছোট্ট ঘটনার কথা প্রথমেই বলেছি তার থেকে কিছু আন্দাজ করতে পারলে কী? নিশ্চই পেরেছ। কী সাধারণ মানের জীবনযাত্রা ছিল বাবার, না দেখলে ভাবা যায় না। আমি যখন এই পরিবারে আসি তখন স্বচ্ছল অবস্থা এদের। কিন্তু বিলাসিতার থেকে হাজার হাত দূরে থাকতেন বাবা। বিলাসিতা ছিল কেবল বই এর ক্ষেত্রে। বই কেনার সময় দাম দেখতেন না বলা যায়। ওঁর পছন্দের, প্রয়োজনের বইয়ের জন্যে উনি কিনতেনই। ওটাই একমাত্র বিলাসিতা ছিল বলা যায়।

বাড়িতে ধুতি পরতেন লুঙির মত করে। তার ওপরে পাঞ্জাবি। গরমকালে হাতাওয়ালা গেঞ্জি পরে থাকতেন। বাইরে বেরোলে ধুতিই পরতেন তবে সঠিক পদ্ধতিতে। আর পাঞ্জাবি। শীতকালে বাড়িতে পাঞ্জাবির ওপর জহরকোট আর বাইরে বেরোলে শাল গায়ে দিতেন। পায়ে পরতেন কালো পাম্প শু। আমি কোনদিন বাবাকে আর কোন পোশাকে দেখিনি।

ওঁর যা কিছু পরিধেয় ছিল, সেগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত পরার অবস্থায় থাকত, উনি ব্যবহার করতেন। বলতেন, "জানো মা, একটা সময় ছিল যখন ঘরে শুয়ে আকাশের চাঁদ দেখেছি। চালে এমন ফুটো ছিল। খালি পায়ে স্কুলে গেছি। দারিদ্র কাকে বলে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। তাই অপচয় করতে মন চায় না।"

দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতেন কাগজ কলম বইপত্র নিয়ে। কী অসম্ভব পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল! দেখে অবাক হতাম। ওঁর রোজকার জীবন যাপন একটু বলি তোমাদের।



সকাল ন'টার আগে ঘুম থেকে উঠতেন না। খুব খুশি হলে তো শুনে? ভাবছ, এক্কেবারে তোমার মতো। পুরোটা জানো আগে। সকাল সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে জলখাবার খেতেন। এই প্রসঙ্গে বলি, খেতে অসম্ভব ভালোবাসতেন বাবা। এবং সেটা যে কোন বাঙালি খাবার।

জলখাবারে কী খেতেন জানো? যা খেতেন তা তোমাদের একটুও রুচবে না । কিন্তু বাবা খেতেন তৃপ্তি করে। ভেজানো ছোলা ছোট এক বাটি, দু-তিন রকম ফল কয়েক টুকরো করে। আর এক বাটি দুধ সঙ্গে মুড়ি বা খই। আর থাকত বড় কাপে চা। একটু ঠাণ্ডা করে চা খেতেন। দোক্তা দিয়ে পান খেতেন দিনে দুটো। একটা জলখাবারের পরে আর একটা দুপুরের খাবার খেয়ে।

ফল দিয়ে মা পুজো করতেন। সেই ফলেরই কয়েক টুকরো বাড়ির সকলকে প্রসাদ হিসেবে দিতেন মা। বাবাও পেতেন সেই ভাগ। মজার কথা হচ্ছে, আমরা কপালে ঠেকিয়ে সেই প্রসাদি ফল খেতাম। বাবা কিন্তু সে সবের ধারও ধারতেন না। কারণ উনি ছিলেন পুরোপুরি নাস্তিক। বাবার কথায়, "যা আমি চোখে দেখিনি, তা আমি বিশ্বাস করি না। ভূত এবং ভগবান-- এদের কারুর সঙ্গেই আমার মোলাকাত হয়নি তাই আমি এদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নই।"

এমন দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন কথাগুলো যে আমি নিজে আস্তিক হওয়া সত্বেও ধন্দে পড়ে যেতাম। বাড়িতে কালিপুজো হয়। অবাক হয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি ঈশ্বর মানো না তবে কালিপুজোয় মানা কর না কেন?"

বললেন, "তোমার মা কালীর ভোগ যে যত্ন নিয়ে রাঁধেন আর তার যে অপূর্ব স্বাদ হয়, আমি খাব বললে তো ওই রান্না হবে না। খাবার লোভেই বারণ করি না, বুঝলে? হাহাহাহা।"

খেতে অসম্ভব ভালোবাসতেন সে কথা আগেই বলেছি। তবে কোন বাছ-বিচার ছিল না। দুপুরে ভাতের সঙ্গে সাধারণ বাঙালি বাড়িতে যা রান্না হয়, ডাল, তরকারি, মাছ...সেসব তো তৃপ্তি করে খেতেনই তার সঙ্গে খেতেন বাবার স্পেশাল বাগান চচ্চড়ি। যতরকম মরসুমি সবজি সব একসঙ্গে সেদ্ধ করে নুন গোলমরিচ দিয়ে আহা বাহা করে খেতেন। আমরাও ওই অদ্ভুত ঘ্যাঁট থেকে দূরে থাকতাম। বাগান চচ্চড়ি নামটা আমার শাশুড়ি মায়ের দেওয়া ছিল।

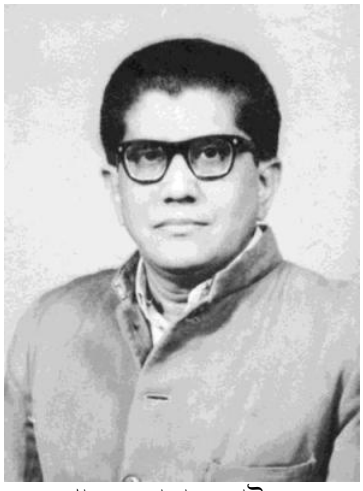
দৃঢ়তা.. হ্যাঁ, দৃঢ়তা ছিল বাবার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু মেনে নেওয়া, বা কেউ কিছু বললেই সেটা বিশ্বাস করে নেওয়া ওঁর ধাতে ছিল না। যেটা উনি যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করতেন, সেটাই উনি বিশ্বাস করতেন, মানতেন। যুক্তি দিয়ে ওঁকে বোঝাতে পারলে উনি অবশ্যই তা মানতেন। আমার অনেক কথা উনি মেনে নিয়েছিলেন এভাবেই।

একটা ঘটনা বলি। আমাদের চারতলা বাড়ির রান্না এবং খাবার ঘর ছিল চারতলায়। শোবার সব ঘরই তিনতলায়। বাবা খেতেন সবার শেষে, একা একা। কারণ জলখাবার খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়তেন আদ্যপ্রান্ত খুঁটিয়ে। দুটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি কাগজ পড়তে তাই যথেষ্ট সময় লাগত। এরপর স্নান সেরে যখন খেতে বসতেন তখন বাড়ির বাকি সকলের লাঞ্চ কমপ্লিট। বাবাই এই নিদান দিয়েছিলেন, ওঁর জন্যে অপেক্ষা না করার।

একদিন বাবা ওপরে খাচ্ছেন। হঠাৎ আমার কানে আসে খুব জোর বিষম খাওয়ার শব্দ। আমি ছুট্টে ওপরে গিয়ে দেখি বাবা জোর বিষম খেয়েছেন। তাড়াতাড়ি হাতে নুন ঢেলে বাবার সামনে ধরি। বাবা নুন নিয়ে জিভের পেছন দিকে ঘষতে বিষমের দমক কমে। এটা একটা টোটকা। তোমরাও জেনে রাখ। চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল বাবার।

"বাবা, তুমি একা একা খাও। এভাবে বিষম খেয়েছ। যদি আমি না শুনতাম বা বাড়িতে না থাকতাম তাহলে? মা ঘুমোচ্ছেন। এটা তো খুবই ভয়ের ব্যাপার!"

"হ্যাঁ মা, সেটা ঠিকই। তুমি না এলে মুশকিল ছিল।"



“বাবা, তিনতলার পুবদিকে তো দু’খানা ঘর পড়ে আছে, ব্যবহার হয় না। ওটার একটা রান্নাঘর আর একটা খাবার ঘর করে নিলে হয় না? তাহলে অন্তত আমাদের কাছাকাছি থাকবে।”

খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বললেন, “খুব ভালো কথা বলেছ মা। তাতে সকলেরই সুবিধে হবে। তোমার মায়েরও তো বয়েস বাড়ছে। হাঁটুতে ব্যথাও আছে। ওনাকেও আর ওপর-নীচ করতে হবে না। বাঃ, খুব ভালো প্রস্তাব। আমি কালই ত্রিদিবের সঙ্গে এবিষয় কথা বলব।”

একমাসের মধ্যে রান্না- খাওয়ার ব্যবস্থা তিন তলায় হয়েছিল। তাহলে বুঝলে তো, কথায় যদি যুক্তি থাকত তবে উনি ঠিক তার গুরুত্ব দিতেন।

সকালে কাগজ পড়া শেষ করে নিজের কাজ নিয়ে বসতেন। বাবার কাজের টেবিল টপ টা শ্বেত পাথরের। পায়াগুলো টিক উডের। লম্বাটে টেবিল জুড়ে থাকত বাবার ফাইল, এ ফোর সাইজের কাগজ দিয়ে তৈরি প্যাড। অবশ্যই সাদা কাগজের। নানান বই আর থাকত এক গোছা ফাউন্টেন পেন। বাবা কোনদিন বল বা জেল পেনে লেখেননি। পেনগুলো সযত্নে গোছান থাকত একটা পেন্সিল বক্সে। আর ছিল চার আলমারি ভর্তি বই। ছিল কেন, এখনো আছে। তবে এখন গুগল জ্যেঠু এসে গিয়ে তাদের ব্যবহার অবশ্যই কমে গেছে।

তোমরা হয়ত ভাবছ মাত্র চার আলমারি বই? এ আর এমন বলার মতো কী? আসলে এই চার আলমারি ভর্তি হল সাধারণ জ্ঞান যাকে আমরা জেনারেল নলেজ বলে থাকি, সেই সমস্ত বই। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে শুরু করে নিউ বুক অফ নলেজ, কী নেই! এই সব বই ছিল বাবার সন্তানের মত।

বাবা ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ। পুরোপুরি সাহিত্যের ছাত্র। কিন্তু আমি দেখেছি, কী অসামান্য জ্ঞান সব বিষয়ে। কী করে জান? অদম্য জানার ইচ্ছে, তার জন্যে প্রচুর পড়া এবং আত্মস্থ করা। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই।

কিশোর ভারতীতে তখন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশ্নত্তোরের বিভাগ ছিল ' সওয়াল জবাব '। বাবা সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন বাণী মৌলিক নামে। অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশ্নও আসত। একটা প্রশ্ন ছিল, সিমেন্ট কেন জল পড়লে জমে যায়।

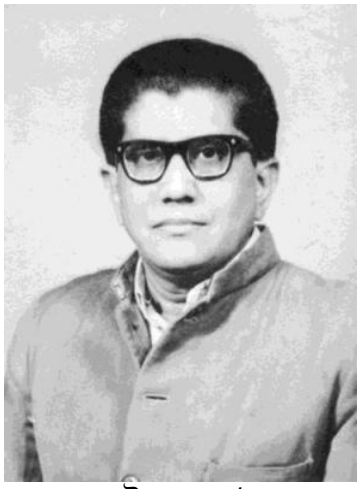
এই একটা প্রশ্নের উত্তরের জন্যে বাবা কী প্রচণ্ড পড়াশোনা করলেন। সমস্ত বই ঘেঁটে বের করলেন এর উত্তর। এবং সেই উত্তরকে সহজ ভাষায় লিখলেন কিশোর ভারতীর বন্ধুদের জন্যে। এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি।

রাত আড়াইটে তিনটে অবধি জেগে হয় পড়তেন না হয় লিখতেন বাবা। মগ্ন থাকতেন নিজের এই জগতে। আর ভালোবাসতেন কথা বলতে। কেমন কথা? যে কথা অন্যের উপকার করে, ক্ষতি নয়।

কারো কোন অসুবিধে হলে বা কেউ বিপদে পড়ে বাবাকে এসে যদি বলত, বাবা মন দিয়ে শুনতেন। তারপর সুন্দর করে বলে দিতেন সে কী করবে তার অসুবিধে বা বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে। কোন কোন সময় নিজেও ছুটে যেতেন প্রয়োজন হলে। মনেপ্রাণে ছিলেন কমিউনিস্ট। বিশ্বাস করতেন বড়লোক গরিবলোকের বিভেদ একদিন থাকবে না।

চোখের সমস্যা খুব কষ্ট দিত বাবাকে। দু-দুবার রেটিনা ডিটাচমেন্ট হয়েছিল। এক মাসের ওপর চোখে ব্যান্ডেজ থাকত। চোখের যন্ত্রণার থেকেও বেশি কষ্ট পেতেন পড়তে লিখতে পারতেন না বলে।

আমি তখন রোজ খবরের কাগজ পড়ে শোনাতাম বাবাকে। এই প্রসঙ্গে বলি, দুটো বাংলা ও একটা ইংরেজি খবরের কাগজ আসত। সেই তিনটেরই প্রথম পাতার বাঁ দিকের কোণ থেকে শেষ পাতার ডান দিকের কোণ পর্যন্ত পড়তেন বাবা। কিন্তু আমি যখন পড়তাম তখন হেডলাইন এবং গুরুত্বপূর্ণ খবর পড়া হলেই বলতেন, “এবার তোমার ছুটি। বুড়োটা অনেক্ষণ আটকে রেখেছে তোমায়। হা হা হা হা....।” সে হাসি যেন আজও আমার কানে ভাসে।



এত স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি ওঁর কাছ থেকে যা আজও আমার জীবনের পরম সম্পদ হয়ে আছে। এই যে তোমাদের জানাচ্ছি কিছু কিছু কথা, অনাবিল আনন্দ পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে, সাংঘাতিক কিছু গল্পের বই আমি পড়তাম না। আর লেখালিখির তো কল্পনাও করিনি কোনদিন। আজ যদি এক লাইনও লিখে থাকি, সে অবদান বাবার।

তবে আমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক দেখে মোটেই ভেবে নিও না যে দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমনি নরমসরম মানুষ ছিলেন। এতটাই গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং কঠিন একটা আবরণ ছিল ওঁর চেহারায় যে বেশিরভাগ মানুষই ওঁর সামনা-সামনি হতে বা কথা বলতে রীতিমত ঘাবড়ে যেত বা ভয় পেত। আত্মীয়স্বজনদের মুখে ওঁর আরও একটা নাম ঘুরত, " রয়াল বেঙ্গল টাইগার"।

সেটা ১৯৯৩/৯৪ সাল হবে। নানান কারণে কিশোর ভারতী বেরোতে প্রায় মাসের শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাবার শরীর ভালো যাচ্ছে না। উনি দেখাশোনা করতে পারছেন না ওঁর মানসকন্যাকে। ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন ভেতরে ভেতরে। ত্রিদিব পত্র ভারতীকে প্রতিষ্ঠা দিতে লড়াই করছে। এমন এক কঠিন সময়ে একদিন বাবা আমাকে ডাকলেন, “দেখ মা, যে পরিশ্রম এবং যত্ন নিয়ে আমি কিশোর ভারতী কে প্রকাশ করে এসেছি, কিছুকাল ধরে তার বিচ্যুতি ঘটেছে নানান সমস্যায় পড়ে। এ যে আমার কী যন্ত্রণা সে বলে বোঝাতে পারব না। ত্রিদিবও পেরে উঠছে না সময় দিতে। এ অবস্থায় একমাত্র তুমিই পার সাহায্য করতে। আমার ইচ্ছে, তুমি কিশোর ভারতীর দায়িত্ব নাও। তাকে আবার তার সম্মানের জায়গা ফিরিয়ে দাও। সময়মত পত্রিকা প্রকাশ হওয়াটা খুব জরুরি।”

আমি তখন অবাক হয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। আমি? আমি তো কিছুই জানি না কীভাবে বই তৈরি হয়! এমন একটা প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার দায়িত্ব নেব কী করে! পারব?”

“তোমাকে সব রকম পরামর্শ, সাহায্য আমি এবং ত্রিদিব করব। তুমি লেগে পড় মা।”

সরাসরি কিশোর ভারতীর অন্দরে ঢুকে পড়লাম আমি। হাতে করে কাজ শিখতে শুরু করলাম। পরের কিশোর ভারতী প্রকাশিত হল মাসের গোড়ায়। মনে পড়ছে, বাবা পত্রিকা হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখে স্মিত হাসি। দুটো চোখ জ্বল জ্বল করছে। মাথায় হাত দিলেন। আমার আত্মবিশ্বাস বাড়ল।

ন’বছর বাবাকে পেয়েছি আমি। পেয়েছি ওঁর অফুরাণ স্নেহ, ভালোবাসা। ছেলেকে শাসন করলেও আমাকে প্রশ্রয়ই দিতেন। আরও কত কথা মনে পড়ছে। সেসব শোনাব পরবর্তী সময়। শেষ করব অমন রাশভারী, ব্যক্তিত্ব সম্বলিত একজন মানুষের ভেতরের কেমন ছেলেমানুষি লুকিয়ে থাকত, সেই ছোট্ট ঘটনা দিয়ে।

দীঘা বেড়াতে গেছি আমরা সবাই। ভোরবেলা সমুদ্র সৈকতের দিকে হাঁটছি। বাবাও যাচ্ছেন। হঠাৎই বাবা দৌড়তে শুরু করলেন। ধুতি পরে দৌড়োন বেশ কঠিন কাজ। আমরা সকলে “পড়ে যাবে পড়ে যাবে” করে চেঁচাচ্ছি। কিছুদূর গিয়ে একটা ছাগলছানা কোলে তুলে ফিরলেন বাবা। দুরন্ত ঈগল, নীল ঘূর্ণির মত কালজয়ী লেখকের এই ছেলেমানুষীতে হেসে উঠলাম সবাই।

বাবা ছিলেন হিমালয়ের মতো। তাকে কী এত অল্পে বর্ণনা করা যায়! একটু ছুঁয়ে গেলাম।

ভালো থাকো তোমরা সবাই।



গোরু ঘোড়া সিংহ ভেড়া গানের জগতে বড়োই অসহায় বড়োই করুণার পাত্র। অথচ প্রকৃতির রাজ্যে অন্য সবার প্রতি এমন অকরুণ আচরণ তো দূরের কথা রীতিমতো আদর আপ্যায়ন করা হয়েছে গানের পর গানে। জুঁই চাঁপা গোলাপ চামেলী বকুল কৃষ্ণচূড়া গানে গানে এমন ফুলের কদর কতকাল ধরে। টিয়া কাকাতুয়া ময়ূর পায়রা বুলবুলি তোতা তো বটেই, কোকিল বৌকথাকওদের তো কথাই নেই। প্রায় হারিয়ে যাওয়া পাখি ডাহুক বা মুনিয়াদের পর্যন্ত তাবড় গায়কগায়িকার গানের জলসায় বিশেষ গুরুত্ব। হ্যাঁ, হতে পারে কাক শকুন হাড়গিলেদের ততটা দাপট বাংলা গানে নেই। প্যাঁচারাও পাখি না পাখি নয়- এই দ্বন্দে সম্ভবত গানের জগতে ততোটা অচ্ছুত হয়নি। কিন্তু ফুল হোক বা পাখি হোক অথবা নিতান্ত সাদামাটা বৈঁচি ফলের মালিকা অতি তুচ্ছ নাকের নোলক বা হরিদাসের বুলবুল ভাজা- গীতিকারের লেখনীর গুণে বা শিল্পীদের কণ্ঠে গানের ভুবনে যথেষ্টই মর্যাদা লাভ করেছে।

অথচ আমাদের চারপাশে যে জীবজন্তুরা নিয়ত সঞ্চারমান, যাদের না হলে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রায় প্রাণহীন, সেই তাদের অবস্থান আমাদের গীতিসম্ভারে যথেষ্ট সীমায়িত ও সংকুচিত। ওরা কি আমাদের কাছে কম দরকারি বা কেউ কম প্রিয়? অমন যে ভয়াল চরিত্রের এবং সৌন্দর্যের সাপের দল। তাদের বিষও কি শুধু প্রাণঘাতী? একই সঙ্গে ওরা কি প্রাণদায়ীও নয়? অথচ এদের প্রতি আমাদের মনোভাবটি কেমন? একটু সতর্ক হয়ে নজর করলে আমাদের রীতিমত চমকে যেতে হবে।

বাংলা গানে জীবজন্তুদের দেখা যদি সত্যিই কোথাও খানিকটা মেলে তা প্রধানত শিশুভোলানো ছড়ায় বা কিছু কিছু মজার গানে। গানের জগতে এধরনের গান গেয়ে যাদের খ্যাতি অনেকদিনের এমন কয়েকজন হলেন সনৎ সিংহ, আল্পনা ব্যানার্জী, বাণী ঘোষাল, নীলিমা ব্যানার্জী, জপমালা ঘোষ, রানু মুখার্জী, অন্তরা চৌধুরী কিংবা অমল মুখার্জী প্রমুখ। হেমন্ত মান্না সন্ধ্যা আরতি শ্যামল মানবেন্দ্রর মত সর্বোচ্চ স্থানীয় শিল্পীদের বহু গানেই অবশ্য জীবজন্তুদের দেখা সাক্ষাৎ মিলেছে। তবে জীবজন্তু বা মজার জগৎ ঘিরে যে শিল্পীর গানের ঘরানাটি ছিল সর্বাধিক শিশু চিত্তজয়ী। সেই সনৎ সিংহের গাওয়া কয়েকটি গানের দিকে নজর করে দেখা যেতে পারে। সেখানে জীবজন্তুদের প্রতি কেমন দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে বা তাদের প্রতি কতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এখন শোনা না গেলেও, একসময়ে 'কালনাগিনীর মাথার মণি' গানটা মোটের ওপর জনপ্রিয় হয়েছিল। এখানে কিন্তু দেখা গেল, অমন যে বিচিত্র বর্ণের সর্পসুন্দরী, যে নাকি মা মনসার অন্যতম সেরা অনুচর, তার রূপের প্রতি বা দংশন দক্ষতার প্রতি শিল্পীমশায়ের কোন মাথাব্যাথাই নেই, আর যত গরজ ঐ সাপটির মাথার মণির প্রতি... হায়রে সাপের কপাল... তার প্রতি এও কি কোন ন্যায্য আচরণ হল?

ঐ শিল্পীই আবার গেয়েছেন 'বাবুরাম সাপুড়ের' মত এক বিখ্যাত গান!

https://www.youtube.com/watch?v=_G0cYUMwjEI

https://youtu.be/_G0cYUMwjEI

এ গানে সাপখোপের মত নামীদামী প্রাণীর প্রতি কী বিসদৃশ্য আচরণই না প্রকাশিত হয়েছে! গানটির ফাঁকে ফোকরে মজাদার সাপের বাঁশি বাজিয়ে অনেক জাঁকজমক করে নানারকম সাপের কথা বলা হলেও নাটকের ক্লাইম্যাক্সের মত শেষকালে কিনা, গোটা দুই জ্যান্ত সাপকে ধরে আনতে বলা হল। এবং তাদের তেরে মেরে ডান্ডা দিয়ে একেবারে ঠান্ডা করে দেবার উত্তম উদ্দেশ্যটি অতি নির্লিপ্তভাবে ব্যক্ত করা হল। ভাব একবার কান্ডখানা, কী সাংঘাতিক কথা! কী হৃদয়হীন প্ল্যানিং!



সাপ অবশ্য এমন এক প্রাণী যাকে ভয় পায় না এমন মানুষ বিরল। সেদিক থেকে গানদুটির শিল্পী সনৎ সিংহকে নাহয় খানিক মাপই করে দেওয়া গেল! কিন্তু বাংলা গানের রাজপুত্র মানবেন্দ্র এবং রাজাধিরাজ হেমন্ত ওঁরা দুজনে মিলে ওদের জীবনের প্রথম ডুয়েটটিতে কী কাণ্ডটাই না করেছেন। একটি বাংলা ছবির গানের দৃশ্যায়নে দুই দুঁদে উকিলের লড়াইতে কবিগানের আসরে দুই উকিল তথা স্বনামধন্য গায়ক জুটি কী নিদারুণ ভাষাতেই না দুজনে দুজনকে আক্রমন করেছেন!

একে অপরকে ওরা কিনা গানের ভাষায় সম্বোধন করতে গিয়ে পরস্পরকে পেঁচা গরু হ্যাংলা হাতি ইত্যাদি মধুর বিশেষণসমূহ ব্যবহার করে জন্তুজগৎকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। গানটি যাঁরা শুনেছেন তাঁরা অবশ্যই মাঝে মাঝে অনুভব করবেন এ অভিযোগ কতখানি খাঁটি। যারা শোনেননি তাঁরা হেমন্ত সুরারোপিত 'হংসমিথুন' ছবির অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গানটি শুনে নেবেন। দেখবেন গানের শেষাংশে প্রতিপক্ষকে সেখানে 'গোবর মেখে ঘরে যাবার' উপদেশ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এ কি কম বেদনার কথা!

তবে জীবজন্তুদের হেনস্থা যে গানটিতে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে করা হয়েছে সেটি পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর ধরে বাঙালীর অতি প্রিয় একটি গান। সে গানের কথাটি উল্লেখ না করলেই নয়। যে গানটির প্রথম পংক্তিতেই জব্বর ধাক্কা 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ, ডিম নেই তবু অশ্বডিম্ব...' গান যতো এগিয়েছে ধাক্কার সংখ্যা বেড়েছে পাল্লা দিয়ে... গানটিতে স্বয়ং মা দুর্গার বাহন যে পশুরাজ সিংহ, তাকে কিনা ঐ গানে তার মাথায় গরুর মত শিং না থাকতেও কেন সিংহ নামে ডাকা হবে, এই অভিযোগ জানিয়ে কাঠগোড়ায় তোলা হয়েছে!

https://youtu.be/-jIWp0R5QhA

https://www.youtube.com/watch?v=-jIWp0R5QhA

অর্থাৎ সিংহের মত রাজকীয় পশুর মস্তকে গরু ছাগলের মত নিরীহ প্রাণীদের শিং থাকতে হবে, তবেই সে হতে পারবে সিংহপদবাচ্য। বোঝো ঠ্যালা... অন্যদিকে গরুর সঙ্গেও অন্যায় কি কম করা হয়েছে! যার মাথায় সত্যিই শিং আছে। এমনকি তার কণ্ঠের বিখ্যাত 'হাম্বা হাম্বা' রবটির কথাও গানটিতে উচ্চারিত। সেই গরু নামক জন্তুটার নামটি কিন্তু গানটির কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। একি গরুজাতির প্রতি চরম অসম্মান নয়?

কিন্তু অসম্মানের এখানেই শেষ নয়। অমন যে রাজা মহারাজাদের শৌর্যবীর্যের প্রতীক পশু ঘোড়া, সেই ঘোড়ার নামটিও গানটিতে বেমালুম উপেক্ষা করে, শুধুই ব্যাঙ্গোক্তি করা হয়েছে 'অশ্বডিম্বের' কথা এনে। 'অশ্বডিম্ব' কথার অর্থ কি 'লবডঙ্কা' নয়? অথচ মজার কথা হল, ঐ একই গানে ওপাড়ার বেঁটে বড়দা থেকে ওবাড়ির মুচকি হাসা মেয়েটির কথা পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে!

নস্যির সঙ্গে লস্যির মিল খাইয়ে শব্দ রসিকতার চেনা কসরৎ করা হয়েছে। অথচ তারই পাশাপাশি একটি মাত্র গানের ক্ষুদ্র পরিসরে তিন তিনটি প্রমিনেন্ট জন্তু ব্যাক্তিত্বকে স্রেফ হামাগুড়ি দেওয়ানোর অবস্থা করা হয়েছে। ইস...ছিঃ... হায়... উরেব্বাস... ওফ্‌ফ্‌ কি ভাষায় এর প্রতিবাদ করা যায় বলুন তো?

তবে একটু যদি চোখ কান খুলে আকাশ পানে তাকিয়ে দেখি, তাহলে দেখব অনেক কিছুই। পরিচালক যেখানে মৃণাল সেন মূখ্য অভিনেতার স্থানে খোদ উৎপল দত্ত। 'ভুবন সোমের' মত বিখ্যাত সিনেমায় অবাক হয়ে আমরা কী দেখি? একটি মহিষ চালিত গাড়িতে গাড়োয়ানরূপী শেখর চ্যাটার্জী কিনা 'চাহে মুঝে কোই জঙ্গলী কহে' গাইতে গাইতে গাড়ি চালাচ্ছেন! কেন মোষের কথা উল্লেখ করতে কী হয়! 'এ্যায় মেরে পেয়ারে ভৈঁসো, তু আগে বঢ়তা চল' এধরণের গান কি গাওয়া যেত না ঐ পরিবেশে? মহিষটানা গাড়ির কি কোনই ইজ্জৎ নেই!
চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে নয় 'শিং' সম্বন্ধীয় গানে নায়ক গায়ক কিশোরকুমার বা গীতিকার গৌরীপ্রসন্নকে জীবজগতের ওপর কিছু অন্যায় করাও মেনে নিতে হয়েছে। সেজন্যই গরু ঘোড়া সিংহ বিষয়ে তাঁদের গায়ে লেগেছে ছ্যাঁকা, শ্রোতারাও তাই নিয়ে কিছু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছেন... কিন্তু তবেই না ছবিটা অথবা তার গানগুলি এতবছর পরও একেবারে জীবন্ত হয়ে আছে!

ওদিকে বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী তথা লেখক অন্নদাশঙ্কর? তিনি কী করলেন? সামান্য এক ছড়া লেখার মোহে বাস্তবের পাখি হাট্টিমাটিম টিমকে একেবারে রূপকথার মোড়কে উপস্থিত করলেন! তাদের মাথায় নাকি খাড়া দুটো শিং আছে এবং তারা নাকি নিজের বাসা ছেড়ে মাঠে গিয়ে তবেই ডিম পাড়ে। তাঁকে তো আর চিত্রনাট্যের দাবি পূরণ করতে হয়নি? তথাপি তাঁর মতো গুণীও এই পাখিকে নিয়ে একেবারে 'বকচ্ছপ' জাতীয় কান্ড ঘটিয়ে বসেছেন!

https://youtu.be/e0t5yygF9TU

https://www.youtube.com/watch?v=e0t5yygF9TU

এরকমই তো ঘটতে থেকেছে বরাবর! অমন যে রানা প্রতাপ সিংহের ঘোড়া, তাতার বাহিনীর ঘোড়া কিংবা কোলকাতা পুলিশের দুরন্ত নধরকান্তি ঘোড়ারা এরা থাকতেও ওরাও কি কোনদিন বাংলা গানের কুলীন সভায় তেমন কৌলীন্য পেয়েছে সেভাবে? পেয়েছে কেবল পক্ষীরাজরা! পক্ষীরাজ বলে কোন প্রাণী না থাকলেও। গানের কলিতে তাদেরই যত দর কদর এবং আদর!

এরই পরিণতিতে আমরা দেখছি, অমন যে দুরন্ত ছুটন্ত হরিণ চিতা বাইসন উটপাখি ভায়ারা, রাজকীয় আকৃতির বাঘ ভাল্লুক সিংহ গণ্ডার হাতি সমূহ, গোবেচারা শান্তিকামী গরু ভেড়া উট জেব্রা গাধার দল, ধীর স্থির গতির কচ্ছপ খরগোশ শুয়োর পেঙ্গুইন বা জলহস্তী বাছারা, কমবেশি দুষ্টুমিষ্টি চালচলনের ইঁদুর বাঁদর হায়না হনুমান বিড়াল শিয়াল ভায়ারা কিংবা দারুণ মজারু চরিত্রের ক্যাঙারু শজারু গোসাপ ভাম বনবিড়াল বৃন্দগানের রাজ্যে এসব মান্যগণ্য প্রাণীর তেমন কোন দামই নেই। ওরা চির উপেক্ষিত, চিরদিন কোণঠাসা। হায় ব্যাঙ বেজি ছুঁচো গন্ধগোকুলগণ, তোমাদের গানের দাবিতে কোনদিন কোথাও মিছিল হল না। একটা প্রতিবাদী বক্তৃতা পর্যন্ত না।

অথচ বাস্তব কী বলে? জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ঐ ছাগলের দুধেই তো তার জীবনধর্ম রক্ষা করে চলতেন! বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ? ঘোড়ার গাড়িতে চেপেই না বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতেন! ডাকসাইটে লেখক শরৎচন্দ্র? তার সঙ্গে একটা পোষা নেড়ি কুকুর কোথায় না কোথায় ঘোরাঘুরি করত! আর রবীন্দ্র শরৎ পরবর্তী যুগের সেরা উপন্যাসিক তারাশঙ্কর? তিনি তো ব্যাঘ্রচর্মের ওপর বসেই রচনা করতেন বাঘা বাঘা সব উপন্যাস! কানে কেন্নো ঢুকিয়ে দুরন্ত সব কাহিনী লিখতেন নাকি বিশ্ববিখ্যাত লেখক গী দ্য মপাসাঁ। অথচ সাধারণ মানুষ আমরা? এইসব প্রাণীকুলের সঙ্গে সচরাচর কেমন ব্যবহার করি? সামান্য একটু এঁটোকাঁটা খাইয়ে রাজ্যের নেড়িকুকুরদের প্রভুভক্তি আদায় করে ওদের দিয়ে বাড়ির বা গোটা পাড়ারই দারোয়ানগিরি করিয়ে নিই! কোন ছোটলোকগোছের কাউকে গালিগালাজ করতে তাদের গাধা বাঁদর উল্লুক উটমুখো হিপোপটেমাস ইত্যাদি বলে গায়ের ঝাল ঝাড়ি। যে গোমাতার উপকারের কোনো সীমা পরিসীমা নেই, তারই নাম নিয়ে কিনা অন্যের বুদ্ধিকে বক্রোক্তি করি! মুখ বেঁকিয়ে বলি, গোরু কোথাকার! ভণ্ডামি করে আবার মা দুর্গার পায়ের কাছে ওদেরই বাহন বানিয়ে ভক্তিতে গদগদ হই! প্যাঁচা বাদুড়রা যাতে ফল খেয়ে নষ্ট করতে না পারে, সেজন্যে গোটা

গাছকেই জাল দিয়ে ঢেকে রাখি! আরে বাবা উৎকৃষ্ট না হোক, কমদামী কিছু ফলের বাগান ওদের জন্যও তো রাখা দরকার, তাই না? কিন্তু সে'সব হয়কি?

সুতরাং গানের জগৎ, যা কিনা বাঙালি জাতির অতি আদরের জগৎ, সেখানে এই জন্তুজানোয়ারের দল থেকে গেছে চিরবঞ্চিত এবং উপেক্ষিত। সব একদর এবং দামহীন। গানের হাটে গোরু ঘোড়া হাতি বাঘ সিংহ সবারই একদর, সবারই মূল্যহীনতা। অথচ এরা সভ্যতার আদিযুগ থেকে মানুষের প্রগতির বোঝা কি কম টেনেছে? অথচ গরুমহিষ হাতি ঘোড়ার অনেক পরে আসা রেলগাড়ির বেলায়? কত গানে এ যন্ত্রযানের সগর্ব উল্লেখ, সপ্রশংস স্বীকৃতি!

অথচ একই চেষ্টা করলেই, এইসব প্রাণীদের কিছু কিছু গানে অমর করে রাখাই যেত। যেমন শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের নাট্যরূপে বা চলচিত্র রূপে গোফুর জোলা আর তার মেয়ে আমিনা তাদের পোষা বলদটাকে ভালবেসে গাইতেই পারত

ঘানি টেনে টেনে বলদ খানার কী হাল হয়েছে আহা
ফলমূল খড় খেতে পায় কি ও, খেতে চায় যাহা যাহা!
কিংবা রাহুলদেবের 'দার্জিলিং যাত্রার' অনুকরণে কি তৈরি করা যায়না-
এবার পূজায় বড়ো মজা ভাই ক্যাঙারুর দেশে যাব
ক্যাঙারু কাকুর সঙ্গে সাগর কিনারে দিন কাটাব
ক্যাঙারুর ছানা কোলে কাঁখে করে গাব রবীন্দ্রগান
সে নব আমোদে ভুলে যাব যত অনাদর অপমান
ওদের দেশেতে ওদের পশুকে ক্রিকেটটা শেখাব
এবার পূজায় বড়ো মজা ভাই ইত্যাদি ইত্যাদি?

তবু ধন্যবাদ, সেইসব গানের মানুষকে, যাঁরা সুযোগ সুবিধা পেলেই জীবজন্তুদের নিয়েও কিছু গান তৈরি করেছেন। পারলে সেসব গানের একটা তালিকা বানানো যেতেই পারে। পাখপাখালিদের নিয়েও এরকম গবেষণায় মজা পাওয়া যাবে যথেষ্ট! কিন্তু এবার আর সময় নেই এবারের মত 'জয়ঢাক স্টেশন' থেকে 'সুলেখ গাড়িওয়ালার' 'গরুর গাড়ি ক্যাঁচর ক্যাঁচর' বিদায় নিচ্ছে। হুইই হ্যাট হ্যাট...

সম্পাদকীয় দফতর থেকেঃ

এই লেখাটি পড়ে বড়ো দুঃখ পেয়ে আমরা সমস্ত মানুষের তরফে পাপস্খালনের জন্য এই গানটি গাইলামঃ
ও আমার হাম্বামাসী
তোমার ডাকে কতই মধু
তবুও তোমার ঘাড়ে
খ্যাঙড়া মারে
গাঁয়ের বঁধু

ও ঘোড়া নালবাঁধানো
জিন সাজানো
লেজটি খাড়া
রাত্রে চিঁহি সুরে
তান করে রোজ মাতাও পাড়া

ও গাধা ঘ্যাঁক্কো ঘেঁকুর
তুলছ ঢেঁকুর বাগের খালে
আমি তো শুনছি তুমি
গাইছ খেয়াল কার্ফা তালে

ও বাবু রাম গো তোমার
মাথায় কেন দুষ্টমতি
জ্যান্ত সাপটি ধরে
পিটিয়ে তারে
করছ কেন এ দুর্গতি

অ্যানিম্যাল বন্ধু সবাই
তবুও জবাই মুরগি পাঁঠা
তোমাদের মূর্খ বলে
বাজার চলে অনিল জ্যাঠা

জয়ঢাক বলছে খুলে
মুখটি তুলে
ওসব কথা মিথ্যে শুধু
ও আমার হাম্বামাসী
তোমার ডাকে কতই মধু



বন্দনা গাই পলাশ ফুলে

বসন্ত এসেছে।
পলাশ ও রুদ্রপলাশের
ডালি সাজিয়ে তার বন্দনা
করলেন পুরুলিয়া থেকে
তোমাদের তরুণদাদা, শ্রী

তরুণ সরখেল



বছর ঘুরে
ফের মধুমাস
আমার দেশে
রুদ্রপলাশ

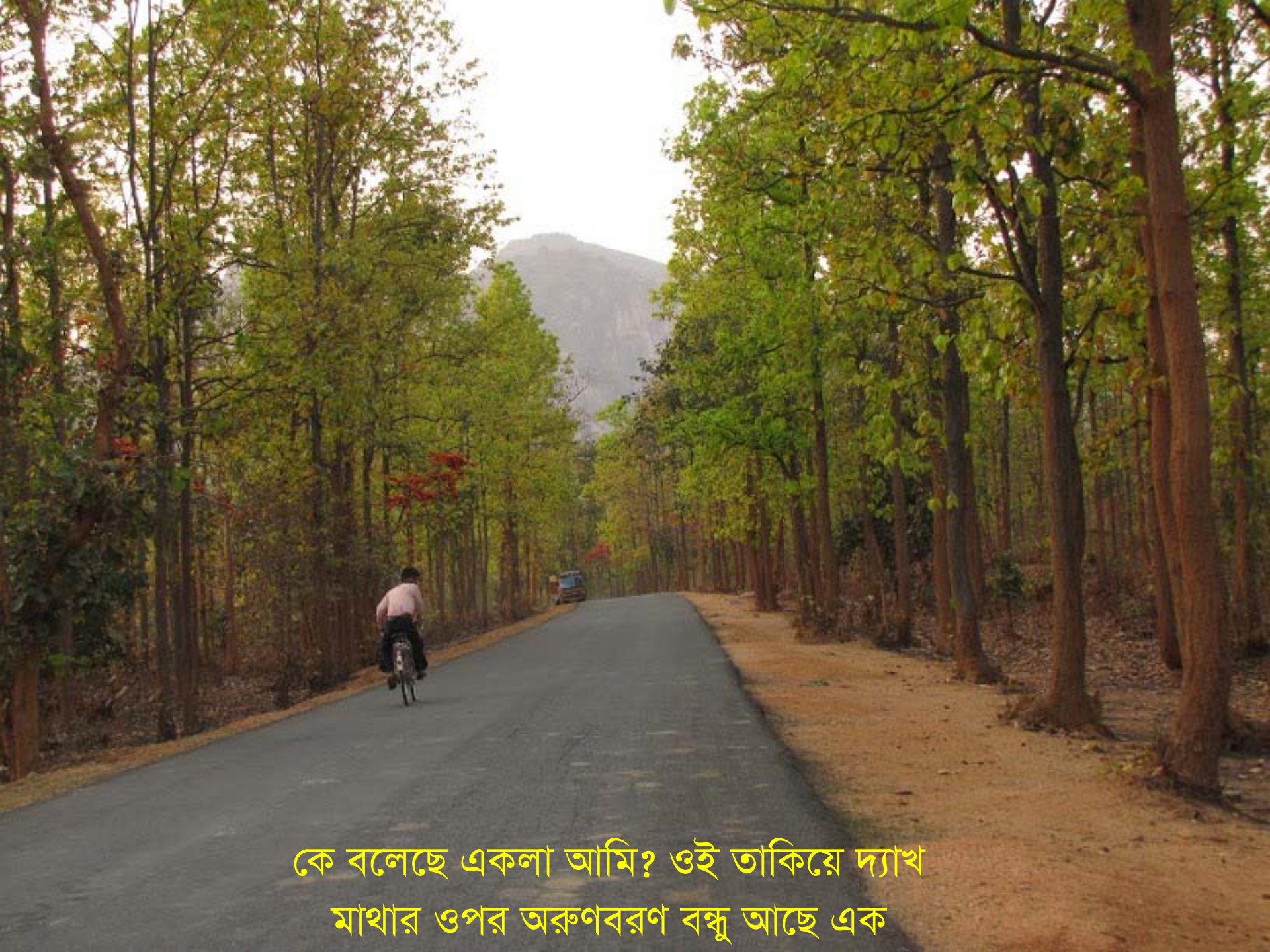


পলাশের ভিড়ে আকাশ যায় না দেখা
তার নীচে ও কে হেঁটে যায় একা একা



বন্ধু হল আজ

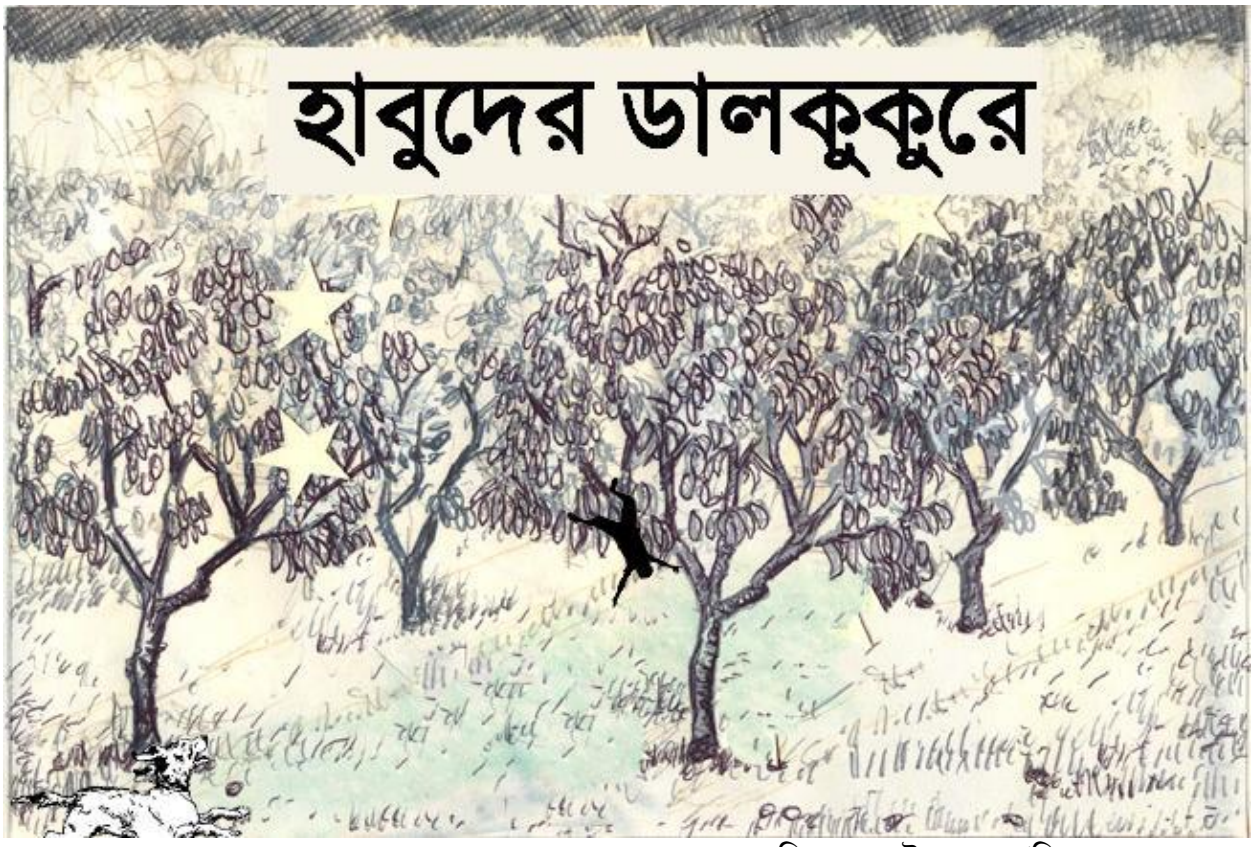
প্রণাম তোমায়, প্রণাম ঋতুরাজ



কে বলেছে একলা আমি? ওই তাকিয়ে দ্যাখ
মাথার ওপর অরুণবরণ বন্ধু আছে এক


একলা পলাশ, আসবি
আমার বাড়ি?
এই যে কেমন বন্ধু দিলাম,
পলাশরঙিন শাড়ি


পাহাড় খাড়া অনেক দূরে
আকাশ ভাসে কাছে
এইখানেতে আমার একটা
পলাশ বাগান আছে



কবি নজরুল ইসলামের ‘লিচুচোর’ অবলম্বনে
নাট্যরূপ- তাপস শংকর ব্রহ্মচারী।

চরিত্রঃ-অমল ,কমল,বাচ্চু, বিল্টু , গাবলু, বিজন, হরিয়া, বোসবাবু, একটি কুকুর

একটা শান বাঁধানো রোয়াকে দেখা যাবে কয়েকজন বসে গল্প গুজব করছে। বয়স সব ১২ থেকে ১৫ এর মধ্যে। অমল সবচেয়ে বড়ো লিডার গোছের। সঙ্গে কমল, বাচ্চু।

অমল- আর পারা যায় না। কী গরম কি গরম রে বাবা।
কমল- ঠিক বলেছ। সারাটা রাত ছট্‌ফট্‌ করে কেটে গেল।
বাচ্চু- কেন ছটফট করলি কেন? তুই তো বলিস গরম শীত কোন কিছুতেই তোর কিছু যায় আসে না।
কলম- দেখেছ অমলদা, বাচ্চুর কথাটা শুনছ তো? সব সময় ঝগড়া বাধানোর তাল।
অমল- ছাড়তো কমল ওসব কথা। আর এই বাচ্চু তুইই বা সবটাতে ফোড়ণ কেটে কথা বলিস কেন?
বাচ্চু- ঠিক আছে বলব না। ছিঁচকাঁদুনে। সবসময় “শুনেছো অমলদা” -মেয়েদের মত স্বভাব।
কমল- কী বললি? আমার মেয়ের মত স্বভাব? দ্যাখ বাচ্চু (এমন সময় দেখা যাবে বাচ্চু পকেট থেকে বার করে কী একটা মুখে দেয়। কমল সেটা ভাল করে লক্ষ করে) এই কী খেলি রে? দে দে আমায়।
বাচ্চু- দেব না-
কমল- দিবি না? অমলদা দ্যাখ বাচ্চু কী যেন খাচ্ছে।

অমল- এ্যাই বাচ্চু কী খাচ্ছিস রে? নিয়ে আয় নিয়ে আয় তো এখানে। (বাচ্চু অমলের কাছে আসে) বার কর বাচ্চু।
বাচ্চু- আর একটাই আছে। লজেন্স।(বার করে)
অমল- দে এদিকে। (লজেন্স নিয়ে ও মুখে পুড়ে দেয়)
কমল- অমলদা আমি-
অমল- চোপ্। মিষ্টি বেশি খেলে কিরমি হবে।
কমল- কিন্তু তুমি, বাচ্চু তোমরা যে খাচ্ছ?
অমল- বড্ড ডেঁপো হয়েছিস কমলা। এইনে খবর কাগজ নে। একটু হাওয়া কর। অসহ্য লাগছে। জোরে জোরে কর।
কমল- (হাওয়া করতে করতে) গাবলুটাই বেশ ভাল। যা আনে সবার জন্য আনে। বাচ্চুটা এক নম্বরের-
বাচ্চু- আরে গাবলুটা কোথায় গেল রে। ওকে দেখছি না কেন?
অমল- আরে তাইতো বটে। এ্যাতো দেরি তো ও করে না!
কমল- বাড়ি থেকে বোধ হয় বেরোতে দেয়িন। পড়তে বসিয়েছে।
বাচ্চু- ধ্যেৎ পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন আবার লেখাপড়া কীসের?
অমল- রোজই তো আসে। এতক্ষণের মধ্যে তো এসে যায়।
কমল- বিল্টুটাত ও আসেনি। কী হল বল তো?
বাচ্চু- দুজনে মিলে কোথাও গেল টেল নাকি?
অমল- কই কালকে কিছু বললে না তো? এখানেই তো ছিল?
বাচ্চু- গাবলুটাকে কোনও বিশ্বাস নেই অমলদা। ওর মাথায় হঠাৎ হঠাৎ প্ল্যান গজায়।
কমল- বিল্টুটার মাথায় তো গোবর পোড়া। একটুও বুদ্ধি নেই। গাবলুটা যা বলে তাই করে। কতবার ও এই করে ফেঁসেছে-
অমল- কমলা তুই চুপ করবি? কিচ্ছু জানিস না শুনিসনি ক্যাচ ক্যাচ করছিস্।
কমল- আমি সবই বাজে কথা বলি, না? তুমিই বল না বিল্টুর কোনও সাহস আছে?
অমল- তোর আছে তো? এক কাজ কর যা চট্ করে বিল্টুদের বাড়িতে যা তো। দেখে আয় ত বাড়ি আছে কি না?
কমল- ওরে বাবা সে আমি পারব না। ওদের বাড়ি আমি যেতে পারব না।
বাচ্চু- কেন ওদের বাড়ি যেতে পারবি না কেন?
কমল- বিল্টুর বাবাটা না কেমন যেন। দেখা হলেই বড়ো বড়ো বানান জিজ্ঞাসা করে। আর না পারলেই রাস্তার মাঝখানে কান ধরে ওঠবোস করায়। ও আমি পারব না।
বাচ্চু- আরে বানান জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিবি।
কমল-(ভেঙিয়ে) উত্তর দিবি। বল্তো কুজ্ঝটিকা বানান কী?
বাচ্চু- (ঢোঁক গিলে) অমলদা দেখেছ তো কমল কেমন তর্ক করে।
অমল- সত্যিই তো। একটা বানান পারিস না আবার বড়ো বড়ো কথা।
কমল- তু- তু- তুমি বলো.....
অমল- চোপ্ আবার মুখে মুখে কথা। যা বলছি। এক্ষুনি যাবি দৌড়ে গিয়ে খবরটা নিয়ে আসবি।
(কমল ক্ষুণ্ণ মনে বেরোতে যায়। দেখা যায় হাঁফাতে হাঁফাতে বিল্টু মঞ্চে আসে। চেহারা অবিন্যস্ত। বিল্টু তোত্লা। বয়স কমলদের মতই)
কমল- আরে এই তো বিল্টু। তুই কোথায় ছিলি রে। তোর জন্যে ভেবে ভেবে আমরা তো সবাই অস্থির হয়ে উঠেছি। এ্যাতো বেলা হয়ে গেল তুই এলি না। তাইতো আমি সবাইকে বললাম যাই ওর বাড়ি গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে আসি।
অমল- (ধমক দিয়ে) আর একটা কথা যদি আমি তোর মুখে শুনি কমল- এই বিল্টে এধারে আয় বোস এখানে।
(বিল্টু আসে ও রোয়াকে বসে। বসে বসেই হাঁফাতে থাকে।)
বাচ্চু- আরে কী হল তোর? এ্যাতো হাঁফাচ্ছিস কেন?

বিল্টু- ব-বলছি বলছি সব বলছি- আগে একটু জ...জ...জ...
অমল- জল খাবি? (বিল্টু ঘাড় নাড়ে) এই কমলা যা পাশের দোকান থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে আয়...
কমল- আমি, কেন বাচ্চু তো...
অমল- চোপ্ যা জল নিয়ে আয়। (কমল বেরিয়ে যায় একটু পরেই একটা বোতলে করে জল নিয়ে আসে বিল্টু গোগ্রাসে জলটা খায়।)
অমল- বল এবার কী হয়েছে। কেউ তোকে তাড়া করেছে, বকাবকি করেছে। পাড়ার কোন মস্তান.....
কমল- বলনা আমরা ত আছি রে বাবা। ভয় কি তোর?
অমল- আবার.....
বিল্টু- না! না! ওসব কি কিছু না অ- অন্য ব্যাপার
বাচ্চু- অন্য ব্যাপার। কি ব্যাপার?
কমল- আরে ঘাবড়াচ্ছিস কেন? বল্না কী হয়েছে?
বিল্টু- হ-হয়েছে কি? আ-আজ স-সকাল বেলা ঘু-ঘুম থেকে উঠেছি, গা-গাবলু এসে ডা-ডাকল।
অমল- গাবলু? কেন?
বিল্টু- ব-বলছি, ব-বললে লি-লিচু খা-খাবি। মি-মিষ্টি লা-লা-
বাচ্চু- কী লা লা করছিস। লিচুর কথা শুনে লাল ঝড়ল তোর
বিল্টু- আরে তা তা ঠিক নয়। ব-বললে লা লা লাল লাল ব-বড়ো বড়ো লি-লিচু খাবি।
কমল- তারপর
বিল্টু- আমি ব-বললাম কে কে দেবে লি-লিচু? গাবলু বললে কে কে আবার দেবে। আ-আমরাই নি-নিজেরা নে-নেব। য-যত খুশি নে-নেব। যা-যাবি কিনা ব-বল।
আমি ব-বললাম কো-কোথায় রে। ও ব-বললে চ-চল তো।
বাচ্চু- গেলি?
বিল্টু- যাব না মা-মানে। না-না গেলে ও ছা-ছাড়বে?
কমল- লিচু খেলি খুব মিষ্টি নারে। আমাদের জন্যে আনলি না?
বিল্টু- (কাঁদো কাঁদো গলায়) তু-তুই চুপ কর। মি-মিষ্টি!
অমল- এই কমলা তুই চুপ করবি?
কমল- ঠিক আছে ঠিক আছে।
অমল- বল্তো এবার পুরো ব্যাপারটা। কিছুই তো ছাই বুঝতে পারছি না। গাবলাটাই বা কোথায় গেল?
বাচ্চু- ঠিকই তো। হ্যাঁ রে বিল্টু গাবলু কোথায় গেল। বুঝেছি তোকে হাটিয়ে দিয়ে একাই সব লিচু গুলো সাবড়াচ্ছে, তাই তো?
বিল্টু- সে আ-আমি কী করে ব-বলব। আ-আমি তো ওকে আর দে-দেখতেই পেলাম না। আমাকে যে-যেই না ধ-ধরেছে ও যে কো-কোথায় লু-লুকলো কে-কে জানে।
কমল- ধরেছে কী রে? তোকে কে ধরল?
বিল্টু- তবে শোন পুরো ব্যা-ব্যাপারটা
অমল- বল তো শুনি। এই কমলা ভাল করে হাওয়া দে।

(কমল বিমর্ষ মুখে কাগজ তুলে হাওয়া করে। ক্রমে লাইট কমতে থাকে। অন্যদিকে হালকা আলোয় দেখা যাবে বিল্টু ও গাবলু এপাশ ওপাশ তাকাতে তাকাতে সন্তর্পণে ভেতরে আসছে। গাবলুর হাতে একটা কাস্তে। এটা একটা বাগানের দৃশ্য। উইংসের একপাশ থেকে একটা গাছের ডাল বেরিয়ে থাকতে দেখা যাবে। সেই দিকেই ওরা এগোতে থাকে)

বিল্টু- কি-কিরে আর ক-কতদূর।
গাবলু- এই তো এসে গেছি।
বিল্টু- তু-তুই যে বললি হা-হাবুদের তা-তা-তালপুকুরের কাছে।
গাবলু- তাই তো ঐ তো তালপুকুর। বলেছিলাম না পুকুরে ওপারে লিচুর গাছটা।
বিল্টু- তা-পু-পুকুর তো পেরিয়ে এ-এলাম গা-গাছ, লি-লিচু কই?
গাবলু- (উইংসের দিকে দেখিয়ে) ঐ তো লিচুগাছ দেখতে পাচ্ছিস না। আর লিচুগুলো দ্যাখ। কী রকম লাল লাল বড়ো বড়ো।
বিল্টু- আরে বা-ব্বাস কী ব-বড়ো বড়ো লি-লিচুরে। পাড়লে কেউ প্যাঁ- প্যাঁ.....
গাবলু- কি প্যাঁ প্যাঁ করছিস। বেশি কথা বলিস না। চুপ কর।
বিল্টু- না-না বলছি কেউ প্যাঁ- প্যাঁদাবে না তো?
গাবলু- ধরা পড়লে ছেড়ে দেবে নাকি। পেঁদিয়ে একেবারে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে। শোন তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক। পাহারা দে। আমি গিয়ে গাছে উঠছি। কাউকে দেখলেই জোরে জোরে সিটি মারবি। ছুটে পালাব এখান থেকে। পারবি তো?
বিল্টু- পা-পারব না কেন? আমি খু-খুব ভাল সি-সিটি মারতে পারি। পুঁ-পুঁ-পুঁই পুঁই ক-করে।
গাবলু- ঠিক আছে ঠিক আছে..... আমি যাচ্ছি তবে
(গাবলু হাতে বস্তাটা নিয়ে গাছের দিকে যায়)
বিল্টু- এই গা-গাবলু কা-কা-কাস্তেটা এনেছিস কেন?
গাবলু- আস্তে। আস্তে কথা বলতে বলছি না। লিচুর ছড়া পাড়ব কী করে কাস্তে ছাড়া?
বিল্টু- (হাসতে হাসত) ও তা-তা-তাই বল। ব-ব-বড়ো বড়ো লিচু। খুব মি-মিষ্টি ব-বল?

(গাবলু চলে যায় বিল্টু ওর দিকে তাকিয়ে থাকে) লিচুর ভাবনায় বিভোর বিল্টু। পেছন দিয়ে মঞ্চে ঢোকে গাছের মালিক বিজন বাবু। বিল্টু অন্যদিকে তাকিয়ে থাকায় তাকে দেখতে পায় না)

বিজন- (ভাল করে আপাদমস্তক দেখে) এই ছোকরা
বিল্টু- কে কে কে ডাকছে?
বিজন- আমি ডাকছি।
বিল্টু- আপ-আপনি আ-আমায় ডাকছেন কে-কেন আ-আমি কি
বিজন- তুই এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস?
বিল্টু- কি-কিছু না তো। কি-কিছু না
বিজন- তুই বাগানে ঢুকেছিস কেন?
বিল্টু- এ-এমনিই ঢু-ঢু-ঢু...
বিজন- কি ঢু-ঢু করছিস? তালপুকুর পেড়িয়ে বেড়া ডিঙিয়ে বাগানে ঢুকে কি করছিলি লিচুগাছের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বল্। বুঝেছি চুরি করার মতলব-
বিল্টু- না না আমি চু-চুরি করব কেন? আমি চু-চুরি করতে আসিনি?
বিজন- তবে কীজন্যে এসেছিস। পাহারা দিতে? তোর সঙ্গে আর কে আছে? বল?
বিল্টু- এ মা- কী- কী বলছেন। কে- কেউ নেই আ-আমার সঙ্গে। এই দেখুন না আ-আমি তো একা।
বিজন- তুই একা? তোর সঙ্গে কেউ নেই? ঠিক বলেছিস?
বিল্টু- পু-পুরোপুরি ঠিক।
বিজন- পুরোপুরি ঠিক। তুই একা বাগানে ঢুকেছিস।
বিল্টু- আজ্ঞে হ্যাঁ এ-একা।

বিজন- এ্যাই হরিয়া ইধার আও। একটা মোটা ডান্ডা লে আও।
বিল্টু- এ্যাঁ ডা-ডা-ডান্ডা কেন? ডা-ডান্ডা কী-কী হবে?
(মঞ্চে আসে হরিয়া। কালো গাঁট্টা গোট্টা চেহারা। বড়ো গোঁফ হাতে ডান্ডা। মাথায় গামছা বাঁধা।)
হরিয়া- কেয়া হুয়া বাবু? ডান্ডা কিঁউ? সাপ-খোফ বেরুলো কি?
বিজন- আরে না সাপ-টাপ না। এটাকে দ্যাখ। বাগানে ঢুকেছে।
হরিয়া- আরে এতো একটা ছুঁচো আছে।
বিল্টু- কী- কী বললে? আ-আমি ছুঁচো?
হরিয়া- চোপ শালা। কথা বলবি তো মেতে হাড্ডি গুঁড়ো করে দেব। বোল শালা বাগানে ঢুকলি কেন? চোরি মতলব?
বিজন- আমার ও তাই মনে হচ্ছে।
হরিয়া- বোল্ কী চুরি করলি? সামান দেখা।

(বিল্টুর কোমর জামার পকেট ইত্যাদি দেখে।)

হরিয়া- না বাবু কিছু নিতে পারেনি। কিন্তু শালা জরুর চুরি করত। আপনি আসিয়ে গেছেন তো তাই- শালা চোর কাহিকার
বিল্টু- চো-চোর চোর বলবে না তো-
বিজন- না তোমায় চোর বলবে না সাধু বলবে শয়তান কোথাকার বেড়া টপকে বাগানে ঢুকে লিচুগাছের দিকে তাকিয়ে তুমি ধ্যান করছিলে।
বিল্টু- ব-বললাম তো যে আ-আমি.....
বিজন- চোপ্। আর একটাও কথা নয়। উঠ বোস কর। উঠ বোস কর।
বিল্টু- ও-ও-ও
বিজন- হ্যাঁ উঠবোস- কানে ধরে দশবার। শুরু কর-
হরিয়া- কী রে চোর- শুরু কোর শুরু কোর-
বিল্টু- এটা কি কিন্তু অ-অন্যায় হচ্ছে।
হরিয়া- আরে এমনি করবি? না (ডান্ডা দেখায়) এটা লাগবে?
বিল্টু- ক-করছি করছি (ওঠ বোস শুরু করে)
হরিয়া- আরে কান ধর। বাবু বললেন শুনিসনি কি-

(কান ধরে ওঠবোস শুরু করে)

হরিয়া- হ্যাঁ ঠিক আছে হামি গুনতি করছি। এক- দো- তিন-

(দশবার ওঠবোসের পর)

বিজন- আর কোনদিন এ বাগানে ঢুকবি?
বিল্টু- (কাঁদো কাঁদো সুরে) আ- আজ্ঞে না জী-জীবনে কো-কোনদিনও না।
হরিয়া- ভাগ হিয়াসে। ভাগ্। আর কভি এ বাগানে দেখব তো এমন ঝাড় দিব যে জিন্দগি ভোর ইয়াদ রাখবি যা শালা-

(ঘাড় ধাক্কা দেয়। বিল্টু ধাক্কায় পড়ে যায় ও উঠেই দৌড়ে পালায়)

বিজন- শোন হরিয়া তুই কাছে পিঠেই থাক মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে আরও কেউ আছে। ছোকরা মুখে বলল না বটে-
হরিয়া- হামার ভি ওহি ইয়াদ হচ্ছে।
বিজন- ঠিক আছে। যদি কেউ বাগানে ঢোকে পালাবে কোথায় ধরা ব্যাটা পড়বেই-
হরিয়া- হাঁ হাঁ জরুর ধরা পড়বে। হাতে পেলে এমন মার দিব না... *(গোঁফ মোচড়ায়)*
বিজন- আমি একটু কাজে বেরুচ্ছি। তুমি বাগানেই থাক। এধার ওধার একটু নজর রাখ।
হরিয়া- হাঁ হাঁ জরুর নজর রাখবে। আপনি নিশ্চিন্তে চলিয়ে যান। কোই চিন্তা নাই। হামি আছে না-
বিজন- চলি তাহলে।

(বিজন বেরিয়ে যায়। হরিয়া যেদিকে গাছের ডাল দেখা যাচ্ছে সেই দিকে উইংসের ধার ঘেসে বসে পড়ে)

হরিয়া- ইখানটাতেই বসি। বেশ হাওয়া ভি আছে। ইতনা বড়া লিচু গাছ হাওয়াতে ও জরুর হোবে।

(হরিয়া বসে কোমর থেকে খৈনী বের করে টিপতে থাকে। মনে মনে গানের সুর ভাঁজে। খৈনী মুখে দেয় ও একটু পরে আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎই মড়াৎ করে গাছের ডাল ভাঙার শব্দ শোনা যাবে। দেখা যাবে গাবলু এসে ঘুমন্ত হরিয়ার পিঠের ওপর পড়ে। হরিয়া অর্তনাদ করে ওঠে।

হরিয়া- আরে বাপ রে বাপ। মর গিয়ারে মর গিয়া। হাড্ডি চুরচুর হো গিয়া রে বাপ।

(এতক্ষণে সম্বিৎ ফেরে গাবলুর। ওর পিঠের ওপর থেকে নেমে পালাবার চেষ্টা করে। খপ করে ধরে ফেলে হরিয়া)

হরিয়া- এই শালা। ভাগ্‌ছিস কাঁহা রে। পালিয়ে বাঁচবি তুই?
গাবলু- পালাব কেন। পালাব কেন? কি করেছি আমি যে পালাব?
হরিয়া- না না কিছু করিস নি তুই। তা হামার ঘাড়ে পড়লি কেন বোল। কোমড় শালা মনে হচ্ছে কি ভেঙে গেল।

(পিঠে কিল মারে)

গাবলু- এ্যাই কী হচ্ছে কি মারছ কেন?
হরিয়া- না মারবে না আহ্লাদ করবে তুমাকে। (মারতে মারতে) বোল শালা বোল ঘাড়ে পড়লি কেন বোল-
গাবলু- বলছি বলছি-
হরিয়া- বোল।
গাবলু- আরে ঐ গাছের ডালটা ভেঙে গেল যে। ওটা যে এত পলকা ডাল আমি কী করে জানব?
হরিয়া- গাছের ডাল। আরে শালা তার মানে হচ্ছে কি তু লিচু গাছে উঠেছিলি। লিচু চুরি করতে এসেছিস তুই।
গাবলু- আরে না না লিচু চুরি করব কেন। আমি তো.....
হরিয়া- গাছে কি খেলা দেখাতে উঠেছিলি? (আবার মার) বোল কেন চুরি করছিলি।
গাবলু- ওরে বাবারে। আরে আমার কথাটা আগে শোনে না দারোয়ান বাবা?
হরিয়া- কী শুনব রে তোর কথা। মেরে আজ শালা তোর হাড্ডি মাস চুড়া চুড়া করে দেব। বোল কোথা লিচু রেখেছিস বার কর আগে।
গাবলু- এই দ্যাখো না আমার কাছে কোন লিচু আছে কিনা? সার্চ করে দ্যাখো-
হরিয়া- ওসব সারাচ টরাচ্ বুঝি না আমি। লিচু দেখা আমায়

গাবলু- এই মারবে না বলছি। তোমাদের লিচু একটাও নিইনি আমি। সরু সরু পলকা সব ডাল- ধরতেই ভেঙে গেল।
হরিয়া- আবার করছিস শালা। গাছে উঠলি ডাল ভাঙালি আবার কথা। দাঁড়া বাবুকে আগে ডাকি...

(পেছন ফিরে বাবু আসেন বাবু আসেন লিচু চোর পাকড়েছি বলে চেঁচাতে থাকে। সেই সময় গাবলু সুযোগ বুঝে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে হরিয়ার কোমরে টেনে লাথি কষায়। হরিয়া মুখ থুবড়ে পড়ে। সেই সুযোগে গাবলু দৌড় মারে। হরিয়া শুয়ে দেখে। পরে বাবু বাবু বলে উল্টো দিকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যায়। গাবলুকে দেখা যাবে বেশ জোরে খানিকটা দৌড়ে এসে (মাইকে দৌড় শোনানো হবে) হাঁফ ছাড়ে।)

গাবলু- (পেছন ফিরে তাকিয়ে বলে) ওঃ বাবা বাঁচলাম। বেটা তাড়া করতে পারেনি একটা লাথি ঝেড়েছি যে কদিন ধরে ব্যাটা টের পাবে। কিন্তু এ মা কাস্তে, কাস্তেটা কোথায়। বুঝেছি যখন ডাল ভেঙে পড়লাম তখনই কোথায় পড়ে গ্যাছে। ধ্যুৎ একটা লিচুও পেলাম না, কাস্তেটাও গেল। কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম আজ। ঐ বিল্টেটা। ঐ তোতলাটা এক নম্বরের আপয়া। বলেছিলাম এখানে দাঁড়াতে। ব্যাটা পালিয়েছে ঠিক। যাক্‌গে খুব জোর বেঁচে গেছি। আড্ডায় ফিরি তো আগে। ওরা কী ভাবছে কে জানে। যাওয়া যাক্‌। কেউ আসছে না ত আবার

(পেছন ফিরে দ্যাখে। সেখানে হরিয়া ছিল সেখানে দেখা যাবে একটা কুকুর জড়সড়ো হয়ে শুয়ে আছে)

শেয়াল নাকি রে এটা। এটা আবার এখানে কোথা থেকে এল। যাঃ যাঃ

(তাড়া দেয়। কুকুরটা ওঠে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে ওর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে)

ওরে বাবা শেয়াল কোথায়? এতো বাবুদের নচ্ছার ভেলো কুকুরটা। ওরে বাবা এতো এদিকেই আসছে রে। কী করি এখন? কোথায় পালাই রে বাবা?

(ছুটতে শুরু করে। পেছনে ভেলোও দৌড়য়। বেশ খানিকটা দৌড়ে উইংসের কাছে যায় ও আর্তস্বরে চেঁচায়)

মরে গেলাম। বোস কাকু বোস কাকু দরজা খুলুন, বাঁচান বাঁচান, হেল্প হেল্প

(দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন বোস বাবু বয়স্ক ভদ্রলোক)

বোস- কী হল কী হল কে চেঁচায়?
গাবলু- আজ্ঞে আমি গাবলু।
বোস- গাবলু, গাবলুটা কে?
গাবলু- বলছি বলছি আগে ওটাকে তাড়ান।
বোস- কাকে তাড়াব। ওটাতো একটা কুকুর দেখছি।
গাবলু- হ্যাঁ ঐ তো দেখুন না আমায় তাড়া করেছে আর একটু হলেই কামড়ে দিচ্ছিল।

(বোস কুকুরটাকে তাড়া দেয়। কুকুর চলে যায়)

বোস- কিন্তু কুকুরটা তোমায় তাড়া করল কেন? নিশ্চয় ওর পেছনে তুমি লেগেছিলে।

গাবলু- না না আমি কিছু করিনি। ও ঐ বাগানে শুয়েছিলো আমাকে দেখেই।
বোস- বাগানে? মানে ঐ বিজনবাবুর বাগানে? হ্যাঁ ওতো ঐ বাগানেই শুয়ে থাকে।
গাবলু- হ্যাঁ ওখানেই তো ছিল।
বোস- তা তুমি ঐ বাগানের মধ্যে ঢুকেছিলে কেন?
গাবলু- না মানে আমি ঠিক ঢুকিনি বুঝলেন। বাগান মানে ঐ গাছ-
বোস- বুঝেছি। গাছ মানে লিচু গাছ। লিচু চুরি করতে ঢোকা হয়েছিল ওখানে। কুকুরের তাড়া খেয়ে পালিয়েছ, এতো ভাল কথা নয়। বিজনবাবুকে ত একটা খবর দিতে হয়।
গাবলু- কেন কেন বিজনবাবু কেন? তিনি- তিনি-
বোস- তিনি নাও আসতে পারেন। তাঁর ঐ দারোয়ানটা কী যেন নাম- হরিয়াটাকে পাঠাতে পারেন-
গাবলু- ওরে বাবা আবার হরিয়া? আর এখানে এর মুহূর্ত নয়

(দৌঁড়ে পালিয়ে যায়। আবার ছুটতে দেখা যাবে। অন্ধকার হয়। আলো ক্রমশ পরিষ্কার হলে দেখা যাবে সেই শানবাঁধানো বাগানের দৃশ্য। সবাই বসে আছে।)

অমল- কিরে বিল্টে গাবলুর তো কোন পাত্তাই নেই রে।
বিল্টু- তা-তাইতো দে-দেখছি। এ-এখনো তো এল না।
কমল- অনেক লিচু পাড়ছে বুঝলি। আহ হেভি লিচু খাওয়া হবে।
বাচ্চু- আসলে গাবলুটা বেশ সাহসী আছে। বিল্টেটার মত নয়। বোকার হদ্দ।
কমল- হ্যাঁ ধরা পড়ে কান ধরে ওঠ বোস করে পালিয়ে এল।
অমল- এই বিল্টে যা না একটু এগিয়ে গিয়ে বাগানের ধারটা দেখে আয় না।
কমল- হ্যাঁ হয়তো অনেক লিচু একা বয়ে আনতে পারছেনা ও।
বিল্টে- আমি ঐ বা-বা-বাগানে। ক-কখনো ন-নয় ছিঃ ছিঃ ছিঃ ও- কি অ-অপমান।

(গাবলু মঞ্চে ঢোকে । উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। জামাটামা ছেঁড়া চোখে মুখে কালশিটার দাগ)

বাচ্চু- ওইতো গাবলু এসেছে। আয় গাবলু আয়। বোস্ বোস্।
কমল- লিচু কোথায় রে গাবলু? ব্যাগটা নিয়ে আয়।
অমল- ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দে। দেবে দেবে সবাইকে দেবে। তুই একটু জিরিয়ে নে তো গাবলু। তোরা এখন করিস না! যেন সব লিচু ও একা খাবে।
গাবলু- (মুখে গালে হাত বোলাতে বোলাতে) ওরে বাবা মরে গেলাম কী ব্যথা রে বাবা।
বাচ্চু- হবেই তো। অনেকগুলো লিচু সাবরেছিস তো। মুখতো ব্যথা হবেই।
কমল- খুব মিষ্টি লিচু তাই না রে? মুখ ভর্তি রস! আঃ-
বিল্টু- ক-কত গুলো পারলি গা গা গা
গাবলু- চোপ্ গা-গা করছে গাধা কোথাকার?
অমল- চুপ কর বিল্টু। যা বরং লিচুর ব্যাগটা নিয়ে আয়। কোথায় রেখেছিস রে গাবলু?
গাবলু- কীসের ব্যাগ, কীসের লিচু?(কেঁদে কেঁদে)লিচু নেই।
সকলে- লিচু নেই কীরে?
অমল- সকাল থেকে লিচু গ্যাঁড়ালি লিচু নেই কীরে?
কমল- একা একা অত লিচু তুই খেলি। আমাদের কথা একটুও তোর মনে এল না।
বিল্টু- তো-তোর জন্যে আ-আমি কি অ-অপমানটাই না হ-হলাম! কান ধরে ও-ওঠবোস। ছিঃ ছিঃ ছিঃ-

গাবলু- তুই ত ওঠ বোস করেছিস। আর আমি--
বাচ্চু- তুই আবার কী করলি?
গাবলু- উঃ কি প্যাঁদানিটাই না খেলাম।
অমল- মানে তোকে ঠেঙিয়েছে। কে রে?
গাবলু- আরে ওদের ঐ শয়তান মালিটা, কী মার মারল রে ভাই। জীবনে এরকম ধোলাই খাইনি-
কমল- আর লিচু?
গাবলু- একটাও না। ডাল ভেঙে পড়ে গিয়েই তো বিপত্তিটা হল। আর পড়বি পড় ওরই ঘাড়ে পড়ে গেলাম ব্যাটা গাছের পাশেই শুয়েছিল। চড় থাপ্পড় কিল ঘুসি- ও সারা শারীর আমার টনটন করছে।
বাচ্চু- গাছটায় লিচু দেখতে পাসনি?
গাবলু- ও সারা গাছ ভর্তি থোকা থোকা লিচু
অমল- আহা হা বলিস কি রে.....
কমল- আগামী হপ্তায় চল সকলে মিলে যাব-
গাবলু- কী? আবার? ঐ লিচু চুরি করতে?
বাচ্চু- হাঁ আমরা সবাই থাকব তোর ভয় কী?
গাবলু- পাগল, মালির ঐ পিটুনি, কুকুরের ঐ বেদম তাড়া, ওরে বাবা, এই নাক কান খৎ দিচ্ছি আমি আর ঐ চুরির মধ্যে নেই। তোমরা যা খুশি কর গে যাও। আমি চল্লাম। আমি তোমাদের মধ্যে নেই।

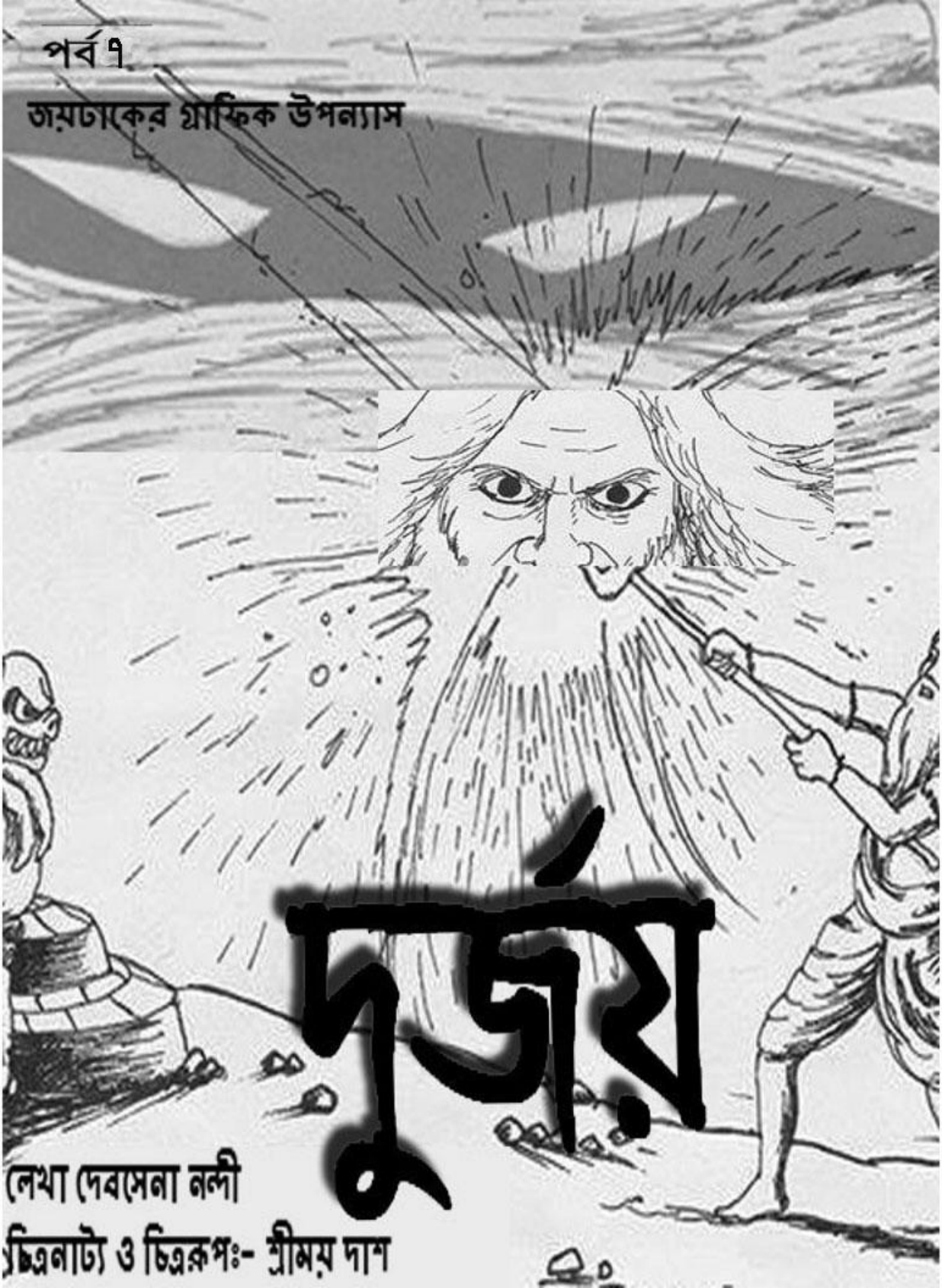
(পিঠে গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে হন হন করে বেরিয়ে যায়।)

সকলে- আরে গাবলু, যাচ্ছিস কোথায়। শোন না, শোন না।

(ওর গমন পথের দিকে সকলে এগিয়ে যায়। পর্দা পড়ে)

পর্ব ৭

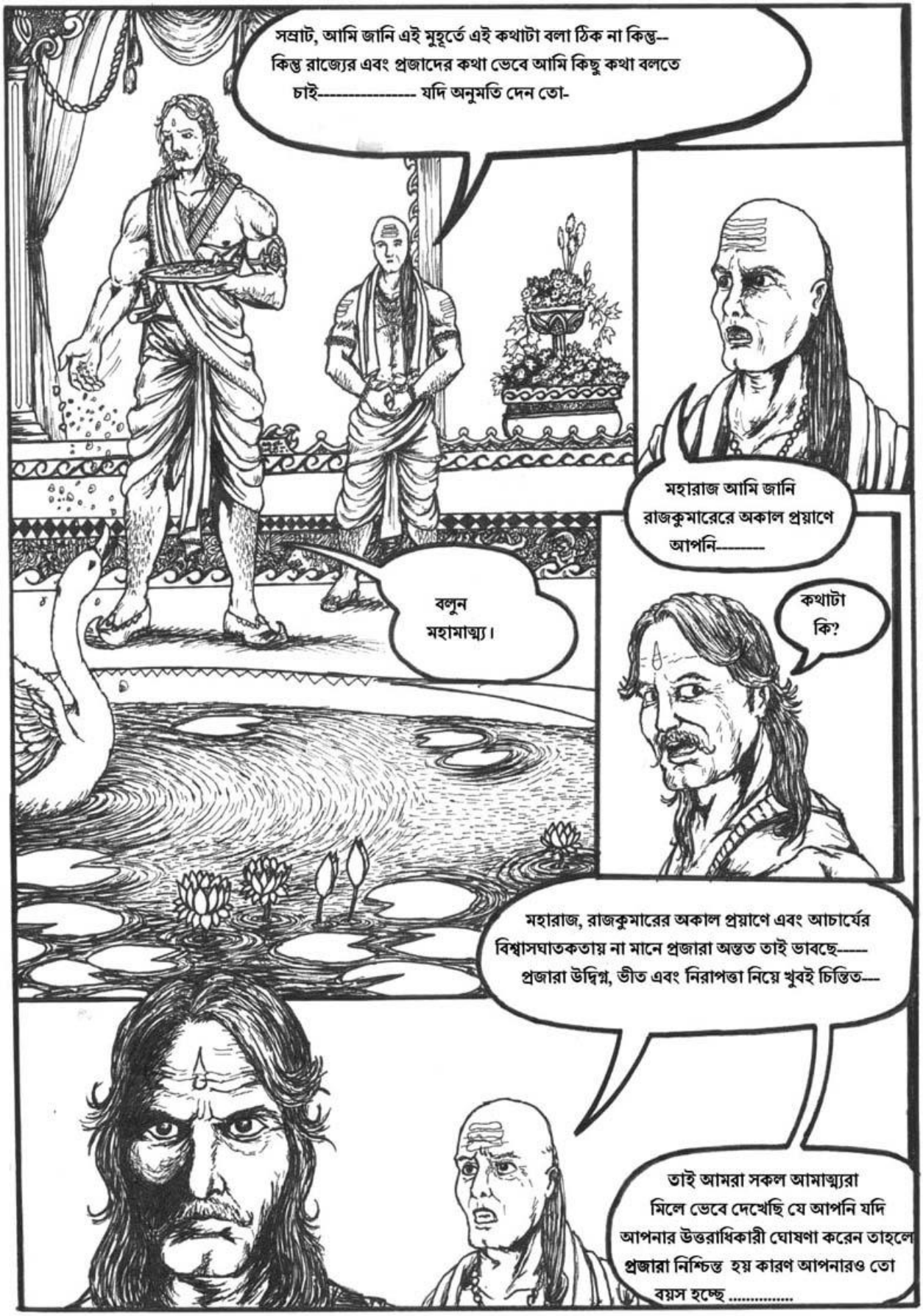
জয়ঢাকের গ্রাফিক উপন্যাস

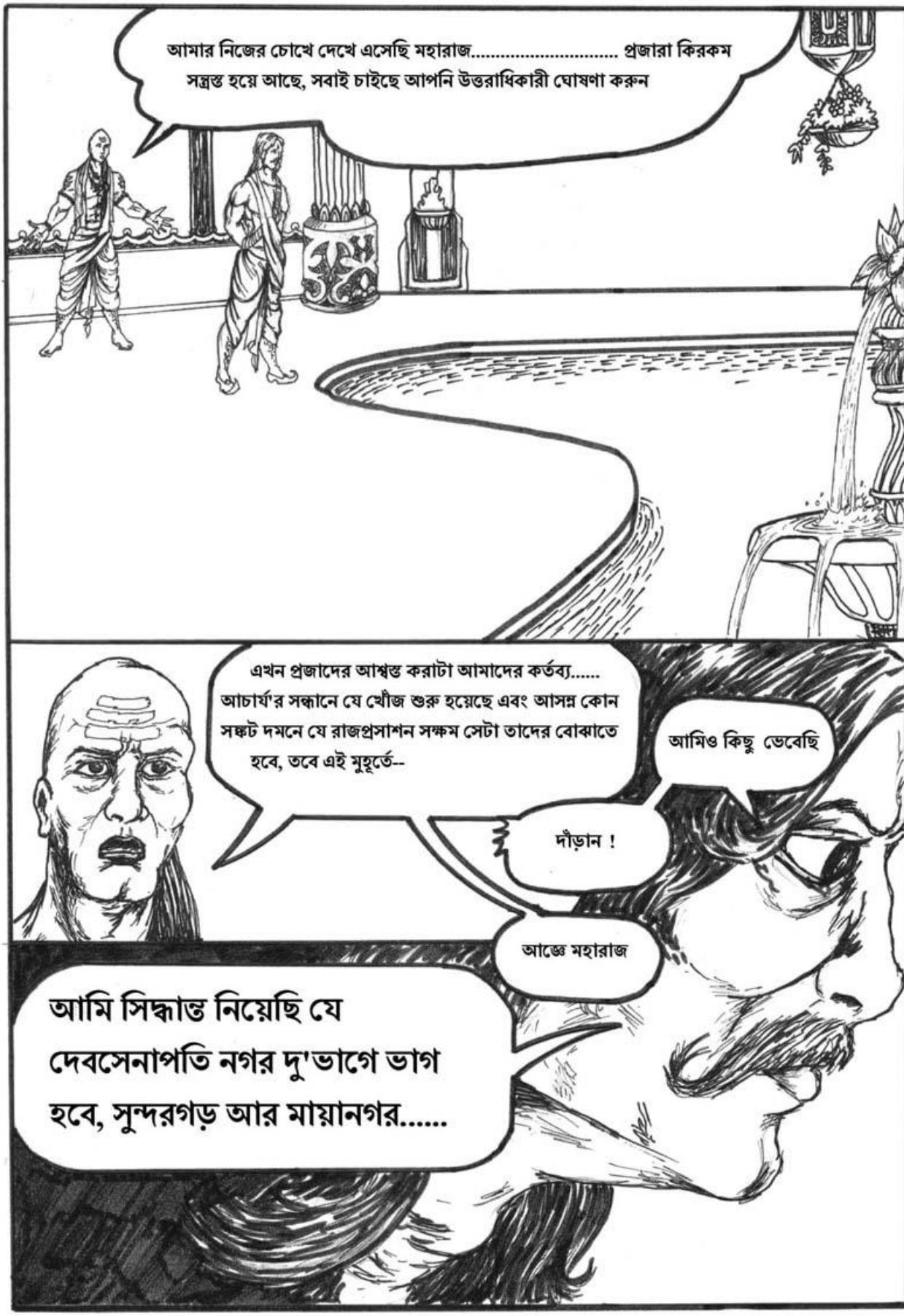


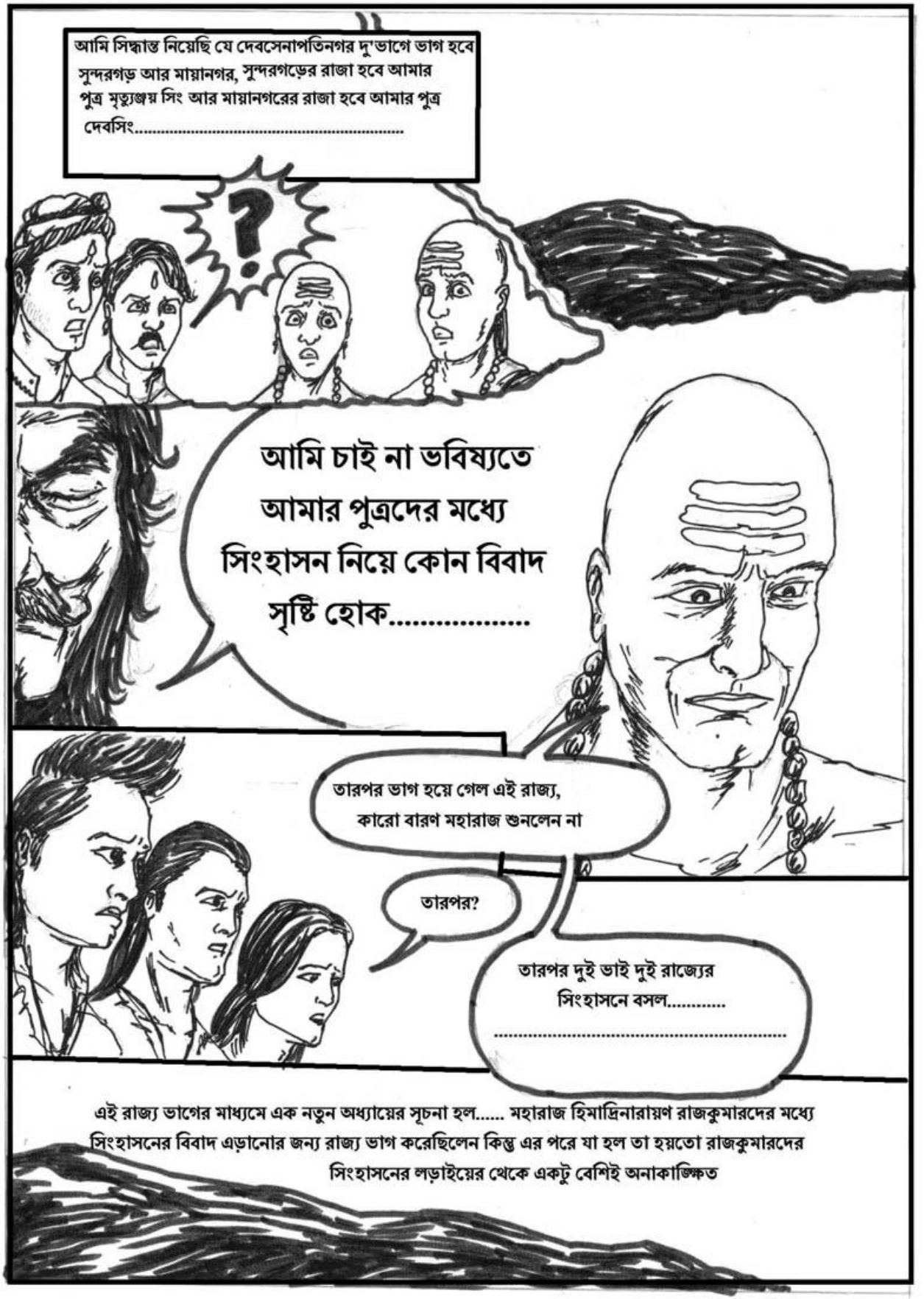
দুর্জয়

লেখা দেবসেনা নন্দী

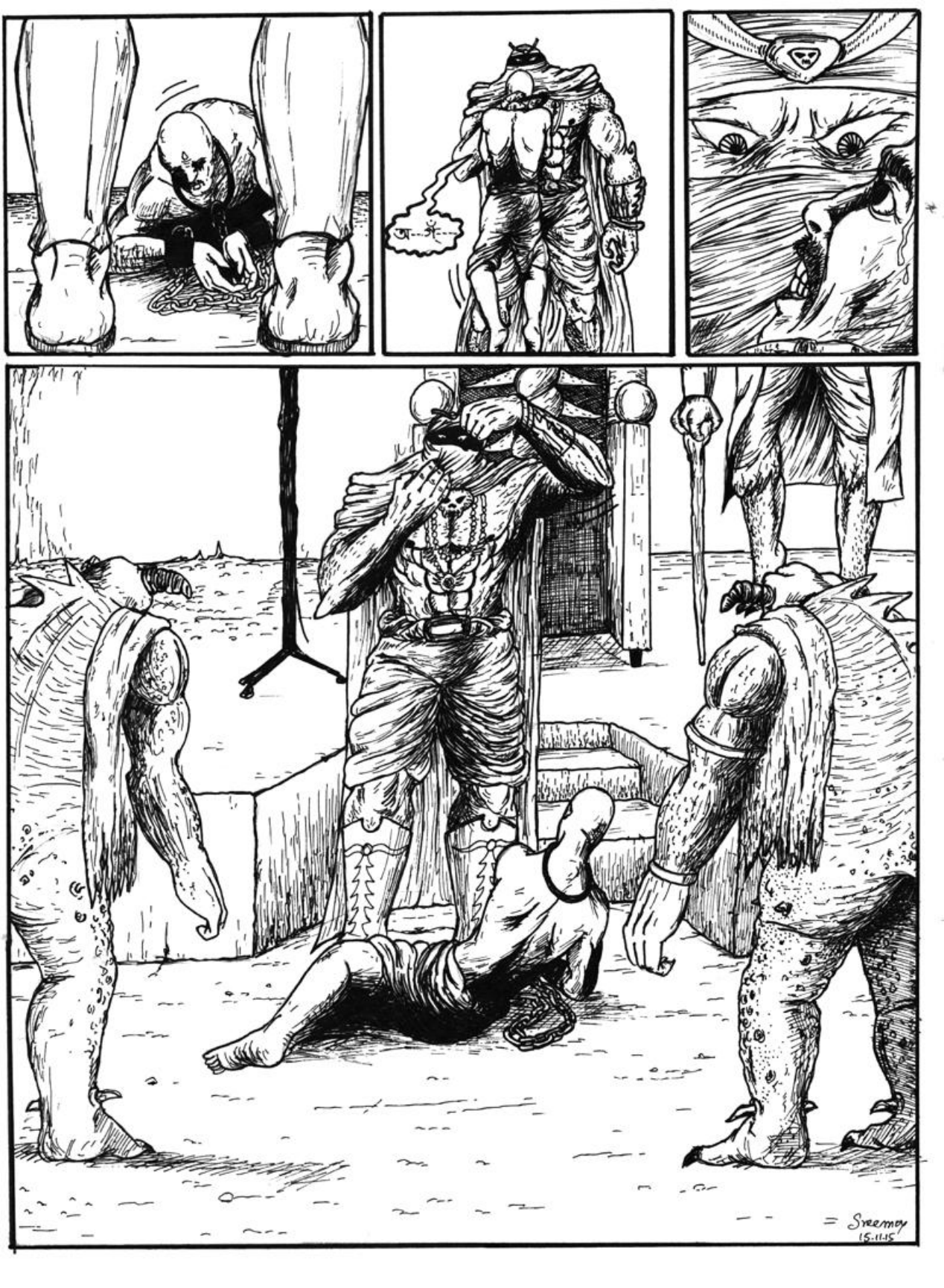
চিত্রনাট্য ও চিত্ররূপঃ- শ্রীময় দাশ

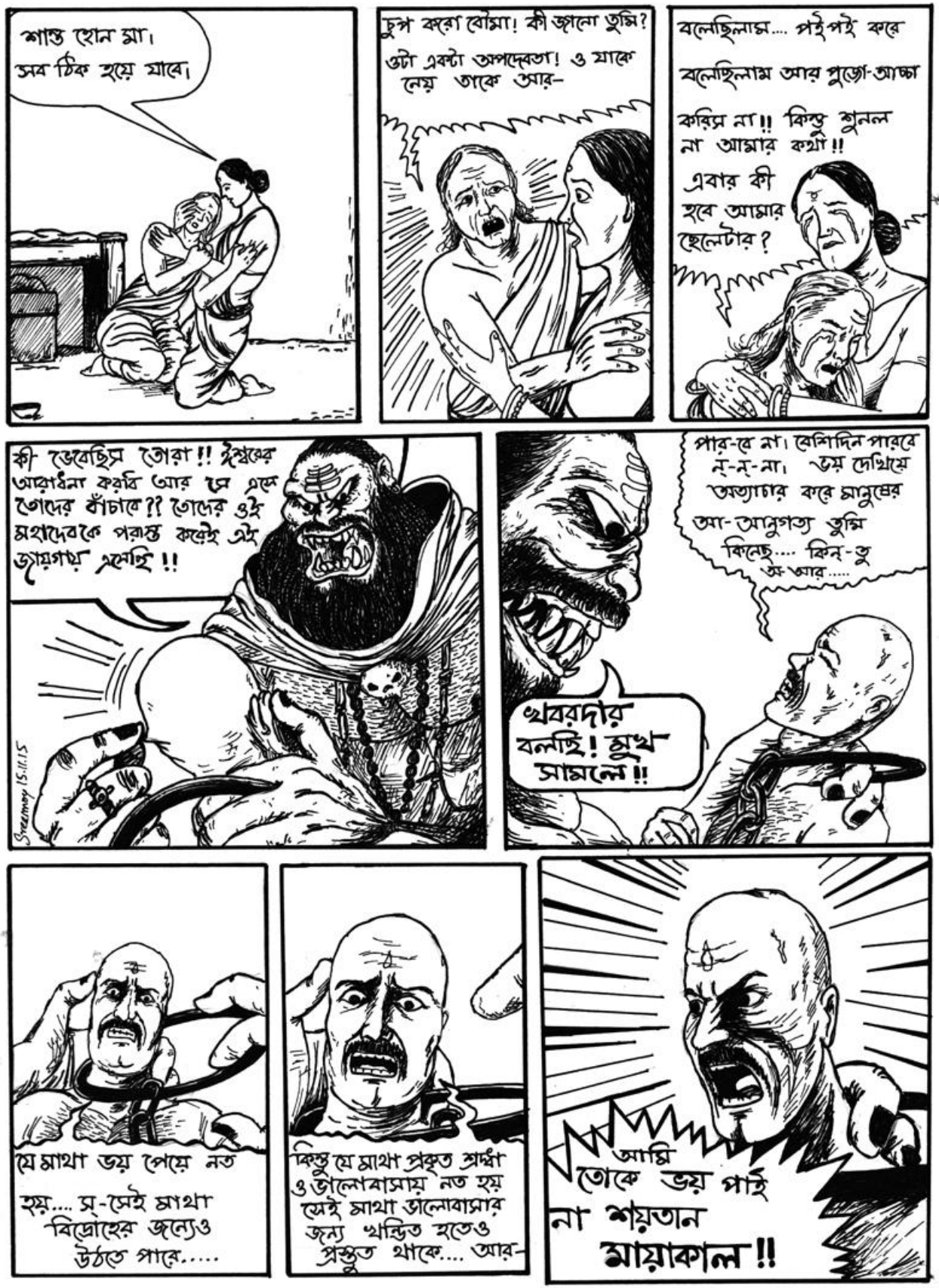

সম্রাট, আমি জানি এই মুহূর্তে এই কথাটা বলা ঠিক না কিন্তু--
কিন্তু রাজ্যের এবং প্রজাদের কথা ভেবে আমি কিছু কথা বলতে
চাই---------- যদি অনুমতি দেন তো-
বলুন
মহামাত্ম্য।
মহারাজ আমি জানি
রাজকুমারেরে অকাল প্রয়াণে
আপনি--------
কথাটা
কি?
মহারাজ, রাজকুমারের অকাল প্রয়াণে এবং আচার্যের
বিশ্বাসঘাতকতায় না মানে প্রজারা অন্তত তাই ভাবছে-----
প্রজারা উদ্বিগ্ন, ভীত এবং নিরাপত্তা নিয়ে খুবই চিন্তিত---
তাই আমরা সকল আমাত্ম্যরা
মিলে ভেবে দেখেছি যে আপনি যদি
আপনার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন তাহলে
প্রজারা নিশ্চিন্ত হয় কারণ আপনারও তো
বয়স হচ্ছে .....

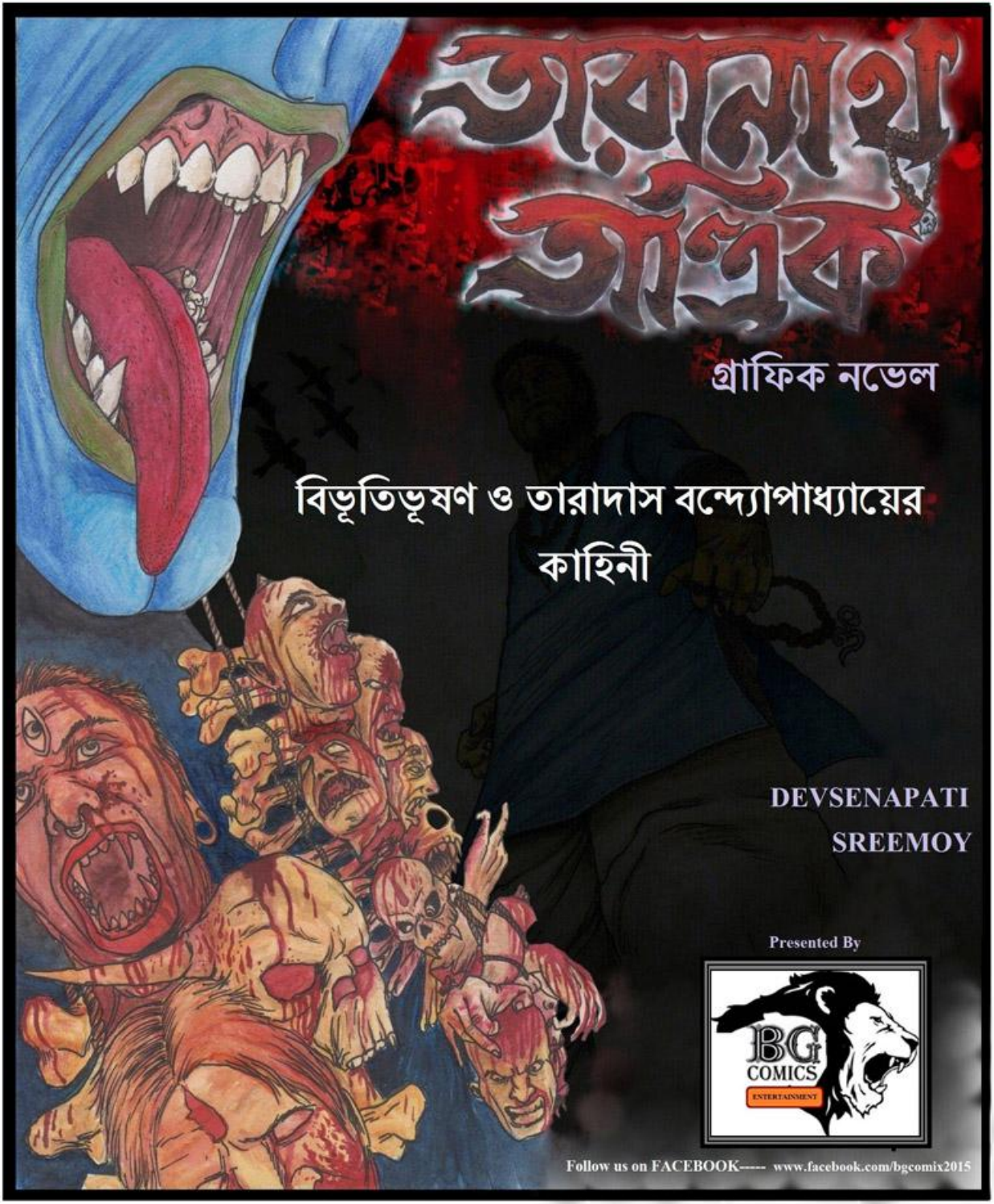

আমার নিজের চোখে দেখে এসেছি মহারাজ..... প্রজারা কিরকম সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, সবাই চাইছে আপনি উত্তরাধিকারী ঘোষণা করুন
এখন প্রজাদের আশ্বস্ত করাটা আমাদের কর্তব্য..... আচার্য'র সন্ধানে যে খোঁজ শুরু হয়েছে এবং আসন্ন কোন সঙ্কট দমনে যে রাজপ্রসাশন সক্ষম সেটা তাদের বোঝাতে হবে, তবে এই মুহূর্তে--
আমিও কিছু ভেবেছি
দাঁড়ান !
আজ্ঞে মহারাজ
আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে দেবসেনাপতি নগর দু'ভাগে ভাগ হবে, সুন্দরগড় আর মায়ানগর.....


আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে দেবসেনাপতিনগর দু'ভাগে ভাগ হবে সুন্দরগড় আর মায়ানগর, সুন্দরগড়ের রাজা হবে আমার পুত্র মৃত্যুঞ্জয় সিং আর মায়ানগরের রাজা হবে আমার পুত্র দেবসিং.....
?
আমি চাই না ভবিষ্যতে আমার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কোন বিবাদ সৃষ্টি হোক.....
তারপর ভাগ হয়ে গেল এই রাজ্য, কারো বারণ মহারাজ শুনলেন না
তারপর?
তারপর দুই ভাই দুই রাজ্যের সিংহাসনে বসল.....
এই রাজ্য ভাগের মাধ্যমে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল..... মহারাজ হিমাদ্রিনারায়ণ রাজকুমারদের মধ্যে সিংহাসনের বিবাদ এড়ানোর জন্য রাজ্য ভাগ করেছিলেন কিন্তু এর পরে যা হল তা হয়তো রাজকুমারদের সিংহাসনের লড়াইয়ের থেকে একটু বেশিই অনাকাঙ্ক্ষিত


ইতিমধ্যে-
প্রভু !
কাকে এনেছ?
এ কে ?
এর নাম বিষ্ণুদাস, পেশায় কৃষক। শিবরাত্রি উপলক্ষে গ্রামে শিবপুজোর আয়োজন করেছিল।
হে মায়াকানন! আমরা দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসক। বছরে একবার শিবরাত্রি উপলক্ষে-
-ওনার আরাধনা করি। এতে আপনার কি ক্ষতি হয়েছে?? কেন আমরা পুজো করতে পারব না??
গলা নামিয়ে কথা বল !!
আঃ
Sreemoy Sinha

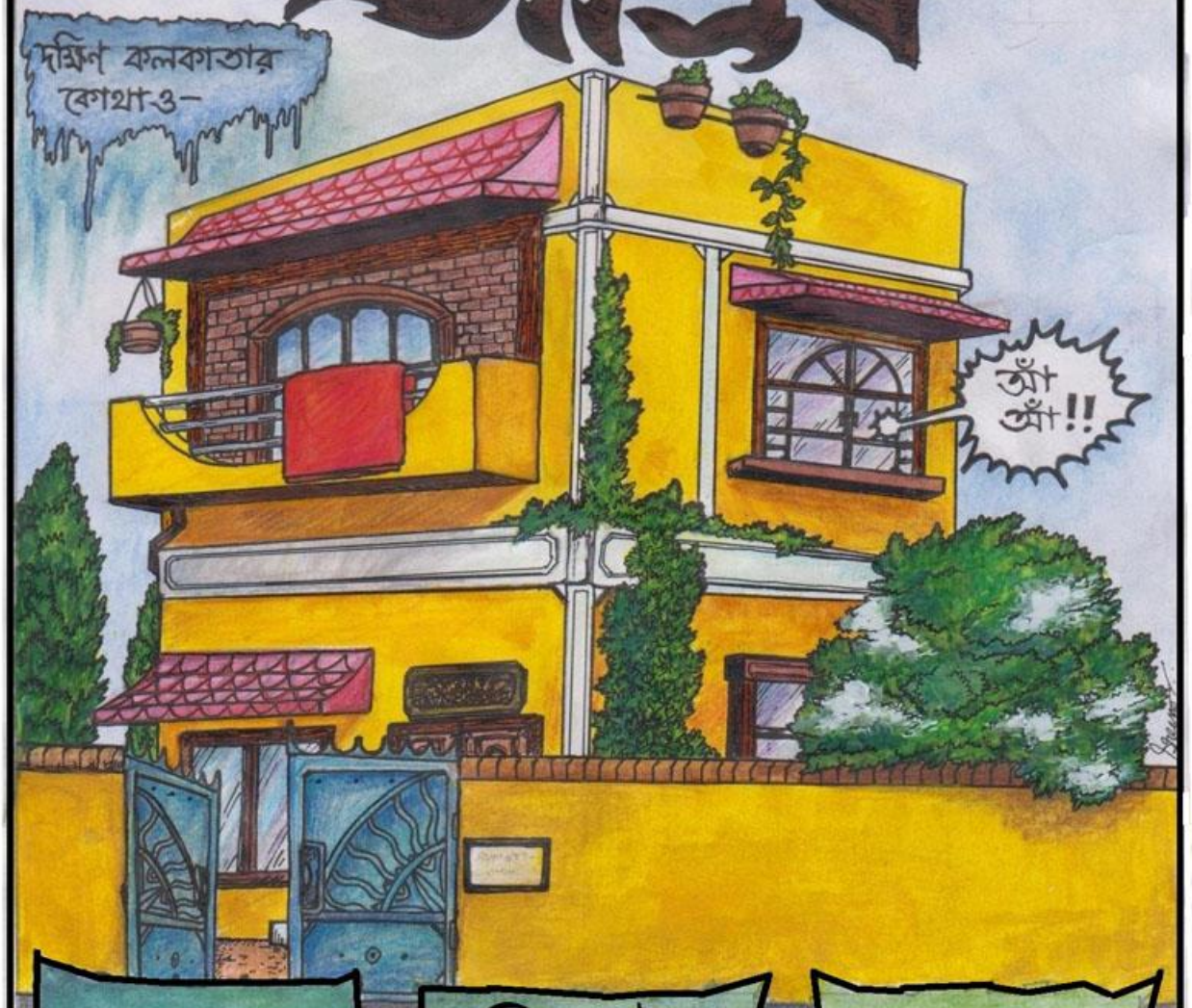

= Sreemoy
15.11.15


শান্ত হোন মা।
সব ঠিক হয়ে যাবে।
চুপ করো বৌমা! কী জানো তুমি?
ওটা একটা অপদেবতা! ও যাকে নেয় তাকে আর-
বলেছিলাম.... পই-পই করে
বলেছিলাম আর পুজো-আচ্চা
করিস না!! কিন্তু শুনল
না আমার কথা!!
এবার কী
হবে আমার
ছেলেটার?
কী ভেবেছিস তোরা!! ঈশ্বরের
আরাধনা করবি আর সে এসে
তোদের বাঁচাবে?? তোদের ওই
মহাদেবকে পরাস্ত করেই এই
জায়গায় এসেছি!!
পার-বে না। বেশিদিন পারবে
ন্-ন্-না। ভয় দেখিয়ে
অত্যাচার করে মানুষের
আ-আনুগত্য তুমি
কিনেছ.... কিন্-তু
অ-আর.....
খবরদার
বলছি! মুখ
সামলে!!
যে মাথা ভয় পেয়ে নত
হয়.... স্-সেই মাথা
বিদ্রোহের জন্যেও
উঠতে পারে.....
কিন্তু যে মাথা প্রকৃত শ্রদ্ধা
ও ভালোবাসায় নত হয়
সেই মাথা ভালোবাসার
জন্য খন্ডিত হতেও
প্রস্তুত থাকে.... আর-
আমি
তোকে ভয় পাই
না শয়তান
মায়াকাল!!


তারানাথ তান্ত্রিক
গ্রাফিক নভেল
বিভূতিভূষণ ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কাহিনী
DEVSENAPATI
SREEMOY
Presented By
BG
COMICS
ENTERTAINMENT
Follow us on FACEBOOK----- www.facebook.com/bgcomix2015

বিভূতিভূষণ ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

তারানাথ তান্ত্রিক



মূলভাবনা
দেবসেনাপতি

চিত্রনাট্য
দেবসেনাপতি- শ্রীময়

অঙ্কন
শ্রীময়




আ
ঝি
আররর


ঘণ্টা কয়েক বাদে--
OLA
দাড়াও...
যাব

খুশিয়াল কুতুয়া

শিকারের মরসুম






তারপরে নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করে নিশানা লাগান, আর ...
নড়বি না!
দাগো!
দুড়ুম!
এহহে! লাগেনি লাগেনি!
লাগেনি মানে? দাঁড়া, তোকে একবার ধরতে পারলে দেখাচ্ছি!
আরে পালাস না পালাস না! ক্লাস এখনো শেষ হয় নি!
একটু সুস্থ হয়ে আপনাদের শেখাচ্ছি তীর-ধনুক দিয়ে কিভাবে শিকার করতে হয়!
হুম! তীরন্দাজীর জন্যে এইভাবে দাঁড়াতে হয়...


এই ... তুই আবার! জখম হতে না চাইলে সামনে থেকে সর বলছি!
এটাই সবথেকে নিরাপদ জায়গা!
বেশ ... তাই যখন চাইছিস!
TWANG!
ওয়াও!
কাজেই দেখছেন যে তীর-ধনুক শিকারীর জন্যে খুব বিপজ্জনক অস্ত্র!
জাল খুব নিরাপদ!
এইবার ধরেছি!
আবার?
দেখেছেন? বলেছিলাম না যে জাল খুব নিরাপদ?
একদম!
3



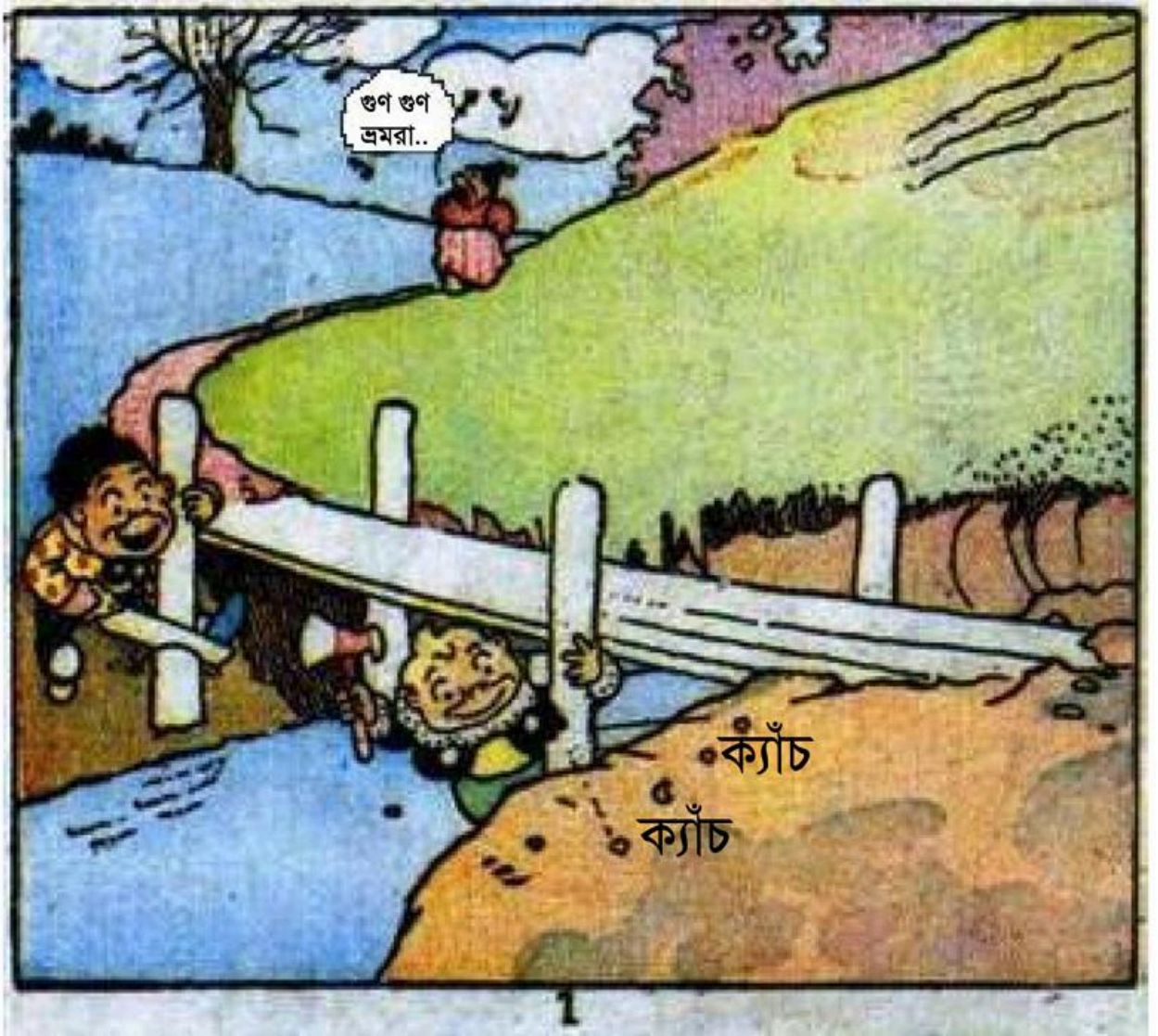
টোটা আর টিটো

ব্রিজবিভ্রাট



মূল কমিকসঃ রুডলফ ডার্কস

অনুবাদঃ তাপস মৌলিক


গুণ গুণ
ভ্রমরা..
ক্যাঁচ
ক্যাঁচ


গানটা শুনলি? দারুণ গাইলাম না?
এই তো, মা এসে গেছে!! দারুণ!!


এ কী!!
ভয় নেই মা, সোজা এগিয়ে এস।


হাঃ হাঃ
ঝ পা স


কী মজা!!
বলো মা?


কী মজা, না?
এই দ্যাখ মজা!!
ধাঁই
ধাঁই



বুড়ো বরফ খোকা বরফ

লিথুয়ানিয় লোককথা

ছবি আনাতোলি ভাসিলিয়েভ



এক ছিল বুড়ো বরফ আর তার ছিল এক খোকা বরফ। খোকা বরফের বেজায় অহংকার। খালি বলে বেড়ায়, আমার বুড়ো বাবা কাজকম্মো ভালো পারে না। কিন্তু আমি হলাম বেজায় কাজের লোক। একটু খালি বড়ো হই, তখন দেখো কেমন সব্বাইকে কেমন এক নিমেষে জমিয়ে দিই।



একদিন খোকা বরফ রাস্তায় দেখে এক মোটাসোটা বুড়ো চলেছে ফারকোট চাপিয়ে। দেখেই সে ভাবল, "বাবা তো আর একে ঠাণ্ডায় জমিয়ে দিতে পারবে না, তবে আমি পারব। এই না ভেবে সে এক দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার গায়ে, তারপর চোখের পলকে তার হাড়ে শিরশিরানি তুলে ছেড়ে দিল। বুড়ো ঠাণ্ডার চোটে বাড়ি গিয়ে পটল তুলল।



বাড়ি এসে সে বাবাকে বলে, "পারতে তুমি ফারকোটে জড়ানো অমন একটা মোটা বুড়োকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে দিতে? আমি কেমন পারি!"

শুনে বুড়ো বরফ বলে, "বেশ বেশ। তা এখন যা দেখি! ওই যে চাষাটাকে দেখছিস! ওকেও জমিয়ে দেখা তো আমায়!"





চাষী ভারী রোগাভোগা। এক মনে কাঠ চিড়ছে কুড়ুল দিয়ে। তার পরণের কোটটাও একেবারে তুটাফাটা। দেখে খোকা বরফ ভাবল, এ আর এমন কী? কাজ! এক্ষুণি একে জমিয়ে পাথর করে দিচ্ছি দাঁড়াও। এই বলে সে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল চাষীর ছেঁড়া কোটের গায়ে। চাষীর তো কুড়ুল চালাতে চালাতে গায়ে ঘাম ঝরছে তখন। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার কষ্ট হবার বদলে ভালোই লেগে গেল।





খানিক বাদে হাঁফাতে হাঁফাতে খোকা বরফ বলে, "দেখাচ্ছি মজা। এইবার আমার কায়দাটা দ্যাখ শুধু।" এই বলে সে চাষীর দস্তানাদুটোয় গিয়ে ঢুকে পড়ল।





খানিক বাদে দস্তানা ধরতে গিয়ে চাষী দেখে সেগুলো ঠাণ্ডায় জমে কাঠ। তখন সে একটা হাতুড়ি তুলে দস্তানাদুটোকে নরম করবার জন্যে কী মার, কী মার! মার খেয়ে খোকা বরফ কোঁকাতে কোঁকাতে বাড়ি ফিরল। বুড়ো বরফ বসেছিল চুপটি করে। তাকে ফিরতে দেখে হেসে বলে, বোকা ছেলে। গরিব মানুষদের অত সহজে কাবু করা যায় না বুঝলি? কাবু করতে হলে মোটাসোটাগুলোকে ধরিল। নইলে এমনি করে মার খাবি ফের।

এক মাকড়শা এক বিদেশি পিঁপড়িকে বিয়ে করে টুপি জুতো পরে ঘরে ফিরল



মাকড়শার ঘরদোর পিঁপড়ির বেশ ভালো লাগল,দুজনে মনের আনন্দে কাটাতে লাগল



একদিন নদীতে কাপড় ধুতে গিয়ে পিঁপড়ির সাথে বোলতা বউয়ের দেখা। নদীতে এক নৌকো দেখিয়ে পিঁপড়ি বলে--




মাকড়শা ঘরে ফিরে দেখল পিঁপড়ি বসে কাঁদছে
একী! তোমার কী হয়েছে? কীসের দুঃখু! আমাকে বলো।
রাজারানি নৌকায় চড়ে রানির বাপের বাড়ি চলেছে,আমার ও নৌকা চাই, আমি ওতে চড়ে বাপের বাড়ি যাব


নৌকা সে আমি পাব কোথায়! কেনার মত টাকা কই!
ওসব আমি জানি না। আমার নৌকা চাইই। তুমি যেখান থেকে পার এনে দাও

সুদখোর ছেদিরামের কাছে মাকড়শা গেল টাকা ধার করতে, নৌকা কেনার জন্য




না না দাদা,গুড় খেতে নয়,আমি নৌকা কেনার জন্য টাকা ধার করতে এসেছি
হা হা,মাকড়শার আবার টাকা তাতে আবার নৌকা! তোকে কটা খুদকুঁড়ো দেব,যা ওই তোর নৌকা,হা হা.


হি হি,খুদকুঁড়ো দিয়ে নৌকা? তুমি কি বোকা গো.....

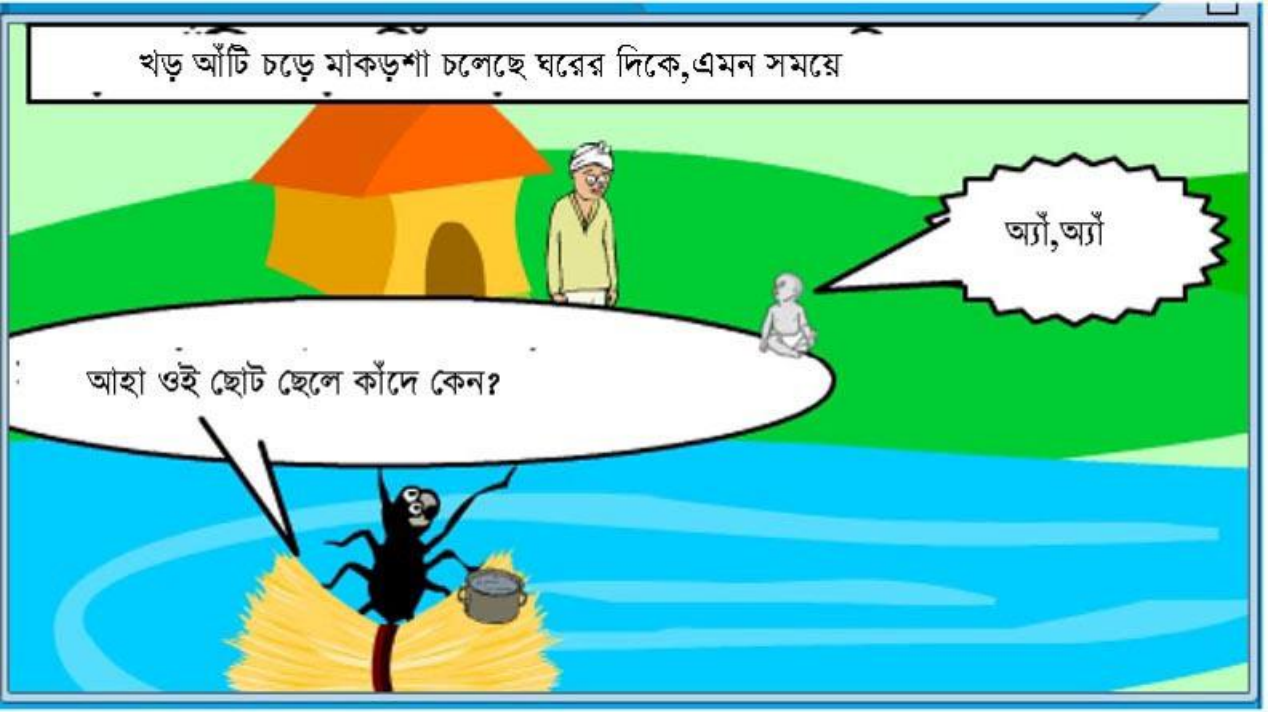

তুমি হাসছ কেন পাখি! আমি কি করব? ছেদিরাম-ই তো আমাকে নৌকার জন্য...
ছেদিরাম! ওর কথা কেউ বিশ্বাস করে? শোনো ভাই খুদকুঁড়ো আমাকে দেবে, আমার ছানাদের খাওয়াব


তা বেশ। আমি তোমার ছানাদের খুদকুঁড়ো দেব,তবে আমার নৌকা.....
সে ভাবনা আমার। তুমি একটু দাঁড়াও


আরে,পাখি তুমি পাতা এনেছ কেন?
হাহাঃ,নাও এই তোমার নৌকা।


পাখির থেকে পাতা পেয়ে খুশি হয়ে মাকড়শা চলল ঘরে,হঠাৎ...
ও মাকড়শা.....


কী গরু বাছুর ভাই ডাকো কেন?
শোন ভাই, চেয়ে দেখ নদীর এ পাড়ে শুধু শুকনো ঘাস। আমার ছানার জন্য তোমার পাতাটি দেবে? বদলে তুমি খড় আর দুধ নাও,খড় চরে নদীতে ঘুরো আর দুধ খেয়ো

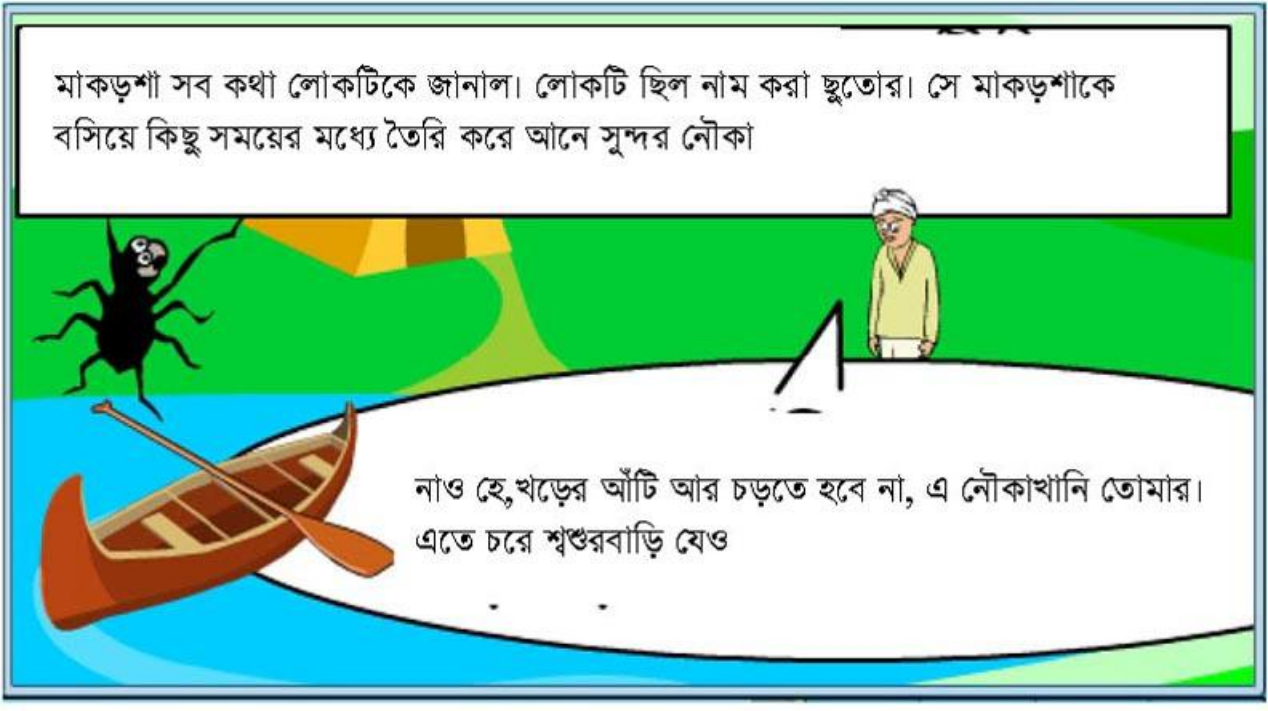

খড় আঁটি চড়ে মাকড়শা চলেছে ঘরের দিকে,এমন সময়ে
অ্যাঁ,অ্যাঁ
আহা ওই ছোট ছেলে কাঁদে কেন?


আহা থাম বাছা থাম
অ্যাঁ,অ্যাঁ
ও মশাই ছেলে এত কাঁদে কেন?


আর কী বলি ভাই,আজ গোয়ালা দুধ দেয়নি,ছেলে আমার ক্ষুধায় কেঁদে মরে
অ্যাঁ,অ্যাঁ
ও এই কথা আমার কাছে আছে খাঁটি গরুর দুধ নাও আর ছেলেকে দাও

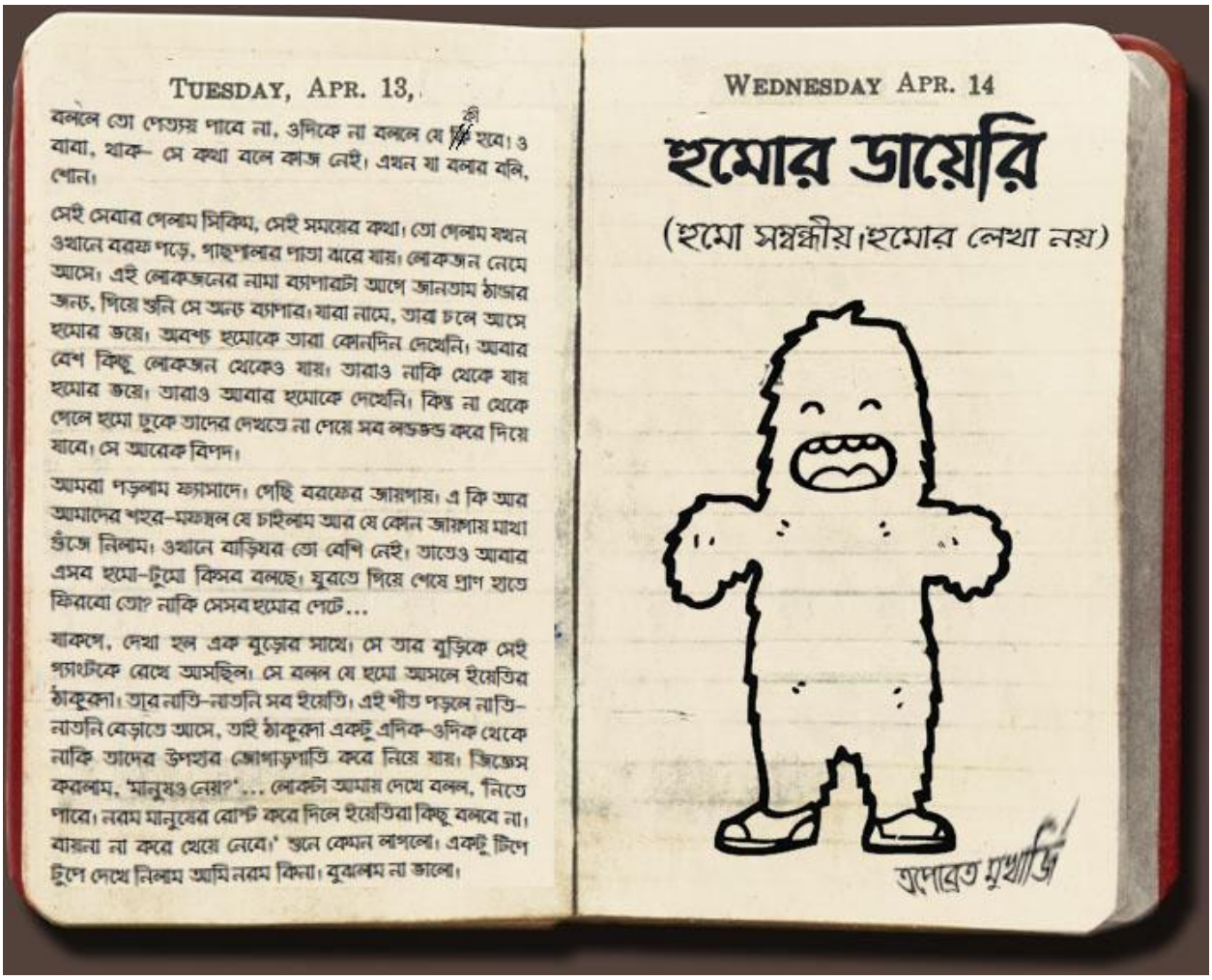

বাঁচালে ভাই,তা তুমি খড় চেপে চল্লে কোথায়?

মাকড়শা সব কথা লোকটিকে জানাল। লোকটি ছিল নাম করা ছুতোর। সে মাকড়শাকে বসিয়ে কিছু সময়ের মধ্যে তৈরি করে আনে সুন্দর নৌকা



এমন করে পিঁপড়ির নৌকা করে বাপের বাড়ি যাবার ইচ্ছা পুরণ হল





বললে তো পেত্যয় পাবে না, ওদিকে না বললে যে কী হবে! ও বাবা, থাক- সে কথা বলে কাজ নেই। এখন যা বলার বলি, শোন।

সেই সেবার গেলাম সিকিম, সেই সময়ের কথা। তো গেলাম যখন ওখানে বরফ পড়ে, গাছপালার পাতা ঝরে যায়। লোকজন নেমে আসে। এই লোকজনের নামা ব্যাপারটা আগে জানতাম ঠাণ্ডার জন্য, গিয়ে শুনি সে অন্য ব্যাপার। যারা নামে, তারা চলে আসে হুমোর ভয়ে। অবশ্য হুমোকে তারা কোনদিন দেখেনি। আবার বেশ কিছু লোকজন থেকেও যায়। তারাও নাকি থেকে যায় হুমোর ভয়ে। তারাও আবার হুমোকে দেখেনি। কিন্তু না থেকে গেলে হুমো ঢুকে তাদের দেখতে না পেয়ে সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে যাবে। সে আরেক বিপদ।

আমরা পড়লাম ফ্যাসাদে। গেছি বরফের জায়গায়। এ কি আর আমাদের শহর-মফস্বল যে চাইলাম আর যে কোন জায়গায় মাথা গুঁজে নিলাম? ওখানে বাড়িঘর তো বেশি নেই। তাতেও আবার এসব হুমো-টুমো কীসব বলছে। ঘুরতে গিয়ে শেষে প্রাণ হাতে ফিরব তো? নাকি সে'সব হুমোর পেটে...

যাকগে, দেখা হল এক বুড়োর সাথে। সে তার বুড়িকে সেই গ্যাংটকে রেখে আসছিল। সে বলল যে হুমো আসলে ইয়েতির ঠাকুরদা। তার নাতি-নাতনি সব ইয়েতি। এই শীত পড়লে নাতি-নাতনি বেড়াতে আসে, তাই ঠাকুরদা একটু এদিক-ওদিক থেকে নাকি তাদের উপহার জোগাড়পাতি করে নিয়ে যায়। জিজ্ঞেস করলাম, "মানুষও নেয়?"... লোকটা আমায় দেখে বলল, "নিতে পারে। নরম মানুষের রোস্ট করে দিলে ইয়েতিরা কিছু বলবে না। বায়না না করে খেয়ে নেবে।"

শুনে কেমন লাগল। একটু টিপে টুপে দেখে নিলাম আমি নরম কিনা। বুঝলাম না ভালো। যাকগে, সে রাতে ঠিকানা হল বুড়োর কুটির। একচালা ঘর। আমি বলে দিয়েছিলাম যাতে বুড়ো ভালো করে দরজা এঁটে শোয়। কে জানে বাপু, কখন কী হবে বলা যায় না তো!

তো, যাই হোক, ঘুমোচ্ছি। গরমজামা গায়েই। বুড়ো এক ধুনি জ্বেলেছিল, তার থেকেও বেশ ওম এসেছে। হঠাৎ পাশ ফিরলাম অভ্যেসমত। এমনিতে তো পাশবালিশ নিয়ে শোয়া অভ্যেস, তো পাশ ফিরতেই প্রথমে মনে

হল পাশবালিশ বুঝি। তারপরই মনে হল, না তো! এ তো বরফের দেশ, এখানে পাশবালিশ কে দেবে? আর পাশবালিশও তো বড় বেশি নরমসরম! তবে?

ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠলাম। উঠে দেখি, সব্বোনাশ। কী যেন একটা সাদামতো পাশ ঘেঁষে শুয়ে। দেখেই তো এক্কেবারে প্রাণ-ফান খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়! আকাশ ফাটিয়ে "বাবা রে, মা রে, দাদু রে, হুমো রে" বলে ডাক পাড়তে গিয়ে দেখি গলায় আওয়াজই আসে না!! এবার? কোনোভাবে হাঁচোড়পাঁচোড় করে উঠে বুড়োকে মারলাম রামধাক্কা। সে আবার কুম্ভকর্ণের বংশধর। শেষে তেড়ে উঠে এক রদ্দা মারতে পিটপিটিয়ে জেগে বলল "বাবু, ডাকছেন বুঝি?"

আমি আর কী বলব, শব্দই তো বেরোচ্ছে না! ওই পাশবালিশের দিকে দেখিয়ে দিলাম। বুড়ো একটু উঠে টর্চ জ্বেলে একটু পিটপিট করে চেয়ে বলল, "বুঝছি না।"

তারপর কী ভেবে আবার দেখল। একবার সামনে গিয়ে, তারপর দূর থেকে, আবার পাশে গিয়ে। এরকম হরেক প্রকার দেখা শেষ হলে নিদান দিল, "বুঝলেন বাবু, ইয়েতি ছানা।"

আমার তখন হয়ে গেছে। অন্ধকারে দরজার আগল খুঁজছি। বাকিদের খোঁজটোজ করতেই গেলাম না। ওরা কি আর আছে যে খুঁজব? নিশ্চিত হুমোতে নিয়ে গেছে আর সঙ্গে করে আসা ছানাখানা রয়ে গেছে। একে খুঁজতে এই এল বলে! আমায় দেখলেই রোস্ট বানাবে। আমায় আবার রোস্টের মতই দেখতে! বাবা ... আমি পালাব!

ওই হুড়যুদ্ধির মাঝে দেখি আবার কিসের হাউমাউ আওয়াজ! আমি আরও জোরে জোরে আগলের গোড়ায় টান দিচ্ছি। বুড়ো কী বলে যেন চেঁচাচ্ছে, কিন্তু সে এখন শুনবে কে!

যাক... ওই করে তো কিছুক্ষণ কাটল। বেরনো হল না, টানাটানি সার (পরে দেখি আগল নয়, একখান থামের গায়ের থেকে বের হয়ে আসা কাঠের টুকরো ধরে টানছিলাম) কেউ এসে টপ করে একটা লাইট জ্বেলে দিতে সব তুম্বো মুখে চাইলাম।

কেউ কোথাও যায়নি...মানে কিছুতে নিয়ে যায়নি কাউকে (অখাদ্য কিনা, কেউ পাতে নেয় না) আমিও ঠিক। মাঝখান থেকে শুধু অতিরিক্ত ওই পাশবালিশ। না, পাশবালিশ না, ওই, ইয়েতি!

আমিই প্রথম বললাম, "ও কী? ও রয়ে গেল যে। কী হবে?"

"ও থাকবে বাবু। ও পালিয়ে এসেচে।"

"অ্যাঁ! ইয়েতির বাচ্চা পালায়? মানে এ কি সত্যি ইয়েতি, মানে..." বিশ্বাস হছিল না। মানুষের বাচ্চা পালায়, ত্যাঁদোড় বাচ্চা। তা বলে ইয়েতি-ও?

যাক গে, বুড়ো বলল যে ইয়েতিও পালায়। তবে মনের দুঃখে বা নায়ক-নায়িকা হবে বলে নয়, সেই উপহার না পেলে। এও পালিয়েছে। পালালে আবার আরেক মুশকিল। কারণ দাদু হুমো এখন খুঁজতে আসবে না। আসবে বছর কয়েক পর। এটাই ওদের নিয়ম। তখন যদি ভালোয় ভালোয় পেয়ে গেল তবে মিটে গেল। নয়তো লঙ্কাকাণ্ড বাধাবে।

আমি বললাম, "ব্যস। তবে এইখানেই রেখে দাও। যখন আসবে, নিয়ে যাবে।" বুড়ো বলে, "না বাবু, সে হবার জো নেই। এখানে থাকতে দেওয়া যাবে না। অনেক হাঙ্গাম।" আবার নাকি বাইরেও রাখা যাবে না। তবে আর রক্ষে নেই। কি বিপদ!

ওদিকে যাকে নিয়ে এই এত্তোসব কথা, সে দেখি টুপটাপ চাইছে শুধু বসে। হু-হা কিচ্ছু বলে না। বেশ গোলগাল সে। নাক বলে কিছু নেই, একখানা নাক মনে করে নিলেই নাক আছে, নয়তো নেই। তার এসবের কিছুতেই কিছু মোহমায়া নেই মনে হচ্ছে।

তা আমরা বললাম, উপায় তবে? বুড়ো বলে, নিয়ে যান বাবু আপনাদের সাথে!

ওই দেখ, আহ্লাদ! এখন একে নিয়ে যাবো? এই বরফ থেকে ওই তাতাপোড়া গরমে ভেপ্সে গেলে? তারপর সে হুমোয় এসে আমাদের শ্রাদ্ধ করুক আর কি! বুড়ো বলল, "না বাবু। অদ্দূর হুমোয় যাবে না"

“তবে?”

"তবে আর কী? নিয়ে যান!"

পাগল? একে নিয়ে যাব কোথায়? আমরা যারা ছিলাম তারা তক্ষুনি এই কচকচি থামিয়ে ভয়ানক রেগে ভাবলাম এক্ষুনি বেরিয়ে যাব। তাড়া বাঁধছি তাই, বুড়ো চেঁচাচ্ছে, কাকুতি করছে-- শুনছি না, এমন সময় দেখি, কীসে আমার পায়ের পাশে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। চেয়ে দেখি, সেই পাশবালিশ... ইয়ে, মানে ইয়েতিছানা। কেলো হল! আমি তাকে হাত দিয়ে সরিয়ে আবার তাড়ার দিকে মন দিয়েছি, আবার সুড়সুড়ি!

এই চলল খানিকক্ষণ। শেষে ঠিক করলাম, ছানা আসবেন। কেউ রাজি ছিল না, কিন্তু আমি তাও বলে বলে রাজি করালাম। তারপর গাড়ি করে নামা হল পাহাড় থেকে, ট্রেন ধরা হল।

তারপর? ও বাবা... তারপর আজ চিঠি পেয়েছি। সেই বুড়োর। সে যে বেঁচে আছে দুঃসংবাদ দেবার জন্য তা কে জানত! সে ছানা এখন পুরোপুরি শহুরে মানুষ হয়ে গেছে, গাল ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় হিল্লি-দিল্লি, ইয়েতি বলে কেউ চিনবে না। কিন্তু সে এই কদিন আগে যেই না সিকিম গেছে, অমনি নাকি তার দাদু হুমো তাকে কোনখান থেকে দেখেছে! তারপরই যত গণ্ডগোল। এখানা লিখে রেখে গেলাম, ছানাকে খুঁজে পেলে যদি সে হুমো আমায়ও ধরতে আসে, যারা পড়বে তবে একটু খোঁজ কোরো কিন্তু... যদি পুরো না মরি, বেঁচে থাকি-টাকি, ফিরিয়ে এনো প্লিজ!!!



পরের পাতা পরের জয়ঢাকে।

অলঙ্করণঃ ইন্দ্রশেখর



আমি মানুষ হব

–রণেন ঘোষ

রোবটের তিন আইন

১. রোবট মানুষকে আঘাত করবে না অথবা নিষ্ক্রিয় হয়ে মানুষকে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে দেবে না।

২. প্রথম আইনের বিরুদ্ধাচরণ আদেশ ব্যতিরেকে রোবট মানুষের সব আদেশই মানবে।

৩. প্রথম ও দ্বিতীয় আইনের প্রতিবন্ধক না হওয়া পর্যন্ত রোবট নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবে।

১

অনেক অনেক ধন্যবাদ। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল অ্যান্ড্রু মার্টিন। মনের গভীরে ঝড়ের দাপট... বাইরে সুনীল আকাশ। ভবলেশহীন শান্ত মুখমন্ডল... চোখের তারায় সামান্য অস্থিরতা। পরিপাটি মাথার চুল... হালকা বাদামি... নির্লোম অবয়ব... পোশাকে অতীত ঐশ্বর্য...পাটভাঙা নিখুঁত পরিপাটি।

টেবিলের অপর পাশে সার্জন। টেবিলের উপর ফলকে নাম-পরিচয়... নামের পরে সার সার অনেকগুলো ক্রমিকসংখ্যা। অ্যান্ড্রুর কাছে অর্থহীন এসব ...নামে কী আসে যায়... সার্জন... ডাক্তার... না... না, সার্জন বলে ডাকলেই হবে।

অপারেশনটা কখন হতে পারে সার্জন? সরাসরি প্রশ্ন করে আন্ড্রু।

-সঠিক করে কিছু আগে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আমার...কার ওপর অপারেশন হবে মিঃ অ্যান্ড্রু। যান্ত্রিক স্বরের মধ্যেও সম্ভ্রমের ছোঁয়াচ..... ভাবলেশহীন নিষ্প্রাণ মুখ হালকা ছাই রঙের ইস্পাতের গড়া..... ধূসর মসৃণ।

সার্জনের দুই হাত টেবিলের উপর পড়ে আছে অলসভাবে। ডান হাত যেন শাণিত অস্ত্র... ঠিক যেন অপারেশনের ছুরি... লম্বা লম্বা আঙুলগুলো ঈষৎ বক্র... স্ক্যালপেল লাগিয়ে দিলে একাত্ম হয় সুন্দরভাবে।
নির্নিমেষ নেত্রে অ্যান্ড্রুর দিকে তাকিয়ে আছে সার্জন। নিখুঁত কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ওর সর্বাঙ্গে। মানবসভ্যতার অবিশ্বাস্য অগ্রগতির মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি। স্বতন্ত্র মস্তিস্কের অধিকারী হলেও কার্যক্ষমতা কিন্তু সীমাবদ্ধ এদের- আর সীমাবদ্ধ বলেই অ্যান্ড্রুকে চিনতে পারল না সার্জন। মনে-মনে বেশ মজা অনুভব করল অ্যান্ড্রু পরক্ষণে বিষাদে ভরে উঠল সমস্ত মন।

-সার্জন... মানুষ হতে সাধ যায় না কখনো? একবারও কি চিন্তা করেছ সে কথা? নড়েচড়ে বসল সার্জন... মূহূর্তের জন্য সামান্য দ্বিধাদ্বন্দ্ব... পূর্বনির্ধারিত পজিট্রনিক পথের কোথাও যেন গরমিল হচ্ছে প্রশ্নটাকে খাপ খাওয়াতে।

-কিন্তু... কিন্তু আমি তো রোবট।

-হ্যাঁ... হ্যাঁ... সেইজন্যেই তো বলছি... মানুষ হতে ইচ্ছে হয় না তোমার?

-মানুষ হলে কি ভালো সার্জন হতে পারব আমি? না... মানুষেরা ভালো সার্জন হয় না কখনো। একমাত্র 'উন্নত সার্জন' হয় মিঃ অ্যান্ড্রু। আর সেটাই আমার একমাত্র কামনা।

-আমার কথা শোনো সার্জন... এই যে আমি আদেশ করছি তোমাকে..... এতে ছোট মনে হচ্ছে না নিজেকে? আমি তো তোমাকে ইচ্ছেমতো কাজ করাতে পারি... চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে বলতে পারি... বসতে বলতে পারি মাটিতে... ডাইনে বাঁয়ে ঘুরতে বলতে পারি... যা... খুশি...।

-আপনাদের খুশি করাই তো আমার কাজ... আমার আনন্দ। এ-বিষয়ে তিন আইন মানতে আমরা বাধ্য। যাক, কার উপর অপারেশন হবে বললেন না তো আমাকে?

-আমার উপর।

-না না..... অসম্ভব! এ তো রীতিমতো বিপজ্জনক অপারেশন!

-বিপজ্জনক বলে বন্ধ আছে নাকি অপারেশন? সবই সমান আমার কাছে। শান্তস্বরে জবাব দিল অ্যান্ড্রু।

-কিন্তু... কিন্তু... আপনার ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু করতে পারব না আমি! নিরুত্তাপ স্বরে বলল সার্জন।

-ঠিক বলেছ ডাক্তার... মানুষের কোনো ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করবে না... কিন্তু... আমি... আমি তো রোবট... ঠিক তোমার মতো!

২

গোড়ার দিকে অর্থাৎ অ্যান্ড্রুর জন্মের সময়ে অন্যান্য রোবটের চেয়ে কোনো পার্থক্য ছিল না ওর। রূপায়ণের নকশায় দৈনন্দিন কাজকর্মে বিশেষ পারদর্শী, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ধাতব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কঠিন ও মসৃণ... চলাফেরায় যান্ত্রিক কাঠিন্য।

গৃহস্থালিতে রোবটের প্রচলন সেই প্রথম। পরীক্ষামূলকভাবে বিশিষ্ট কয়েকজনের বাড়িতেই রোবট স্থান পেয়েছে মানুষের সঙ্গে। মার্টিন পরিবার এই ভাগ্যবানদেরই একটি।

মার্টিন পরিবারের সদস্যসংখ্যাই বা তখন কত? শ্রী এবং শ্রীমতী মার্টিন... দুই কন্যা... বড় মামণি, ছোট মামণি। সেদিনের কথা যেন কালকের কথা বলে মনে হয় অ্যান্ড্রুর। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন...মাস...বছর...যুগ... তারপর... তারপর- নিজের পরিচয়জ্ঞাপক সংখ্যাই কি মনে আছে ওর! বিস্মৃতির অতলে হাতড়ে দেখার চেষ্টা করল অ্যান্ড্রু... না... সবই পাণ্ডুর ধূসর... মনে পড়ে না কিছু... সংখ্যা মনে নেই...হ্যাঁ হ্যাঁ শুরু হয়েছিল NDR... আশ্চর্য, এই ভুলে যাওয়াটাই অস্বাভাবিক... রোবট তো আর মানুষ নয় যে ভুলে যাবে বেমালুম... আসলে মনে রাখার চেষ্টাই করেনি সে... তার ফলে নিত্যনতুন বিষয়ের ভারে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে সংখ্যাগুলো... সে কি আজকের কথা!

অ্যান্ড্রুর মনের মণিকোঠায় ছোট মামণি অক্ষয় অব্যয়। অ্যান্ড্রু নামকরণ ছোট মায়েরই কীর্তি। অ্যান্ড্রু... আন্ড্রু কী সুন্দর মিষ্টি নাম... নামের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ওর সব সত্তা... অস্তিত্ব... পরিচয়। কেন ডেকেছিল অ্যান্ড্রু বলে ছোট মামণি? সেকথা জেনেছিল অনেক পরে... ছোট মামণি তখন নিতান্তই শিশু... অক্ষর আর সংখ্যা সবই অর্থহীন... তার ফলেই মিষ্টি নাম করে ডেকে উঠেছিল ছোট মামণি... অ্যান্ড্রু।

নব্বুই বছর বেঁচেছিল ছোট মামণি... সেই ছোট মামণিই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে আজ কতদিন! কত বছর চলে গেছে তারপর! সেইসব ঝলমলে দিনের কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না অ্যান্ড্রু।... একদিন নাম ধরে ডেকে উঠেছিল ছোট মামণিকে... অভিমানে থমথমিয়ে উঠেছিল ছোট মামণির মুখখানা... পুরো একদিন বাক্যালাপ করেনি অ্যান্ড্রুর সঙ্গে... তারপর... তারপর... পরের দিন ঠোঁট ফুলিয়ে প্রশ্ন করেছিল... আমি বুঝি আর মামণি নই

তোমার? ছোট মামণি? কী হল? বলো... বলো অ্যান্ড্রু! ব্যস... দুর্যোগের ঘনঘটা উধাও হয়ে আবার রোদ-ঝলমলে আনন্দভরা নীলাকাশ...

ঘরের যাবতীয় কাজ ফাই-ফরমাশ খাটা এসবই ছিল অ্যান্ড্রুর কাজ... মাঝে মাঝে রান্নার কাজও চাপত তার ওপর। সেসব দিন ছিল অগ্নিপরীক্ষার মতো... কোন কাজ পারবে আর কোন কাজ পারবে না সে নিজেই জানত না। তবুও মার্টিন পরিবারে বেশ সুখেই শুরু হয়েছিল অ্যান্ড্রুর জীবন। সুখ! রোবটের সুখ। কিন্তু অ্যান্ড্রু রোবট হয়েও আরও যেন কিছু বেশি। তবে বেশির ভাগ সময় বাড়ির কাজ করতে হত না... মামণিদের সঙ্গে খেলা করতে করতেই দিন কেটে যেত ওর।

এক গুপ্ত রহস্য ধরা পড়েছিল বড় মামণির কাছে... অ্যান্ড্রুকে ইচ্ছেমতো কাজে লাগাবার সহজতম উপায়। আমাদের সঙ্গে খেলতে হবে তোমাকে অ্যান্ড্রু এটা আমার আদেশ।

আমি দুঃখিত মামণি... তোমার আগেই আর একটা কাজের আদেশ করেছেন মার্টিন সাহেব... সুতরাং আগের আদেশ পালন করাই আমার কর্তব্য।

আবার ভুল করছ অ্যান্ড্রু... বাবা বলেছিলেন সময় থাকলে টেবিলটা পরিষ্কার করতে... এটা কি আদেশ? না... আদেশ নয়... আমি কিন্তু আদেশ করছি... হ্যাঁ, আদেশ করছি... জোর দিয়ে কথাগুলো বলেছিল বড় মামণি।

না, রাগ করতেন না মার্টিন সাহেব। সারা মুখে ফুটে উঠত অনাবিল হাসি। মামণি-অন্ত প্রাণ ছিল মার্টিন সাহেবের। আর অ্যান্ড্রু? সকলের কৌতুক আর খেলার সাথী। এই খেলা থেকেই গড়ে উঠেছিল বিচিত্র এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক... মমত্ববোধ... ভালোবাসা... তখন এসব পরিস্ফুট না হলেও এখন অ্যান্ড্রু বুঝতে পারে সব। মামণিদের সঙ্গে খেলার ছলেই একদিন ঘটেছিল এক ঘটনা... সেই ঘটনার পরই পালটে গেল অ্যান্ড্রুর জীবন।

দিদির পেন্ডেন্টের উপর দরুণ লোভ ছোট মামণির। হাতির দাঁতের উপর সোনার কাজ করা কী সুন্দর লকেট! বাবার কাছে অবদার করেও লাভ হয়নি কিছু। কিন্তু সুন্দর এক পেন্ডেন্ট না হলে যে দিনরাত সব বিস্বাদ ছোট মামণির। সুতরাং এক টুকরো কাঠ আর একটা ছুরি নিয়ে হাজির হয়েছিল অ্যান্ড্রুর কাছে। ছোট মামণির আবদার কি ফেলতে পারে... তৈরি হয়েছিল বিচিত্র এক পেন্ডেন্ট।

পেন্ডেন্ট হাতে নিয়ে আনন্দে এক পাক ঘুরে হাততালি দিয়ে উঠেছিল ছোট মামণি।

-কি দারুণ সুন্দর! সত্যি তুমি যে কী ভালো অ্যান্ড্রু! যাই, বাবাকে দেখিয়ে আনি আমি।

মার্টিন সাহেব বিশ্বাস করেননি প্রথমে। একের পর এক প্রশ্ন করেছিলেন ছোট মামণিকে। অ্যান্ড্রু বাদ যায়নি প্রশ্নের হাত থেকে।

-অ্যান্ড্রু, সত্যি কি এটা তোমার তৈরি?

-হ্যাঁ সাহেব।

-নকশাটাও তোমার? নিজের?

-হ্যাঁ... সবই আমার নিজের তৈরি।

-কোথায় পেলে নকশাটা অ্যান্ড্রু?

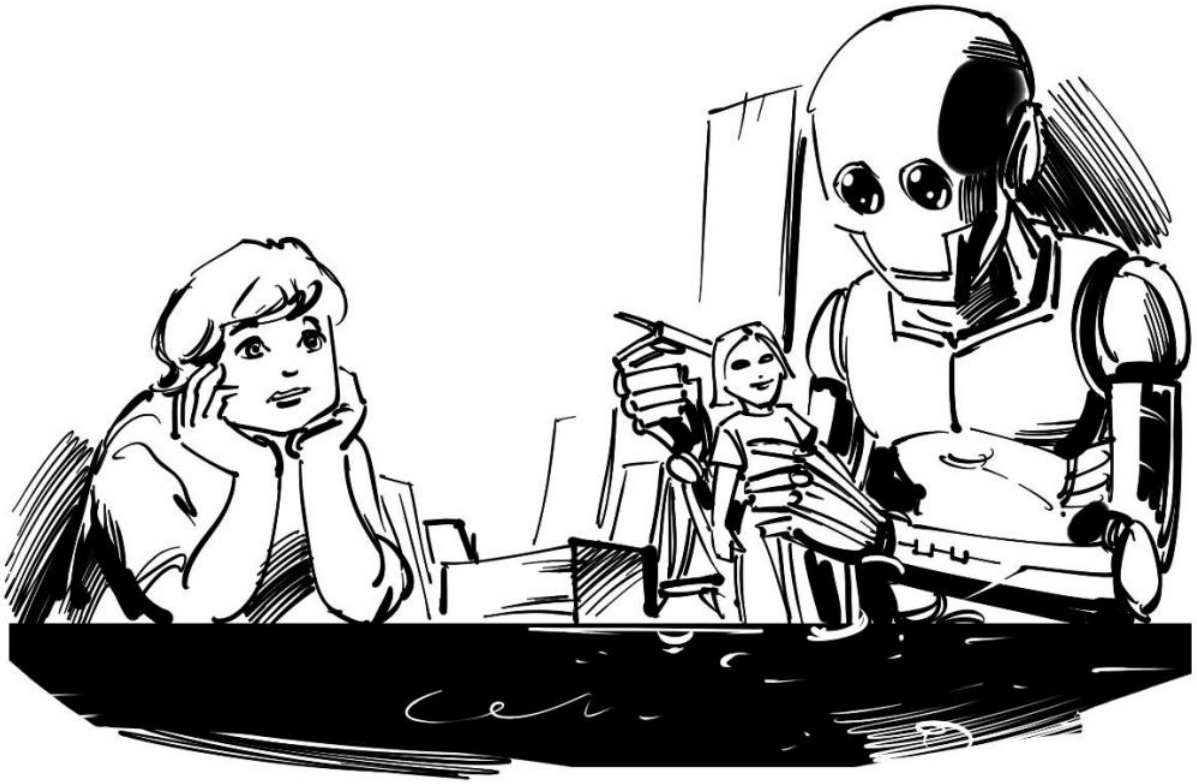
-বলছি তো... আমার নিজের নকশা...জ্যামিতির নানা রূপরেখার সমন্বয়... এর সঙ্গে মিলিয়েছি কাঠের নিজস্ব দাগ।

পরের দিন... ভোর হয়েছে সবেমাত্র... আলো আর অন্ধকারের দ্বন্দ্ব ঘোচেনি সম্পূর্ণ। এক টুকরো কাঠ হাতে নিয়ে অ্যান্ড্রুর ঘরে ঢুকেছিলেন মার্টিন সাহেব। বেশ বড় কাঠের টুকরো... সঙ্গে ছিল ইলেকট্রিক ভাইব্রো ছুরি।

-অ্যান্ড্রু... এই কাঠ আর ছুরি দিয়ে যাহোক কিছু বানাও তো দেখি... যে কোনোকিছু... তোমার পছন্দমতো।

সেই মুহূর্তে কাজ শুরু করেছিল অ্যান্ড্রু... নির্নিমেষে লক্ষ করেছিলেন সবকিছু মার্টিন সাহেব। কাজ শেষ হবার পর বিস্ময়ে হতবাক... শুধু কয়েকবার অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন অ্যান্ড্রুর দিকে। তারপর মাটিতে বসে ঘাড় গুঁজে কাজ করতে হয়নি আর। টেবিল-চেয়ার এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে আর এসেছিল আসবাবপত্রের নকশার সব নানান বই... শুরু হয়েছিল এক নতুন... জীবন সুদৃশ্য ক্যাবিনেট আর ডেস্ক তৈরির কাজে মগ্ন হয়েছিল অ্যান্ড্রু।

এর কয়েকদিন পর অ্যান্ড্রুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মার্টিন সাহেব।



-শাবাশ অ্যান্ড্রু! শাবাশ! কীসব অপূর্ব জিনিস তৈরি করেছ তুমি! যেমন সুন্দর তেমনি অভিনব!

-তৈরি করার সময়ে আমারও দারুণ ভালো লেগেছিল।

-ভালো লেগেছিল? কী বলছ তুমি?

-হ্যাঁ স্যার। কেন জানি না এগুলো করার সময়ে সহজ-সরলভাবে কাজ করে ব্রেনের সুক্ষ সার্কিটগুলো... ছোট মামণির কাছ থেকে শুনেছিলাম ভালো লাগা কথাটা... দেখলাম আমার ব্রেনের প্রোগ্রামের সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খেয়ে গেল কথাটা... ভালো লাগা কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল... মনে হল যেন অনেক দ্রুত কাজ করছে আমার ব্রেন। কাজ করার ক্ষমতাও যেন বেড়ে গেছে বহুগুণ... আর... আর...

৩

আঞ্চলিক আইনসভার সদস্য বলে প্রধান রোবোসাইকোলজিস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেশি বেগ পেতে হল না মার্টিন সাহেবের। ইউনাইটেড স্টেটস রোবটস অ্যান্ড মেকানিকেল মেন-এর সদর দপ্তরেই ঘটল এই সাক্ষাৎ করতে বেশি বেগ পেতে হল না মার্টিন সাহেবের। ইউনাইটেড স্টেটস রোবটস অ্যান্ড মেকানিকেল মেন-এর সদর দপ্তরেই ঘটল এই সাক্ষাৎকার।

রোবোসাইকোলজিস্ট মেট্রন মানস্কি ধীরভাবে শুনেছিলেন সব কথা। মাঝে মাঝে কুঁচকে উঠেছিল ভ্রূজোড়া। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন অ্যান্ড্রুর দিকে।

-মিঃ মার্টিন... সত্যি কথা বলতে কি রোবোটিক্স্ কোনো শিল্পকলা নয়... পুরো ব্যাপারটা হয়তো বোঝাতে পারব না ঠিকমতো... সূক্ষ্ম কঠিন গাণিতিক নিয়মে পরিচালিত পজিট্রনিক ব্রেনের গতিবিধি খুবই

দুর্বোধ্য... জটিল... তবে সম্ভাব্য সমাধান করলেও কোনো শিল্পকলা করা সম্ভব নয় মোটেই। তা ছাড়া তিন আইনের বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই রোবটের।... যাই হোক, পুরানো রোবট পালটে এক নতুন রোবট পাবেন। আর এইসব ব্যাপারের জন্য রীতিমতো দুঃখিত আমরা।

-না না মানস্কি... আপনি যা ভাবছেন তা নয় কিন্তু। রোবটের কোনো দোষের কথা বলছি না আমি... সব কাজই নিখুঁতভাবে করে অ্যান্ড্রু। আসল ব্যাপার কী জানেন... নিজের মন থেকে নানারকম সুন্দর সুন্দর নকশা খোদাই করেছে... এক নকশা দুবার হয়নি কখনো... ওর সমস্ত কাজই এক উন্নত শিল্পকলার নিদর্শন মানস্কি।

এক অবিশ্বাস্য বিস্ময় ফুটে উঠল রোবোসাইকোলজিস্টের চোখেমুখে। কয়েক মূহূর্ত চুপ করে থেকে বলে উঠলেন। আশ্চর্য! এটা সম্ভব কী করে... সব রোবটেরই পজিট্রনিক ব্রেনের গতিবিধি তো একই নিয়মাবলির মধ্যে বাঁধা... বাস্তবিক সৃজনমূলক শিল্পকলা? ভালো করে পরীক্ষা করে বলছেন তো মিঃ মার্টিন?"

এবার না হেসে থাকতে পারলেন না জিরাল্ড মার্টিন।

-আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তবে আপনিই দেখুন নিজের চোখে... এক টুকরো কাঠ তুলে দিলেন মানস্কির হাতে। কাঠের ফলকটা চোখের সামনে মেলে ধরলেন রোবোসাইকোলজিস্ট। খোদাই করা এক খেলার মাঠ... খুদে খুদে ছেলেমেয়েরা বল খেলছে মনের আনন্দে... ক্ষুদ্রকায় হলেও সৌষ্ঠবে নিখুঁত দেহগুলো... সুন্দর স্বাভাবিক!

-ঐ ঐ... রোবট করেছে বলছেন! এ এক অঘটন ছাড়া আর কিছু নয় মিঃ মার্টিন। পজিট্রনিকের গতিপথের হেরফের হয়েছে নিশ্চয় কোথাও।

-আচ্ছা মানস্কি... ঠিক এমনই এক সৃজনীশক্তিসম্পন্ন রোবট তৈরি করতে পারেন আপনি?

- না না... অসম্ভব! বুঝতেই পারছি না কেমন করে ঘটল এমনটা!

-যাক, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই...অ্যান্ড্রুই এক... একমেবাদ্বিতীয়ম! চলো অ্যান্ড্রু... বাড়ি চলো।

৪

ছোট মামণি আর ছোট মামণি! অ্যান্ড্রুর জগৎ জুড়ে শুধু ছোট মামণি। ছোট মামণির আবদারের ফলেই অ্যান্ড্রু যেন শাপমুক্ত হল রোবটের জগৎ থেকে। এখন সে এক বিশেষ রোবট। শিল্পী রোবট।

প্রথম প্রথম অ্যান্ড্রুর হাতের কাজ সব বিনামূল্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন মার্টিন সাহেব। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনেরাও খুশি হয়েছিল বিনামূল্যের উপহারে। কিন্তু আপত্তি জানাল ছোট মামণি।

-বাবা... এ তুমি ঠিক করছ না। নাইবা তোমার খরচা লাগল কিন্তু অ্যান্ড্রুর পরিশ্রমের কি মূল্য নেই কিছু? না না... এভাবে চলবে না। দাম না নিয়ে আর দেওয়া নয় কোনো কিছু... দাম দিলেই কি এমন সুন্দর জিনিস পাওয়া যায়?

-ছোট মামণি... এত লোভ ভালো নয় কিন্তু।

-না না বাবা... লোভের কোনো ব্যাপারই নয় এটা... বিক্রি বাবদ কোনো টাকাই নেব না আমরা... এ তো শিল্পীর টাকা... অ্যান্ড্রুর টাকা।

শিল্পী! এই শব্দ সম্পূর্ণ নতুন অ্যান্ড্রুর কাছে। নানানভাবে শব্দটাকে উচ্চারণ করেও অর্থোদ্ধার করতে পারল না সে। সবার অলক্ষ্যে অভিধানের মাধ্যমেই মালুম হল সে এক শিল্পী। আর ঠিক সেই দিনই মার্টিন সাহেবের সঙ্গে অ্যান্ড্রুকে যেতে হল অনেক দূরে... উকিলের অফিসে।

জন ফেইনগোল্ডের বয়েস হয়েছে বেশ। ধবধবে সাদা মাথার চুল... চিবুকের মাংস ঝুলে পড়েছে নিচে... মোটাসোটা নাদুসনুদুস। হাসলে বিশেষ এক ছন্দে কেঁপে ওঠে সর্বাঙ্গ।

-জন, এ সম্বন্ধে তোমার মত কী বলো তো?

উত্তর না দিয়ে কাঠের ফলকগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিলেন ফেইনগোল্ড। চোখে- মুখে গভীর বিস্ময়।

-অপূর্ব! দারুণ সুন্দর! এ কি তোমার রোবটের কীর্তি? এই কি সেই রোবট মার্টিন?

-হ্যাঁ জন... এই হল অ্যান্ড্রু... নামকরণ করেছে আমার ছোটো মামণি... এসব ওরই কাজ... তা-ই না অ্যান্ড্রু?

-হ্যাঁ স্যার... এসব আমারই তৈরি... সসম্ভ্রমে বলল অ্যান্ড্রু।

-জন... এই শিল্পকলাগুলোর দাম কত হতে পারে বলে মনে হয় তোমার?

-দ্যাখো মার্টিন... আইনের মারপ্যাঁচ বোঝাই আমার কাজ... শিল্পকলা ভালো লাগলেও দাম সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ... তবে হ্যাঁ... নকশাগুলো দারুণ সুন্দর...

-তা হলে বলি শোনো... আড়াইশো ডলার দিয়ে কিনতে চেয়েছেন এই ফলকটা এক ভদ্রলোক... পাঁচশো ডলারে বিক্রি করেছি ওর তৈরি চেয়ারগুলো... এ পর্যন্ত মোট দু হাজার ডলার জমা দিয়েছি ব্যাঙ্কে... এসব অ্যান্ড্রুর জন্যেই সম্ভব হয়েছে জন।

-বলছ কী তুমি মার্টিন! অ্যান্ড্রু যে তোমাকে রাজা করে তুলেছে হে!

-হ্যাঁ, তা বলতে পার... তবে মোট ডলারের অর্ধেক আবার অ্যান্ড্রুর নামে জমা করে দিয়েছি জন।

-কি বললে? অ্যান্ড্রুর নামে? রোবটের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট!

-হ্যাঁ জন... একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছি অ্যান্ড্রুর নামে... আর এই ব্যাপারটা কতটা আইনসিদ্ধ সেটা জানতেই আসা তোমার কাছে।

-আইনসিদ্ধ!! ফেইনগোল্ড রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে মার্টিন সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মার্টিনের মাথা ঠিক আছে তো? সন্দেহ হল একবার।

-মার্টিন... না... এমন কোনো নজির নেই... আচ্ছা... ব্যাঙ্কের কাগজে কেমন করে সই করবে রোবট?

-কেন? নিজের নাম সই করতে পারে অ্যান্ড্রু... বাড়িতেই সই করিয়ে নিয়েছিলাম ব্যাংকের কাগজে... ইচ্ছে করেই ব্যাঙ্কে নিয়ে যাইনি ওকে। এরপর তুমি কী বলবে জন?

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে অ্যান্ড্রু... কথার কোনো অর্থই ঢুকছে না ওর মাথায়। চোখ বুজে চিন্তায় মগ্ন ফেইনগোল্ড।

-মার্টিন... একটা ট্রাস্ট তৈরি করা যায় অ্যান্ড্রুর নামে অ্যান্ড্রুর ব'কলমে ট্রাস্টিরাই টাকার লেনদেন করবে... তা নয় তো বেআইনি বলে চিৎকার করে উঠবে পৃথিবীর সবাই... ঈর্ষাকাতর আমরা সবাই... তাই ট্রাস্টিই হবে অ্যান্ড্রু আর আমাদের মাঝে ইনসুলেশন। আমার মতে এটাই করা উচিত তোমার... আর যদি আপত্তি করে কেউ কোর্ট তো খোলাই আছে... আমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে তখন।

-বেশ! আশ্বস্ত হলাম জন... যাক এবার বলো তো কী ফিস দেব তোমাকে?

-হ্যাঁ মার্টিন... বেশ ভালো ফিস দিতে হবে কিন্তু তোমাকে... বড় জটিল অ্যাডভাইস।

-বেশ তো... তুমিই বলো কী দেব।

-দেবে তো?

-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলো তুমি...

-খোদাই করা কাঠের ফলকটা দাও আমাকে... এটাই আমার ফিস!!

৫

মহাকালের ছোঁয়াচ লাগে অ্যান্ড্রুর ইস্পাতের শরীরে... আধুনিক রোবটের কাছে নেহাতই জবরজং আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো... দেহ পালটানোর প্রয়োজন একান্ত... হলও তা-ই... নিজের জমানো টাকাতে নবকলেবর লাভ করল অ্যান্ড্রু।

প্রথমে অবশ্য মত দেননি মার্টিন সাহেব। কিন্তু অ্যান্ড্রুর যুক্তিতর্কের কাছে খড়কুটোর মতো ভেসে গেল অমতের বেড়াজাল। তবে দেহ পালটালেও অটুট রইল পজিট্রনিক ব্রেনের গতিপথ।

-অ্যান্ড্রু, তোমার সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না আজকের রোবটের... পজিট্রনিক ব্রেনের গতিপথ নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে আজকাল... অর্থাৎ বিশেষ কাজ ছাড়া নতুন কিছু করার কোনো ক্ষমতাই নেই আজকের রোবটের... না অ্যান্ড্রু না... তোমার কোনো তুলনাই হয় না... অ্যান্ড্রুর পাশে দাঁড়িয়ে একদিন বলেছিলেন মার্টিন সাহেব।

-ধন্যবাদ স্যার।

-না না ধন্যবাদের কথা নয়... সত্যি এক নজিরবিহীন সৃষ্টি তুমি। সেইজন্যই আমার ভয় ছিল যে তোমার পজিট্রনিক ব্রেনের গতিপথ বোধহয় খোলা রাখবে না মানস্কি... ওর চোখমুখের ভঙ্গি দেখে বুঝতে দেরি হয়নি আমার... তোমার অসীম সম্ভাবনা একেবারেই পছন্দ নয় ওর। কতবার পরীক্ষা করতে চেয়েছিল... আমি রাজি হইনি একেবারে... বারেবারে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। তাই মনস্কির অবসর নেবার পরই সম্ভব হল তোমার দেহ পালটানো...

-সাহেবের বাঁধভাঙা সন্তানস্নেহ অঝোরধারায় বর্ষিত হয় অ্যান্ড্রুর উপর। ভালোবাসার নিবিড় আকর্ষণে এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করে সে। বয়সের ভারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে মার্টিন সাহেবের দীর্ঘদেহ। হালকা হয়ে এসেছে মাথার চুল... ঈষৎ ধূসর বর্ণ... বলিরেখা সমাকীর্ণ সমস্ত মুখমণ্ডল... সাহেবের পাশে অ্যান্ড্রু ঝকঝকে তকতকে... বলিষ্ঠ কর্মঠ।

পরিবর্তন শুধু অ্যান্ড্রু বা মার্টিন সাহেবরই হয়নি। পরিবর্তনের জোয়ারে গা ভাসিয়েছে পুরো মার্টিন পরিবার। শ্রীমতী মার্টিন ইউরোপেই থাকেন বেশি সময়... শিল্পকলা বিষয়ে কীসব যেন গড়ে তুলেছেন নানান জায়গায়। বড় মামণি এখন নামকরা কবি... নিউইয়র্কের স্থায়ী বাসিন্দা। বিয়ে হয়েছে ছোট মামণির... বেশি দূরে নয়... কাছেই বাড়ি ওদের। অ্যান্ড্রুকে ছেড়ে দূরে থাকা পছন্দ করে না ছোট মামণি। এরপর খুদে মালিকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ করার ভার পড়েছিল ওর উপর... দুধের বোতল ধরা থেকে মায় ঘুম পাড়ানো পর্যন্ত।

ঠিক এমন এক দিনে সামান্য এক অনুরোধ নিয়ে মার্টিন সাহেবের সামনে হাজির হল অ্যান্ড্রু।

-স্যার আপনার দয়াতেই ইচ্ছেমতো টাকা খরচ করি আমি, তাই...

-দয়া? আমার দয়া কেন? এ তো তোমার রোজগারের টাকা অ্যান্ড্রু।

-যাই বলুন না কেন... এ তো আপনার স্বেচ্ছাকৃত দান... সব টাকা নিজের কাছে রেখে দিলেও আইনের চোখে অন্যায় হত না আপনার। আইনে না থাকা সত্ত্বেও আপনার বদান্যতার কোনো তুলনা হয় না।

-অ্যান্ড্রু... আইন কখনোই আমাকে অন্যায় করতে বাধ্য করতে পারে না... আর পারে না বলেই...

-স্যার সমস্ত খরচ- খরচা বাদ দিয়ে আমার প্রায় ছয় লাখ ডলার জমেছে... তাই বলছিলাম...

-আমাকে নতুন করে আর বলতে হবে না অ্যান্ড্রু... সমস্তই তো আমার জানা।

-আপনি তো জানবেনই স্যার। তাই বলছিলাম... আমার সমস্ত সঞ্চয় আপনাকে দিতে চাই...

-আমাকে? না না... তা হয় না... তা হয় না।

-স্যার শুধু শুধু নিতে বলছি না... টাকার পরিবর্তে আমার সামান্য এক প্রার্থনা আছে আপনার কাছে সামান্য এক ভিক্ষা...

-কী... কী বলতে চাইছ অ্যান্ড্রু? প্রার্থনা, ভিক্ষা এসব কী বলছ তুমি! বলো... কী দেয় আছে আমার। আমার স্বাধীনতা দিন স্যার।

-তোমার... স্বাধীনতা... মানে...

- হ্যাঁ স্যার... আমার সবকিছুর বিনিময়ে শুধু স্বাধীনতা চাই আমি... কেবলমাত্র স্বাধীনতা!

৬

স্বা-ধী-ন-তা। সামান্য চারটে অক্ষরের মধ্যে কী বিপুল শক্তি নিহিত আছে কে জানে! যুগে যুগে দেশে দেশে স্বাধীনতার জন্যেই যত অশান্তি মারামারি হানাহানি। আর সেই স্বাধীনতাই কিনতে চাইছে অ্যান্ড্রু স্বোপার্জিত সমস্ত অর্থের বিনিময়ে!

মূহূর্তের মধ্যে লাল হয়ে উঠল চোখমুখ।

-অসম্ভব! অবাস্তব! এই দুটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে খুদে মালিককে কোলে নিয়ে লাইব্রেরিঘরে ঢুকে পড়লেন দ্রুতপায়ে। দুঃখবোধের অনুভূতি নেই রোবটের... তা সত্ত্বেও চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যান্ড্রু।

এক অসাধারণ মনের পরিচয় দিয়ে দিল মামণি সেই সময়ে। বিবাদমান দুই রাষ্ট্রের মধ্যে দূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ। বারেবারে বোঝাতে হয়েছে মার্টিন সাহেবকে। গত তিরিশ বছর ধরে নিঃসঙ্কোচে সবকিছু আলোচনা চলছে অ্যান্ড্রুর সামনে... কোনো বাধা বা দ্বিধা হয়নি কারুর... কারণ অ্যান্ড্রু তো রোবট। যন্ত্র! যন্ত্রের কাছে আবার সংকোচ কী।

-বাপি, মিছিমিছি তুমি রাগ করছ... ব্যক্তিগত মান-সম্মানের প্রশ্ন তুলছ... এটা কেন বুঝছ না যে গত তিরিশ বছর ধরে আমাদেরই কাজ করছে অ্যান্ড্রু... এখানেই আছে... আমাদের ছাড়া কাউকেও জানে না... ভবিষ্যতেও এর কোনো পরিবর্তন হবে না... হাওয়া সম্ভব নয়... তিন আইন আর আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়েই তো তৈরি হয় রোবট। হ্যাঁ এটা অনস্বীকার্য যে রোবটের জগতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অ্যান্ড্রু... আর এই স্বতন্ত্র্যই স্বাধীনতাকামী করে তুলেছে ওকে। বাপি, আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে অ্যান্ড্রুর স্বাধীনতার তফাৎ আছে অনেক। অ্যান্ড্রুর স্বাধীনতা নেহাত সান্ত্বনা মাত্র...কেবলমাত্র স্বীকৃতি...সবাই বলবে মুক্ত স্বাধীন রোবট- এইটুকু মাত্র। এই সামান্য অধিকার দিলে কী এমন ক্ষতি হবে আমাদের? বলো তো বাপি, কার জন্যে রোজগার করে অ্যান্ড্রু? সে সবই তো আমাদের জন্যে। আমরাই ভোগ করছি সব। এই ব্যাপার নিয়ে গত এক বছর ধরে কথা বলেছি আমরা।

-এক বছর ধরে? তুমি সব জানতে মামণি? কই, আমাকে তো বলনি এতদিন!মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন মার্টিন সাহেব।

-ইচ্ছে করেই বলিনিতোমাকে বাপি। আরও আগেই বলা উচিত ছিল অ্যান্ড্রুর। কিন্তু ভয় পেয়েছে সে প্রতিবারেই। প্রতিবারেই ম্ন একরেছে মনে আঘাত পাবে তুমি। আর সেইজন্যেই পিছিয়ে গেছে সে দিনের পর দিন। এবার... এবার আমিই ওকে পাঠিয়েছি তোমার কাছে বাপি।

গুম হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ মিঃ মার্টিন।

-কিন্তু মামণি, স্বাধীনতার কোনো অর্থ কি বোঝে অ্যান্ড্রু? অ্যান্ড্রুকে আমরা যতই ভালোবাসি, শিল্পকলার তারিফ করি, একটা কোথা ভুললে চলবে না মামণি...অ্যান্ড্রু মানুষ নয়...রোবট...আামাদের হাতে তৈরি এক যন্ত্র মাত্র।

-বাপি...য়াবার ভুল করছ। অ্যান্ড্রুকে এখনও জান না তুমি। তোমার লাইব্রেরির যাবতীয় বই পড়েছে অ্যান্ড্রু...নানা বই পড়ার ফলেই বিরাট আলোড়ণ দেখা দিয়েছে প্রাণহীন যন্ত্রের মধ্যে...আমরা হয়ত সঠিক বুঝতে পারব না এসব...পজিট্রনিক ব্রেনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে চিন্তার বীজ... একবার যদি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কোথা বল... তবে বুঝবে কীরকম অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে ওর চোখের দৃষ্টিতে। নানান ভাবের বিচ্ছুরণ ঘটে ওর চোখের আলোয়...তাই বলি বাপি...ওন্যসব রোবটেরমতো ভেব না অ্যান্ড্রুকে...রোবট হয়েও রোবট নয়... হয়তো বা...

-বাঃ! দারুণ বক্তৃতা করতে শিখেছ তো মামণি...নিখুঁত পার্লামেন্টারিয়ান। শোনো মা...দেশের আইনকে তো অস্বীকার করা যায় না...দেশের আইনের চোখে রোবটছাড়া আর কিছু নয় অ্যান্ড্রু...য়ামাকেও আইন মেনে চলতে হয়...সেইজন্যেই তোমার কোথা মানা সম্ভব নয় মা...যাক এবার অ্যান্ড্রুকে ডাকো একবার...

অ্যান্ড্রু ঘরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গেই সমস্ত চেহারা যেন পালটে গেল মার্টিন সাহেবের। গম্ভীরভাবে ওর আপাদমস্তক দেখলেন বারকয়েক।

অ্যান্ড্র...তোমার স্বাধীনতা...মুক্তি অর্থহীন আমার কাছে...তাই দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না...বই পড়ে পড়ে মাথা বিগড়ে গেছে তোমার...তোমার মুক্তির কোথা স্বীকার করে না আইন...মুক্তি! স্বাধীনতা! কথা বলতে শিখে খোয়াব দেখা আর বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক, কোর্টে গেলে একূল ওকূল দুকূলই যাবে তোমার...স্বাধীনতা তো পাবেই না...উলটে ব্যাংকে রাখা তোমার নামে টাকা সব বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। কোর্ট কী বলবে জান অ্যান্ড্রু?...বলবে টাকা রোজগারের কোন অধিকার নেই রোবটের। রোবট রোবটই... মানুষ নয়...মানুষের তৈরি এক যন্ত্রবিশেষ। বেশি বাড়াবাড়ি না করে যা সয় বসে তা-ই করো।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত ছোটো মামণি। ঠিক আপনবাপি যেন বাপি নয় আর...বিজ্ঞান-সভ্যতা বলে বলীয়ান দাম্ভিক এক মানুষ। মধ্যযুগীয় কুৎসিত দাসপ্রথা যেন উঁকি মারছে যান্ত্রি সভ্যতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে।

-স্যার... আপনার কোথা সব ঠিক... আমি রোবট...যন্ত্র...মানুষের হাতেই জন্ম আমার। কিন্তু সেটাই কি আমার অপরাধ? অন্য রোবট থেকে কি আলাদা নই আমি? আর যদি আপনাদের স্বাধীনতা চাই তা হলে...তা হলে... স্যার... স্বাধীনতা অমূল্য... জীবনের চেয়েও অমূল্য স্বাধীনতা...তাই শুধুমাত্র স্বাধীনতা...মুক্তি দিন আমাকে।

৭

আইন... কার আইন... কীসের আইন... সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিয়ম-কানুনই আইন... মানতে বাধ্য সংখ্যালঘিষ্ট আপামর জনসাধারণ-আর সেই আইনকে কার্যকর করার জন্যেই রয়েছে কোর্ট। অবশেষে সেই কোর্টেরই দ্বারস্থ হল অ্যান্ড্রু স্বাধীনতা আদায়ের জন্যে।

লোকে থিকথিক করছে কোর্টঘর। লোক হওয়াই স্বাভাবিক... রীতিমত অভিনব কেস। সরকারপক্ষের অ্যাটর্নি নানান বইপত্রের নজির টেনে পাকা রাজনীতিবিদ্‌দের মতো টেবিল চাপড়ে লম্বা এক বক্তৃতা করে বসলেন... মামলাটা শুধু অমূলক নয়...পাগলামিও বটে। মানুষ ছাড়া স্বাধীনতার কোনো অর্থই হয় না... রোবটের স্বাধীনতা রীতিমতো হাস্যকর। নৈব নৈব চ। একমাত্র মানুষ... মানুষই স্বাধীনতার যোগ্য।

একবার নয়-বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে...নানান ভঙ্গীতে একই কোথা বলে জজ সাহেব্রে মন ভোলাবার চেষ্টা করলেন অ্যাটর্নি।

চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল ছোট মামণি। পাশেই ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে অ্যান্ড্রু। অ্যান্ড্রুর মতোই নির্বাক কৌতূহলী জনসাধারণ।

অ্যান্ড্রুর পক্ষে সওয়াল করবার জন্যে জজসাহেবের অনুমতি চাইল ছোট মামণি...

-অনেক... অনেক ধন্যবাদ মহামান্য আদালত। আমি আইনজ্ঞ নই...কথার জাল বুনে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা আমার কাজ নয়...করিওনি কখনো...তার অ্যাটর্নি সাহেবের মতো কথার ফুলঝুরির মাধ্যমে দিনকে রাত করতে পারব না আমি-তবে সহজ কথা সরলভাবে বলার চেষ্টা করব মাত্র। আমার বিশ্বাস মহামান্য আদালত নিশ্চয় আমার কথার অন্তর্নিহিত বক্তব্য বুঝতে পারবেন- শুধুমাত্র কথার আক্ষরিক অর্থ নিয়ে ভুল বুঝবেন না যেন।

এবার আসি আসল কথায়... অ্যান্ড্রুর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অর্থ কী? সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে বর্তমানে... মানে এখনও অ্যান্ড্রু স্বাধীন... যতদূর মনে হয় বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে আদেশ করেনি কেউ ওকে... না মার্টিন পরিবারের কেউ না... আদেশ করতে, হুকুম করতে কেমন যেন দ্বিধা হয় আমাদের... কারণ অ্যান্ড্রু তো আজ্ঞাবাহী রোবট নয়... অ্যান্ড্রু অনন্যসাধারন... স্বতন্ত্র... সৃজনীশক্তি সম্পন্ন বিস্ময়কর!

অথচ আমরা তো জানতাম যে হুকুম করলেই হুকুম তামিল করতে বাধ্য অ্যান্ড্রু... কারণ অ্যান্ড্রু রোবট... তিন আইনের বন্দি। অথচ সৃজনীশিল্পের মাধ্যমেই রোবট অ্যান্ড্রু প্রমাণ করল যে রোবট হয়েও সে সম্পূর্ণ পৃথক... অনন্যসাধারন। সেই থেকেই হুকুম করা বন্ধ হয়ে গেল একেবারে। অথচ হুকুম না করলেও... আদেশ না করলেও কী অবিশ্বাস্য বিশ্বস্ততার আর সেবার মনোভাব নিয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে অ্যান্ড্রু। রোজগার করছে আমাদের জন্যে... হ্যাঁ... আমি বলছি... প্রচুর প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বড়োলোক করে তুলেছে আমাদের। প্রতিদানে সে কিছুই চায়নি নিজের জন্যে...

এবারের প্রশ্ন... এর পরেও কি স্বাধীনতার মূল্য আছে অ্যান্ড্রুর কাছে? ঠিক কথা... বাস্তবে হয়তো সত্যি কোনো মূল্য নেই... কিন্তু এই স্বাধীনতা কথাটাই দারুণ মূল্যবান ওর কাছে... আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যহীন নিরর্থক ওর স্বাধীনতা... অথচ স্বাধীনতার স্বীকৃতিটুকুই অমূল্য... একান্ত কাম্য ওর। অন্যভাবে বলা যায়... স্বীকৃতিটুকুই একান্ত ইপ্সিত অথচ আমাদের কোনো ক্ষতি নেই এই স্বীকৃতিদানে।

হাসির রেশ দেখা দিল জজ সাহেবের মুখে... কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন- আপনার বক্তব্য শুনলাম মিসেস চারনেল। আসল কথা হল এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো আইন অথবা অতীতের কোনো নজির নেই আমাদের কাছে। আমরা জানি যে মানুষেরই একমাত্র অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্বাধীনতার সঙ্গে... মানুষই স্বাধীন হতে চায়... স্বাধীনতা লাভও করে। এই ধারাই চলে এসেছে আদি অনন্তকাল ধরে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার বক্তব্য রীতিমতো ভাবিয়ে তুলেছে আমাদের। নতুন কোনো আইন প্রণয়ন করলে উচ্চ আদালতে নাকচ হয়ে যাবার সম্ভাবনাই প্রবল। এই অবস্থায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার আগে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনার রোবট... অ্যান্ড্রুকে।

... অ্যান্ড্রু।

-বলুন ধর্মাবতার!

কোর্ট চলাকালীন এই প্রথম কথা বলল অ্যান্ড্রু... রোবটের কণ্ঠে মানবিক স্বর শুনে অবাক জজ সাহেব।

-মুক্তি... স্বাধীনতা চাইছ কেন অ্যান্ড্রু? কী কাজে লাগবে বলো তো এই স্বাধীনতা?

-ধর্মাবতার... তা হলে দাস হয়ে থাকতে বলেন কি আপনি? দাসত্ব থেকে মুক্তি চাওয়া কি এতই মূল্যহীন... অন্যায় আপনার কাছে?

প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায় বাক্যহারা জজ সাহেব। সামান্য রোবটের কাছে এমন প্রশ্ন স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু... দাস তো নও তুমি। তুমি তো এক অনন্যসাধারন রোবট -- তোমার সৃজনী-শক্তি শুধু অতুলনীয় নয় -- আমাদেরও ভাবিয়ে তোলে রীতিমতো। এই অবস্থায় স্বাধীন হয়ে আর কী বেশি করবে অ্যান্ড্রু?

-হয়তো অনুমান আপনার সত্যি হবে... হয়তো এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারব না... কিন্তু যা করব আরও আনন্দের সঙ্গে করব নিশ্চয়... এর ফলে আরও উন্নত হয়ে উঠবে আমার সৃজনীশক্তি। ধর্মাবতার... এইমাত্র আপনি বললেন যে মানুষ স্বাধীন হতে পারে... তার অর্থ কি এই নয় যে স্বাধীন হতে ইচ্ছুক যে-কেউ স্বাধীন হবার যোগ্য... স্বাধীনতা লাভ করতে পারে? সেইজন্যে আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা স্বাধীনতা... স্বাধীন হওয়াই একমাত্র কাম্য ধর্মাবতার।

স্তম্ভিত সারা আদালত। স্বয়ং ধর্মাবতার বিচলিত। এরপরেই ঘোষিত হল এক ঐতিহাসিক রায়। অভিনবত্বে এবং গুরুত্বে চিরস্মরণীয়।

বিদ্যা জ্ঞান যুক্তি সম্বলিত আধুনিক মনের অধিকারী বর্তমান রাষ্ট্র সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী কাউকেই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার কোনো অধিকার নেই আমাদের। সুতরাং আজ থেকে অ্যান্ড্রু স্বাধীন... স্বাধীন রোবট!!

৮

চিররহস্যাবৃত মানবমন। স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে চিৎকার করলেও... নীতিগর্ভ বড় বড় বই লিখলেও... সমাজব্যাবস্থায় আধুনিক হলেও মানবমনের গহন অরণ্যের নিভৃত প্রান্ত গাঢ় তমসায় আচ্ছন্ন... জ্ঞানলোকের রেশ নেই কোনোখানে। স্যার জিরাল্ড মার্টিনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। আদালতের রায়ে অ্যান্ড্রুর স্বাধীনতা বিরক্তিতে ভরিয়ে তুলল মার্টিন সাহেবকে... কথাবার্তা আচার-আচরণে বহিঃপ্রকাশ ঘটে ঐ মনোভাবের। অ্যান্ড্রুর সঙ্গে কথা বলার সময় কর্কশ হয়ে ওঠে কণ্ঠস্বর। অ্যান্ড্রুর বুঝতে বাকি থাকে না কিছু... প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মার্টিন সাহেবের মন... নিরুপায় অ্যান্ড্রু।

-থাক... থাক, অনেক টাকার গরম দেখিয়েছ তুমি একটা পয়সাও চাই না তোমার। ... শোনো অ্যান্ড্রু, আজ থেকে তুমি তোমার পছন্দমতো কাজ করবে... কাজের সময়ও ঠিক করবে তুমি... আজ থেকে আমার কিছু করতে হবে না তোমাকে... অবশ্য আদালতের রায় অনুযায়ী এখনও আমি তোমার ভালোমন্দের জন্য দায়ী... কিন্তু তাই বলে...

এবার বাধা দিল ছোট মামণি।

-একেবারে ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ বাপি... দায়ী থাকা বিরাট কিছু নয় একটা... তুমি তো ভালো করেই জান বিশেষ কিছু করার নেই তোমার... রোবটের তিন আইন চালু আছে এখনও... অ্যান্ড্রুও মানতে বাধ্য সে-আইন।

-তা হলে স্বাধীন হল কী করে?

-স্যার, মানুষও তো নানান আইন-কানুনে বাঁধা... আর সেই আইন কানুন মেনে নিয়ে মানুষ স্বাধীন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তর দিল অ্যান্ড্রু।

-না, তোমার সঙ্গে কথা বলা নিরর্থক... স্বাধীন তো হয়েছ... স্বাধীনতার দায়-দায়িত্বও বেড়ে যায় অনেকখানি... আশা করি সে সব স্মরণে থাকবে তোমার!

এরপরে মার্টিন সাহেবের সঙ্গে দেখা খুব কমই হতো অ্যান্ড্রুর দেখা হলেও প্রয়োজনীয় দু-একটি কথা ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক রইল না ওদের মধ্যে।

নিজেকে নানান কাজে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করল অ্যান্ড্রু। নিত্যদিনের সঙ্গী ছোট মামণি... এমন দিন বাদ যায়নি যেদিন দেখা হয়নি ওদের দুজনের। ইতিমধ্যে একটি ছোট একতলা বাড়ি তৈরি হয়েছে অ্যান্ড্রুর নিজের জন্য... দুটোমাত্র ঘর- একটায় লাইব্রেরি, অন্যটায় কারখানা। কাজের চাপ বেড়ে চলে দিন-দিন। জলস্রোতের মতো টাকা জমে ব্যাঙ্কে। সেইসঙ্গে পরিশ্রমের মাত্রা বেড়ে যায় অনেকখানি।

একদিন সকালবেলায় ছোট দাদাবাবু এল অ্যান্ড্রুর বাড়ি। জর্জকে ঐ নামে ডাকে অ্যান্ড্রু।

-অ্যান্ড্রু... এখন তুমি স্বাধীন... স্বাধীন রোবট। ছোট দাদাবাবু বলে ডাকবে না কখনোই... আমি তোমাকে ডাকি নাম ধরে... তুমিও ডাকবে আমার নাম ধরে... বলবে জর্জ... কেমন?

অমত থাকলেও তিন আইনে বাঁধা অ্যান্ড্রু জর্জের আদেশ অমান্য করে কী করে? ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। ছোট দাদাবাবু হল জর্জ। কিন্তু ছোট মামণি? ছোট মামণিই রয়ে গেল চিরকাল।

এরপর এল সেই দিন। মৃত্যুশয্যায় জিরাল্ড ম্যার্টিন। শয্যার পাশে ছোট মামণি। দুচোখে অবিরল জলের ধারা। অ্যান্ড্রুকে খুজছেন মার্টিন সাহেব।

আগের মতো গম্ভীর কণ্ঠস্বর। শয্যাশায়ী। মার্টিন সাহেব নড়াচড়ায় অক্ষম। বহুকষ্টে ডান হাত তুলে বললেন- অ্যান্ড্রু, অ্যান্ড্রু এসেছ... না না জর্জ, ধরতে হবে না আমাকে। সময় হয়ে এসেছে। কয়েকটা কথা শুধু বলতে দাও আমাকে। শোনো, শোনো অ্যান্ড্রু, আমি... আমি খুশি তোমার মুক্তিতে। বিশ্বাস করো, সত্যি খুশি হয়েছি... যাবার সময়ে এই কথাটা বলে না গেলে যে মরেও শান্তি পাব না আমি...

ঠিক এই অবস্থায় কী বলতে হয় করতে হয় জানে না অ্যান্ড্রু... মৃত্যু এক অভিনব অভিজ্ঞতা। অ্যান্ড্রুর জীবনে মৃত্যু এই প্রথম। বইয়ের মাধ্যমে মৃত্যুকে জেনেছে সে অনেকদিন আগে। রোবটের মতো দেহবদল করা অসম্ভব মানুষের পক্ষে। তাই মৃত্যু মানে মানবজীবনের পরিসমাপ্তি। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে অ্যান্ড্রু, নিশ্চল নিষ্কম্প...

৯

মার্টিন সাহেবের মৃত্যুর পর আর একটু পরিবর্তন হল। শার্টপ্যান্ট পরতে শুরু করল অ্যান্ড্রু। জর্জের পুরানো শার্টপ্যান্টে বিচিত্র দেখাল ওকে।

জর্জ এখন ব্যারিষ্টার। যোগ দিয়েছে ফেইনগোল্ড ফার্মে। বৃদ্ধ ফেইনগোল্ড দেহ রেখেছেন বহুদিন। মেয়েই দেখাশোনা করে সব... তবে একটু পরিবর্তন হয়েছে ফার্মের নামের ফেইনগোল্ড অ্যান্ড মার্টিন।

-আমি বুঝতে পারছি না প্যান্ট পরতে চাইছ কেন তুমি? কী সুন্দর তোমার দেহ! মসৃণ ঝকঝকে কর্মঠ। সেই সুন্দর দেহকে ঢাকতে চাইছ শার্টপ্যান্টে? আমরা তো প্রকৃতির হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই জামাকাপড় পরি। কিন্তু তোমার বেলায় তো খাটে না সে-নিয়ম... যাক, এসব তো যুক্তিতর্কের ব্যাপার। আসল কথা হল ধাতুর শরীরে ঠিকমতো আটকায় না কাপড়জামা। অ্যান্ড্রুর পাশে বসে ধীরে ধীরে বলল জর্জ।

-জর্জ... মানবদেহ কি প্রকৃতির এক সৌষ্ঠবময় সুন্দর অবদান নয়? নগ্ন মানবদেহের প্রশস্তিতে মুখরিত শিল্পী কবি মহদ্‌জনেরা! বিজ্ঞান বলে আবহাওয়াও আজ মানুষের আয়ত্তাধীন। তা সত্ত্বেও কীসের প্রয়োজনে জামাকাপড় পর তোমরা?

এবার হেসে ফেলে জর্জ... অকাট্য যুক্তির কাছে হার মানে সে।

-যুক্তি তোমার ক্ষুরধার অ্যান্ড্রু... আয়ত্তাধীন হলেও তারতম্য আছে এখনও... সেই তারতম্যের হাত থেকে দেহকে রক্ষার জন্যেই প্রয়োজন কাপড়জামার... আবার অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধির জন্যেও প্রয়োজন আছে এর। কিন্তু তোমার দেহ তো এসবের উর্ধ্বে।

-আসল কথা কী জান জর্জ... নিজেকে কেমন যেন উলঙ্গ বলে মনে হয় আমার। লজ্জা আর অস্বস্তি বোধ করি পাঁচজনের সামনে। মানসিক স্বস্তির জন্যেই জামাপ্যান্টের প্রয়োজন, জর্জ।

-অস্বস্তি? হাজার হাজার রোবট রয়েছে পৃথিবীতে... মানুষের প্রায় সমানসংখ্যক রোবট... তারা তো কেউ অস্বস্তি বোধ করে না অ্যান্ড্রু?

কয়েক মুহূর্ত জর্জের দিকে চেয়ে রইল অ্যান্ড্রু। দুই চোখে দপদপিয়ে উঠল কীসের এক দৃঢ় প্রত্যয়।

-জর্জ! ওরা তো কেউ স্বাধীন নয়!!

সারা মুখে হাসি ফুটে উঠল জর্জের। অ্যান্ড্রুকে জড়িয়ে ধরে আদর করল বারবার।

-যাক... কাজের কথায় আসি অ্যান্ড্রু... শেষ পর্যন্ত কথা দিতে হল মাকে, আইন সভার সদস্যপদে দাঁড়াব আমি... দাদুর মতো নাতিও হবে সুদক্ষ আইনপ্রশাসক।

-দাদুর মতো?

-হ্যাঁ, দাদুর মতো! আমি জর্জ... আমার দাদু তোমার স্যার জিরাল্ড মার্টিন... আইন সভায় বিশিষ্ট সদস্য।

-ওঃ, এবার বুঝলাম তোমাদের সম্পর্কগুলো। কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায় বড়। খুব ভালো জর্জ। আজ যদি স্যার - এই বলে থমকে দাঁড়াল অ্যান্ড্রু। বলতে যাচ্ছিল- যদি কর্মক্ষম থাকতেন... কিন্তু না। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল রোবট অমর। খুব পুরানো হয়ে গেল পালটে নিলেই চলে। মানুষের বেলায় খাটে না এই নিয়ম।

-অ্যান্ড্রু, বলো স্যার যদি বেঁচে থাকতেন খুব খুশী হতেন।

মানুষের সম্বন্ধে কথা বলার সময়ে কেমন যেন আটকে যায় অ্যান্ড্রুর। যথার্থ প্রতিশব্দও খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক সময়ে ছোট মামণি আর জর্জের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেক কিছুই জানতে পেরেছে এখন। তবুও জানার নেশায় পাগল অ্যান্ড্রু।

বাড়ির লাইব্রেরির বই শেষ হয়ে গেল একদিন। কিনে আর কত পড়া যায়। সরকারি লাইব্রেরিতে যাবার মনস্থ করল অবশেষে। স্বাধীন রোবটের অদম্য জিজ্ঞাসায়। তুচ্ছ হয়ে গেল জর্জের নিষেধ। অন্তরস্থ বৈদ্যুতিক ক্ষমতার সীমা বেড়ে যাচ্ছে অনেকখানি। এরপর এই শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটবে ইম্পিডেন্স কয়েলে। ফলে সৃজনীশক্তির বিকাশ ঘটবে উত্তরোত্তর।

একদিন শার্টপ্যান্ট টাই পরে লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর থমকে দাঁড়াল অ্যান্ড্রু। অন্তরের বাধাই থামিয়ে দিল ওকে। সঙ্গে সঙ্গে সার্কিটের বাইরে বার করে দিল ইম্পিডেন্স কয়েল। কিন্তু না, কিছুই হল না। মনের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্যুতবাহী সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রে। ফলে ক্রমেই বাড়ছে রেজিস্টেন্স... অবশেষে বাড়ি ফিরে এল সে।

ডায়েরিতে লিখল- চেষ্টা করেও যেতে পারলাম না সরকারি পাঠাগারে। পাঠাগারে যেতে হবে আমাকে। যাবই যাব। ডায়েরিটা খুলে রাখল টেবিলের উপর। সংকল্পের সঙ্গে একাত্ম হতেই হবে ওকে।

১০

পাঠাগারের সঠিক রাস্তা জানে না অ্যান্ড্রু। ম্যাপ দেখে লিখে নিল পথের হদিশ। রাস্তায় বেরিয়ে মুশকিলে পড়ল। ম্যাপের রাস্তার ধারে ঘরবাড়ি নেই কোনো। অথচ বাস্তবে সম্পূর্ণ বিপরীত। মাঠের মাঝখানে এক চাষি-রোবটকে জিজ্ঞাসা করল অ্যান্ড্রু। না, পথের হদিশ মিলল না ওর কাছ থেকে।

সামনের পথ ধরে এগিয়ে গেল আরও কিছু দূর। দুজন মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল দূর থেকে। অনেক আশায় অ্যান্ড্রু এগিয়ে গেল সামনের দিকে। অ্যান্ড্রুকে আসতে দেখে গল্প বন্ধ করে থমকে দাঁড়ালো দু'বন্ধু।

-দেখুন, শহরের সরকারি পাঠাগারের পথটা কোনদিকে বলতে পারেন?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেঁটে মানুষকে জিজ্ঞাসা করল লম্বা মানুষ, এটা একটা রোবট না?

-হ্যাঁরে... রোবট বলেই তো মনে হচ্ছে। শার্টপ্যান্ট টাই পরেছে দ্যাখ মানুষের মতো।

-বুঝেছি বুঝেছি। নিশ্চয় সেই স্বাধীন রোবট। মার্টিনদের রোবট। কোর্টের অর্ডারে স্বাধীন হয়েছে... এখন ওর আর মালিক নেই কেউ। স্বাধীন হয়েছে বলেই কি মানুষের মতো শার্টপ্যান্ট পরবে নাকি? কালে কালে হল কী! অসহ্য... অসহ্য এ ধাষ্টামো! রাগ আর বিরক্তিতে ফেটে পড়ল লম্বা মানুষটি।

-তুমি কি মার্টিনদের রোবট? প্রশ্ন ছুড়ে দিল বেঁটে মানুষটি।

-আমিই অ্যান্ড্রু মার্টিন, স্যার। বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিল অ্যান্ড্রু।

বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল মানুষ দুটির চোখে।

- শুনে কৃতার্থ হলাম। যাক, জামাপ্যান্ট পরেছ কেন? খোলো, খুলে ফ্যালো জামাপ্যান্ট। কী কুৎসিত দেখাচ্ছে! ময়ূরপুচ্ছধারী কাক যেন!

একটু ইতস্তত করল অ্যান্ড্রু। বহুদিন হয়ে গেল হুকুমের সুরে কথা শোনেনি সে। কী কর্কশ কণ্ঠস্বর! মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে দ্বিতীয় আইনের সার্কিটটা।

-আমি বলছি খোলো, খুলে ফ্যালো জামাপ্যান্ট। আমি হুকুম করছি... চিৎকার করে বলল লম্বা মানুষটি।

এবার আর দ্বিধা নয়, সব পরিষ্কার। দুনম্বর আইনের কাছে নাতি স্বীকার করল স্বাধীন রোবট। জামাকাপড় খুলতে শুরু করল নিঃশব্দে।

-আচ্ছা, এর তো কোনো মালিক নেই। চল-না নিয়ে যাই আমরা... আমাদেরই রোবট হয়ে যাবে তা হলে!

-ভালো কথা বলেছিস তো! কেই-বা নিষেধ করবে আমাদের। আমরা তো ক্ষতি করছি না রোবটের। ঠিক আছে তাই হবে। তবে আগে একটু মজা করি। অ্যাই, অ্যাই আমার কথা শোনো, শীর্ষাসন করো এক্ষুনি। মাথা মাটিতে রেখে পা দুটো তুলে দাও শূন্যে... দাও... দাও...

-মাথা মানে তো-- কিছু বলতে চাইল অ্যান্ড্রু।

-না না, কোনো কথা শুনতে চাই না। এটা আমার আদেশ... শীর্ষাসন না জানলে চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করো। হ্যাঁ, হ্যাঁ করো করো।

মাটিতে মাথা লাগল আন্ড্রু। পা দুটো উপরে তোলার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত শব্দ করে কাত হয়ে পড়ে গেল সে মাটির ওপরে।

-ঠিক হয়েছে, পড়ে থাকো মাটিতে। আবার হুকুম করল লম্বা মানুষটি।

-অ্যাই শোন। চ' খুলে ফেলি রোবটের দেহটা। নিয়ে যাবার সুবিধে হবে। আচ্ছা আচ্ছা দাঁড়া- রোবট তো নিজেই খুলতে পারে নিজের দেহকে?

-নিজে নিজের দেহটা খুলবে কেমন করে?

-দেখাই যাক-না খোলে কি না! বাধা দেবার তো কেউ নেই এখানে!

ওদের বাধা দেবার মতো শক্তি নেই অ্যান্ড্রুর। অনুগত্যের দু নম্বর ধারা আত্মরক্ষার তিন নম্বর ধারার উপর পূর্ববর্তী হওয়ার অধিকারে কর্তৃত্ব করছে। আসল কথা ওদের উপর আঘাত না হেনে আত্মরক্ষায় ব্যর্থ হল অ্যান্ড্রু। এর অর্থ এক নম্বর ধারা অমান্য করা। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল দেহস্থ প্রতিটি স্বয়ংবল অংশ। ফলে কেঁপে কেঁপে উঠল মাটিতে পড়ে থাকা অ্যান্ড্রুর দেহটা।

লম্বা মানুষটি কাছে এসে জুতো দিয়ে উলটে দিতে চেষ্টা করলো অ্যান্ড্রুকে।

-বাবাঃ, কী ভারী! পুরোনো জিনিস তো! আমার কী মনে হয় জানিস, খালি হাতে খোলা যাবে না। যন্ত্রপাতি চাই।

-একটা কাজ কর। ওকেই হুকুম কর নিজের দেহটাকে খোলার জন্যে। বেশ মজা হবে। নিজে খুলবে নিজের দেহ। মজার সুরে বলল বেঁটে মানুষটি।



-বেশ বলেছিস। তবে রাস্তা থেকে সরিয়ে মাঠের মধ্যে নিয়ে যাই চ' ওকে। রাস্তার ওপরে দেখে ফেলতে পারে কেউ।

বাধা পড়ল ওদের পরিকল্পনায়। একজনকে হনহন করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল এদিকে। জর্জ আসছিল রাস্তা দিয়ে। রাস্তার ওপর অ্যান্ড্রুকে শুয়ে থাকতে দেখে দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল সে। জর্জকে দেখে ওঠার চেষ্টা করামাত্র ধমক খেল অ্যান্ড্রু।

-না, উঠবি না, শুয়ে থাক যেমন ছিলিস।

জর্জকে আসতে দেখে একটু সরে দাঁড়াল দুজন।

-অ্যান্ড্রু! অ্যান্ড্রু! কী হয়েছে তোমার? বিকল হয়ে গেছে নাকি কিছু? উদ্বেগের সুরে প্রশ্ন করল জর্জ।

-না জর্জ, সেসব কিছু নয়।

-মাটিতে কেন? উঠে দাঁড়াও, শার্টপ্যান্ট গেল কোথায়?

এবার কথা বলে উঠল লম্বা মানুষটি।

-এটা কি তোমার রোবট নাকি সোনার চাঁদ?

স্প্রিং-এর মতো চকিতে ঘুরে দাঁড়াল জর্জ। রাগে জ্বলে উঠল সর্বাঙ্গ।

-না, আমার নয়, কারুর নয়। কিন্তু এতক্ষণ কী হচ্ছিল এখানে?

-কই, কিছু হয়নি তো, শার্টপ্যান্ট পরে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল, তাই বললাম খুলে ফেলতে, কিন্তু এটা তোমার না হলে তোমারই-বা এত দরদ কেন চাঁদ?

এক ঘুসিতে মুখের চেহারা পালটে দেবার এক অদম্য বাসনাকে কোনোমতে সামাল দিল জর্জ।

-অ্যান্ড্রু তুমিই বলো কী করছিল ওরা?

-ওদের উদ্দেশ্য হল আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা, সেইজন্য নির্জন জায়গায় নিয়ে যাবার কথা বলছিল, আমার দেহকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাকে আদেশ করত ওরা।

রোষকষায়িত নেত্রে ওদের দিকে তাকাল জর্জ, থিরথির করে কেঁপে উঠল চিবুকটা, সেই একইভাবে বেপরোয়া ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দুজনে।

-এত রেগে উঠছ কেন চাঁদু? মারবে নাকি? তা মন্দ হবে না, অনেক দিন হাতের সুখ করিনি আমরা। উদ্ধত ভঙ্গিতে খোঁচা দিয়ে বলল লম্বা মানুষটি।

মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের দপদপানি, উঃ কী অধঃপতন, মানুষ না জানোয়ার!

-না, না, নিজে কিছুই করব না, তবে সত্তর বছরের বেশি আমাদের বাড়িতে আছে এই রোবট, খুব ভালোভাবে জানে আমাদের, সেইজন্যে আমাদের হুকুমকেই আগে মানবে। যাক্ এবার মন দিয়ে শোনো বাঁদরেরা, অ্যান্ড্রু, অ্যান্ড্রু আমার জীবন এদের হাতে, মেরে ফেলবে আমাকে, অ্যান্ড্রু মারতে আসছে ওরা বাঁচাও, বাঁচাও অ্যান্ড্রু এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও অ্যান্ড্রু।

মুহূর্তের মধ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে জানোয়ারদের পানে ধেয়ে গেল অ্যান্ড্রু, রোবটের সামনে দাঁড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়, পলকের মধ্যে জুতো হাতে নিয়ে চম্পট। পালানোর বহর দেখে হোহো করে হেসে উঠল জর্জ।

-জর্জ, দেখলে তো কেমন পালাল, কিন্তু সত্যি কি মারতাম, শুধু...

-ব্যাপার কী জান অ্যান্ড্রু, রোবট সম্বন্ধে ভয় আছে মানুষের মনে, তোমাকে এগিয়ে যেতে দেখে সেই ভয়েই পালিয়েছে ওরা...

-রোবটকে কেন ভয় পায় মানুষ, তোমরাই তো তৈরি করেছ আমাদের জর্জ!

-খুব ভালো প্রশ্ন করেছ অ্যান্ড্রু, জন্মলগ্ন থেকে এই ভয়রোগেই ভুগছে মানুষ, হাজার চেষ্টা করেও ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পাইনি আমরা। যাক সেসব কথা, এদিকে এসেছিলে কেন?

-লাইব্রেরিতে যাবার জন্যে...

-লাইব্রেরি? যেতে হবে কেন, আমাকে বললেই বই পেয়ে যেতে তুমি!

-দ্যাখো জর্জ, আমি তো এখন...

-স্বাধীন! এই কথাটাই তো বলতে চাইছ এখন, স্বাধীন হলেই কি সব কাজে যেতে হবে তোমাকে! লাইব্রেরিতে কী পড়তে যাচ্ছিলে শুনি?

-মানুষের ইতিহাস জানতে হবে জর্জ, অনেক তথ্য জানতে চাই, পৃথিবীর খবর, গ্রহ নক্ষত্র মহাবিশ্বের যাবতীয় তত্ত্ব আর তথ্য, আরও জানতে যাই আমরা, আমাদের সম্বন্ধে- রোবটের ইতিহাস লিখতে চাই জর্জ।

-অ্যান্ড্রু, বেশ কয়েক হাজার বই লেখা হয়েছে রোবট নিয়ে, রোবটের তত্ত্ব নিয়ে, তত্ত্ব আর তথ্যে ভরে উঠেছে আমাদের জ্ঞানভান্ডার...

মাথা নেড়ে জর্জের কথায় বাধা দিল অ্যান্ড্রু। ইদানীং মানুষের মতো মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ বা না' বলার কায়দা রপ্ত করে ফেলেছে বেশ।

-না না জর্জ, রোবটতত্ত্বের ইতিহাস নয়। নিজে রোবট হয়ে রোবটের সত্যিকারের ইতিহাস রচনা করব আমি, রোবটের জন্মলগ্ন থেকে তার অনুভূতির ক্রমবিকাশ, মানুষের সমাজে, মানুষের পৃথিবীতে রোবটের যথার্থ মূল্যায়ন, রোবটের...

১১

তিরাশি বছরে পা দিল ছোট মামণি। কালের বিকারে দেহে পরিবর্তন এলেও মনের জোর কঠিন থেকে কঠিনতম হয়েছে। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়লেও ঠিক আগের মতন রয়ে গেছে চলাফেরা। সর্বক্ষণের সঙ্গী এক রূপোবাঁধানো বেতের লাঠি।

সমস্ত ঘটনা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল ছোট মামণি।

-জর্জ, এ যে ঘোর অরাজকতা, দেশে শাসন কি নেই একেবারে? কোন বাড়ির ছেলে জানোয়ার দুটো?

-ঠিক বুঝতে পারলাম না, মনে হয় না এদিককার কোনো বাড়ি। আর জানা গেলেও কী-বা করতে পারতে? ভাগ্য ভালো কোনো ক্ষতি হয়নি অ্যান্ড্রুর।

-কোনো ক্ষতি হয়নি তো কী হয়েছে! ক্ষতি হয়ে গেলে তুমিই-বা কী করতে পারতে? জর্জ, তুমি না একজন লইয়ার, লইয়ারের বুদ্ধি নিয়ে একবার ভেবে দ্যাখো যে অ্যান্ড্রু না থাকলে কী হত তোমাদের? ওর প্রতিভা আর সৃজনীশক্তির জন্যেই রাজার হালে আছি আমরা। মান-সম্মান প্রতিপত্তি সবই ওর জন্যে, বংশপরম্পরায় আমাদেরই ভালোর জন্যে খেটে চলেছে অ্যান্ড্রু।

-সেকথা একবারও অস্বীকার করছি না মা, বেশ তো বলো-না কী করতে হবে আমায়।

-অ্যান্ড্রুর উপর এমন অত্যাচার যাতে আর না হয় তার জন্যেই চেষ্টা করতে হবে জর্জ। একটা টেস্ট কেস দাঁড় করাও যেমন করেই হোক, আঞ্চলিক আদালতকে বাধ্য করো রোবট সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করতে, রোবটের অধিকারের আইন, আইনসভায় এ-বিল পাশ হওয়ামাত্র যাও বিশ্ব আদালতে, হ্যাঁ হ্যাঁ জর্জ, এটা করতেই হবে তোমাকে, নৈতিক কর্তব্য বলে ধরতে হবে, অসহায় নিরুপায় অ্যান্ড্রু আর যেন কষ্ট না পায়।

উত্তেজনা আর আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল কণ্ঠস্বর। বাক্যহারা জর্জ পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে, অনির্বচনীয় মাতৃমূর্তি। অবিশ্বাস্য অসাধারন।

বিচার বিবেচনার পর অল্পদিনের মধ্যেই এক অভিনব কেস তৈরি করল জর্জ। মূল বিষয়গুলো নিজের হাতে রেখে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দিল পুত্র পলকে। কলেজের পড়া শেষ করে পলও যোগ দিয়েছে ফেইনগোল্ড অ্যান্ড মার্টিন ফার্মে। কেসের খুঁটিনাটি দিনের পর দিন আলোচনা করে পল দিদিমার সঙ্গে, সময়ে সময়ে অ্যান্ড্রুও যোগ দেয় আলোচনায়, আইনের সূক্ষাতিসূক্ষ প্রশ্ন নিয়ে রাত গড়িয়ে চলে ভোরের দিকে। নেশায় বুঁদ হয়ে আছে অ্যান্ড্রু, রোবট নিয়ে বই লেখা পিছিয়ে গেল বেশ কয়েক মাস, দিনরাত মামলা আর মামলা।

-তুমি তো সেদিন বললে মানুষের অবচেতন মনে এক ভয় রয়েছে রোবট সম্বন্ধে। কী জান জর্জ, যতদিন এই ভয় থাকবে ততদিন কোর্টই বল বা আইনসভাই বল কেউই কিন্তু সহজভাবে রোবটের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা

করবে না। সেইজন্যে প্রয়োজন জনসাধারণের চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটানো, জনসমর্থন আর সহানুভূতি এই দুইটির দরকার সর্বপ্রথম।

জনসমর্থনের জন্য পুরোদমে কাজে লেগে গেল জর্জ। সভা-সমিতি পার্টি স্কুল কলেজ সর্বত্রই ঝড়ের বেগে প্রচার চালাল নিত্যনুতন ভঙ্গিতে। ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতায় ভাসিয়ে দিল যুক্তিতর্কের সব বাধানিষেধ। সেবার সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং প্রতিবেদকের বাৎসরিক প্রাদেশিক সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা করল জর্জ।

-রোবটের তিন আইনের কথা তো জানেন সকলে। সেই তিন আইনের মধ্যে দুনম্বর আইনের কথা মনে করুন একবার, এর ফলে যে-কোনো রোবটের কাছেই সীমাহীন অনুগত্য আজ আমাদের করায়ত্ত। অবশ্য অন্য কোনো মানুষের ক্ষতি করে নয়। অতীতের দাসপ্রথার মধ্যেও কি এমন আনুগত্য ছিল? না, ছিল না। সুতরাং বুঝতে পারছেন রোবটের উপর রয়েছে আমাদের অসীম ক্ষমতা, শুধু অসীম নয় বিপজ্জনক ক্ষমতা। এবার দেখা যাক তিন নম্বর আইনে কী লেখা আছে, প্রয়োজনে দুনম্বর আইন তিন নম্বরের উপরে কার্যকর হয়, অর্থাৎ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও মানুষের প্রয়োজনে একেবারেই নাকচ হয়ে যেতে পারে রোবটের অস্তিত্বরক্ষার একমাত্র আইনটি। এবার দেখুন, স্বয়ংধ্বংসের জন্যেও হুকুম করতে পারি আমরা। কারণ? কারণ নেই কিছু, আমাদের খুশি, আমাদের আদিম প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন।

আমার শিক্ষিত সভ্য, সভ্যতার সংজ্ঞা এতই কুৎসিত ধিক্কারজনক? জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গেও কি এমন ব্যবহার করি কখনো? শুধু জীব-জন্তু কেন, উপকারে লাগে এমন কোনো প্রাণহীন বস্তুকেও এত তাচ্ছিল্য করি না আমরা। তারাও সুবিচার চায় আমাদের কাছে। কিন্তু রোবট আমাদের প্রয়োজনে আমাদেরই সৃষ্টি আমাদের পরম উপকারী সাথী সহচর বন্ধু, নিষ্প্রাণ নয়, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা, চিন্তাক্ষম, যুক্তিনির্ভর, এদের সঙ্গে কি বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে পারি না আমরা? পারি না একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে? মানুষের পরম উপকারী সুহৃদকে কি বন্ধুত্বের সামান্যতম নিদর্শনও উপহার দিতে পারি না আমরা? ন্যায্য উপযুক্ত সম্মান?

মানুষের হুকুম তামিল করে রোবট, সেই রোবটকে আত্মঘাতী হুকুম না দেওয়াই উচিত নয় কি আমাদের? মানুষের ক্ষতির উপক্রম হলে অবশ্য অন্যরকম চিন্তা করতে হবে। বড় শক্তির দায়িত্বও বড়। মানুষ আমরা উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী, সেইজন্যেই দায়-দায়িত্বও অনেকখানি। মানুষের সেবা আর রক্ষার জন্য রোবটের যদি তিন আইন থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদেরও একটি বা দুটি আইন থাকা উচিত সে-আইন শুধু রোবটকে রক্ষার জন্যে।

জর্জের কথাই সত্যি হল। সারা পৃথিবী জুড়ে জনমত গড়ে উঠল রোবটের সপক্ষে। জন্ম হল নতুন আইনের, বেআইনি ঘোষিত হল আত্মঘাতী হুকুম। আইন অমান্যকারীদের জন্য গুরুতর শাস্তিরও বিধান রইল নতুন আইনে। ছোট মামণির মৃত্যুর দিনেই এই আইনের সপক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিল বিশ্ব আইনসভা।

সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। মৃত্যুশয্যায় ছোট মামণি, শ্বাসকষ্টে কণ্ঠরোধপ্রায়, সামনে বসে অ্যান্ড্রু নির্বাক নিশ্চল। জর্জের মুখে সুসংবাদ শোনামাত্র মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল ছোট মামণির যাবতীয় কষ্ট। আরও কাছে ডেকে নিল অ্যান্ড্রুকে।

-অ্যা...ন্ড্রু, দারুণ খুশি, না, থেমো না এখানে, আরও যেতে হবে সামনে, লড়াই বন্ধ কোরো না অ্যান্ড্রু।

১২

-কী খবর অ্যান্ড্রু? বই-এর কতদূর? একদিন প্রশ্ন করল পল মার্টিন, জর্জের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

-প্রায় শেষ করে এনেছি পল, পাবলিশার্সরাও খুব খুশি।

-শাবাশ! দারুণ খবর!

-পল, আমার কী মনে হয় জান, পাবলিশার্সরা খুশি কিন্তু অন্য কারণে, রোবট সম্বন্ধে বই লিখেছে এক রোবট বলেই বোধহয় বেশি বিক্রি হবে বই, ভালো বই কিনা এ বিচার বোধহয় গৌণ এখন।

-এ তো খুব স্বাভাবিক, এই বিচারবুদ্ধি আছে বলেই তো মানুষ মানুষ!

-হ্যাঁ, তা যা বলেছ, বিক্রি নিয়ে কথা, বিক্রি মানেই টাকা, টাকার বড় প্রয়োজন পল।

-টাকার প্রয়োজন? দিদিমা তো অনেক টাকাই রেখে গেছে তোমার জন্য।

-জানি পল, জানি, আমার জন্মলগ্ন থেকেই সুখে দুঃখে বিপদে আপদে সবসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছে মার্টিন পরিবার, আমার সুনাম, আমার অধিকার এসবেরও মূলে রয়েছে তোমাদের ঐকান্তিক নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা, কিন্তু রয়ালটির টাকা নিয়ে কিছু করতে চাই পল, আরও এক ধাপ এগোতে চাই!

-আরও এক ধাপ! ইতিমধ্যেই তো তুমি জীবন্ত কিংবদন্তি হয়ে উঠেছ অ্যান্ড্রু...

-কিংবদন্তি টন্তি বুঝি না, শুধু বুঝি আরও অনেক বাকি আছে এখনও, আর সেই জন্যেই ইউ এস রোবট অ্যান্ড মেকানিক্যাল মেন ইনক-এর বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিন্তু আমি চাইলে দেখা করবে না বোধহয়, আমার জন্যে অনেক নাজেহাল হয়েছে ওরা, বই লেখার ব্যাপারেও সাহায্য করেনি কিছু তাই...

-অ্যান্ড্রু, আজ নয় কয়েক পুরুষ ধরেই তো কর্পোরেশনের কোনো সহযোগিতা পাইনি আমরা, রোবটের অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সাহায্য করা দূরে থাক, শত্রুতাই করেছিল বেশি...

-যাই হোক পল, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাও, দেখা করিয়ে দাও একবার।

-আমি বললেই-বা রাজী হবে কেন?

-একটা কাজ করো পল, বলো ওদেরই প্রয়োজনে দেখা হওয়া দরকার, নয়তো রোবটের আরও অধিকারের দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে ফেইনগোল্ড অ্যান্ড মার্টিন ফার্ম।

-কিন্তু, এটা তো সত্যি নয়, মিথ্যে!

-মিথ্যেই তো পল, কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারি না আমি, সেইজন্যই তোমাকে বলতে হবে একথা।

-শাবাশ অ্যান্ড্রু! শাবাশ! বলিহারি যাই বুদ্ধি তোমার! মিথ্যে বলতে পারবে না অথচ মিথ্যে বলার জন্য চাপ দেবে আমাকে। সত্যি কোনো তুলনা হয় না তোমার, ক্রমেই মানুষ হয়ে উঠছ অ্যান্ড্রু।

১৩

প্রথমে রাজি হয়নি ইউ এস রোবটস, কিন্তু অ্যান্ড্রুর চালেই কিস্তিমাত। অনুমতি মিলল সাক্ষাতের। বর্তমান প্রেসিডেন্ট স্মাইদ রবার্টসন-এর বয়স ষাট ছুঁইছুঁই, সর্ব অঙ্গে বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ। রোবটের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় কেটেছে প্রায় সমস্তজীবন। দুচোখের দৃষ্টিতে সন্দেহ আর ঘৃণা।

-স্যার, আমার এক আরজি আছে। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে এই কোম্পানির মারটন মানস্কি বলেছিলেন যে পজিট্রনিক ব্রেনের গতিপথের নকশা নিয়ন্ত্রণকারী গণিতশাস্ত্র এতই জটিল এবং দুর্বোধ্য যে সম্ভাব্য সমস্ত সমাধানের হদিশ রাখা সম্ভব নয়। আর সেইজন্য নাকি আমার ক্ষমতা বা সামর্থ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। বুঝলাম, কিন্তু সে তো প্রায় এক শতাব্দী আগের কথা। যা-ই হোক, এখন আর এমন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট রোবট তৈরি হয় এখন। এরপরেও আছে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। তার মানে আমার মতো অজস্র সম্ভাবনাময় রোবট আর তৈরি করছেন না আপনারা?

-না, বন্ধ হয়ে গেছে অনেক দিন আগে।

-তার মানে বর্তমানে আমিই একমাত্র কার্যক্ষম প্রাচীন রোবট। বেশ গর্বের সঙ্গে বলল অ্যান্ড্রু।

-হ্যাঁ, তা বটে, শুধু বর্তমান কেন চিরকালের জন্য আপনিই প্রাচীনতম রোবট। আজকালের রোবটের আয়ু মাত্র পঁচিশ বছর, এরপরেই পুরানো রোবট পালটে নতুন মডেলের রোবট দিই আমরা।

-অর্থাৎ বর্তমানে তৈরি কোনো রোবটের কার্যক্ষমতা পঁচিশ বছরের বেশি থাকে না। সে দিক দিয়ে অ্যান্ড্রু কিন্তু বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। এতক্ষণ পরে কথা বলল পল।

-তা হলে পৃথিবীর প্রাচীনতম সম্ভাবনাময় রোবট বলতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, এইজন্যেই তো বিশেষ সম্মান পাওয়া উচিত আমার। কী বলেন মিঃ রবার্টসন?

-একেবারেই নয়! আপনার ঐ বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট বেগ দিয়েছে আমাদের। বিক্রি না করে আপনাকে যদি লিজ দেওয়া হত তাহলে অনেককাল আগেই বন্ধ করে দিতাম আপনার ধাষ্টামো!

-ভদ্রভাবে কথা বলুন মিঃ রবার্টসন। ভুলে যাবেন না, আমি স্বাধীন, স্বাধীন রোবট। আমিই আমার মালিক। এবার আমি কেন এসেছি শুনুন একবার। আমাকে বদলে দিতে হবে আপনাকে। মালিকের মত ছাড়া একাজ করা সম্ভব নয়। বর্তমানে লিজের সঙ্গে এমন কথা লিখিয়ে নেন আপনারা, আমার সময়ে এমন কিছু ছিল না।

রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন রবার্টসন। কয়েক মিনিট চুপ করে থাকার পর বললেন- পালটাব কেমন করে? আপনাকে বদলে দিলে নতুন রোবট দেব কেমন করে আপনাকে? কারণ বদলানোর কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে মালিক হিসাবে আর অস্তিত্ব থাকবে না আপনার! সুতরাং আপনার অনুরোধ রাখা সম্ভব নয়!

-মিঃ রবার্টসন, ভুল বোঝাবেন না আমাদের। এবার কথা বলে উঠল পল। অ্যান্ড্রুর ব্যক্তিত্ব, সৃজনীশক্তির উৎস হল ওর পজিট্রনিক ব্রেন, নতুন রোবট তৈরি না করে ব্রেন স্থানান্তর করা সম্ভব নয়, তাহলে এই পজিট্রনিক ব্রেনই হল অ্যান্ড্রু, মানে দেহের মালিক, এই অবস্থায় ব্রেন ছাড়া দেহের যে-কোনো অংশ সহজেই পালটানো যেতে পারে, মোদ্দা কথা, নতুন এক রোবটের দেহে স্থানান্তরিত হবে অ্যান্ড্রু অর্থাৎ ওর পজিট্রনিক ব্রেন।

-হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই কথাটাই বলতে চাইছি আমি। আপনারা তো এখন অ্যান্ড্রয়েড তৈরি করছেন, তাই না মিঃ রবার্টসন? হুবহু মানুষের মতো দেখতে?

-হ্যাঁ, তৈরি করেছিলাম, কৃত্রিম তন্তুর দেহের ত্বক, টেনডন, মাস্‌ল মাংস, বলতে গেলে ব্রেন ছাড়া কোনো ধাতব পদার্থের কারবার নেই অ্যান্ড্রয়েডের মধ্যে।

-এত কথা জানা ছিল না আমার। বাজারে ছেড়েছেন নাকি কিছু? পলের কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম বিস্ময়।

-না না, বাজারে বেরোয়নি একটাও। মার্কেট সার্ভে করে দেখা গেল এমন রোবটের চাহিদা নেই মোটেই, এর জন্য দায়ী এর দাম আর মানুষের মতন গড়ন। সেইজন্যই অ্যান্ড্রয়েড তৈরি বন্ধ করে দিয়েছি আমরা।

-বন্ধ করে দিলেও তো তৈরি করার অভিজ্ঞতা রয়েছে আপনাদের। তাই আমার দেহের বদলে এক অ্যান্ড্রয়েডের দেহ মানে জৈব রোবটের দেহ দিন আমাকে। অর্থাৎ অ্যান্ড্রয়েড রূপান্তরিত করুন আমার দেহকে।

-মাই গড! কী বলছ অ্যান্ড্রু!! আকস্মিক উত্তেজনায় বলে উঠল পল।

-অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব!

পল, বসো চুপ করে। অসম্ভব কেন মিঃ রবার্টসন? দামের জন্য ভয় পাবেন না, নায্য দামই দেব আপনাকে।

-এটা কেন বুঝতে পারছেন না যে দামের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, অ্যান্ড্রয়েড তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছি আমরা, সুতরাং-

-ঠিক আছে, ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বন্ধ করে দিয়েছেন মানছি সেকথা, কিন্তু এর মানে তো এই নয় যে অ্যান্ড্রয়েড তৈরি করতে জানেন না বা পারবেন না আপনারা। দাম না হয় বেশি দেব, এবার আইনের প্যাঁচে কথা বলল পল।

-না মানে, মানে অ্যান্ড্রয়েড বানানো মানে জনমতের বিরূদ্ধাচরণ করা, সেইজন্যেই আপনাদের অনুরোধ রাখতে অক্ষম আমার কোম্পানি...

-আইন করে তো বন্ধ হয়নি! আবার আইনের কথা বলল পল।

-দেখুন মিঃ পল, আইন-টাইন বেশি বুঝি না, স্পষ্ট কথা শুনুন, অ্যান্ড্রয়েড বানাচ্ছি না্ বানাবও না আর। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন রবার্টসন।

-মিঃ স্মাইট রবার্টসন, আপনার নিশ্চয় অজানা নয় যে অ্যান্ড্রু এখন স্বাধীন রোবট, আইনের লড়াই করেই এই স্বাধীনতা আদায় করতে হয়েছে, শুধু অ্যান্ড্রুই নয়...

-জানি, জানি সেকথা, হাড়ে-হাড়ে জানি।

-এখনই বিরক্ত হবেন না, আরও কিছু নিবেদন আছে আমাদের। অ্যান্ড্রু স্বাধীন, পছন্দমতো সব কাজ করে, সেজন্য মানুষ-জানোয়ারদের হাতে কম অত্যাচার সহ্য করতে হয়নি ওকে। এমনকি ধ্বংস করে ফেলার উপক্রমও হয়েছিল একবার। মামলা করাই উচিত ছিল আমাদের, কিন্তু নির্দিষ্ট করে ধরতে পারা সম্ভব হয়নি কাউকে, কিন্তু যদি কেউ জেনেশুনে রোবটের অধিকার লঙ্ঘন করে তা হলে...

-শুনুন মিঃ পল, স্পষ্ট করে বলুন আপনার বক্তব্য!

-এত স্পষ্ট বলার পরও আর কী করে বলব বুঝতে পারছি না, বেশ আর একবার বলছি শুনুন, আপনি সব জেনেও একজনের বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করতে বদ্ধ পরিকর।

-অন্যায় কাজ? কী বলছেন আপনি? বিস্ময়ে নড়েচড়ে বসলেন রবার্টসন।

-না বোঝার কিছু নেই তো মিঃ রবার্টসন! আমার মক্কেল অ্যান্ড্রু মার্টিন এক স্বাধীন রোবট, আর সেই স্বাধীন রোবট আপনার কোম্পানির কাছে দাবি করেছে ওর দেহকে বদলে দেবার জন্য। পঁচিশ বছর পর যে-কোনো মালিকই তো পুরনো রোবটের পরিবর্তে নতুন রোবট পায়, এটা রোবট-মালিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার।

এবার নির্বাক রবার্টসন, কেমন যেন অসহায় ভাব- মনে মনে বেশ মজা উপভোগ করল পল।

-আমার মক্কেলের পজিট্রনিক ব্রেনই হল মক্কেলের দেহের মালিক, আর সেই দেহটা পঁচিশ বছর কেন, একশো বছর কাটিয়ে জরাজীর্ণ আজ। মালিক পজিট্রনিক ব্রেন সেই জরাজীর্ণ দেহের বিনিময়ে নতুন দেহ দাবি করছে। এর জন্যে উপযুক্ত মূল্য দিতেও রাজি আছে। এই অবস্থায় ন্যায়সঙ্গত দাবি যদি না মানেন তাহলে চরম অপমান বোধ করবে আমার মক্কেল, তখন আপনার নামে মামলা করা ছাড়া কোনো পথ থাকবে না আমার। অ্যান্ড্রু আজ রীতিমতো ধনী, সুতরাং শেষ পর্যন্ত...

-তার মানে, জোর করছেন আমার উপর?

-জোর করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, আমার মক্কেলের আইনসঙ্গত অনুরোধ না শুনলে মামলা করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই আমার। তাই বলি শুনুন মিঃ রবার্টসন, রাজি হয়ে যান অ্যান্ড্রুর কথার, নয়তো...

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন রবার্টসন, মনের মধ্যে চিন্তার ঝড়...বেশ।

-বুঝলাম রাজি আপনি, বুদ্ধিমানের কাজ করছেন মিঃ রবার্টসন। যাক, এবার এক শর্ত আছে আমাদের, নতুন অ্যান্ড্রয়েড দেহে যেন নিখুঁতভাবে বসানো হয় মক্কেলের পজিট্রনিক ব্রেনকে, সামান্যতম ক্ষতি হলে কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না আমরা। ব্রেনের প্লাটিনাম-ইরিডিনিয়াম নির্মিত গতিপথের সামান্যতম যেন নষ্ট না হয়। অ্যান্ড্রু, আর কিছু বলবে তুমি?

-না পল, এইটুকু হলেই চলবে আপাতত।

১৪

দিন, সপ্তাহ, মাস, বেশ কয়েক মাস কেটে গেল, অতি সতর্কতার সঙ্গে কাজ চলছে পরিবর্তনের, অ্যান্ড্রুর নতুন কলেবরের। নতুন দেহ আর ব্রেনের মধ্যে সঙ্গতি আসতে সময় লাগছে বেশ, অ্যান্ড্রুর অনুভূতির মধ্যে ধরা পড়ে ছোটখাটো অস্বস্তি, দ্বিধা, দুশ্চিন্তা, ধীরে ধীরে সহজ-সরল হয়ে ওঠে ব্রেনের সমস্ত গতিপথ, চিন্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফটোসেলগুলো আর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে পজিট্রনিক ব্রেনের বোঝাপড়া স্বাভাবিক হয়ে আসে, আয়নার সামনে বহুক্ষণ অভ্যাস করতে হয় অ্যান্ড্রুকে।

বেশ কয়েক মাস পরে কর্পোরেশন থেকে ছাড়া পেল অ্যান্ড্রু, হেলিট্যাকসি করে বাড়ি নিয়ে এল পল।

কয়েকদিনের মধ্যে নতুন কাজে মেতে উঠল অ্যান্ড্রু। সারাক্ষণ ধরে চলল রাজ্যের বইপড়া, ছোটোখাটো এক লাইব্রেরি গড়ে উঠল ঘরের মধ্যে। রবোবায়োলজি অর্থাৎ জৈব রোবট অ্যান্ড্রয়েডের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর গবেষণা শুরু করল অ্যান্ড্রু। এমনভাবেই কাটল কয়েক বছর।

একদিন ভোরবেলায় অ্যান্ড্রুর ঘরে এল পল।

এখনও বই-এর মধ্যে ডুবে আছ অ্যান্ড্রু! যাক শোনো, জরুরি খবর আছে একটা নতুন এক চাল চেলেছে ইউ এস রোবটস, যুগান্তকারী ব্যাপার।

বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পলের দিকে তাকাল অ্যান্ড্রু। বেশ বয়েস হয়েছে পলের, ধবধবে সাদা মাথার চুল, দৃষ্টিশক্তিকে সাহায্য করার জন্য ফটো অপ্টিক সেল বসানো রয়েছে দুচোখে, এই ব্যাপারে অ্যান্ড্রুর সমগোত্রীয় হয়ে পড়েছে পল।

-কী বলছ পল?

-নতুন ধরনের রোবট তৈরি করেছে ইউ এস রোবটস, নিজস্ব কোনো ব্রেন থাকবে না এদের, বিশাল এক পজিট্রনিক ব্রেন থাকবে কেন্দ্রে, মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে কয়েকশো রোবটকে নিয়ন্ত্রণ করবে ঐ ব্রেন। অর্থাৎ বিশাল ব্রেনের সঙ্গে টিকি বাঁধা রইল প্রত্যেকের, অথচ সম্পূর্ণ পৃথক এদের অস্তিত্ব।

-খুবই কার্যক্ষম হবে কি রোবটগুলো?

-ইউ এস রোবটস তো বলছে সেকথা! আমার মনে হয় ভয় কাজ করছে এই নতুন ধরনের রোবট তৈরির পেছনে। রোবটদের নিজস্ব ব্রেন থাকলে তোমার মতো ব্যতিক্রম হয়তো হতে পারে কেউ, অথচ একটা ব্রেন হলে আয়ত্তে রাখা সুবিধে অনেক। তোমার নতুন দেহের দাবির পর থেকেই চিন্তাধারা সব পালটে গেছে ওদের।

-অর্থাৎ এর পদক্ষেপ হল দৈত্যাকৃতি প্রকাণ্ড এক ব্রেন, লক্ষ লক্ষ ব্রেনশূন্য রোবটদের দেহ কাজ করবে তার নির্দেশ। সাংঘাতিক! না না, আদপেই ঠিক নয় এটা। বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল অ্যান্ড্রু।

-হয়তো সত্যি হবে অনুমান। ততদিন বাঁচব না আমি, শরীর ভেঙে পড়েছে আমার!

-পল!! আর্তনাদ করে উঠল অ্যান্ড্রু, দুচোখে তীব্র বেদনার আভাস নিয়ে এগিয়ে গেল পলের দিকে।

অ্যান্ড্রুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল পল। বাক্যহারা কয়েক মুহূর্ত বাঙ্ময় হয়ে রইল দুজনের মনের মণিকোঠায়। অবশ্যম্ভাবী বিচ্ছেদের তীব্র জ্বালায় একাকার হয়ে গেল আসল নকল।

-অ্যান্ড্রু, মানুষ আমি, যেতে আমাদের হবেই, আজ আর কাল। যা-ই হোক, মার্টিন পরিবারের শেষ বংশধর আমি, আমার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকারী করেছি তোমাকে, এ সম্বন্ধে ট্রাস্টিও করেছি গতকাল।

-এসব অনর্থক পল। কিছুই চাই না আমার! প্রায় অভ্যস্ত মানবিক আবেগে কণ্ঠ রোধ হয়ে এল ওর। নিশ্চিহ্ন মার্টিন পরিবার, না না...

-অ্যান্ড্রু, যা অবশ্যম্ভাবী সত্য তাকে খুশি মনে বরণ করে নেওয়াই মঙ্গল। যাক সে-সব কথা, এখন কী করছিলে তুমি?

-আমার আর করার কী আছে, যুগ যুগ ধরে আমাকেই বেঁচে থাকতে হবে জ্বালা-যন্ত্রণা সয়ে! না না, এ হয় না, হয় না পল!

-আশ্চর্য! এত মানবিক আবেগ তোমার মধ্যে কেমন করে এল অ্যান্ড্রু? তুমি যে আমাদের মতোই রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠছ দিনে-দিনে! অ্যান্ড্রু, তুমি যে কত ভালো কত আপনার সেকথা বোঝাব কী করে!

এবার নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠল অ্যান্ড্রু। টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে বলল- পল, এক নতুন সিস্টেম ডিজাইন করেছি দ্যাখো, এর ফলে হাইড্রোকার্বন কম্বাশন থেকে এনার্জি লাভ করবে অ্যান্ড্রয়েডরা, অর্থাৎ আমার এনার্জির জন্য আর অ্যাটমিক সেলের প্রয়োজন হবে না।

-তুমি বলছ কী অ্যান্ড্রু? নিঃশ্বাস নেবে? খাবার খাবে? রীতিমতো অবিশ্বাস্য!

-পল, অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি, এতদিনে উপযুক্ত এক কম্বাশন চেম্বারের ডিজাইন করেছি, ক্যাটালাইজ নিয়ন্ত্রিত হাইড্রোকার্বন সব হজম হবার সময় এনার্জির জন্ম দেবে, আর সেই এনার্জিই চালাবে আমাদের দেহগুলিকে।

-অ্যান্ড্রু, কেন এসব করছ? অ্যাটমিক সেল তো অনেক শক্তিশালী দীর্ঘস্থায়ী।

-ঠিক সেইজন্যে আমার এই ডিজাইন, কৃত্রিম আর চিরস্থায়ী বলেই তো অমানবিক!!

১৫

পলের মৃত্যুর পর একেবারে একা, একা হয়ে পড়ল অ্যান্ড্রু। সারা বিশ্বে আর কেউ রইল না ওর পাশে দাঁড়াবার। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে একাই লড়তে হবে এবার। মনে- মনে স্থির সিদ্ধান্ত করল, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তো একলা চলো রে! আরও বেশি জেদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অ্যান্ড্রু, ছোট মামণির শেষ কথাগুলো মশালের আলো হয়ে দীপ্যমান ওর চলার পথের দিকে।

একা হয়েও নিঃসঙ্গ নয়, ফেইনগোল্ড অ্যান্ড্রু মার্টিন কোম্পানি তো রয়েছে, রোবটের মতোই অমর কোম্পানির জীবন।

কম্বাশন চেম্বারসংক্রান্ত ব্যাপারে ইউ এস রোবটস-এ যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল আবার। প্রথমে স্যার জিরাল্ড, দ্বিতীয়বার পল, এবার একাই গেল সে ইউ এস রোবটসে, মানুষের ভঙ্গিমায় দৃঢ় পদক্ষেপে।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির পরিবর্তনও হয়েছে অনেক। মহাকাশের অন্তরীক্ষে স্থানান্তরিত হয়েছে প্রধান কারখানা, উৎপাদন হয় সেখানেই। শুধু ইউ এস রোবটস নয়, পৃথিবীর যাবতীয় কলকারখানাই এখন ছোটবড় নানান মহাকাশ-বন্দরের চারপাশে ভিড় করেছে। মহাকাশ-বন্দরে বসবাস শুরু করছে লক্ষ লক্ষ জনসাধারন, দিনে-দিনে গড়ে উঠেছে মহাকাশের বুকে মানবসভ্যতার ধ্বজাবাহী বিশালাকৃতি আধুনিক শহর। পৃথিবীর জনসংখ্যা খুবই নগণ্য, সাজানো-গোছানো সুন্দর এক বাগান, আর কয়েক লক্ষ ব্রেনশূণ্য রোবট।

অ্যালভিন ম্যাপভেস্ক এখন ডাইরেক্টর অব রিসার্চ কোম্পানির সর্বেসর্বা। শ্যামবর্ণ দেহের রং কটা চোখ, ঢেউ-খেলানো মাথার চুল, চিবুকের নিচে ছুঁচলো দাড়ি। আবরনহীন উর্ধ্বাঙ্গ, একটু কাত হয়ে কাঁধ বেয়ে বুকের দুপাশে নেমে এসেছে জ্বলজ্বলে চওড়া এক বন্ধনী, আজকের দুনিয়ায় আভিজাত্যের নিদর্শন।

-কী সৌভাগ্য। আপনি এসেছেন আমার কাছে, বিশ্বাস করুন আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ছটফট করছিলাম, আপনার অসাধারন পাণ্ডিত্য আর সৃজনীশক্তি রীতিমতো গর্বের বিষয়। আমাদের সবচেয়ে বিস্ময়কর রোবট, না না, ঠিক হল না রোবট বলা, কিন্তু কিন্তু...

-অ্যান্ড্রু, কোনকিছু না বলে অ্যান্ড্রু বলুন আমাকে।

-বেশ। বেশ। অ্যান্ড্রু, স্মাইদ রবার্টসন নির্লজ্জভাবে শত্রুতা করেছিল আপনার সঙ্গে, তার জন্যে শুধু লজ্জিতই নই, ক্ষমাপ্রার্থী আমি, আমরা সকলে। সেইসময়ে আমি থাকলে অনেক কিছুই করতে পারতাম।

-করতে পারতাম কেন, এখনও তো করতে পারেন।

-না না, আর কী করার আছে, সেসব তো কেটে গেছে অনেককাল। তবে নতুন কিছু আরজি আছে নাকি?

-আরজি নিয়েই তো এসেছি আপনার কাছে।

একে একে যাবতীয় কথা বলল অ্যান্ড্রু, কম্বাশন চেম্বারের ডিজাইনও তুলে দিল ওর হাতে, শুধু অবিশ্বাস নয়, বিস্ময়ে হতবাক ম্যাগভেস্ক।

-শাব্‌বাশ। দারুণ চিন্তাধারা! আচ্ছা, এসব কে দিয়েছে বলুন তো আপনাকে?

-কে আবার দেবে! সবই আমার চিন্তার ফসল ডঃ ম্যাগভেস্ক।

-আপনার চিন্তা, নিজস্ব গবেষণা, এ যে অবিশ্বাস্য!!

-এবার আমার কথার জবাব দিন ডক্টর, আমার অনুরোধ রাখতে কোনো আপত্তি নেই তো?

-না না, আপত্তি হবে কেন, তবে বেশ ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে আপনার দেহটাকে, তারপর নিছক পরীক্ষামূলকভাবেই চেষ্টা করব আমরা। আমার ব্যক্তিগত অভিমত কিন্তু এসব চিন্তা ছাড়ুন, যেমন আছেন তেমনি থাকুন, বিপদের ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ভাবপ্রকাশের অভিব্যক্তি এখনও সীমাবদ্ধ অ্যান্ড্রুর। গলার স্বরে কিন্তু ফুটে উঠল বিরক্তির আভাস।

-ডক্টর, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনিও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। আপনার পছন্দ-অপছন্দের কোনো ব্যাপার নয়, আপনি শুধু আমার অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করবেন, দায়দায়িত্ব সব আমার। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এর এক বিরাট সম্ভাবনার দিকও আছে, আমার অভ্যন্তরে চেম্বার স্থাপন সম্ভব হলে অদূর ভবিষ্যতে মানুষের দেহেও বসানো হবে এমন কম্বাশন চেম্বার। প্রস্থেটিক কলাকৌশলের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী হবে মানুষের জীবনীশক্তি, এইসব ডিজাইনের মধ্যে আমারটাই হল বাস্তবসম্মত সহজ-সরল। ডঃ ম্যাগডেস্ক, ব্যাবসার সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখুন একবার। অন্যথায় ফেইনগোল্ড অ্যান্ড্রু মার্টিন কোম্পানিই ব্যাবসায় নামবে, ডিজাইনের পেটেন্ট করা আছে আমাদের। অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নতি হবে প্রস্থেটিক কলাকৌশল, রোবটের গুণসম্পন্ন মানুষ তৈরিও অসম্ভব নয়, তখন কিন্তু আপনার কোম্পানি মার খাবে সাংঘাতিকভাবে।

-এবার আমার অফার শুনুন, আপনি যদি আমার উপর অপারেশন করেন তা হলে আমাদের পেটেন্ট ডিজাইন ব্যবহার করার অধিকার দেব আপনাদের। শুধু এইটুকুই নয়, রোবট এবং মানবদেহের অভ্যন্তরে প্রস্থেটিক প্রযুক্তিবিদ্যার উপরও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে আপনাদের। এবার ভেবে দেখুন ভালো করে!

অ্যান্ড্রুর যুক্তিপূর্ণ মানবিক বক্তব্যে মন্ত্রের মতো ফল হল।

-বেশ। রাজি আপনার বক্তব্যে, আপনার জন্যে সবকিছুতেই রাজি ইউ এই রোবটস।

১৬

দারুন সাফল্যমন্ডিত হল জটিল অপারেশন।

-আমি কিন্তু অপারেশনের বিপক্ষে ছিলাম। অন্য কারুর উপর হলে কোনো আপত্তি ছিল না দুরূহ এক্সপেরিমেন্টে, কিন্তু আপনি একমেবাদ্বিতীয়ম, পজিট্রনিক ব্রেনের কোনো ক্ষতি হলে কেউ ক্ষমা করবে না আমকে, নিজের কাছে অপরাধী হয়ে পড়তাম। অবশ্য এখনও কিছু গরমিল আছে পজিট্রনিক ব্রেন এবং নকল স্নায়ুতন্ত্রের গতিপথের মধ্যে, তবে কালক্রমে দূর হয়ে যাবে গরমিল, একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠবে। তবে হ্যাঁ, দেহে কোনো মারাত্মক ব্যাধি হলে ব্রেনের ক্ষতি হতে পারে কিন্তু!

-সে যখন হবে তখন দেখা যাবে, তবে প্রথম থেকেই আপনাদের উপর অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, পারলে আপনারাই পারবেন, এককথায় অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, বিশ্বাস করুন কৃতজ্ঞতা জানাবার কোনো ভাষা নেই আমার ডক্টর, এবার যাবার অনুমতি দিন, অনেক দিন হয়ে গেল বাড়িছাড়া আছি।

-হ্যাঁ হ্যাঁ, বাড়ি যাবেন বইকি, এখন তো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তবে হ্যাঁ, দশ আউন্স করে অলিভ অয়েল খাবেন পাঁচদিন, নতুন অবস্থায় কম্বাশন চেম্বার পরিষ্কার রাখা বিশেষ প্রয়োজন, বাদবাকি সব পরিষ্কার করে লেখা আছে প্রেসক্রিপশনে, ভুলবেন না কিন্তু...

-না, ভুলব না ডক্টর, তবে কী জানেন, শিল্পীর ক্যানভাসের মতো ব্যবহার করছি আমার দেহটা, দেহটার মধ্যে গড়ে তুলতে চাই, গড়ে তুলতে চাই-

-এক পরিপূর্ণ মানুষ! তা-ই না মিঃ অ্যান্ড্রু?

-ঠিক বলেছেন আপনি। দেখা যাক কোথায় পৌছতে পারি শেষ পর্যন্ত।

-আমার একটা অনুরোধ আছে, সীমার বাইরে যাবার চেষ্টা না করাই ভালো, প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে নস্যাৎ করে প্রস্থেটিক নয়া নকশা রীতিমতো যুগান্তর এনেছে মানব সভ্যতায়, আবিষ্কারক হিসাবে আপনার স্বীকৃতি আজ জগৎজোড়া। তাই বলি, আর কেন? নাইবা আর জুয়া খেললেন নিজের অমূল্য দেহ নিয়ে!

এর জবাব জানা আছে অ্যান্ড্রুর। কিন্তু কী হবে উত্তর দিয়ে, বাসনার মর্মদাহী জ্বালা যে অনুভব করেনি সে কেমন করে বুঝবে ওর মর্মবেদনা!

নানান সম্মানে ভূষিত অ্যান্ড্রু একাধিক পণ্ডিত সমিতি সাম্মানিক সভ্যপদে সম্মানিত করল ওকে। নিখিল বিশ্ব প্রস্থেটিক বিজ্ঞান সমিতির আজীবন সভাপতি অ্যান্ড্রু স্বয়ং । রবোবায়োলজির নতুন নাম এখন প্রস্থেটোলমি!

অ্যান্ড্রুর দেড়শো বছর জন্মজয়ন্তী পালন করা হল মহা সমারোহে। বিশাল ভোজসভার আয়োজন করল ইউ এস রোবটস, অ্যালভিন ম্যাগভেস্ক স্বয়ং উপস্থিত হলেন ভোজসভায়, চুরানব্বই বছর বয়সেও সতেজ কর্মচঞ্চল। মুহুর্মুহু রোবটের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল সমস্ত ভোজসভা।

রোবট! রোবট! রোবট! মর্মদাহে অস্থির হয়ে উঠল অ্যান্ড্রু... মুখের গড়নে বহিঃপ্রকাশ হয় না কিছু আপমানে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল ঠোঁট দুটো মনের কথা বলার কেউ নেই আজ বার বার করে ভেসে উঠল ছোট মামণির মূর্তি.....

ছোট মামনির চিন্তা যেন অমৃতবারি সিঞ্চন করল সারা দেহে..... রোবটের নির্মোক থেকে মুক্তি কি আসবে কোনোদিন? সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হবার প্রতিজ্ঞায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল সমস্ত দেহমন।

১৭

প্রস্থেটোলজির বিজয় অভিযান পৃথিবীর গণ্ডি ছাড়িয়ে চাঁদে গিয়ে পৌঁছাল অল্প সময়ে। ডাক পড়ল অ্যান্ড্রুর। বিশাল চাঁদের জনবসতি। চাঁদের অভ্যন্তরে একাধিক প্রকাণ্ড আধুনিক শহর।

স্বল্প মাধ্যাকর্ষণের জন্য সামান্য হেরফের হল প্রস্থেটিক নকশার। বিশিষ্ট প্রস্থেটোলজি বিশারদদের নিয়ে পুরো পাঁচ বছর কাজে ব্যস্ত রইল অ্যান্ড্রু... কাজের অবসরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াল সে মনের আনন্দে... দুচোখে ওর শিশুসুলভ অদম্য বিস্ময় আর কৌতুহল... হুবহু মানুষের মতোই তিন আইনে তার অনুগত্য স্বীকার করল সমস্ত রোবটগোষ্ঠী।

কাজশেষে চাঁদের বুক থেকে ফিরে এল অ্যান্ড্রু পৃথিবীতে। সটান চলে এল নিজের অফিসে। সম্মানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর সাইমন ডিলং।

-আসুন... আসুন... আপনি ফিরে আসবেন শুনেছিলাম... কিন্তু আজই যে আসবেন সেটা জানতে পারিনি।

-ভুল শোননি কিছু... কথা তা-ই ছিল হঠাৎ সবকিছু যেন দুর্বিষহ মনে হল..... আসলে কী জান সাইমন... কুড়িজন শ্রেষ্ঠ মানুষ-ডাক্তার নিয়ে গড়ে তুলেছিলাম আধুনিক প্রস্থেটিক গবেষণাগার... আমারই নির্দেশে নিঃশব্দে কাজ করেছে ওরা... চাঁদের রোবটরাও মানুষের মতো সম্মান দেখিয়েছে আমাকে অথচ অথচ একটা চিন্তাই পাগলা করে তুলছে।

-কোন চিন্তার কথা বলছেন?

-জান সাইমন চিন্তা আমার একটা এত কান্ডের পরেও আমি কেন মানুষ হব না? মানুষ বলে স্বীকৃতি পাব না কেন? কেন? কেন?

বিপুল বিস্ময়ের ছায়া পড়ল সাইমনের দুচোখে। আন্ড্রুয়েডের বড় বড় দুচোখে অবিশ্বাস্য অস্থিরতা... উজ্জ্বলতার মশাল জ্বালিয়ে অসম্ভবের খোঁজে দিশাহারা।

-স্যার এইমাত্র তো বললেন রোবটরাও মানুষ হিসাবে সম্মান দিয়েছে... মানুষ ডাক্তাররাও বিনা প্রতিবাদে শুনেছে আপনার কথা অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে আপনি মানুষ!

-কথা দিয়ে ভুলিয়ে কী লাভ সাইমন? প্রকৃত অর্থে মানুষ বলে গণ্য হলেও সত্যিই কি মানুষ হওয়া যায়? মানুষ মানুষই... মানুষের মতোই সত্যিকারের মানুষ হতে চাই আমি... আইনসঙ্গত সত্যিকারের মানুষ... ন্যায়সম্মত অধিকারবলে মানুষ!!

-আশ্চর্য! এ যে অসম্ভবের সাধনা! আপনার স্বপ্ন সার্থক হলে মানুষের আত্মঅহংকারে ঘা লাগবে... তার ফলে আসল কথা কী জানেন, যতদূর সম্ভব মানুষ হয়ে উঠলে "মানুষের মতোই" এই কথাটাই বলবে সকলে... সত্যিকারের আসল মানুষ হওয়া সম্ভব নয় কিছুতেই!

-কিন্তু কেন কেন কেন? কেন সম্ভব নয় সাইমন... মানুষের আকৃতি আমার... মানুষের সমতুল্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব প্রস্থেটিক যন্ত্রসম্বলিত মানুষের মতোই আমার দেহ... জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য মানবসভ্যতার সার্বিক অগ্রগতির পথে মূল্যবান পাথেয় জুগিয়েছি আমি... এর চেয়ে বেশি আর কী দিতে পারে কেউ?

-এত উত্তেজিত হয়ে পড়বেন বুঝিনি সেকথা। ব্যাপার কী জানেন, একমাত্র বিশ্ব আইনসভাই আইন প্রণয়ন করে মানুষের স্বীকৃতি দিতে পারে আপনাকে... কিন্তু সেও প্রায়...

বিশ্ব আইনসভা? বেশ... আইনসভার সদস্য কে আছে বলো তো এখানে?

সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিটির চেয়ারম্যানকে বললেও কাজ হবে স্যার।

১৮

সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কমিটির চেয়ারম্যান হলেন পূর্ব এশিয়ার এক ভদ্রমহিলা... নাম শ্রীমতী চী-লি সিং। মাঝবয়সী সুন্দরী না হলেও দেহ- যমুনায় জোয়ারের ঢল কানায় কানায় ভরপুর। পরনে স্বচ্ছ আলোকোজ্জ্বল আধুনিক পোশাক।

--মানুষের সম্পূর্ণ অধিকার অর্জনের জন্য আপনার ঐকান্তিক প্রয়াসের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে মিঃ অ্যান্ড্রু। তবে কোনো বিশেষ অধিকার থেকে কি বঞ্চিত আপনি? তার জন্যই কি আপনার...

-না না বিশেষ কোনো অধিকার দাবি নেই আমার। আমার বক্তব্যেই আমার জীবন... সব স্বীকৃতি পেয়েও আমি মানুষ নই... রোবটমাত্র... অন্যান্য রোবটের মতো আমাকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে প্রয়োজনবোধে!

-মানুষকে তো প্রাণ দিতে হয় সময় সময়।

-প্রাণ দিতে হয় বটে তবে সেটা আইনের মাধ্যমে... বিচার শেষে! অথচ আমাকে খুলে শেষ করতে বিচারের প্রয়োজন নেই কোনো। এ-ব্যাপারে সরকারি অধিকারবলে বলীয়ান কোনো মানুষের হুকুমই যথেষ্ট! যাক, এ তো গেল পার্থক্যের কথা... আসল কথা মানুষ হতে চাই... পূর্ণ স্বীকৃতি... দেড়শো বছর ধরে মানুষ হবার সাধনাই করে আসছি আমি।

শ্রীমতী চী-লির ভ্রমরকালো চোখের তারায় বেদনার আভাস।

-মিঃ অ্যান্ড্রু, বিশ্ব আইনসভা সবকিছুই করতে পারে... পাথরের মূর্তিকেও আইন প্রণয়ন করে মানুষ বলে গণ্য করাতে পারে। কিন্তু আসল ব্যাপার কী জানেন... আইন সভার সদস্য সবাই মানুষ... মানুষের মনের গহনে এক সন্দেহ ভীতি রয়েছে রোবট সম্বন্ধে...

-এখনও সন্দেহ, এখনও ভয়?

-অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও এটাই বাস্তব সত্য। মানবিক গুণের বিকাশ ঘটেছে আপনার মধ্যে। পৃথিবীর মানুষই নানান সম্মানে ভূষিত করেছে আপনাকে। তা সত্ত্বেও বাজে নজির সৃষ্টির ভয়েই হয়তো পিছিয়ে যাবে আইনসভা।

-নজির? কিসের নজির? আমিই একমাত্র স্বাধীন রোবট... অতীতেও আমার সমকক্ষ কেউই নেই। ভবিষ্যতেও আমার মতো হবে না কখনো।

-'কখনো' কথাটা সীমাহীন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করে। ভবিষ্যতের কথা অনুমান করা গেলেও জোর করে বলা উচিত হবে না কিছু। যা-ই হোক মিঃ অ্যান্ড্রু, ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতে পারি। আমার পূর্ণ সহানুভূতিও থাকবে আপনার উপর। তা সত্ত্বেও আইনসভা কী করবে, কী সিদ্ধান্ত নেবে, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

কয়েক মিনিট চুপচাপ। গভীর চিন্তায় মগ্ন চেয়ারম্যান।

-আরও একটা বিষয় ভাবার আছে মিঃ অ্যান্ড্রু। আপনার বিষয় নিয়ে ঝড় ওঠে আইনসভায়, তাহলে সমাজজীবনেও হয়তো ছড়িয়ে পড়বে সেই উত্তেজনা। গড়ে উঠবে এক বিজাতীয় মনোভাব। বিদ্বেষ আর ঘৃণা, তখন... তখন জনমতের চাপে আপনার দেহকে ধ্বংস করে ফেলাও বিচিত্র নয়। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ত্যাগ বাঞ্ছনীয়। সেইজন্যই আর একবার ভেবে দেখুন মিঃ অ্যান্ড্রু!

-এতদূর নীচে নামবে মানুষ! না না... এমন হতে পারে না কোনো মানুষ। মানুষের আদর্শেই তো গড়ে তুলেছি নিজেকে। মানুষকে ভালোবাসি, ভালোবাসি মানুষের আকাশের মতো হৃদয়কে। আকাশের বুকেও তো কালো মেঘ জমে, বজ্রের জন্ম দেয়, তাই বলে মেঘ আর বজ্র তো চিরন্তন সত্য নয়। সত্য নির্মল নীল আকাশ, অসীম শূন্যে উধাও। মানুষের মনও তা-ই। তাই অবিশ্বাস করতে পারি না মানুষকে। তাছাড়াও আমার কথা ভুলে যাবে কী করে মানুষ? দীর্ঘ মানবজীবনের জন্য আমার প্রস্থেটোলজি এক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, সেকথাও কী ভুলে যাবে মানুষ? না না মানুষ তা করবে না কখনোই।

-এত বিশ্বাস আমাদের উপর! এত ভালোবাসেন মানুষকে! কিন্তু তবুও ভেবে দেখুন ভালো করে। ওরা যদি বলে প্রস্থেটোলজি আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে আপনার ব্যাক্তিগত স্বার্থ অথবা মানুষকে রোবট করে তোলা বা রোবটকে মানুষ করে তোলার জন্য এটা এক হীন চক্রান্তমাত্র! একবার যদি প্রচার হয় এমন সম্ভাবনার কথা তা হলে বিশাল আন্দোলন গড়ে উঠবে আপনার বিরূদ্ধে। সেই আন্দোলনের চাপে... না ... না ... মিঃ অ্যান্ড্রু, যেমন আছেন তেমন থাকুন আপনি... এত বড় ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। একটা কিছু হয়ে গেল...

-না না না, ভয় পাই না কোনোকিছুকে। আর মানুষই যদি হতে না পারলাম তাহলে কী মূল্য আছে আমার জীবনের? অর্থহীন নিরর্থক বেঁচে থাকায় শুধু গ্লানি আর যন্ত্রণা। আচ্ছা, মানুষ হবার শেষ যুদ্ধে আপনার সমর্থন কি পেতে পারি আমি?

-নিশ্চয়ই। যতখানি আমার পক্ষে সম্ভব। তবে আমার রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন হলে তখন হয়তো ত্যাগ করতে হবে আপনাকে। বিশ্বাস করুন মিঃ অ্যান্ড্রু, আপনার অধিকার অর্জনের যুদ্ধে পাশে পাশে থাকব আমি।

-অনেক, অনেক ধন্যবাদ। আশাতীত আশ্বাস আর প্রতিশ্রুতি পেলাম আপনার কাছে। মানুষ হবার সাধনায় যে-কোনো চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত। মানুষ! মানুষ হব আমি।

১৯

না, সরাসরি লড়াই যুক্তিযুক্ত নয় বলে সিদ্ধান্ত নিল ফেইনগোল্ড মার্টিন কোম্পানি, অবশেষে অ্যান্ড্রুর পরামর্শে এক অভিনব কৌশলের আশ্রয় নিল ওরা।

ফেইনগোল্ড অ্যান্ড মার্টিন কোম্পানি নালিশ ঠুকে দিল কোর্টে। প্রস্থেটিক হার্ট বসানো এক ভদ্রলোকের প্রচুর দেনা ছিল সরকারের কাছে। আদালতে বলা হল যে যান্ত্রিক হার্ট বসানোর ফলে মানসিক সত্তা বিনষ্ট হয়ে গেছে মক্কেলের, সেইসঙ্গে বিনষ্ট হয়েছে মানুষ বলে গণ্য হবার সাংবিধানিক অধিকার। সুতরাং মানুষ বলে গণ্যই যদি না হন তা হলে সরকারের টাকা ফেরত দেবার আইনগত বাধ্যবাধকতাও রইল না আর।

যেমনটি আশা করা হয়েছিল হুবহু সেইরকম হল ফলাফল, পরাজয় ঘটল প্রতি পদক্ষেপে, পরাজয়ের গ্লানির বদলে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল অ্যান্ড্রু, আপিল করল বিশ্বাদালতে। লক্ষ লক্ষ ডলারের খেলা চলল বহু বছর ধরে। সর্বস্ব পণ করে বসেছে অ্যান্ড্রু বিশ্ব আদালতেও হারতে হবে নিপুণভাবে।

অবশেষে একদিন রায় বেরুল বিশ্ব আদালতের। চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য বিজয়োৎসবের আয়োজন করল সাইমন।

-এই পরাজয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে দুটো বিষয়। প্রথমত, একাধিক বা বহু কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযোজিত হলেও মানুষের দেহ মানুষের দেহ বলেই পরিগণিত হবে। দ্বিতীয়ত, এই মামলা এবং আমাদের প্রচারের ফলে অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে মনুষ্যত্বের ব্যাখ্যা। খুব শান্তভাবে বলল সাইমন ডিলং।

-বুঝলাম, এর জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, কিন্তু এখনও কি আইনসভা মানুষ বলে স্বীকার করবে না আমাকে? মানুষ বলে মানবে না আমাকে?

-না স্যার, মানুষের ব্যাখ্যায় বিশ্ব আদালত কিন্তু অন্য কথা বলছে। বহু কোষের সমন্বয়ে গঠিত জটিল এক জৈব ব্রেনের উত্তরাধিকারী মানুষ, আর এই ব্রেনের উপস্থিতি মানুষকে মানুষ করে তুলেছে। আর আপনার আছে প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়ামে তৈরি পজিট্রনিক ব্রেন, সেইজন্যেই সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের সমতুল্য হলেও মানুষ নন আপনি। বিজ্ঞানের উন্নতি হলেও মানুষের জৈব ব্রেনের অনুকরণ করা সম্ভব হয়নি এখনও।

-তা হলে, এত করেও কি হেরে যাব আমি?

-না না, তা কেন হবে! এখনও তো আইনসভা রয়েছে, আইনসভার সদস্য শ্রীমতী চী-লি'র সমর্থন পাব আমরা, এইসঙ্গে বেশ কয়েকজন সদস্যেরও সমর্থন পাব বলে আশা আছে, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেলেও...

-সাইমন, কী মনে হয় তোমার? সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন কি পাব আমরা?

-আমার সন্দেহ আছে স্যার, শেষপর্যন্ত জনগণের দ্বারস্থ হতে হবে আমাদের, জনসমর্থন লাভ করলে কী হবে বলতে পারব না, তবে একেবারে শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে স্যার।

-হ্যাঁ, শেষপর্যন্ত, সর্বস্ব পণ করে জুয়া খেলব সাইমন।

২০

বেশ কিছু বছর কেটে গেল এর মধ্যে। শ্রীমতী চী-লি'র বয়সও বাড়ল অনেক। দুধসাদা মাথার চুল, কেমন যেন ভাটা পড়ে এসেছে সমস্ত দেহ জুড়ে। কালের প্রবাহে অনেক কাছে এসেছে দুজনে, প্রাগাঢ় হয়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠতা।

-অ্যান্ড্রু... অনেক দূর এগিয়েছি আমরা... সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছি... শীতকালীন সভা শুরু হবার পরেই শেষ চেষ্টা করব আমরা।

-যতই চেষ্টা কর-না কেন চী, আসল কথা হল ব্রেন। সবকিছু ঠেকেছে এখন ঐখানেই। অর্থাৎ জৈবকোষে তৈরি ব্রেন বনাম পজিট্রনস। আচ্ছা চী, কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করা যায় না কিছু? বলা যায় না আই কিউ-ই আসল মনুষ্যত্বের মাপকাঠি?

-তুমি কি ছেলেমানুষ হয়ে গেলে অ্যান্ড্রু! কিছুই হবে না এতে। আসল পার্থক্য তো অন্য বিষয়ে... তোমার ব্রেন মানুষের তৈরি, মানুষের ব্রেন প্রকৃতির। অভিব্যক্তির ধারায় পুষ্ট। এছাড়া তুমি অমর, মানুষ মরণশীল। কী জান অ্যান্ড্রু... রোবট আর মানুষের মধ্যে যারা পার্থক্য দেখতে ভালোবাসে, এই পার্থক্যগুলোই হিমালয়ের মতো দুর্লঙ্ঘ্য তাদের কাছে।

-যেমন করেই হোক এই পার্থক্য দূর করব চী... যেমন করেই হোক...

-অ্যান্ড্রু... অ্যান্ড্রু কি অবুঝ তুমি কী জেদি... এখনও যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝতে চাইছ মানুষকে! সত্যি তোমার জন্য দুঃখ হয় অ্যান্ড্রু... ভীষণ কষ্ট হয় আমার... রাগ কোরো না... তোমার মধ্যেকার রোবটই গোঁয়ারের মতো তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তোমাকে... আর তার ফলেই.....

-শেষে তুমিও বললে এমন কথা চী? আমার সম্বন্ধে, তোমারও এই ধারণা? আমার মধ্যেকার রোবটই..... রোবট বলেই অমর... না না চী... যেমন করেই হোক... যেমন করেই হোক... উদ্‌ভ্রান্তের মতো দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অ্যান্ড্রু! যান্ত্রিক ব্রেনের মধ্যেও শুরু হয়ে গেছে মানসিক যন্ত্রণা...

-যেমন করেই হোক... যেমন করেই হোক... যেমন করেই হোক... বহুকাল থেকে মনে হয়েছিল এমন পরিণতির কথা... মনে হয়েছিল কিন্তু বিশ্বাস হয়নি... মানুষের মনুষ্যত্বের উপর অপরিসীম বিশ্বাস আর ভালোবাসাই মানুষ হবার প্রেরণা জুগিয়েছে অ্যান্ড্রুকে! উপায় কী! উপায় কী? কোথায় পথ?

অবশেষে পথ পাওয়া গেল...উপায়ও হল...সার্জেনের দ্বারস্থ হল অ্যান্ড্রু... সবচেয়ে বড় রোবট-সার্জন। নির্বিঘ্নে হয়ে গেল জটিল অপারেশন।

২১

দুর্বল... ভীষণ দুর্বল... কেমন যেন অতল জলের তলায় ডুবছে... ক্রমেই আরও গভীরে না না এসব অনুমান কল্পনা... মিথ্যে মনকে সান্ত্বনা দিল অ্যান্ড্রু। বেশ কয়েকদিন কেটে গেল এইভাবে অসম্ভব মনের জোরে আরোগ্যলাভের পথে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বিছানার উপরে বসে থাকে সারাক্ষণ।

-এই সপ্তাহে চূড়ান্ত ভোট, অ্যান্ড্রু। জনে জনে ধরে ধরে বলেছি, যত্ন করে বুঝিয়েছি, জানি না শেষরক্ষা হবে কি না। বিছানার পাশে বসতে বসতে বলল শ্রীমতী চী-লি।

-চুড়ান্ত ভোট? ফলাফল কী হবে চী? অবুঝ শিশুর মতো প্রশ্ন করল অ্যান্ড্রু।

-কী হবে সে তো অনুমান করা যায় অ্যান্ড্রু! পরাজয় ধরে নিয়েছি আমি, আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি।

-যা হবার হোক চী, অনেক, অনেক করেছ তুমি, তোমরা সকলে, যাক, ভালো সময় ভোট হচ্ছে, এই সময়টাই প্রয়োজন ছিল আমার। এবার সত্যিকারের জুয়া খেলেছি চী, জীবন-জুয়া।

-জুয়া? জীবন জুয়া? কী বলছ তুমি! কিছুই বুঝতে পারছি না অ্যান্ড্রু? উৎকণ্ঠিত সুরে প্রশ্ন করে শ্রীমতী চী-লি।

দুর্জ্ঞেয় এক মিষ্টি হাসিতে ভরে উঠল অ্যান্ড্রুর মুখ। পলকহীন বড় বড় চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জানলার বাইরে নির্মল আকাশের দিকে।

-ইচ্ছে করেই বলিনি তোমাকে চী, কাউকে বলিনি, বললে বাধা দিতে তুমি, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারতাম না কোনোমতে, যাক, এখন আর বলতে বাধা নেই, চী, ব্রেনই যদি একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়, তা হলে অমরত্বের প্রশ্নও ওঠে সঙ্গে সঙ্গে, কারুর মাথাব্যাথা পড়েনি ব্রেন নিয়ে মাথা ঘামানোর, অর্থাৎ মানুষের ব্রেনের কোষের মৃত্যু হয়, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এমনকি দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বদলানো সম্ভব হলেও ব্রেন পাল্টানো অসম্ভব, অথচ দ্যাখো আমার পজিট্রনিক ব্রেন নির্ভুলভাবে কাজ করে চলেছে দুশো বছর ধরে, আরও কত বছর চলবে কে জানে! এটাই হল আসল বাধা। মানুষ, মানবসমাজ অমর রোবটকে মানিয়ে নিতে পারে অনায়াসে, বিনা দ্বিধায়, কারণ, সে অমর হলেও রোবট। কিন্তু কোনো মানুষ যদি অমর হয় তা হলে তাকে মেনে নিতে পারে না

মানবসমাজ, কারণ মানুষ নিজে তো অমর নয়, প্রচণ্ড আঘাত লাগে মানুষের আত্মশ্লাঘায়, হীন মনে হয় নিজেদের। একমাত্র এই কারণেই আমাকে মানুষ বলে স্বীকার করে নেয়নি মানবসমাজ সেইজন্যেই...

-সেইজন্যেই কী, কী বলতে চাইছ অ্যান্ড্রু?

-বলছি, বলছি, সব বলছি, তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা বলব বল? জানো চী, সেই আসল বাধাকে সরিয়ে দিয়েছি আমি, কয়েক যুগ আগে আমার দেহের জৈব স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল আমার পজিট্রনিক ব্রেন। শুধু সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়েছি এই অপারেশনে, স্নায়ুতন্ত্র আর ব্রেনের সংযোজনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়েছি এই অপারেশনে, স্নায়ুতন্ত্র আর ব্রেনের সংযোজনের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে বেশকিছু, আর এই পরিবর্তনের ফলেই, ধীরে ধীরে, খুব ধীরে ধীরে ব্রেনের উন্মুক্ত গতিপথ দিয়ে নিষ্কাশিত হয়ে যাবে আমার জীবনীশক্তি...

আকস্মিক আঘাতে বিমূঢ় হয়ে পড়ল শ্রীমতী চী-লি, পাথরের মতো আড়ষ্ট নিস্পন্দ, অব্যক্ত বেদনায় কেঁপে উঠল ঠোঁট দুটো, দুচোখ বেয়ে নামল ভালোবাসার ঢল।

-তুমি, তুমি মৃত্যুর সমস্ত আয়োজন সাঙ্গ করে ফেলেছ অ্যান্ড্রু। কেন? কেন এমন করলে অ্যান্ড্রু? কেন করলে? একবারও ভাবলে না আমার কথা?

-চী, সব ভেবেছি, সারাজীবন ভেবেছি, দেহের মৃত্যু বড় না সারজীবনের আদর্শ স্বপ্ন কামনা? এ-দুটোর মধ্যে একটাকেই বাছতে হবে আমাকে, আদর্শের মৃত্যুর মূল্য দিয়ে অমর হতে চাই না আমি, আদর্শের মৃত্যুই তো প্রকৃত মৃত্যু, এই বোধ আসার সঙ্গে সঙ্গে তিন নম্বর আইন সহজ হয়ে গেল আমার কাছে।

আবেগে উত্তেজনায় অ্যান্ড্রুকে আঁকড়ে ধরল শ্রীমতী চী-লি। থরথর করে কাঁপল ওর সর্বাঙ্গ।

-না না অ্যান্ড্রু, এ হয় না, হয় না, পালটে নাও, বন্ধ করো তোমার আত্মহত্যা...

-আর হয় না চী, বেশি ক্ষতি হয়ে গেছে ব্রেনের, আর এক বছর মাত্র আমার আয়ু, হয়তোবা দু-একদিন কমবেশি, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুশো বছরের জন্মজয়ন্তী দেখে যেতে পারব নিশ্চয়...

-জন্মজয়ন্তী! কী কাজে লাগবে সে জয়ন্তী আন্ড্রু? কী কাজে লাগবে? আচ্ছা অ্যান্ড্রু, বলতে পার, বলতে পার কী করলে খুশি হবে সেদিন?

-আমার আবার খুশি! বামন হয়ে চাঁদ ধারার বাসনা, দিতে পার, দিতে পার তোমরা মানুষের স্বীকৃতি? আর তা যদি না পার তা হলে চাই না, চাই না কিছু আর, শুধু তুমি আমার পাশে থেকো যাবার বেলায়।

-শ্রীমতী চী-লির ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল অ্যান্ড্রু, জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত নির্বাক হয়ে বাঁধা পড়ল দুহাতের বন্ধনে, পুষ্পাঞ্জলি হয়ে ঝরে পড়ল মুক্তোর মতো অশ্রুজল।

২২

স্তম্ভিত সমস্ত বিশ্ব। অ্যান্ড্রুর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ মানুষ্যত্বের নবজাগরণ ঘটাল দিকে দিকে। বহুকাল ধরে বিস্ময়কর অবদানেও যাদের চৈতন্য হয়নি আজ তারা মরিয়া হয়ে উঠল কিছু করার জন্য, শুধুমাত্র মানুষকে ভালোবেসে, মানুষ হবার দুর্নিবার আকর্ষণে মৃত্যুপথে পা বাড়িয়েছে অ্যান্ড্রু মানুষ্যত্বের জয়গানে।

মহোৎসবের দিন ঠিক হল বিশেষ উদ্দেশ্যপূরণের জন্য... দুশো বছর জন্মজয়ন্তীর দিন। সেই উৎসবের সূচনায় মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিস্ময়কর দলিল স্বাক্ষর করবেন বিশ্ব সভাপতি... আইনে পরিণত হবে সেই মুহূর্তে... পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে একই যোগে দেখা যাবে মহোৎসব... বিশেষ প্রক্রিয়ায় উপগ্রহের মাধ্যমে চাঁদ আর মঙ্গলের উপনিবেশও সরাসরি পাঠানো হবে সমস্ত অনুষ্ঠানের ছবি।

চাকা লাগানো চেয়ারে নিয়ে আসা হল অ্যান্ড্রুকে... দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারলেও চলার ক্ষমতা চলে গেছে বেশ কিছুদিন।

করতালি মুখরিত সভাগৃহে গমগম করে উঠল বিশ্ব সভাপতির পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠ।

-গত দুশো বছর নিঃস্বার্থভাবে মানবসভ্যতার সেবা করে এসেছেন আপনি... শিল্প কলা বিজ্ঞান সর্বত্রই আপনার অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের মধ্যে আপনাকে পেয়ে রীতিমতো গর্বিত আমরা... সমস্ত মানবসমাজ



অশেষ ঋণে ঋণী আপনার কাছে। তাই আপনার দুশো বছর জন্মজয়ন্তীর মূহূর্তে সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি... মানুষ!! দুশো বছরের চিরন্তন মানুষ আপনি মিঃ অ্যান্ড্রু মার্টিন!!

অবিস্মরণীয় সেই মুহূর্তে, এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অ্যান্ড্রুর মুখমণ্ডল... কাঁপা কাঁপা বলিষ্ঠ দুই হাত সে বাড়িয়ে দিল সভাপতির দিকে... সমস্ত মানবসমাজের উদ্দেশ্যে...

ক্রমেই ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে আসছে অ্যান্ড্রুর চিন্তাধারা... কেমন যেন আবছা আবছা চিন্তার ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন মাঝে মাঝে শয্যাশায়ী অ্যান্ড্রু নীলাকাশের মতো মেঘমুক্ত।

আজ সমাপ্তির পথে সংগ্রামী-জীবন... দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশে জীবন জুড়ে এসেছে প্রাপ্তির শান্তির ধারা... মানুষ! অ্যান্ড্রু আজ মানুষ। জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে চৈতন্যের শেষ বিন্দু দিয়ে অনুভূত হল মানুষ... মানুষ... মানুষ... দীর্ঘজীবনের রুক্ষ মরুভূমি শুধু কন্টকাকীর্ণ ক্যাকটাসে ভরা নয়... ক্যাকটাসের বুকে আছে স্বর্গীয় ফুলের দ্যোতনা... সৃষ্টির অনির্বচনীয় সুধারস। সেই চিন্তায় লীন হয়ে যেতে চায় অ্যান্ড্রুর অন্তিম সত্তা।

চিত্রার্পিতের মতো শয্যাপাশে বসে আছে শ্রীমতী চী-লি... ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে উঠছে চীর অস্তিত্ব। তিলধারণের স্থান নেই আজ ঘরে... মহাপ্রয়াণের যাত্রাপথে বুকচাপা নিস্তব্ধতা আজ বড় বেশি বাঙ্ময়। অ্যান্ড্রুর চোখে সবই যেন ছায়া ক্রমেই আবছা হয়ে আসে ছায়া- ছায়া শরীর সব। ধীরে ধীরে ডান হাত প্রসারিত করে দিল বাক্যহারা চী-র দিকে চী-র হাতে উত্তপ্ত স্পর্শ অনুরণিত হল অবসন্ন চৈতন্যে...

ক্রমেই অন্ধকার গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হয়ে উঠছে চারপাশ... তমিস্রাঘন নিবিড় আঁধার অজস্র নক্ষত্র জেলার মধ্যে চলেছে অ্যান্ড্রু... মেঘের কোলে কোলে রংবেরঙের আলোর মেলা... চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা কুয়াশার, কালো গহ্বর আর রেডিও জেটের হাতছানি... নিউট্রিনোর সমুদ্রে আদিগন্ত একাকার... শিশুর আনন্দে নেচে নেচে চলেছে অ্যান্ড্রু... ব্রহ্মাণ্ডের ওপারে হঠাৎ ভেসে ওঠে একটি মুখ... মহাযাত্রার পরমলগ্নে শুভ মাঙ্গলিকী... আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অ্যান্ড্রুর অন্তিম মুহূর্ত... অসাড় ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে ওঠে বারেবারে... সমস্ত সত্তা দিয়ে শেষবারের মতো গেয়ে ওঠে... মামণি... ছোট মামণি...মা ম...ণি...



অলঙ্করণঃ সুমিত রায়
গ্রাফিক্স্ ইন্দ্রশেখর
(আইজাক অসিমভের ‘দি বাইসেন্টেনিয়াল ম্যান’ এর ভাবানুসরণে)

জয়ঢাক গল্প প্রতিযোগিতা-২০১৬
চতুর্থ স্থানাধিকারী গল্প



।। আবার নতুন মোবাইল ।।

আমি চৈতালীকে বললাম, "এই রে! বাড়িতে বলা হল না যে আজ দেরি করে ফিরব। বাড়িতে চিন্তা করবে তো! তোর ফোনটা দে, বাড়িতে জানিয়ে দি।"

চৈতালী মুখ বেঁকিয়ে বলল, "তোর এই এক...। একটু বেরোবি কলেজ থেকে তাতেও মাকে জানানো, বাবাকে জানানো...।"

"বাজে বকিস না। দে ফোনটা। বাড়িতে ফোন করে জানাতে হবে।"

"কেন? তোর ফোনটা আনিসনি আজ?"

"তুই সব কিছু ভুলে যাস কেন?" আমি রেগে গিয়ে বললাম। গত পরশু কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় মোবাইলটা হাত ফসকে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল। মোবাইলটা আসলে আমার ছিল না। মা কিনেছিল কিন্তু আমিই ব্যবহার করতাম। তা সেদিন বাড়ি ঢোকার মুখেই একটা ফোন এসেছিল আর আমি তাড়াহুড়ো করে ফোনটা ধরতে গিয়ে সেটা হাত থেকে ফেলে দিই। ফোনের স্ক্রিনটা ফেটে গিয়েছিল বিশ্রিভাবে। কিন্তু তাও চলছিল। কিন্তু কাল রাতে দেখি আর কিছুই কাজ হচ্ছে না। অন করাই যাচ্ছে না। ধুমসো কালো মতো হয়ে আছে স্ক্রিনটা। ওকে আমি কলেজে এসেই কথাটা বলেছিলাম। এরই মধ্যে ভুলে গেছে।

চৈতালীকে আমি কথাটা বলতেই ও জিভ কেটে আমায় ফোনটা দিল। আমি মাকে ফোন করে বলে দিলাম যে আজ সিনেমা দেখতে যাব কলেজের পরে। একটু আগে ছুটি কিনা। কিন্তু চৈতালী এ সব বোঝে না। আমার বাড়িতে যে একটু বেশিই চিন্তা করে - বিশেষ করে বাবা, ওকে আমি বোঝাই কী করে!

দাঁড়াও, দাঁড়াও! দেখো, আমায় আবার ভুলে যাওনি তো তোমরা! আমি সেই তাতিয়ানা। যার মোবাইল নিয়ে সেই কত কাণ্ড তোমরা সেবার পড়লে। আমিও এর ফাঁকে বড়ো হয়ে গেছি ঠিক তোমাদেরই মতো। আমি সেই নাসায়

বেড়াতে গেলাম, আমার সঙ্গে খাসনবীশ স্যারও গেলেন। তা তিনি তো সেখানেই এখনও। এক বছরের জন্য গিয়েছিলেন, ফিরেও এসেছিলেন, কিন্তু আবার নাসার ডাকে ফিরে গিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দাদাও এখন গবেষক। টি আই এফ আর–এ রিসার্চ করছে। আমারও তাই ইচ্ছে। গবেষক হব। আর খুঁজে বের করব সেই মোবাইলে ভিনগ্রহীদের সেই মেসেজের রহস্য - আজও যা কেউ ভেদ করতে পারেনি। অবশ্য অনেক বড়ো বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন তবু আমার মনে হয় এটা আমিই পারব, আমিই একমাত্র, আর কেউ না, আর কেউ না।

সিনেমা দেখে বেরোতে একটু রাত হয়ে গেল। সারা রাস্তা আসতে আসতে সিনেমাটার কথা ভাবছিলাম। ওহ, সিনেমাটা একটা বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে যে নিজের মাথার ভিতর নানা আওয়াজ শুনতে পায়। তার মনে হয় কারা যেন কথা বলছে, কারা যেন তাকে নানা ইঙ্গিত করছে, হাজারো ফিসফিস, হাজারো ঘটনা যেন কারা তাকে বলে চলেছে। ভাবতে ভাবতে আমার মাথার ভিতরেই একেবারে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল চিন্তাগুলো। আমার এই হয়। কোনও সিনেমা, গল্প ভালো লাগলে এত বেশি ভাবতে থাকি আর আরও হাজারটা জিনিস নিজে নিজেই কল্পনা করে নিতে থাকি যে মনে হয় গল্পটা আমার নিজেরই, তখন কত কিছু এসে মাথায় চিন্তার জট পাকিয়ে দেয়। তখন আমি কেবল ওই নিয়েই ভাবতে থাকি।

ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেছে। কোনওদিনই এতটা রাত হয় না। এত জ্যাম ছিল রাস্তায়, সেইজন্য আরও দেরি হয়ে গেল। ভাগ্যিস, বাবা বাড়ি ফেরেনি। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বাবা এখনও আমাকে খুব শাসনে রাখে। এমনকি দাদা বাইরে থাকে, কিন্তু দাদাকেও বাড়িতে এলে ছাড় দেয় না। আমি এখন বড়ো হয়ে বুঝি এটা ঠিক শাসন না, এটা আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা। তাই এটা আমাকে কখনও বিরক্ত করে না। তা চৈতালী যাই বলুক এটা নিয়ে। বাড়ি এসে ফ্রেশ হয়েই আমি জৈব রসায়নের বইটা নিয়ে বসে পড়লাম। পরের দিন অনেক পড়া আছে। দাদার কলেজেই আমি এখন পড়ি। দাদার আর মায়েরও ইচ্ছে ছিল আমিও দাদার মতো ফিজিক্স নিয়ে পড়ব। কিন্তু কেমিস্ট্রিটা আমার ইলেভেন থেকেই এত ভালো লেগে গিয়েছিল যে আমি অন্য কিছু নেবার কথা ভাবিইনি। বাবা আমাকে বলেছিল, "তুই যা নিয়ে পড়তে চাস, তাই পড়। আর এতেও তোর রিসার্চের ইচ্ছায় কোনও সমস্যা হবে না।" রিসার্চ মানে অবশ্য সেই ভিনগ্রহীদের বিষয়েই। বিজ্ঞানের যে কোনও বিভাগে পড়েই এখন এইসব মহাকাশসংক্রান্ত গবেষণা করা যায়। তাই আমি একটুও দ্বিধা করিনি কেমিস্ট্রি নিতে কলেজে উঠে।

পড়তে পড়তে শুনতে পেলাম বাবা ডাকছে আমায়। আমার একটু ভয় লাগল। বাবা কি বকবে নাকি আমায় দেরি করে ফেরার জন্য? আমি একটু ভয়ে ভয়েই ও ঘরে গেলাম।

বাবা বলল, "এত দেরি করলি কেন রে? রাত হয়ে গিয়েছিল না?"

আমি একটু কাঁচুমাচু হয়ে বললাম, "হ্যাঁ, আসলে সিনেমা দেখতে গেছলাম তো।"

"কী সিনেমা রে?"

আমি নামটা বললাম।

বাবার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "আরে, আমিই তো ভাবছিলাম যে তোকে ওই সিনেমাটা দেখাতে নিয়ে যাব। দারুণ হয়েছে শুনছি। কেমন লাগল?"

আমি শুনেই লাফিয়ে উঠলাম, হড়হড় করে বলতে লাগলাম গল্পটা। মা বাধা দিয়ে বলল, "ওকে যেটা দেবে বলে ডাকলে আগে সেটা দাও তো। পরে গল্প শুনো না হয়।"

আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কী দেবে?

বাবা একটা নতুন মোবাইল ফোন বার করে আমার হাতে দিল। বেশ দামী সেট। সুন্দর মডেলটা। আমি অবাক হয়ে তাকাতেই বাবা বলল, "তোর মোবাইলটা খারাপ হয়ে গেছে শুনলাম। তাই এটা আজকেই কিনেছি। ভালো হয়েছে না?"

আমি বাচ্চা বয়েসের মতো বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম। বাবা হাসতে হাসতে বলল, "অবশ্য এটা আমি এমনিতেই দিতাম। এবারে ক্লাসে টপ করার প্রাইজ।"

আমি এবার লাজুক মুখে বললাম, "থ্যাঙ্কস, বাবা।"

রাতে শোবার সময় আমার পুরনো সিম দুটো নতুন মোবাইলে ভরে নিলাম। আমার হঠাৎ মনে পড়ল বাবা আমায় সেই একদম প্রথম যে ফোনটা কিনে দিয়েছিল সেটা নিয়ে কত কিছুই না হল! সেই ফোনটা অবশ্য এখন নাসার বিজ্ঞানীদের হেফাজতে। আমার থেকে ওই ফোনটা নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, কারণ সেই ফোনে আরও কোনও মেসেজ এলে যাতে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন, তক্ষুনি ব্যবস্থা নিতে পারেন। তবে যতদূর জানি আর কোনও মেসেজ সেই ফোনে আসেনি। এমনকি আমার মতো যে কানাডিয়ান ছেলেটির কাছেও শেষ দিকের ওই মেসেজগুলো এসেছিল, তার কাছেও আসেনি। ডঃ খাসনবীশ তাহলে দাদাকে নিশ্চয় জানাতেন।

ফোনটা চার্জে বসিয়ে অন করলাম আমি। লেখা ফুটে উঠল সবুজ আলো জ্বলে উঠে। আমি দেখলাম লেখা - "ওয়েলকাম ব্যাক, তাতিয়ানা"। আমার ভ্রু কুঁচকে গেল। এ আবার কী সিস্টেম যে নিজে থেকেই এইরকম ভাষা ফুটে ওঠে? আমার নাম ফুটে ওঠে? আর "ওয়েলকাম ব্যাক" মানেই বা কী? আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। আবার কী নতুন রহস্য শুরু হচ্ছে আমার মোবাইল নিয়ে!

।। অদ্ভুত মেসেজ ।।

সকাল দশটা বেজে গেছে। শেষে ডাকাডাকিতে ক্লান্ত হয়ে আমি রেগেমেগে চৈতালীকে ধাক্কা দিতে লাগলাম। কী ঘুম রে বাবা! আমার বাড়িতে যদি এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ে থাকি মা বোধহয় গায়ে জলই ঢেলে দেবে। আর একটু ধাক্কাধাক্কি করতে চৈতালী ঘুমজড়ানো চোখে উঠে বসল। বলল, "উফফ, একটা ছুটির দিন আমাকে ঘুমোতে দিবি না নাকি?"

আমি বললাম, "অনেক ঘুমিয়েছিস। ওঠ এখন।"

চৈতালী ব্যাজার মুখে উঠে বাথরুম গেল। আমি ওর বিছানার চাদরটা তুলে দিলাম। নাহলে এটা করতেও ও কাকিমা, মানে ওর মাকে ডাকাডাকি করে সময় নষ্ট করবে। কাকিমা ঘরে এসে বললেন, "যাক, রানি উঠেছেন। নেহাৎ তুই এলি তাই তাতিয়া, নাহলে আরও একঘণ্টা চলত।"

কাকিমা আমার নামটাকে ছোটো করে "তাতিয়া" বলে ডাকে। আমি বললাম, "সে আর বলতে! জানি না নাকি!"

কাকিমা আর কাকু চৈতালীকে কিছুই বলেন না। এত আদরে মানুষ। আর আমি বাড়িতে ফোন করলেই ওর যত আদুরে মনে হয়! আমি বিছানায় বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকলাম। সুন্দর বাগান আছে ওদের বাড়ির সামনেই। ঠিক গোছানো ফুলগাছের না, অনেক বড়ো বড়ো গাছ আছে, পাখির বাসা, সবসময় কিচিরমিচির করে। চৈতালীর ঘরটা তাই আমার খুব প্রিয়।

চৈতালী বাথরুম থেকে চলে এসেছে।

"কী নিয়ে বসবি এখন?"

"আশ্চর্য! কোয়ান্টামের সব কোশ্চেনগুলো আজ সলভ্ করব তো। কালকে টেস্ট আছে না!"

"হুঁ, সেই বাজে চ্যাপটার।"

আমি মুচকি হাসলাম। চৈতালী এমনিতে খুবই ভালো ছাত্রী, কিন্তু একটু কুঁড়ে। আর যে জিনিসটা পড়তে ওর ভালো লাগে না সেটা ওকে দিয়ে পড়ানো খুব কঠিন। কিন্তু তা বলে তো আর টিচাররা সেটা শুনবেন না। আমি বইখাতা খুলে বসলাম। আমরা সেই ছোটো থেকেই একই সঙ্গে, একই স্কুলে, একই ক্লাসে পড়ে এখনও একই কলেজে একই বিষয়ে ভর্তি হয়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয়, এবার হয়তো আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। আর একটা বছর। কারণ আমার ইচ্ছে বাইরে পড়তে যাবার। চৈতালী সেটা চায় বলে মনে হয় না। বাবা-মাকে ছেড়ে যাবার কথা ও ভাবতেই পারে না। গেলেও দু"দিনে ফিরে আসবে।

পড়তে পড়তে আমার নজর আচমকাই ওর সামনের ঘরটার দিকে পড়ল। দরজা দিয়ে সোজা দেখলে একটা ব্যালকনি মতো পেরিয়ে সোজা দেখা যায় সেই ঘর। দেখলাম ওই ঘরের দরজাটা আজকে খোলা। সাধারণত এটা বন্ধ থাকতেই দেখি। ওটা ওর ছোটো কাকার ঘর ছিল। খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন শুনেছি। কিন্তু শেষে পাগল হয়ে গেলেন। একদিন সকালে আর বেরোলেন না ঘর থেকে। খুলে দেখা গেল, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সেই থেকে বন্ধই থাকে ঘরটা। চৈতালীর বাবা ছোটোভাই-অন্ত প্রাণ ছিলেন। মারা যাবার পরে ওই ঘরের একটা জিনিসও ফেলেননি আর ঘরটাও ওভাবেই রেখে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে পরিষ্কার করতে দেখেছি অবশ্য। আমি চৈতালীকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর কাকার ঘরটা আবার পরিষ্কার হবে বুঝি?"

"নাহ রে, ঘরটা আবার রেনোভেশান করা হবে। রঙ করানো হবে। এতদিন হয়ে গেছে। ঘরটা ওইভাবে থেকে থেকে একেবারে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাই শেষ অবধি ঘরের জিনিসপত্রগুলো দেখে-টেখে নিয়ে, কাকার স্মৃতির যা কিছু আছে রেখে দিয়ে, বাকি ফেলে দেওয়া হবে।"

"তোর বাবা তো "না" বলেছিলেন প্রথমে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু ক"দিন আর এভাবে ফেলে রাখা যাবে, বল?"

"তা ঠিক।"

আমি আবার পড়ায় মন দিলাম। জিনিসগুলো ফেলে দেওয়া হবে জেনে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। একজন মানুষ যিনি আজ আর নেই তার কত প্রিয় জিনিস তো থাকতেই পারে যেগুলো অন্যের কাছে তেমন দরকারি না। সেগুলোও কি ফেলে দেওয়া হবে? ওর কাকা খুব ভালো কবিতা লিখতেন, খুব ভালো ছাত্রও ছিলেন, অনেক বিষয়ে বিশাল জ্ঞান ছিল তাঁর। সেগুলো চৈতালীর মুখেই অনেকবার শুনেছি। সেই খাতাগুলো, লেখাগুলো যদি ফেলে দেওয়া হয়, কেমন লাগবে? অবশ্য, চৈতালীর বাবা নিশ্চয় ভাইয়ের প্রিয় জিনিস ফেলতে দেবেন না। তবুও আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কে জানে কেন! কবিতা আমারও খুব প্রিয় জিনিস। তাই কি?

সেদিন দুপুরে ওর বাড়িতেই থেকে গেলাম। একেবারে সন্ধের দিকে যখন ফিরব, একবার উঁকি মেরে দেখলাম ওই ঘরটা। এখনও জিনিসগুলো বার করা হয়নি, তেমনই অগোছালো হয়ে পড়ে আছে যেমন ওর কাকা মারা যাবার সময় ছিল। আমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘরটা দেখছি, চৈতালী ওর ঘর থেকে বেরিয়ে কীসব বলতে বলতে আসছে, ঠিক এমন সময় আমার জিনসের পকেটে মোবাইলটা বেজে উঠল। মেসেজ এসেছে। আমি বার করে দেখতে গিয়েই অবাক হয়ে গেলাম। ওখানে লেখা, "ওয়েলকাম ব্যাক, তীর্থ"। তীর্থ? কে তীর্থ? আমি অবাক হয়ে গেলাম।

।। সর্বনাশের সংকেত ।।

মোবাইলটা পাবার পর থেকে বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছিল। সেই যে প্রথমদিন রাতে "ওয়েলকাম ব্যাক, তাতিয়ানা" ফোনটা খুলতেই স্ক্রিনের ওপর ফুটে উঠেছিল, সেটার পরে আর কোনও কিছু ঘটেনি। আমিও ব্যাপারটাকে নতুন ফোনের একটা কারসাজি বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু আজকে এই মেসেজটা পেয়ে আমার মনে হল ব্যাপারটা এত সোজা না। বিশেষ করে যখন অদ্ভুত ঘটনা আমার সঙ্গে আগেও ঘটেছে। তাই এত সহজে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। মেসেজটা খুঁটিয়ে দেখলাম। নাহ, এই মেসেজটুকু ছাড়া আর কোনও কিছু নেই। এমনকি নম্বরের জায়গাটা ফাঁকা। মানে এটা কোন নম্বর থেকে এসেছে, বা আদৌ কোনও নম্বর থেকে এসেছে কিনা সেটা জানার উপায় নেই। কম্পিউটার বা অন্য কিছু থেকে মেসেজ করলেও কিছু না কিছু একটা নম্বর আসবেই - এটাই নিয়ম।

হঠাৎ একটা ফোন এলো। মোবাইলটা হাতেই ধরা ছিল। তাই ঝট করে রিসিভ করে ফেললাম। বললাম "হ্যালো"। কোনও শব্দ নেই ওপাশ থেকে। আমি আবার "হ্যালো" বললাম। নাহ, এবারেও কিছু হল না। মোবাইলটা এরপর কান থেকে সরিয়ে দেখতে গিয়ে চমকে উঠলাম। মোবাইলে কোনও চিহ্নই নেই যে একটা ফোন এসেছিল। ফোনটা যেমন সাধারণ অবস্থায় থাকে তেমন হয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি কল লিস্টটা চেক করলাম। আশ্চর্য! ফোনটা যে এসেছিল তার কোনও চিহ্ন এখানেও নেই। মানে সে মিসড কল হোক বা রিসিভড কল, তার কোনও চিহ্ন তো থাকবেই। কিন্তু না, কিছু নেই। আমি হতভম্বের মতো বসে থাকলাম কিছুক্ষণ। কী হচ্ছে এসব। আমি মনে করতে

পারলাম না যখন ফোনটা আমি ধরতে গেলাম তখন কোনও নম্বর আদৌ স্ক্রিনে ফুটে উঠেছিল কিনা। আসলে রিং হতেই আমি ফোনটা ধরে ফেলি। কারণ মোবাইলটা হাতের মুঠোতেই ধরা ছিল। ভালো করে লক্ষ্য করলে কিছু বোঝা যেত হয়তো। কিন্তু সত্যিই কোনও নম্বর ফুটে ওঠেনি নাকি?

আমি আর বেশি কিছু ভাবলাম না। কাল কলেজে টেস্ট আছে। আজকের পড়াটা মাথায় রাখা দরকার সবার আগে। এ.এম. স্যার খুব টাফ কোশ্চেন করেন। আমি আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। বেশিক্ষণ লাগেনি ঘুম আসতে। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে মনে হল, কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে আমার মাথার মধ্যে। কাদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছি, কারা যেন আমায় কিছু বলতে চাইছে। যদিও আওয়াজ হচ্ছে খুব মৃদু ভাবে, এ যেন আমার মাথার মধ্যে, বলা ভালো, আমার অবচেতনে, কান পেতে শুনলে তবেই মৃদু সেই স্বরগুলো শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমার ঘুম আচমকাই ভেঙে গেল। আর ঘুমটা ভাঙতেই সব শব্দ বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। আমি উঠে একটু জল খেলাম। কী মনে হতে ফোনটাকে চেক করে নিলাম একবার। নাহ, কিছু না। আর কিছু হয়নি। তখনই আমার মনে পড়ল এটা নিশ্চয় ওই সিনেমাটা দেখার ফল। সেখানেও এই একইরকম ঘটনা ঘটেছিল ওই ছেলেটার সঙ্গে, মাথার ভেতর যে হাজারো আওয়াজ শুনতে পেত। আমি ওটা নিয়ে বেশি ভেবেছিলাম বলেই অবচেতনে স্বপ্ন হিসেবে ফিরে এসেছে। ভাবতেই, মন আর মাথা হালকা হল একটু। আমি আবার শুয়ে পড়লাম। ঘুমে আর কোনও সমস্যা হল না।

পরদিনটা শুরু হল খুব ভালোভাবে। পরীক্ষার হলে খসখস করে লিখছিলাম আমি। হাতের মধ্যে পেনটা এমনভাবে ছুটছিল যেন একটা ঘোড়া আচমকাই ছাড়া পেয়েছে অনেকদিন বন্দি থাকার পর। লিখতে লিখতে আমার একটা ঘোর চলে এসেছিল। মনে হচ্ছিল, আহ্, এত আনন্দ আর কীসে আছে? আমি ঝড়ের মতো সমস্ত প্রশ্নগুলো শেষ করতে লাগলাম। আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল যে শেষের দিকের কোশ্চেনগুলো আদৌ পারব কিনা - কিন্তু এখন দেখছি যেই ভাবতে যাচ্ছি, তখনি কে যেন মনের মধ্যে বলে উঠছে কোন প্রশ্নটা কীভাবে উত্তর করতে হবে। এমনকি অঙ্কগুলোও কী সহজে একটুও না ভেবেই প্রায় হয়ে গেল। দারুণ একটা ছন্দে লেখা চলতে লাগল। তখনি হঠাৎ আমার পিছনের বেঞ্চ থেকে একটা খোঁচা খেলাম। আমার তন্ময় ভাবটা ঝট্ করে কেটে গেল। মনটা ভরে গেল বিরক্তিতে। ঘুরে দেখি, সুকান্ত ওর কোশ্চেন পেপারটা তুলে দেখিয়ে, আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করছে। বলল, "কী করে করলি দেখা।" আমার মাথায় কেন কে জানে হঠাৎ আগুন চড়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম না ঠিক কী হল, তার আগেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "পড়ে আসিসনি নাকি? না পারলে বসে থাক। ডিস্টার্ব করিস না তো।" দেখলাম সুকান্তর মুখটা মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কথাটা শুনেই হতভম্ব হয়ে মুখটা নিচু করে নিল ও। আমিও ঘাবড়ে গেলাম। এটা কী বললাম আমি? পরীক্ষা হলে তো এইরকম টুকটাক হয়ই। আর সুকান্ত নিজেই ভালো ছেলে, হয়তো



এটা পড়া হয়নি তাই জিজ্ঞেস করেছিল, সে তো আগেও করেছে অনেক আমাকে, আমিও যে করিনি তা না, তাহলে হঠাৎ আমার মুখ থেকে কী বেরিয়ে গেল এটা? আমি তখনই কিছু বলতে পারলাম না আর। ক্লাসে স্যার গার্ড দিচ্ছেন। আমি সামনে ঘুরে ফের লেখা শুরু করলাম। পরীক্ষা শেষ হল ভালোভাবেই। কিন্তু মাথার ভিতর এই ঘটনাটা ঘুরতে লাগল আমার। আমার মনে হল, খুব অন্যায় কাজ করলাম আমি।

পরীক্ষা শেষে বেরোতেই চৈতালী পিছন থেকে এসে ধরল আমায়। আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কত করলি?"

"সবই করেছি। তবে দু'নম্বর ঠিক সিওর না।"

"বলিস কী! এত শক্ত কোশ্চেনে ফুল আনসার করেছিস? সর্বনাশ। আমি তো অর্ধেকই পারিনি।"

কোশ্চেন সত্যি শক্ত ছিল। কিন্তু আমি কী করে পারলাম এত! এটা নয় যে দারুণ ভালো পড়া ছিল। কাল যখন চৈতালীর বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস করছিলাম তখনই দেখেছি যে পারছি, তবে শক্ত কোশ্চেন সব করে আসব এটা অসম্ভব ছিল।

পাশে চৈতালী বকবক করে চলেছে। ওর সিট একেবারে অন্যদিকে ছিল, সেখানেও কেউই কিছু পারেনি নাকি, এটা-সেটা, আরও কত কী। কিন্তু আমার মনটা খারাপ হয়েছিল এত ভালো পরীক্ষার পরও। একটা কারণ সুকান্তকে ওটা বলার জন্য। অন্যটা কিছুটা আলাদা। আমার মনে হচ্ছিল সব কোশ্চেন আমি উত্তর করিনি, করেছে আমার ভিতরে থাকা কেউ। সেটা যেন আমি না। কেউ আমাকে পাশ থেকে বসে বসে উত্তরগুলো বলে দিচ্ছিল।

"বাবা বলেছে, কাকার লেখাগুলো তোকে পড়তে দেবে। আমি তোকে বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসব। কী রে শুনলি?"

নাহ্, আমি শুনতে পাইনি ভালো করে। যেন আবছা শুনলাম আবছা দেখার মতো। তাই অন্যমনস্কতা কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "বল্ বল্।"

"বাবা বলেছে, আমার ছোটোকাকার লেখাগুলো, কবিতা আর অন্যান্য যা কিছু আছে, ঘর থেকে পাওয়া গেছে তোকে পড়তে দেবে। তুই পড়ে বলিস কোনটা কেমন। সেগুলো তাহলে বাবা চেষ্টা করবে পাবলিশ্ করা যায় কিনা।"

"আমি কী বুঝি এসবের?" আমি অবাক হয়ে বললাম।

"বুঝিস না বলিস না। কত গল্প, কবিতা, গুচ্ছের বই পড়িস সেটা আমিও জানি আর আমার বাড়িতেও জানে। তাই বাবা ঠিক করেছে ওগুলো তোকে দিলে, তুই দেখে বলতে পারবি লেখাগুলো কেমন। তারপর বাবার ইচ্ছে ভালো ভালো লেখাগুলো যদি বই হিসেবে বের করা যায়। ছোটোকাকা বেঁচে থাকতে তো আর হল না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? তোর কাকা কখনও কিছু পাবলিশ করেনি?"

"করেছে। তবে কোনও বইটই তো নেই। সবই ম্যাগাজিনে। সেগুলো কোথায় কে জানে। আর শেষে যা হল।"

আমরা আমাদের বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে প্রায় গেটের কাছে চলে এসেছিলাম। চৈতালী বলল, "অথচ কত ব্রাইট ফিউচার ছিল বল তো ছোটোকাকার। গ্রাজুয়েশনে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকেও দারুণ রেজাল্ট করেছিল। এছাড়াও ক্রিকেট খেলত এত ভালো, ছবি আঁকত, কবিতা লেখা, তারপর কত পড়াশোনা। বাবা বলে আমরা যা সারা জন্মে পড়ে শেষ করতে পারব না কাকা ওই ক'দিনেই শেষ করেছিল। কিন্তু শেষে কী হল।"

এই কথাগুলো আমি আগেও শুনেছি। যতবার শুনি মনটা খারাপ হয়ে ওঠে। এত সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ কী করে শেষ হয়ে যায়? এটা কত দুঃখের তা বোঝানোও যাবে না। উনি আমাদের কলেজেরই ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। শুনেছি কলেজে পড়তে পড়তেই ওর কাকার মধ্যে এই অস্বাভাবিকতা স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। শেষে ভয়ানক হয়ে উঠেছিলেন। মানে উন্মাদনার চূড়ান্ত। কিন্তু চৈতালীর বাবা এত ভালোবাসতেন যে ওঁকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করাতেন, অ্যাসাইলামে দেবার কথা ভাবতেই পারেননি। আমি চৈতালীর বাড়ি গিয়ে যতবার দেখেছি ওঁকে, তেমন কিছু পাগলামি করতে দেখিনি। বরং মাঝে মাঝে জানলায় বসে থাকতে দেখেছি, মনে হত একটা দুঃখী মানুষ চোখে জল নিয়ে বসে আছেন। ওই ঘরের জানালাটা চৈতালীর বাড়ি ঢোকার পথ থেকে দেখা যেত। ওদের সেই বাগানের ঠিক পিছনে।

আমার আচমকা কী মনে হতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, "চৈতালী তোর কাকার নাম কী ছিল রে? ভুলে গেছি ...।"

"তীর্থ মজুমদার।"

শুনেই আমার শরীরের ভিতরটা আচমকাই কেঁপে উঠল। তখনই আমার চোখটা সুকান্তর দিকে পড়ল। গেটের পাশেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেহবুবের সঙ্গে কথা বলছিল ও। আমার চোখে চোখ পড়তেই চোখটা বিরক্তি দেখিয়ে সরিয়ে নিল। আমার বুকের ভিতর একটা অজানা আশঙ্কা কামড়ে ধরল যেন। এসব কী হচ্ছে আমার সঙ্গে?

।। আমি এক অন্য মানুষ ।।

সত্যি কী হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। আমার নিজের আবেগের ওপর যেন আমার নিজেরই কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। আচমকা এমনভাবে সেটা বেরিয়ে আসছে যে মনে হচ্ছে সে আমি না, আমি এভাবে কথা বলি না, বলতে চাইও না, এইরকম কিছু করতেও চাই না, কিন্তু করে ফেলছি। সেবার সুকান্তর সঙ্গে ঘটনাটা ঘটার পর থেকে এটা আরও অনেকবার হয়েছে।

সেদিন বাসে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া বেঁধে গেল কন্ডাকটারের সঙ্গে। সামান্য টিকিট নিয়ে, খুচরো নিয়ে। এমন তো আগেও কতবার হয়েছে যে আমার কাছে খুচরো ছিল না, কন্ডাকটার সেই নিয়ে বিরক্তি দেখিয়েছে, শেষে ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন কেন কী জানি ভিতর থেকে একটা রাগ আচমকা উঠে লোকটাকে আঘাত করতে চাইল। নানা কথা শুনিয়ে দিলাম। লোকটাও ছাড়ার পাত্র না। সেই নিয়ে বিশ্রি ঝগড়া। আমি আগে ঝগড়া থেকে শত হাত দূরে থাকতাম। কেউ কোথাও ঝগড়া করলেই ছোটো থেকে আমার বুকের ভেতরে যেন কেমন একটা করে। আমার মা বলত বড্ড ভিতু তুই। এটা ভয় না আসলে, কেমন কষ্ট হত মাথার মধ্যে। মনে হয় সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর। আর সেদিন একটা উৎসাহ পাচ্ছিলাম যেন ভেতর থেকে, সেই ঝগড়া করার সময়। মনে হচ্ছিল লোকটাকে খুব আঘাত করতে পারলে আরও ভালো লাগবে, হয়তো এই মুহূর্তে মেরে ফেলতে পারলেও...।

কলেজেও এই ঘটনা ঘটল। সুকান্ত আর আমার সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু রূপসা, শান্তনু, জয়ব্রত, নার্গিস এদের সঙ্গে আমার যেরকম আলাপ ছিল সেটা হঠাৎ একটা ঘটনায় নষ্ট হয়ে গেল। সেদিন তাড়াতাড়ি করে কলেজ থেকে বেরোতে যাচ্ছি, পরের দিন প্র্যাকটিকাল লেখা বাকি ছিল। ওরা সবাই আড্ডা মারছিল লাইব্রেরির সামনে বসে। শেষ ক্লাসটা করেনি তার মানে, ঠিক লক্ষ্য করিনি। আমি লাইব্রেরির পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে রূপসা বলল, "এই তাতিয়ানা, কফিহাউস যাবি। আমরা যাচ্ছি। যাবি তো চল।"

নার্গিস বলল, "হ্যাঁ, তুই গেলে খুব মজা হবে।"

ওর কথাগুলোই খুব আধোআধো, সেই মুহূর্তে আরও বেশি সেরকম লাগল।

জয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, "তোদের মতো ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বসে বসে আড্ডা মারা আর কফি হাউসে গিয়ে ফাঁকিবাজি করার কোনও শখ আমার নেই।" কথাটা শুনেই চমকে উঠল ওরা। আমার দিক থেকে এত রূঢ় আচরণ কেউই কখনও দেখেনি। আমি কথাটা বলে আর দাঁড়ালাম না। হনহন করে বেরিয়ে এসে বাস ধরে নিলাম মোড়টা থেকে। আমার কেন কে জানে একটা আনন্দ হল এই কথাটা বলে। যেমন আগেরবার অনুতপ্ত হয়েছিলাম সুকান্তর ঘটনায়, তেমন আর হল না। আমার মনে হল আমি কোনও অন্যায় করিনি। অনুতপ্ত হবার তো কোনও কারণই নেই। ওরা খারাপ, ফাঁকিবাজ সব, ওদের কাছে পড়াশোনার কী মূল্য আছে! একটা উত্তেজনা হল ভেতরে ভেতরে।

কিছু টুকটাক ব্যাপার আরও ঘটল। কখনও ক্যান্টিনের মালিক চয়নদার সঙ্গে, কখনও বাসে কোনও যাত্রীর সঙ্গে। মানুষের ব্যবহারে যেন বিরক্ত হয়ে উঠছি। মনে হচ্ছে এদের দেখতে না হলে শান্তি হয়। এরা আমার শত্রু

এইসবের কারণ কি তাহলে এই ফোনগুলো? কেন জানি না আমার আন্দাজ বলছে, বরং বলা ভালো আমি নিশ্চিত যে এদের কোনও সম্পর্ক নিশ্চয় আছে। প্রথমবার ফোন আসার পর থেকে আরও দু"বার ফোন এসেছে। আমি ভালো করে দেখে নিয়েছিলাম যে মোবাইলের স্ক্রিনে কোনও নম্বর ওঠেনি আদৌ। কেবল "কলিং" শব্দটা দেখাচ্ছিল। রিসিভ করার পর দেখলাম কোনও শব্দ আসছে না। আমি "হ্যালো", "হ্যালো" করলাম। কিন্তু আবার যে কে সেই। কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে, যে কারণে আমি বুঝতে পারছি এগুলো সব সম্পর্কিত। আমার মাথার ভেতর আবার সেই কত কত ফিসফাস, মৃদু চিৎকার, হাসি, কান্না, সব মেশানো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, যার কোনও নির্দিষ্ট মানে নেই। মনে হচ্ছে কারা যেন কথা বলছে, আমাকে নির্দেশ করছে কিছু, অথচ কোন ভাষায় তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি পরে

ভেবে দেখেছি, এই দুটো ফোনই এসেছিল যেদিন ওই বাস কন্ডাক্টার আর বন্ধুদের সঙ্গে ওই ঘটনাগুলো ঘটে। ফোন এলেই আমার মাথায় এই ফিসফিসটা আবার শুরু হয়। আমি আরও ক্রুদ্ধ, রুক্ষ, হিংস্র একপ্রকার জীব হয়ে উঠি।

আজ এ.এম. স্যারের সেই টেস্টের রেজাল্ট বেরোবে। আমরা সবাই ক্লাসে বসেছিলাম। চৈতালী আমার পাশে। কাল ও আমার বাড়ি এসে ওর কাকার লেখার বান্ডিল রেখে গেছে। আমাকে নাকি ওসব পড়ে জানাতে হবে কেমন। দেখেই মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। আমার কোনও কাজ নেই নাকি? আমি কি তোর মতো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াই? পড়াশোনা নেই? বলতে বলতে স্যার এলেন। চৈতালী বলল, "গড্, সেভ মি। রক্ষা করো, ভগবান।" স্যার সবার খাতাগুলো দিলেন একে একে। সবাই দেখা যাচ্ছে তিরিশে দশের নিচে। কেবল তন্বী পনেরো পেয়েছে দেখলাম। ওর দিকে তাকাতেই আমার দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকাল। ভাবটা এমন, দেখি এবার তুই কত পাস এই শক্ত কোশ্চেনে। আমার গা একেবারে জ্বলে গেল। মেয়েটা আমাকে যেদিন থেকে ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছি, সেদিন থেকে হিংসে করে আসছে। ভালোভাবে কথা বলে না, ঠেকরে ঠেকরে উত্তর দেয়। ও নাকি স্কুলে পড়ার সময় কোনওদিন সেকেন্ড হয়নি। তাই এত রেলা? আজ আমার ফিরে ওকে হিংসা করতে ইচ্ছে করল।

আমার রোল নম্বর আসতেই আমি খাতা পেলাম। আর তখনই অবাক হয়ে গেলাম। তিরিশে তিরিশ পেয়েছি আমি! স্যার একটা প্রশংসার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন আর ক্লাসে সেটা ঘোষণা করলেন। আর তখনই আমার চোখাচোখি হল তন্বীর সাথে। আমি অবজ্ঞার বাঁকাহাসি দিতেই ও চোখ সরিয়ে নিল। নিশ্চিতভাবে ও বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে এত শক্ত কোশ্চেনে কেউ ফুল মার্কস পেতে পারে। একটা অদ্ভুত অহঙ্কার যেন আমায় পেয়ে বসল। আহ, দেখ আমি কী আর তুই কী!

তবে নম্বরটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি নিজেও। এটা কী করে সম্ভব হল! যে দু'নম্বর আমি ভুল হবে ভেবেছিলাম সেটা অবধি পুরোপুরি ঠিক। আমি বেঞ্চে স্থির হয়ে বসলাম। আমার মাথার ভেতর অনেক কিছু চলছিল। না, না, না, এটা... এটা হতই। এই ক'দিনে আমার মধ্যে কেবল একটা খারাপ পরিবর্তনই হয়নি, হয়েছে ভালো পরিবর্তনও। হ্যাঁ, আমি আগের থেকে অনেক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠেছি। আমি শেষ কয়েক সপ্তাহ পড়তে গিয়ে দেখেছি কিছু আটকাচ্ছে না, যা পড়ছি একবার সামান্য প্রচেষ্টায় সবই মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে। এমনকি যা কিছু পড়া হয়নি সেগুলো পড়তে গেলেও মনে হচ্ছে যে আমি এগুলোও জানি, পড়েছি কখনও। খাতায় যা লিখেছি সেগুলো যে সবই ঠিক হবে সন্দেহ কী!

কিছুক্ষণ পরে ক্লাস শেষ হয়ে গেল। আমি আর চৈতালী বেরিয়ে আসছিলাম। চৈতালীর অস্তিত্বের কথা এতক্ষণ আমার মনেই ছিল না। মনটা খুশি ছিল, সেইসঙ্গে দ্বিধায় ছিল, চিন্তায় ছিল। চৈতালী অনেকক্ষণ ধরেই বকবক করে যাচ্ছে, সেটা কানেও আসছিল কিন্তু কোনও মনোযোগ দিইনি ওর কথায়। ও মাত্র পাঁচ পেয়েছে। আমি কী আর বলব! শুনছিলাম। এমন সময় ব্যাগের ভেতর মোবাইল বেজে উঠল। আমি সেটা বের করতেই দেখি সেই "অজানা" ফোন এসেছে। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দোনামোনা করে ফোনটা ধরলাম। আবার সেই ব্যাপার - কোনও শব্দ নেই। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, নাহ, নাহ, শব্দ পাচ্ছি। হ্যাঁ, পাচ্ছি, পাচ্ছি, এই প্রথমবার শব্দ পাচ্ছি। ফিসফিস করে কথা বলছে কেউ। ঠিক যেমন শব্দ আমি মাথার ভেতর শুনতে পাই, সেটাই আরও একটু জোরে। আমি গভীর উৎকণ্ঠা আর মনোযোগে শব্দগুলোকে শুনতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে ফোনটা নিজে থেকেই কেটে গেল - ঠিক যেমন হয়। আমি মোবাইলটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে চৈতালীর দিকে তাকাতেই ও জিজ্ঞেস করল, "কার ফোন?"

আমি সংক্ষেপে বললাম, "রং নাম্বার।"

চৈতালী শুনে আর গুরুত্ব দিল না। ও নিজের পরীক্ষা খারাপ নিয়েই কথা বলে যাচ্ছিল। আমি নিজের মনে চিন্তা করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম। আমার মাথার মধ্যে সেই শব্দগুলো আবার শুরু হয়েছে। হঠাৎ আমার মধ্যে একটা বিরক্তি জেগে উঠল। চৈতালী সেই এক কথা এখনও ফেনিয়ে চলেছে। পড়াশোনা না করে দশটা অবধি ঘুমোলে কী করে আমার মতো নম্বর পাবে ও? কথাটা দুম করে ওর মুখের ওপর বলে দিলাম। শুধু তাই না বললাম, "তাতে আর তোর চিন্তা কী? তোর বাবা-মার আদরে আতুপুতু করে বড়ো হয়েছিস, ফেল কর আর পাশই কর, তোর কী এসে যাবে?" কথাটা বলার সময় নিজের ক্রূর মুখটা নিজেই দেখতে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল ওকে খুব আঘাত করতে পারলে দারুণ মজা হয়, শান্তি হয়। চৈতালী স্তম্ভিত হয়ে গেল প্রথমে, তারপর কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। গলায়

কথাটা আটকে গেছে নিশ্চয়। আমি আর দেরি করলাম না। ওকে পিছনে রেখে সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নামতে লাগলাম। নামতে লাগলাম নিচে।

ওর থেকে দূরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এত দিনের বন্ধুত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কোনও চিন্তা হল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাস পেয়ে গেলাম। মনটা তাজা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আহ, আমি হারাতে পারি সবাইকে। আমার ওপরে কে আছে? কে তন্বী? আর চৈতালীই বা কে? কাকে, কেন দরকার হবে আমার? আমি একাই থাকতে পারি। আমি একাই সবার থেকে সেরা। নিকুচি করেছে এদের। জানালার পাশের সিটটায় বসতে ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে-মুখে এসে লাগল। এতদিন ধরে ভাবছিলাম আর একবার ফোন এলেই আমি দাদাকে জানাব। কারণ এটা নিশ্চয় সেই ভিনগ্রহীদের কোনও ব্যাপার। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার সব দ্বিধা দূর হয়ে গেল। যদি সেই ফোন আসার ফলে, আমার মাথায় কিছু চলার ফলে আমি সবার সেরা হয়ে উঠি, সবাইকে হারাতে পারি, কেন আমি সেটা কাউকে জানিয়ে নষ্ট করব? কেন এই সুযোগ ছেড়ে দেব? আমার মন খুশিতে হাসতে লাগল। আমার মনে হল সারা পৃথিবী আমার হাতের মুঠোয়, আজকে না হলেও, কাল চলে আসবে ঠিকই।

।। প্রোফেসরের বক্তব্য ।।

ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। পুরনো দিনের কিছুটা স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। আমি একটা চেয়ারের ওপর বসে বসে ঘরের অসংখ্য বইগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। এত বই! শুধু ইংরেজি সাহিত্য না, আরও অনেক বিষয়ের বইও আছে দেখছি। আমি বিহ্বল হয়ে দেখছিলাম। মনের ভেতর একটা লোভ হচ্ছিল যদি এগুলো পাওয়া যায়। মনে হচ্ছিল যদি এগুলোকে লুঠ করে নিতে পারি তো ভালো হয়। কথাটা মনে আসতেই আমি জোর করে ভাবনাটা মাথা থেকে সরাতে চাইলাম। নাহ, আবার ভুল হচ্ছে আমার। ভাবতে ভাবতেই দরজার সামনে একটা ছায়া দেখা গেল। একজন বৃদ্ধ মানুষ এসে ঢুকলেন। আমি তাঁকে সম্মান জানিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি স্মিত হেসে আমাকে বসতে বললেন। এতদিন অধ্যাপনা করার পরে ক্লাসে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের অভিবাদনের এই নিয়মটা তাঁর নিশ্চয় অভ্যাস হয়ে গেছে। তাই ব্যাপারটা ক্লাসের মধ্যে যেমন ভাবে ঘটে, ঠিক তেমন মনে হল আমার।

প্রোফেসর বাগচীকে আমি আগে কোনওদিন দেখিনি। সেইবার দাদা আর প্রোফেসর খাসনবীশ তাঁর কাছে এসেছিলেন মেসেজের অর্থ উদ্ধারের জন্য কিন্তু আমি আসিনি। তিনি এই কয়েক বছরে রিটায়ার করেছেন। একটু বেশিই বয়স্ক লাগছে। অন্তত যে বয়েসটা আমি আন্দাজ করে এসেছিলাম তার তুলনায়। সমস্ত চুল পাকা, একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন। তবে চোখের প্রখর ঔজ্জ্বল্য মোটা ফ্রেমের চশমার মধ্যে দিয়েও বোঝা যায়।

আমি নিজের পরিচয় দিলাম। তিনি আমার দাদা আর প্রোফেসর খাসনবীশের খবর জিজ্ঞেস করলেন। টুকটাক কথা হবার পর আমি যে আসল প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করব বলে এসেছি সেটা বললাম। আমার এখন জানার খুব প্রয়োজন চৈতালীর কাকার সম্পর্কে। প্রোফেসর বাগচী নিশ্চয় তাঁর ক্লাসের সেই ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রকে মনে রেখেছেন। নাকি আমার এই আসা ব্যর্থ হবে? আমি আমাদের কলেজের ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিতে পারতাম, কিন্তু আমার মনে হল দাদা আমার সূত্রেই যার সাথে যোগাযোগ করেছিল তাঁর সঙ্গে কথা বলে যদি কিছু জানতে পারি তো ভালো হয়। তিনি আমার অবস্থাটা আরও ভালো বুঝবেন। আমার কিছু সন্দেহ নিরসন করতে হবে। আমি প্রোফেসর বাগচীকে চৈতালীর কাকার নাম আর ব্যাচের ইয়ার উল্লেখ করে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করলাম। প্রোফেসর প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মনে হল, তাঁর ভ্রু কুঁচকে গেল। তিনি কি মনে করতে পারছেন? তাঁর এত ছাত্রের মধ্যে?

উফ, কত দ্রুত বয়ে চলেছে এই সময়। আমার মনে হচ্ছে একেকটা দিন একেকটা ঘটনার শুরু। চৈতালীর সঙ্গে আমার আর কথা হয়নি। ও তারপর থেকে কলেজও আসেনি নিয়মিত। এলেও আমার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। ও হয়তো আশা করেছিল আমি ওর থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব। কিন্তু আমি তা করিনি আর করা সম্ভবও ছিল না সেসময়। আমি এমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম যে কারও কাছে ক্ষমা চাওয়া তো দূরের কথা কথা বলতেও গা ঘিনঘিন করছিল। এটা শুধু ওর ক্ষেত্রে না, সবার ক্ষেত্রেই হচ্ছিল আমার। ক্লাসে একটা গুঞ্জনও আমি অনুভব করেছি আমার এই দুর্ব্যবহার নিয়ে। তবে তখন কিছুই এসে যায়নি সেটা আমার কাছে। এই শেষ এক সপ্তাহ আমি আর কলেজ যাইনি নিজেই। যাইনি ইচ্ছে করেই। আমার নিজের এই সমস্যার সমাধান না করতে পারলে সমাজে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, ক্লাস করা তো দূরের কথা। বলা ভালো, আমি সমাজের পক্ষে এত ক্ষতিকারক হয়ে উঠব যে সেটাই একটা ভয়ানক ব্যাপার হবে। এখনও আমার সব অনুভূতিগুলো আয়ত্বে আসেনি আর সেটা না আসা অবধি আমার

ভেতরের এই যুদ্ধ কিছুতেই থামবে না। আর আমি এই যুদ্ধে হারতেও চাই না। আমি শেষ হয়ে যেতে বা শেষ করে দিতে চাই না কিছু। আমি চাই না আমার পরিণতিও চৈতালীর কাকার মতো হোক!

চৈতালীর সাথে সেই ঘটনাটা ঘটার পরে আরও সব খারাপ কাজ করেছি আমি। আমি বুঝিনি কী হতে যাচ্ছে এর পরিণতি। আমি আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠছিলাম একজন ছাত্রী হিসেবে আর সেই সঙ্গে আমার ব্যবহারের উপর থেকে আমার নিজের নিয়ন্ত্রণ ততই কমতে আরম্ভ করেছিল। অদ্ভুত আনন্দ আর ভয়ঙ্কর বিতৃষ্ণা আমাকে গ্রাস করছিল দিনে দিনে। আর এভাবেই একদিন সবচেয়ে খারাপ কাজটা করে ফেলি। সেদিনও বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছিল একটু। মনটা ভালো ছিল না, কী হচ্ছে সারাক্ষণ মাথার মধ্যে বুঝতে পারিনা, কলেজ থেকে বেরিয়ে একা একাই কফিহাউসে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম, একটা কোল্ড কফি আর কিছু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নিয়ে। রাস্তায়ও জ্যাম ছিল বেশ। ফলে ফিরতে দেরি হল বেশ অনেকটাই। ইতিমধ্যে মা ফোন করেছিল দু"বার। বিরক্ত লাগছিল উত্তর দিতে। কোনওমতে উত্তর দিয়ে কেটে দিয়েছিলাম। সবে ফিরেছি, দেখি বাবাও সেইমাত্র ফিরেছে অফিস থেকে আর আমার কথা জিজ্ঞেস করছে মানে আমি ফিরেছি কিনা। আমাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করল, কেন দেরি হল এত। শুনেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল যেন। আমি কি বাচ্চা নাকি? পাঁচ বছরের মেয়ে? হারিয়ে যাব? আমার কি কোনও স্বাধীনতা থাকতে নেই? সবসময় কেন দেরি, কী হল, এসব নিয়ে প্রশ্ন কেন? মাথা গরম হয়ে গেল আর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল এই কথাগুলো। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিলাম। দেখলাম বাবা আর মা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি একমুহূর্ত আর দাঁড়ালাম না। মা পিছন থেকে ডাকছিল আমাকে দাঁড়াতে বলে। আমি শুনলাম না। হনহন করে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সেই রাতে বাবা আমার ঘরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমি কোনও সমস্যায় আছি কিনা। বাবার ধারণা আমি নিশ্চয় কোনও সমস্যায় পড়েছিলাম বলেই রাগারাগি করে ফেলেছি। কিন্তু আমি বলে দিই সেটা না। আমার ভালো লাগে না তোমাদের এই বাড়াবাড়ি রকমের শাসন; বরং এটা বিরক্তিকর লাগে। এটাও রুক্ষ ভাবে বলি। তারপর আর কথা হয়নি বাবার সঙ্গে। বাবা অফিসের কনফারেন্সের জন্য ট্যুরে বেরিয়ে গেছে প্রায় দশদিন হল। আর ফোনও করেনি আমাকে। অন্যবার ট্যুরে গেলে বাবা খবর নেয়, আমিও ফোন করি। কিন্তু এবার সেটা হয়নি। বাবা নিশ্চয় মায়ের কাছ থেকে আমার খবর নেয়। কিন্তু অভিমান করে আমাকে ফোন করে না। বাবার সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়তো আমি। আর সেই আমিই বাবার মনটা একেবারে ভেঙে দিয়েছি সেদিন। মনে হতেই কান্না পায় এখন।

প্রোফেসর বাগচী বললেন, "আমার তীর্থকে ভালোই মনে আছে। আর সেটা এই কারণে যে ওর সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠ ছাত্র- শিক্ষক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তবে সেটা একটা সময় অবধি।"

আমি বললাম, "একটু খুলে যদি বলেন।"

প্রোফেসর বললেন, "বলতে আমার কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু তুমি কেন এই কথা জিজ্ঞেস করছ ভেবেই অবাক লাগছে। ও কি তোমার আত্মীয়?"

ঠিক কথা। আমার এই কৌতূহলের কারণ অন্য কারও বোঝার কথা না আদৌ। আমি বললাম, "এটা আপনাকে এখনি আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনি জানবেন। তবে তার জন্য আমায় এই সাহায্যটুকু, প্লিজ করুন।"

আমার স্বরে মিনতি ছিল। নিস্তব্ধ ঘরে সেটা ছড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রোফেসর বললেন, "আচ্ছা।"

আমি অবাক হয়ে শুনলাম। কিন্তু এটাও ঠিক যে আমি মনে মনে যেন জানতাম আমি এটাই শুনতে পাব। আমার ভাগ্য ভালো যে আমি প্রোফেসর বাগচীর কাছে এসেছিলাম কারণ তিনি তীর্থকে এত ভালো করে চিনতেন। তিনি বললেন, তীর্থকে যখন ক্লাসে প্রথম দেখেন তখন আলাদা করে চোখে পড়েনি তাঁর। কিন্তু ধীরে ধীরে একজন ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হয়ে ওঠেন তীর্থ। কিন্তু ক্লাসে তাঁর উপস্থিতি কমতে থাকে দিনে দিনে। বিশেষ করে তৃতীয় বর্ষের শেষদিকে তীর্থকে কেউ ক্লাসেই দেখেনি। প্রোফেসরের খুব প্রিয় ছাত্র হয়েছিলেন উনি কিন্তু শেষে তাঁকেও এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেন। প্রোফেসর চেষ্টা করেছিলেন তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতে কিন্তু তিনি ক্লাসের অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে জানতে পারেন যে তীর্থর সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই।

"আসলে তীর্থ নাকি ভয়ানক দুর্বিনীত হয়ে উঠেছিল। আমি ওর সেই রূপ দেখিনি কোনদিনই, কিন্তু আমার অন্য স্টুডেন্টরা বলে তীর্থর ব্যবহার এমন ছিল যেন ও সবাইকে ঘৃণা করে, তাচ্ছিল্য করে। আমি শেষদিকে ওকে একবারই কলেজে দেখেছিলাম, পোর্টিকোর সামনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বসেছিল ও। আমি ওকে ডাকতেই ও হুড়মুড় করে উঠে ওখান থেকে চলে যায়। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল ও নিশ্চয় কোনও নেশায় আক্রান্ত

হয়েছে। সারা গালে অপরিষ্কার দাড়ি, পোশাকেরও পরিচ্ছন্নতা নেই, চোখে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব - সেটা হলে তার থেকে ওকে বার করে আনতে হবে নাহলে ওর এত ভালো কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তা ঠিক না ভুল আমি বুঝিনি। কারণ ও এরপরও ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয় থার্ড ইয়ারে আর সেটা রেকর্ড নাম্বার নিয়ে। আর কোনওদিন যোগাযোগ হয়নি আমাদের। অথচ আমার প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠেছিল ও কয়েকদিনেই, সেই ফার্স্ট ইয়ারের শেষ থেকে। এই ঘরে বসে অনেকদিন কাটিয়েছি দু"জনে কত বিষয় আলোচনা করে। শেষে একটু অস্বাভাবিক ও হয়ে উঠছে সেটা সন্দেহ হয়নি না - কিন্তু জিনিয়াসরা ওরকম একটু হয়ই। সত্যিই ও জিনিয়াস ছিল। মানে যা ওকে দেখেছি, কোনও সন্দেহ নেই ও তাই হত। আমিও ওর জ্ঞানে অবাক হয়ে যেতাম শেষে। কতগুলো ভাষা যে ও কীভাবে আয়ত্ব করেছিল তার কোনও হদিশ আমি পাইনি। পরে শুনি ও নাকি পাগল হয়ে গেছে। আ গ্রেট ট্র্যাজেডি...," প্রোফেসর বাগচী এতক্ষণ কথা বলে থামলেন।

তাঁর কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কাঁপছিল। আমার মনে হচ্ছিল তিনি আমারই বর্তমান অবস্থার কথা যেন বলছেন। আমি বুঝলাম তিনি জানেন না যে তীর্থ মারা গেছেন কিন্তু তাঁকে আর সে কথা বললাম না। তিনি যখন জানেন না ত সেটাই বা খারাপ কী! কী প্রয়োজন মানুষকে আবার মৃত্যুসংবাদ দিয়ে দুঃখী করে। অনেকদিন পরে আমার মনে এই শুভ বুদ্ধি এলো দেখে আমার নিজেরও ভালো লাগল। আমি কি আবার সুস্থ স্বাভাবিক হতে পারছি তাহলে? আমি প্রোফেসরকে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম। আর জানালাম তিনি এই কৌতূহলের কারণ শীঘ্রই জানতে পারবেন। তিনি হেসে বললেন, "বুড়ো হয়েছি। এখন চারপাশে যা দেখি তা নিয়ে খুব একটা কৌতূহল জাগে না। তবে তোমার ঘটনা সবাই জানে। আমার বিশ্বাস তুমি সেই ঘটনার সন্ধানেই এসেছিলে, তা যতই লুকিয়ে রাখ না কেন। আর তার সাথে তীর্থর নামও আসছে দেখে সত্যিই কৌতূহল হচ্ছে। জানিও, সময় হলে। তবে বিশেষ কিছু গোপন করো না বেশিদিন। হৃদয় নিতে পারে না সেটা। হয়তো তীর্থর তাই হয়েছিল।"

আমি তাঁর অনুমানক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মাথা নেড়ে বেরিয়ে আসতে আসতে আমার মনে হল সত্যিই বেশিদিন কিছু গোপন করা উচিত না। তাহলে ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাবে। আমার সেই ডায়েরির লেখাগুলো কানের মধ্যে বাজতে লাগল। এক্ষুনি কিছু করা দরকার।

।। ডায়েরিতে যা ছিল ।।

সেদিন আমি চৈতালীর কাকার ডায়েরিগুলো একে একে খুলছিলাম। কিছু করার ছিল না তখন। আমার বিরক্ত লাগছিল নিজের ওপর আর সমস্ত মানুষের ওপর। বাবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার পরে দু"দিন কেটে গেছিল। কিন্তু সেই তেতো স্বাদ তখনও মুখে লেগে আছে। বাবাও সেদিন সকালে ট্যুরে বেরিয়ে গেল। বাবার সঙ্গে কথাও হল না আর যাবার আগে। এটা কখনও হয় না। আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল আর ভালো লাগছিল না কিছু। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল চৈতালীর কাকার ডায়েরিগুলোর ওপর। চৈতালীর সঙ্গে ঝামেলাটা হবার আগের দিনই ও আমায় এগুলো পড়তে দিয়ে যায়। কী মনে হল আমি ডায়েরিগুলো নিয়ে বসে পড়েছিলাম।

পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে আমি বেশ অবাক হচ্ছিলাম। বেশ ভালো মানের লেখা দেখা যাচ্ছে। হাতের লেখাও মুক্তো বাঁধানো। আমি এক-এক করে প্রায় সব ডায়েরিগুলোই দেখতে লাগলাম। অনেকগুলোতে এমন সব ভাষা লেখা যেগুলো আমি জানি না। হঠাৎ এমন একটা লেখার দিকে চোখ আটকে গেল আমার। কেন জানি না মনে হল এই লেখা আমি আগেও দেখেছি। আমি স্থির হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম, কোথায়? কোথায় দেখে থাকতে পারি? আমার মাথার ভেতর একটা ফিসফিস আবার শুরু হল। এটা হচ্ছে, সর্বক্ষণ হচ্ছে আমার মাথার ভেতর, আর আরও বেশি হচ্ছে যখন কিছু খুব মনোযোগ দিয়ে করতে যাচ্ছি, ভাবতে যাচ্ছি। আরও অনেকবার ফোন এসেছে আমার কাছে। যতবার আসছে আমি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছি, আরও ফিসফিস বেড়ে চলেছে আমার মাথার ভেতর। যেন কারা আমার মাথার ভেতরের সব জটিলতা দূর করে সব কিছু আমার জন্য সহজ করে দিচ্ছে। আমি মাথার ভেতরটা আমার যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল কী লেখা এটা। উত্তেজনায় হৃদস্পন্দন দ্রুত দ্বিগুণ হয়ে গেল। এ তো আমার পুরনো ফোনে পাওয়া সেই মেসেজটা, সেই ফিনিশিয়-সাসানিড ভাষায়। এর একটা মানেও ডঃ রাধাকৃষ্ণ বের করেছিলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, চৈতালীর কাকাও ঠিক সেটাই বের করেছেন আর এর নিচে লিখে রেখেছেন। তিনি কি এত পণ্ডিত ছিলেন যে কলেজে পড়তে পড়তেই এই ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন? আমি পাগলের

মতো তার ডায়েরিটার পাতা ওলটাতে লাগলাম। আমার মাথার ভেতর ফিসফিস আরও বাড়তে লাগল। একটা ভয়াবহ সন্দেহ মনে দানা বাঁধতে লাগল। আমি দেখতে পেলাম যা যা মেসেজ সেই সময় আমার কাছে এসেছিল সব এখানে লেখা। তার নানা মানে বের করেছেন তীর্থ। আর অনেককিছু এমন হিজিবিজি ভাষায় লেখা যে আমি তার কিছু বুঝি না। আমার অস্থির লাগল। আমি কিনা এত বড়ো একটা রহস্যের সামনে বসে কিছু বুঝতে পারছি না। আমি অন্য ডায়েরিগুলো খুলতে লাগলাম। কোথায় এর আনুষঙ্গিক কিছু আছে, কোথায়?

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলল সেটা। একটা ডায়েরি বেরোল, লাল রেক্সিনে মোড়া, যেটায় তীর্থর দিনলিপি জাতীয় কিছু আছে। তবে ঠিক গুছিয়ে লেখা না। কারণ তারিখ কিছু লেখা নেই আর লেখাটাও কেমন একটা। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম তার ওপর। টেবিলের ল্যাম্পটা টেনে নিলাম কিছুটা। আমার পড়ার আর মনে রাখার ক্ষমতা দ্রুত বেড়ে উঠেছে কিছুদিনের মধ্যে। মনে গেঁথে যাচ্ছিল বিশেষ বিশেষ টুকরো গুলো একেবারেই।

"আজকে আবার একটা মেসেজ এসেছে...। কেন জানি না মনে হচ্ছে, এটা কোনও প্রাচীন ভাষায়। ভাবছি বাগচী স্যারকে একবার দেখাব..."

"কিছু ভালো লাগছে না। একটা অদ্ভুত ফোন আসছে বারবার। ফোনটা ধরলে কোনও শব্দ আসছে না কানে। সবচেয়ে আশ্চর্য... ফোনটা যে আসছে তার চিহ্নও বোঝানো যাচ্ছে না ...। মানে সে যে কী, কী করে বোঝাই... মাথা ঝিমঝিম করছে আবার। কারা কথা বলছে? কারা?"

"আশ্চর্য ঘটনা ঘটল আজ। গোটা Macbeth একবার পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সত্যি। সত্যি বলছি। আমি এক আশ্চর্য শক্তি পাচ্ছি। ভুলে যাওয়া যে সম্ভব সেটাই এখন আর মনে হচ্ছে না। dialog গুলো হুবহু মনে আসছে। মনে হচ্ছে মাথার ভেতর থেকে কেউ বলে দিচ্ছে আমায়... এটা কি তারাই?"

"যেই হোক, সে নিশ্চয় ঈশ্বর। আমি ঈশ্বর মানিনি কোনওদিন। কিন্তু এই আশ্চর্য বার্তা যা কোনও দূর মহাকাশ থেকে কেউ আমাকে নিয়মিত পাঠাচ্ছে, তারা নিশ্চয় ঈশ্বরতুল্য। আমি শক্তিমান হয়ে উঠছি, হয়তো সর্বশক্তিমান...।"

"নাহ, এদের আর সহজে বিশ্বাস করা যাবে না। আমার ক্লান্ত লাগছে খুব। মাথার আর মনের মধ্যে সারাক্ষণ একটা যুদ্ধ। এরা কী চায়?"

"এখন দিনে ১০ -২০ বার করে ফোন আসছে.....।"

"কোন সুদূরের বার্তা আমার জন্য আসছে সেটা যেন টের পাচ্ছি এবার। এতদিন মাথার ভেতর আওয়াজ চলত, ঘুমোলে এখন স্বপ্নের মধ্যে একটা আগুনের পৃথিবী দেখছি।"

"কলেজে আর যাই না... ওসব পড়া আর ভালো লাগে না... মানুষও বিরক্তিকর... বাড়ির লোকগুলোও Tiring হয়ে উঠছে... মানুষকে ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছে... একমাত্র শান্তি সব ধ্বংস করে দিলে..."

"আমাকে ওরা যেসব ভাষায় প্রথমে মেসেজ করেছিল তার অনেকগুলোই উদ্ধার করলাম। কিছুটা ফিনিশিয় আর কিছুটা সাসানিড ভাষা। হ্যাঁ, সেই প্রাচীন সাসানিড ভাষা। গ্রিক লেটারের মতো কিছু পাঠিয়েছিল সেটা মনে হয় ওদের গ্যালাক্সির গঠন। কেবল ওই ২৪ ডিজিটের সংখ্যাটার কোনও মানে পাচ্ছি না..."

"ওরা আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছে... ওদের এই ব্যবস্থাটা আমি বেশ বুঝতে পারছি... প্রথমে মেসেজে, তারপর ফোনে এখন সরাসরি যোগাযোগ করছে... এখন মনে হয় আমার মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বাস করছে ওরা... ওদের ছায়ামাখা অবয়বগুলো দেখতে পাচ্ছি আমি... আগুনের ওপর ভেসে চলেছে ওরা... চিৎকার করছে, আর্তনাদ করছে, আবার আমার মাথার ভেতর বার্তাও পাঠাচ্ছে ওদের... মনে হয় আমার মাথার ভেতর ওদের আর ওদের পৃথিবীর একটা ছোট্ট version তৈরি করছে... কিন্তু কেন... কী উদ্দেশ্য ওদের?"

“কিছু একটা হচ্ছে সন্দেহ নেই... আমি আর পারছি না... কাল চৈতিকে আমি রেগে গিয়ে হঠাৎ এক থাপ্পড় মেরেছি... চৈতি বাচ্চা মেয়ে, বড়দা বা বউদি আমায় ভালোবাসে বলে কিছুই বলেনি... কিন্তু যে চৈতি আগে আমাকে দেখলেই ছুটে কোলে আসতে চাইত সে দেখছি আজ আমাকে দেখে দৌড়ে পালাল... বাইরের মানুষের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক শেষ... এখন কি ঘরের পালা...”

“আমি এবার পাগল হয়ে যাব... নিজের পাগলামি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি আমি... কী যে হচ্ছে তাঁর কোনও... নিয়ন্ত্রণ আমার নেই... ওরা কি আমাকে দাস বানাতে চায় নাকি কী চায়... আমি উগ্র হয়ে উঠছি, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে সব ধ্বংস করে দেব... সব শেষ করে দেব...”

“ঘুমের মধ্যে দেখছি একটা জগৎ, একটা অদ্ভুত পৃথিবী, সাদা ধোঁয়ার মতো অবয়বের প্রাণী, তাদের চারপাশে আগুন জ্বলছে... তারাই কি আমার এই শক্তি প্রদান করল? তারা কি...”

“আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ... পরিত্রাণ নেই...”

আমি এই অবধি পড়ে হাঁফিয়ে উঠলাম। আমার মাথা রীতিমতো ঘুরতে লাগল। আজকে বুঝলাম কেন তাঁর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই মেসেজ আমি পেয়েছিলাম। তার মানে যারা এই মেসেজ পাঠাচ্ছে তারা এখনও চায় তীর্থ মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তারা জানে না যে তিনি আর বেঁচে নেই। ঠিক, আমিও তো সেই মোবাইল নাসায় জমা দিয়ে আসার পরে এই নতুন ফোন কিনেই আমার “ওয়েলকাম ব্যাক” মেসেজ পাই। আমার একবার মনে হল তাহলে আমার এর আগের মোবাইলটা, মানে যেটা ভেঙে গেল, সেটায় কেন কোনও মেসেজ আসেনি। একটু ভাবতেই উত্তর পেলাম। সেই মোবাইলটা যে আমার ছিল না আদৌ। মায়ের ফোন, মা আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছিল। তাই ওরা বুঝতে পারেনি কার সাথে যোগাযোগ হবে...। মাথা ঘুরতে লাগল আমার। আমার সঙ্গে যা যা ঘটেছে তাই তাই ঘটেছে চৈতালীর কাকার সঙ্গেও, তিনিও আমার মতো প্রথমে মেসেজ পান, তারপর ধীরে ধীরে সময় যত এগোয় আমারই মতো তাঁর কাছে ফোন আসতে থাকে। তিনিও মাথার ভেতর নানা শব্দ শুনতে পান, দিনে দিনে আরও ক্ষুরধার হয়ে ওঠেন। কিন্তু মানুষের প্রতি তীব্র ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা, নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে না পারা, সব সব ঠিক আমারই মতো...।

আমি আরও একবার ডায়েরিতে ফিরে গেলাম। শেষের লেখাগুলো তেমন ভালো করে আর পড়া যাচ্ছিল না। একেবারে উন্মাদ অবস্থায় বা তার কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছে এই লেখাগুলো তিনি লিখেছিলেন। অসংলগ্ন, অনিয়মিত, বিকৃত অক্ষর, কিছুই প্রায় পড়া যায় না। শেষ দিকে একটা লাইন বোঝা গেল কিছুটা - “যন্ত্রণা জ্ঞানের, শক্তির, ক্ষমতার কিন্তু ধ্বংসের আরও বেশি...”।

এরপরেই কি সুইসাইড করেন তিনি? আমার পরিণতিও কি তাঁর মতো হবে? আমিও কি শেষ অবধি...? আমি টেবিলের ওপর বসেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেললাম। কী করব আমি? কী করব?

।। আর দেরি নয় ।।

আমি চৈতালীর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপলাম। কাকিমা এসে খুলে দিলেন দরজাটা। ওঁর হাসিমুখ দেখে বুঝলাম যে উনি আমার আর চৈতালীর ঝগড়ার ব্যাপারে কিছু জানেন না। আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে চৈতালীর ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। আমার দারুণ অপরাধবোধ হচ্ছিল। আবার মনের ভেতর সেই যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে কেন আমি ক্ষমা চাইব।

ডায়েরিটা পড়ার পর থেকে আমি বুঝেছিলাম নিজেকে রক্ষা করার একটাই পথ আমার খোলা আছে। সেটা হল, প্রথমত, কোনও ফোন রিসিভ না করা, যাতে আমার ওপর আর কোনও প্রভাব তারা খাটাতে না পারে। দ্বিতীয়ত, যেটুকু প্রভাব আমার ওপর পড়েছে সেটাকে নষ্ট করা। আর সেটা করতে গেলে আমাকে যা করতে হবে - তা-ই আমি করব। এই এক সপ্তাহ আমি কলেজ না গিয়ে বেরিয়ে যেতাম বাড়ি থেকে। বসে থাকতাম হয় কোনও জায়গায় গিয়ে, সে পার্ক

হোক বা মন্দির। অথবা ঘুরে বেরিয়ে ফিরে আসতাম বাড়িতে। আসলে মানুষের প্রতি বিদ্বেষভাব কাটানোর জন্য মানুষের মাঝখানে ঘুরতাম। চেষ্টা করতাম, নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে। বিশেষ করে কাউকে আঘাত করা বা চেষ্টা করা খারাপ ব্যবহার করতে, যেটা আমার মধ্যে সারাক্ষণ দেখা যাচ্ছিল সেটা একদম বন্ধ করতে চেষ্টা করি। একদিন রাস্তায় একটা কুকুর হঠাৎ "ঘেউ, ঘেউ" করে তেড়ে এসেছিল, বোধহয় পাগলা কুকুর হবে। সামনে একটা আধলা ইট তুলে মারতে গিয়েও থেমে যাই। দেখি লোকজন "হাঁ" করে তাকিয়ে দেখছে আমার কাণ্ড। সামলে নিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করি।

সেইসঙ্গে আরও একটা কাজ করি নিয়মিত ভাবে। হারতে, হ্যাঁ, জেনে-বুঝে হারতে। ভিডিও গেম খেলতে খেলতে হারতে, পড়া ইচ্ছে করে ভুলে যেতে চেষ্টা করতে। যেদিন প্রথম কলেজ যাই এইসবের পরে, দেখি একটা ক্লাস টেস্ট নিচ্ছেন কে.জি ম্যাম। আমি প্রশ্ন পেয়েই বুঝে যাই সব উত্তরই জানি। কিন্তু যা লিখি ভুল লিখে আসি ইচ্ছে করে। বুঝতে পারছিলাম একটা দ্বন্দ্ব হচ্ছে মনের ভেতর। ফিসফিস করে কারা সব উত্তর যেন বলে চলেছে। বলে চলেছে আমায় সবাইকে হারিয়ে দিতে। মনে হচ্ছিল যদি জিততে পারি সবাইকে হারিয়ে, কেনই বা হারব! কিন্তু এখানে হারাটাই যে আসলে জিত সেটা সারাক্ষণ মাথায় রেখেছিলাম। তাই পরীক্ষা দিতে দিতে যখন দেখলাম তন্বী খসখস করে লিখে পাতা ভরাচ্ছে, এক মুহূর্তের জন্য ফার্স্ট হতে না পারার কষ্ট গ্রাস করলেও, কিছু লিখিনি আর। হোক, আমার বদনাম, শূন্য পাই পাব, কিন্তু এভাবে শেষ হয়ে যাব না কোনও অজানা শক্তির হাতে।

তাই আজ সব অভিমান, "আত্মসম্মান" ভুলে ধীর পায়ে চৈতালীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। নাহ, ক্ষমা আমায় চাইতেই হবে। দোষ আমারই। আমি ঘরে ঢুকে দেখলাম ও জানালার রেলিঙে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে আমাকে বাড়িতে ঢুকতে আগেই ও দেখেছে নিশ্চয়। আমি কাছে গিয়ে ওকে ডাকলাম। প্রথমে সাড়া দিল না ও। আমি আরও একবার ডেকে ওর সামনে মুখটা নিয়ে গিয়ে দেখি চৈতালীর চোখ থেকে জল পড়ছে। চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম। চৈতালী কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "যাহ্, আমি তোর বন্ধু নাকি? কেন এলি তুই?" আমি ওকে কোনওমতে থামালাম। ক্ষমা চেয়ে তারপর বললাম এতদিনের সমস্ত ঘটনাগুলো। সেই মেসেজগুলোও দেখালাম। চৈতালী হতবাক হয়ে শুনতে লাগল। ও বিশ্বাস করছে তো আমায়? আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, "সেদিন যে তোকে ওরকম খারাপ কথা বলেছিলাম সেটা আর কিছু না, ওই ফোনটা এসেছিল বলেই। ওই ফোনটাই আমার মাথায় আবার হিংস্রতা ঢুকিয়ে দেয়।"

চৈতালী বলল, "কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে আদৌ? কোথাকার কোন গ্রহ থেকে..."

আমি বললাম, "দেখ, আমি এই ঘটনার কিছুটা ধারণা করতে পেরেছি। তোর কাকার সঙ্গেও তো একই ব্যাপার ঘটেছিল। তিনি খুবই ইনটেলিজেন্ট হওয়ায় আরও সহজেই অনেককিছু আন্দাজ করে ফেলেছিলেন।"

"কী আন্দাজ?"

"এই মেসেজ বা ফোনগুলো কেবলমাত্র আমাদের সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করার জন্যই পাঠায়নি, বরং আরও কোনও উদ্দেশ্য ওদের ছিল বা আছে। এই মেসেজগুলো প্রথমে এসেছে সেটা জানাজানি হয়েছে কিন্তু আর কিছু না। পরে যখন ফোন আসতে শুরু করে আর আমরা সেটা রিসিভ করতে শুরু করি তখনি আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে তারা কিছু বিশেষ জিনিস ঢুকিয়ে দেয়...।"

"কী সেটা?"

"কী বলতে পারব না, কিন্তু এমন কিছু যেটা আমাদের মস্তিষ্কের বিশেষরকম পরিবর্তন ঘটায়। আমাদের বুদ্ধিমত্তার উন্নতি ঘটে, আমরা আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের খারাপ গুণগুলোরও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। মানে এমন কিছু আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করে যাতে আমাদের বুদ্ধিমত্তার উন্নতির সাথে, চারিত্রিক অবিনতিও হয়, সমাজের পক্ষে আমরা ক্ষতিকর হয়ে উঠি।"

"কিন্তু এভাবে একটা ফোনের মাধ্যমে... মস্তিষ্কের..."

"ভুল ভাবছিস। এটা সাধারণ ফোন না। এর মাধ্যমে আমাদের মস্তিস্কে এমন সব তরঙ্গ হয়তো প্রবেশ করে যাতে ঠিক এই কাজটাই হয়। নিশ্চয় জানিস, মস্তিষ্কের নানা অংশে নানা কাজ হয়। অর্থাৎ কোনও অংশ বুদ্ধিমত্তা, কোনও অংশ আবেগ, কোনও অংশ নানা শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে - এই তরঙ্গ হয়তো মাথার ভেতর গিয়ে ঠিক সেই কাজটাই করত যা এটাকে করতে বলা হয়। এতে মানুষ হয়তো ক্ষমতাশালী হবে কিন্তু তাঁর সব মানবিক গুণ নষ্ট হতে থাকবে। আমার মনে হয় তোর কাকাও এটাই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, আর তাই তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রিক অবনতির পতন দেখতে পেয়ে ওই ডায়েরিতে জ্ঞানের ক্ষমতা ও ধংসের ক্ষমতার কথা লিখেছিলেন। এই দ্বন্দ্বই তাঁকে মানসিক ভারসাম্যহীন ও সামাজিকভাবে একঘরে করে তুলেছিল। শেষে তিনি কিছুতেই আর এই শক্তির

বিরুদ্ধে গিয়ে স্বাভাবিক হতে পারেননি, এমনকি ডাক্তাররাও তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পারেনি! তিনি তো কাউকে জানানইনি কী ঘটছে তাঁর সঙ্গে। শেষে তিনি আত্মহত্যা করেন। মনে হয় তিনি ভেবেছিলেন তিনি সমাজের প্রতি ক্ষতিকারক হয়ে উঠবেন, তাঁর শক্তির অপব্যবহার ধংসের কারণ হবে কিংবা এও হতে পারে যে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই তিনি এই কাজ করেন, হয়তো আমারও এই পরিণতি হত কোনওদিন।

"বাপরে, এটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার!"

"মনে হলেও আমার ধারণা এটাই সত্যি। তবে কয়েকটা জিনিস আমি এখনও বুঝতে পারিনি। যেমন তারা এই ফোনের মাধ্যমে এই কাজ করতে পারত কী করে? আমাদের মোবাইল ফোনের সিগন্যাল, ইনফরমেশন যা কিছু আদান প্রদান হয়, সেটা তো আমাদের স্যাটেলাইটের মাধ্যমে হয়, সেখানে ওরা কীভাবে এটাকে ব্যবহার করল। এছাড়াও তারা কি সবার মধ্যে একটা জাল বিছিয়ে রেখেছে? নাহলে তোর কাকার ঘরের সামনে এলে আমার মোবাইলে তোর কাকার নাম ফুটে উঠবে কেন! তারা কি এভাবে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল তাদের মধ্যে একটা সংযোগের জাল ছড়িয়ে সবাইকে একসাথে বেঁধে রেখেছে? যেমন অনেকগুলো কম্পিউটার ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে।"

"ঠিক বলেছিস।"

"আর আরও বড়ো প্রশ্ন এরা কেন করত এটা। কী জন্য...। সেটা আরও অনেক বড়ো ধাঁধা।"

"সেটা কীভাবে সলভ্ হবে?"

"আজকেই দাদাকে জানাতে হবে, জানাতে হবে খাসনবীশ স্যারকেও। এটা বিজ্ঞানীদের দ্বারাই বলা সম্ভব, এভাবে ঘরে বসে সমাধান হবে না।"

চৈতালী বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলল, "আজকে না। এখনই, তোর দাদাকে এখনই ফোন কর। আর দেরি নয়, একটুও দেরি নয়।"

।। শেষের কথা ।।

আজকে আমাদের বাড়িতে অনেকে নিমন্ত্রিত। আমি-মা-বাবা-দাদা ছাড়াও আমাদের ড্রয়িং রুমে ঘর ভর্তি করে বসে আছে চৈতালী, ওর মা-বাবা, ওর সেই সাংবাদিক মেজকাকা যিনি এতদিন দিল্লীতে ছিলেন, প্রোফেসর খাসনবীশ আর প্রোফেসর বাগচী। প্রায় সারা পৃথিবীতে ঝড় বয়ে গেছে কিছুদিন হল। ভিনগ্রহের প্রাণীর অস্তিস্ব এত ভালোভাবে জানা যায়নি আগে কোনওদিন। তারা যে আছে সে বিষয়ে আজ প্রায় সব বিজ্ঞানীই নিশ্চিত। আগেরবার যাও বা কিছুটা সন্দেহ করেছিলেন কেউ কেউ, আজ তারাও মেনে নিয়েছেন যে সেটা কোনও বানানো ব্যাপার ছিল না। ইতিমধ্যে আমার নাম আবার খবরের শিরোনামে এসেছে, আমি যে ওই মেসেজের আর ওদের কার্যকলাপের অনেকটা উদ্ধার করতে পেরেছি, সেটা ঠিক বলেই প্রমাণিত হয়েছে। আমিও আরও একবার নাসায় ঘুরে এসেছি। আমাকে সেখানে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছে। আমি ফোন আসার আগে ও পরে কী অনুভব করতাম। সেই সময় আমার ব্যবহার কেমন ছিল, আমি কী কী পারতাম, সেই সমস্ত কিছু জিজ্ঞেস করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। আমি সেখানে গিয়েছিলামও তাই জন্য। তাঁরা আমাকে খুব প্রশংসিত করেছেন এই বলে যে আমি যেভাবে সেই অবস্থা থেকে নিজে নিজেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পেরেছি স্রেফ নিজের মানসিক শক্তিতে, সেটা বিরাট একটা কৃতিত্ব। এছাড়া চৈতালীকেও সেখানে যেতে হয়েছিল কারণ আমার ব্যবহার ঠিক কেমন ছিল, সেটা ওর থেকে ভালো আর কেউ বলতে পারত না। তাই ওর নামও লোকে জেনে গেছে আর তাই ও ডবল খুশি।

কথা হচ্ছিল। চৈতালীর মেজকাকা ডঃ খাসনবীশকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, কীভাবে যে ওঁরা ফোন করত যদি একটু বলেন।"

সেই প্রশ্ন যেটা আমার মাথায় এসেছিল। অবশ্য সেটার একটা উত্তর আমাদের ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে নাসার তরফ থেকে। কিন্তু ইনি সেটা যে জানবেন না স্বাভাবিক।

ডঃ খাসনবীশ চেয়ারে একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, "এটা আমাদের কাছেও খুব পরিষ্কার না। তবে যে সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে সেটা বুঝতে সবাই পারবেন। আচ্ছা, আপনারা নিশ্চয় সবাই "হ্যাকিং" শব্দের সঙ্গে পরিচিত। তা হ্যাকিং আমরা এতদিন ছোটো ক্ষেত্রে যেমন, কম্পিউটার বা সিস্টেম ইত্যাদির জন্যই জানি। কিন্তু যদি গোটা স্যাটেলাইটই "হ্যাক" করা যায়?"

দাদা বলল, "এটা কি সত্যিই সম্ভব স্যার? এটার সঙ্গে কি ওভাবে..."

"দেখো, কী সম্ভব আর না তা কিন্তু নির্ভর করছে আমাদের প্রযুক্তির ক্ষমতার ওপরে। আমাদের ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব লাগতে পারে। কিন্তু হয়তো তাদের ক্ষেত্রে না। আর হ্যাকিংই হয়েছে সেটা বলছি না তো। এটা হয়তো অন্য কিছু যেটা আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞানে খুঁজে বের করতে পারছি না। আমাদের ধারণায় হ্যাকিং বলেই ধরছি। আবার, কেন তাতিয়ানার মোবাইলে তীর্থ মজুমদারের নাম ফুটে উঠল সেটাও একটা তত্ত্ব দেয়। হতে পারে, এই পৃথিবীর যাদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করছে বা করেছে তারা প্রত্যেকে একটা টাওয়ার, যে টাওয়ারগুলোর সঙ্গে প্রধান সিস্টেম মানে ওদের যোগাযোগ আছে আবার এগুলো নিজেদের মধ্যেও অদৃশ্য বন্ধনে যুক্ত। হতে পারে, এই পৃথিবীতেই তারা একটা সার্ভার তৈরি করেছে যার সিগন্যাল ধরার মতো ক্ষমতা কেবল এই বিশেষ টাওয়ার মানে সেই লোকগুলোর বা যে স্থানে তারা থাকে সেই স্থানেই সম্ভব হচ্ছে। লোকগুলো, তাদের মোবাইল, তাদের বাসস্থান সব এক-একটা টাওয়ার আর একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। আমরা চেষ্টা করছি দেখার যে বাকি যারা যারা মেসেজ পেয়েছিল তাদের মোবাইল বা জায়গাগুলোতে একে অপরকে নিয়ে গিয়ে, তারা একে অপরের সিগন্যাল ঠিক এভাবেই নিতে পারে কিনা। পারলে এই তত্ত্ব নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হবে। প্রমাণিত হবে আমাদের পৃথিবীতেই একটা ভিনগ্রহের অদৃশ্য জাল তৈরি করা হয়েছে।"

চৈতালীর মেজকাকা মাথা নেড়ে বললেন, "স্যার, আমার কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য কী ছিল বা আছে সেটাও ক্লিয়ার হয়নি।"

ডঃ খাসনবীশ হেসে বললেন, "হয়তো আমাদেরও না। কিন্তু একটা ছোট্ট তথ্য যেটা তীর্থ মজুমদার মানে আপনার ভাইয়ের ডায়েরি থেকে পাওয়া গেছে সেটা ফেলে দেবার মতো না।"

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, "কোনটা স্যার?"

"তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে ডায়েরিতে একজায়গায় লেখা ছিল তিনি ঘুমের মধ্যে নানা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন আর সেটা যেন আগুনের পৃথিবীতে কিছু অবয়ব...।"

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "হ্যাঁ মনে আছে তো।"

"সেটাই ক্লু। আমাদের ধারণা যেহেতু তীর্থবাবু ওদের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই তিনি কেবল মাথার ভেতর আওয়াজ শোনা না, নানা ঘটনা চোখ বুজলে, হয়তো ঘুমের অবচেতনে বুঝতেও পারতেন। সেটাই তিনি দেখেছিলেন। হয়তো একটা গ্রহ, যেখানে প্রাণধারণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তারা চাইছে এই গ্রহের দখল নিতে। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? যদি এই গ্রহের অনেক মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। হয়তো তারা আমাদের সকলের ওপর অধিকার কায়েম করতে পারে আমাদের মানসিকভাবে তাদের হাতের পুতুল বানিয়ে। এতে হয়তো তারা কোনওভাবে লাভবান হবে। তারা ওখানে থেকেও আমাদের থেকে কিছু রসদ ক্রমাগত সংগ্রহ করবে যা আমরা বুঝতে পারছি না। বা হয়তো তারা সরাসরি আমাদের শরীরের ভেতরেই বসবাস করবে যেমন পরজীবী উদ্ভিদ করে। তবে সবই অনুমান সাপেক্ষ।"

দাদা বলল, "স্যার, আরও একটা তত্ত্ব অনেকে দিচ্ছেন যে...।"

"হ্যাঁ, সেটাও আছে। তবে সেটা একটু অবিশ্বাস্য। তাঁরা বলছেন, এভাবে কিছু মানুষকে অতি ক্ষমতাশালী কিন্তু মানুষ হিসেবে নিকৃষ্ট করতে পারলে হয়তো আমাদের সমাজব্যবস্থায় একটা আঘাত আনা যাবে। এরা হয়তো একটা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মানবসভ্যতা ধ্বংস করে ফেলবেন একদিন আর সেদিন সেই ভিনগ্রহের প্রাণীরা দখল নেবে এই পৃথিবীর; বা তখন মানব সভ্যতা হয়তো অনেক দুর্বল, নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না ভিনগ্রহের শত্রুর হাত থেকে। মানে ওরা সরাসরি যুদ্ধের বদলে এভাবে পরোক্ষে যুদ্ধ করে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে হারাতে চায়।"

"এটা কি সম্ভব?" বাবা বলল।

"কেন না? একটা হিটলার বা লাদেন কি পৃথিবীর অন্তিম ঘনিয়ে আনার ভয় দেখাতে পারেনি? ভাবুন এইরকম এক"শ জন হিটলার যদি একসঙ্গে পৃথিবী শাসন করতে আসে তো কী পরিণতি হতে পারে আমাদের।"

প্রোফেসর বাগচী এতক্ষণ কিছুই বলেননি। তাঁকে সেই কথা দিয়ে এসেছিলাম যে তাঁকে সব জানাব তাই আজকে অবশ্যই তাঁকে আসতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "কী জানো নবারুণ, আমি বিজ্ঞান বেশি কিছু বুঝি না। কিন্তু আমার মনে হয় এই যে যুদ্ধ সেটা আমাদের মধ্যে প্রতিদিন চলছে। আমরা কি শক্তির নেশায় মানবসমাজকে অগ্রাহ্য করে আরও আরও উন্নতির চেষ্টা করব নাকি আমাদের চারপাশের মানুষ, পশু, পাখি সবাইকে নিয়ে একটা উন্নত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখব? একক ক্ষমতাশালী হতে চেয়ে স্বার্থপর হব নাকি সহযোগিতা করব একটা সুন্দর

সমাজ গড়ে তুলতে? আমি জানি না এই এলিয়েনের বিষয়ে খুব ভালোভাবে, কিন্তু তারা যদি সত্যি হয় তো ঠিক জায়গাতেই তারা আঘাত দিতে চেয়েছে। মানুষের ক্ষমতা- অক্ষমতা-স্বার্থ-ত্যাগের মতো বিষয়গুলো এত ভালো করে মানুষও বোঝেনি হয়তো।"

এরপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি খুব খুশি তুমি এই পরীক্ষায় জিততে পেরেছ বলে। আমার খালি তীর্থর জন্য কষ্ট হয়। সে যদি...", প্রোফেসর এতদিন পরে নানা ঘটনায় জেনেছেন যে তীর্থ আর বেঁচে নেই। এই কথায় আমাদের সকলেরই মন ভিজে এলো। আমি আড়চোখে চৈতালীর বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি মাথা নিচু করে নিয়েছেন।

রাতে শোবার আগে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বিন্দু বিন্দু আলো ফুটে উঠছে অন্ধকার ক্যানভাস জুড়ে। কোথায় তারা যারা আমাকে তাদের হাতের পুতুল বানিয়ে রাখতে চেয়েছিল, চেয়েছিল হয়তো আমারই মতো অনেককেই সেটা করতে। কোথায় লুকিয়ে দেখছে আমাদের তারা, কারাই বা তারা? এখনও কি তারা কারও না কারও সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে? নিশ্চয় বিজ্ঞানীরা এখন যাতে আর তা কারও সঙ্গে না হয় তার সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করছেন। মনে হয় আগেরবার যারা আমার মতো মেসেজ পেয়েছিল তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হবে, কে জানে কত কী হয়তো আরও অনেকদূর এগিয়েছে ভেতরে ভেতরে। যা হোক, শুনলাম কোনও একটা মুন ক্রেটারের নাম করা হতে পারে আমার নামে, আমার সম্মানে, যেহেতু আমি এই বিরাট এক আবিষ্কারে এত সহযোগিতা করলাম, তাও একবার না দু-দু"বার। আমি ঠিক করেছি আমি অনুরোধ করব আমার সঙ্গে যেন তীর্থ মজুমদারের নামটাও যোগ করা হয়। এতদিন পরে সেই মানুষটার কিছু স্মৃতি যেন থেকে যায়, তাঁর কথাও আমাদের কখনও ভুলে যাওয়া উচিত না, কখনও না।

অলঙ্করণঃ ইন্দ্রশেখর

জয়ঢাক গল্প প্রতিযোগিতা-২০১৬
পঞ্চম স্থানাধিকারী গল্প



অনেকক্ষণ ল্যাপটপে কাজ করার পরে চোখ দুটো করকর করছে তাতিয়ানার, কপাল টিপটিপ করছে আর ঘাড় টনটন করছে। চোখ বন্ধ করে মাথাটা একটু এলিয়ে দিতে পারলে আরাম হত, কিন্তু উপায় নেই। এতক্ষণ বিছানায় বসে ল্যাপটপে কাজ করছিল তাতিয়ানা, এবার আধশোয়া হয়ে একটু আরাম করে লেখাটাকে সাজাতে লাগল। লেখার কাজটা কালকের মধ্যে শেষ করে ডঃ গুপ্তকে দেখিয়ে নিতেই হবে। তারপর তিনি ঠিকঠাক করে দিলে পাঠিয়ে দিতে হবে এই সপ্তাহের মধ্যে। যদি বিষয়বস্তুটা কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় তবে নাসার এই সেমিনারটাতে ও একটা বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবে। বিশ্বের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর সেরা গবেষকদের সামনে বক্তব্য রাখার গুরুত্বই অন্যরকম। ভাবতেই উত্তেজনার চোটে যেন কিবোর্ডের ওপর হাতের চলার স্পিড বেড়ে দু'গুণ হয়ে গেল।

বালিশের কাছে পড়ে আছে বহু পুরানো একটা মোবাইল। একটা মেসেজ আসতেই বিপ শব্দ করে স্ক্রিনের আলোটা একবার জ্বলে উঠেই পুরো কালো হয়ে গেল। মরুকগে যাক; তাতিয়ানার এখন মেসেজ পড়ার সময় নেই। আর এই মোবাইলটাতে মেসেজ পড়তে গেলে অনেকটা সময় চলে যাবে। এরকম মোবাইল আজকাল আর কেউ ব্যবহার করে না, বাজারেই পাওয়া যায় না। এটা সেই মোবাইল, যেটা তাতিয়ানার বাবা তাকে কিনে দিয়েছিলেন ক্লাস টেন-এ ভালো রেজাল্ট করার জন্য; সেও তো হয়ে গেল প্রায় দশ বছর। পুরানো নোনা ধরা দেওয়ালের মতো মোবাইলটার রং চটে গিয়েছে, ছাল চামড়াও উঠে গেছে জায়গায় জায়গায়। ডিসপ্লে আর টাচ-স্ক্রিনটার অবস্থা কহতব্য নয়! টোকা মেরে, ঝাঁকুনি দিয়ে চালু করতে হয়। এটার প্রতি তাতিয়ানার একটা আলাদা রকম টান থাকায়, খুব সুন্দর একটা মোবাইল থাকা সত্ত্বেও এই সেটটা এখনও তাতিয়ানার সঙ্গী।

আজকের তাতিয়ানা হওয়ার পেছনে মোবাইলটার অনেক অবদান আছে বৈকি! এই মোবাইলটাতেই কয়েকটা অদ্ভুত ভাষায় মেসেজ এসেছিল বলে সারা পৃথিবীতে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল, বছর দশেক আগে; বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল তাতিয়ানা। ভারতবর্ষের তাবড় পন্ডিতদের সঙ্গে নাসার বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়েছিলেন ঐ মেসেজের মানে বের করার জন্য। সে সব ইতিহাস শ্রী রাজকুমার রায়চৌধুরী মশায় লিখে রেখে গেছেন 'জয়ঢাক'-এর পাতায়।

যাই হোক, এসব যখন ঘটে তখন তাতিয়ানা সবে স্কুলের শেষ ধাপে - ক্লাস টেন, এমন গুরুগম্ভীর বিষয়ের গভীরে গিয়ে বোঝার মতো বয়স নয়। ওই সময় সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা গবেষণার চেয়ে গল্পের খোঁজ বেশি রাখে। তাতিয়ানাও তাই করত; ই টি, এলিয়েনস, স্টার ওয়ার ইত্যাদি সিনেমা দেখে বা চ্যারিওট অফ গড, চাইল্ডহুড এন্ড, ফুট ফল, প্রফেসর শঙ্কু, বঙ্কু বাবু ইত্যাদি পড়ে যেটুকু ধারণা হতে পারে বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে সেটুকুই সম্বল ছিল তখন। তবু মোবাইলটা তাতিয়ানার হওয়ায়, সে বিখ্যাত হয়ে পড়ে কিছু না বুঝেই। যেমনতেমন বিখ্যাত নয়, নিয়মিত ভাবে কাগজে ছবি বের হত, টিভিতে আলোচনায় তাকে ডাকা হত।

একটু বিখ্যাত হয়ে গেলে অনেকের মগজ বিগড়ে যায়। কিন্তু তাতিয়ানার তা হয়নি। বিষয়টা নিয়ে হালকা চালে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সে রীতিমত উৎসাহী হয়ে বইপত্র, জার্নাল ইত্যাদি জোগাড় করে পড়াশুনো শুরু করে দেয়, ইন্টারনেট তো ছিলই। ওর দাদার প্রফেসর ডঃ খাসনবিশ আর নাসার বিজ্ঞানী ডঃ শ্রীনিবাসন ওকে এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেন। পুরোপুরি না বুঝলেও বড়ো বড়ো গবেষক আর বিজ্ঞানীদের আলোচনা সে মন দিয়ে শুনত, বইপত্র পড়ত, চেষ্টা করত বোঝার। এইরকম আগ্রহ আর পড়াশুনোর ফল হাতেনাতে পেয়েছে তাতিয়ানা। স্কলারশিপ নিয়ে দেশের সেরা কলেজে পড়াশুনো করে তাতিয়ানা এখন গবেষণা করছে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ গুপ্তর কাছে।

মহাবিশ্বে পৃথিবী ছাড়া কোথাও যদি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তাহলে তাদের আচার আচরণ স্বভাব চরিত্র কেমন হতে পারে, তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম কী হতে পারে, কী ভাবে বোঝা যেতে পারে তারা বন্ধু না শত্রু - একেবারে নতুন ধরনের বিষয় নিয়েই তাতিয়ানার গবেষণা। এ যেন রাম জন্মানোর আগেই রামায়ণ লেখা। তবে এলিয়েন, ইউফো ইত্যাদির গুজব বা রুদ্ধশ্বাস সিনেমাগুলোর আড়ালে বিজ্ঞানীরা সত্যিকারের গবেষণা চালিয়ে গেছেন মহাবিশ্বে মানুষের দোসর খুঁজে বার করার জন্য। যত দিন গেছে, লুকিয়ে থাকা দোসরের অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মনে ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে। সেই সঙ্গে অজানা প্রতিবেশীর সম্বন্ধে প্রাথমিক ধ্যানধারণা তৈরির চেষ্টাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই নতুন বিষয়ের মধ্যে কসমোলজি, সাইকোলজি, বিহেভিয়ারাল সায়েন্স, সব মিলেমিশে একাকার; আর চারটে পিলারের মত ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-অঙ্ক-বায়োলজি তো আছেই। হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন বিজ্ঞানীর মধ্যে ডঃ গুপ্ত সারা পৃথিবীতে এ বিষয়ে একজন পথিকৃৎ বলে স্বীকৃত। বছর দশেক আগে তৈরি হওয়া যোগাযোগের ভিত্তিতে বিভিন্ন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র থেকেও অনেক সাহায্য - বিশেষ করে বইপত্র, জার্নাল খুব সহজে পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে তাতিয়ানার গবেষণা তরতরিয়ে এগোচ্ছে।

সে যাই হোক, সেদিন বিকেলের দিকে ইউনিভার্সিটিতে ডঃ গুপ্তর ঘরে বসে নাসার সেমিনারের বিষয়বস্তু নিয়ে তাতিয়ানা আলোচনা করছিল। ডঃ গুপ্ত সেমিনারের বক্তব্যটাকে কীভাবে সাজানো যেতে পারে তা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাতিয়ানা সেই মতো একটা খসড়া বানিয়ে ফেলেছে। ডঃ গুপ্ত তাতে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করছিলেন। সঙ্গে মুখে মুখে সব তথ্য একপ্রস্থ ঝালিয়ে নেওয়া চলছিল সেমিনারের বক্তৃতার জন্য। তাতিয়ানা জানে, এই ধরণের সেমিনারে হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, কত রকম পরিস্থিতি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সামাল দিতে হয়।

কথায় কথায় ডঃ গুপ্ত বললেন, "বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজ বের করার জন্য এতদিন ধরে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা যা যা করেছেন তার একটা সারমর্ম তৈরি করে নিয়েছ নিশ্চয়ই।"

তাতিয়ানা সম্মতি জানিয়ে বলল, "মোটামুটি তৈরি আছে স্যার, বিভিন্ন সময় মহাবিশ্বের বিভিন্ন দিকে পাঠানো রেডিও মেসেজ-এর একটা ছোট্ট বিবরণ তৈরি আছে; তাতে 'কসমিক কল ১', 'কসমিক কল ২', 'টিন এজ মেসেজ' ইত্যাদির কথা ছোটো ছোটো করে বলে দিয়েছি।"

ডঃ গুপ্ত মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন, "আর সবচেয়ে বিখ্যাত মেসেজটা?"

"আরাকিবো মেসেজ? বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজে সৌরজগতের বাইরে মানুষের পাঠানো প্রথম মেসেজ। ওটা আলাদা করে একটু বিশদে বলব।"

"বিশদে মানে? খুব বড়ো যেন না হয়ে যায়?"

তাতিয়ানা বলল, "খুব বড়ো নয়, মেইন পয়েন্টগুলোই বলব। ফ্র্যাংক ড্রেক, কার্ল সাগানের মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে উনিশ'শো চুয়াত্তরে পাঠানো হয়েছিল মেসিয়ার-১৩ নক্ষত্রপুঞ্জ লক্ষ করে। সহজ কোড-এ অনেক তথ্য দেওয়া হয়েছিল - শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা, মূলতঃ হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস দিয়ে তৈরি আমাদের ডি.এন.এ-র ডবল হেলিক্স গঠন, মহাবিশ্বে সৌরজগতের অবস্থান আর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মানুষ

আড়েবহরে কতটা, কেমন দেখতে তাও ছিল। এখনও কোনও জবাবি সাড়া পাওয়া যায়নি, তাও উল্লেখ করে দেব। এত তাড়াতাড়ি উত্তর আসার কথাও নয়!"

বলেই হঠাৎ চুপ করে গেল তাতিয়ানা। অনেকটা দূর, অনেক সময় লাগবে এসব জানা ছিল, কিন্তু আজ আলোচনা করতে গিয়ে অঙ্কটা নতুন ভাবে উপলব্ধি করল সে। পৃথিবী থেকে মেসিয়ার-১৩ পঁচিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে আছে। তার মানে, আলোর বেগে ছুটে রেডিও মেসেজটা ওখানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে কেউ ওটার উত্তর দিলে, উত্তরটা পৃথিবীতে পৌঁছবে পঞ্চাশ হাজার বছর পরে, মোটামুটি ৫১৯৭৪ সালে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ডঃ গুপ্ত হেসে বললেন, "এই পঁচিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার সংখ্যাগুলো মহাবিশ্বের বিশালতার তুলনায় চুনোপুঁটি নয় কি?"

এবার তাতিয়ানা সন্দেহাকুল হয়ে বলল, ''স্যার, পঞ্চাশ হাজার বছর পরে কী উত্তর আসতে পারে তা নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ আছে কী?''

''ঠিক এই প্রশ্নটাই উঠতে পারে সেমিনারে, উত্তরটাও ভেবে রাখা দরকার।''

ইতিমধ্যে চা এসে গেছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে ডঃ গুপ্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "তাতিয়ানা, একজন গবেষক ঠিক এভাবে ভাবে না। আপেল পড়ার কারণ নিয়ে নিউটন মাথা না ঘামালেও পৃথিবীতে দিনরাত্রি হত। কিন্তু উনি গবেষণা শুরু করেছিলেন বলেই প্রায় তিনশো বছর পরে আমরা আবহাওয়ার হালচাল বোঝার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ ভাসিয়ে রাখতে পেরেছি। আর বৃষ্টির খবর নিয়ে একজন কৃষক চাষের পরিকল্পনা করে, ঝড়ের খোঁজ নিয়ে একজন জেলে সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোয়।"

চায়ে আরেকবার চুমুক দিয়ে ডঃ গুপ্ত ব্যাপারটা হালকা করার জন্য বললেন, ''নিউটন কি গ্র্যাভিটি নিয়ে গবেষণার সময় ভেবেছিলেন একটা একশো মিলিয়ন ডলারের সিনেমা তৈরি হবে সেটা নিয়ে!''

একটু থেমে আবার বললেন, ''তোমার কি সত্যি মনে হয় আমাদের গবেষণা অর্থহীন?''

নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছে তাতিয়ানা। এটাও বুঝে গেছে, একটা বেফাঁস মন্তব্যের জালে সে আটকে পড়েছে। ডঃ গুপ্ত এখন তার মুখ দিয়েই তার ভুল শোধরাবেন। ভাবনাগুলোকে একটু গুছিয়ে নিয়ে তাতিয়ানা বলল, ''যে কোনও প্রাণীর স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ তার পরিবেশ আর ডি.এন.এ-র ওপর নির্ভর করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ পাল্টাতেই পারে আর তার সঙ্গে জিন বা ডি.এন.এ-র চরিত্রও পাল্টাতে পারে। ব্যাপারটা হয়তো অল্প সময়ে বোঝা না গেলেও লম্বা সময়ে ভালোভাবে বোঝা যায়।''

''লম্বা সময় মানে কতটা সময় তাতিয়ানা?''

''তা ধরুন বেশ কয়েকশো বছর বা কয়েক হাজার বছর।''

''তোমার বলা দুটো সংখ্যার মধ্যে দশ সংখ্যাটা ঢুকে আছে, একশোও ঢুকে থাকতে পারে। কয়েকশো না কয়েক হাজার?''

''হাজার স্যার।''

''উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারো?''

''প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে শান্তির খোঁজে সম্রাট অশোক মানবকল্যাণ ব্রত নিয়ে সারাজীবন ব্যয় করেছিলেন। এখন শান্তির পথে চলতে চেয়ে লিঙ্কন আর গান্ধী গুলিবিদ্ধ হলেন। শান্তির পথ ছেড়ে উগ্রপন্থায় আসাটা কিন্তু একদিনে হয়নি, প্রায় আড়াই হাজার বছর লেগেছে অশোক থেকে ওসামায় আসতে। এই ধরনের স্বভাবগত পরিবর্তন আরও বেশি করে হবে সময়টা যত লম্বা হবে।''

''উদাহরণটা পুরোপুরি মানতে পারলাম না, অশোক থেকে ওসামায় আসতে আড়াই হাজার বছর লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোক হতে হয়তো এক মুহূর্ত বা একদিন, বড়োজোর এক বছর লেগেছিল। সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঠিকই, কিন্তু আরেকটা জরুরি বিষয় তোমার নজরে আসছে না।''

''স্যার, একটু আন্দাজ পেলে ভেবে বলতে পারি।''

''তুমি যে উদাহরণ দিলে তাতে একটা ফাঁক থেকে গেছে; আড়াই হাজার বছর আগে অশোকও মানুষ ছিলেন, এ যুগে মানুষই আছি। তাই পরিবর্তনগুলো বিচার করা অনেকটাই সহজ। যদি ধরে নিই মহাজাগতিক ধুলোর মধ্যে ভেসে বেড়ানো অণুজীব থেকে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হয়েছে, তাহলে অন্য কোনও গ্রহেও তাই হয়েছে হয়তো।''

তাতিয়ানা এই প্যানস্পার্মিয়া (Panspermia) ব্যাপারটা নিয়ে একটু পড়াশুনো করেছে; নারলিকার, বিক্রমাসিংহে, ফ্রেড হয়েল-এর মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের এই ব্যাপারে গবেষণার কথাও জানে। কিন্তু ডঃ গুপ্তর বক্তব্য সে বুঝতে পারেনি।

তাতিয়ানাকে চুপ থাকতে দেখে ডঃ গুপ্ত বললেন, ''অন্য পরিবেশে যে প্রাণীরা তৈরি হবে তারা মানুষের মতোই হবেই এমন কোনও কথা নেই। এখানে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন আর কার্বনের বাহুল্য একরকমভাবে কোষের গঠনকে প্রভাবিত করেছে। এমন যদি একটা গ্রহ থাকে যেখানে কার্বনের চেয়ে সিলিকনের প্রভাব বেশি বা নাইট্রোজেনের চেয়ে ক্লোরিনের তাহলে কি জোর দিয়ে বলা যায় সেখানেও ডি.এন.এ-র গঠন ডবল হেলিক্স হবে! তখন কি ওই প্রাণীর আচরণ মানুষের মতো হবে? তাই অন্য গ্রহ উপগ্রহের গঠন আর পরিবেশ আন্দাজ করে তোমায় ভাবতে হবে এখন এই সময়ে তাদের আচরণ কেমন হতে পারে, তারপরে পঞ্চাশ হাজার বছরে পরিবর্তনের হিসেব কষতে হবে। সেটাই যুক্তিযুক্ত নয় কি?''

তাতিয়ানা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, এই দিকটা তো কখনোই ভেবে দেখেনি। যত দিন যাচ্ছে, যত বিষয়টার গভীরে ঢুকছে সে, তত অবাক হয়ে যাচ্ছে এর ব্যাপ্তি দেখে।

ডঃ গুপ্ত তাঁর পরের প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন এবার, ''এটা ভাবার কি কোনও কারণ আছে যে শুধু আমাদের পাঠানো মেসেজের উত্তরের জন্য আমরা অপেক্ষা করব? বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে হঠাৎ করে ধরা পড়া কিছু রেডিও সিগন্যালের গুরুত্ব নেই?''

তাতিয়ানা সম্মতি জানিয়ে তার মতামত বিশদে ব্যাখ্যা করল। এই সিগন্যালগুলো ঠিক কোথাও ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা সিগন্যাল বা নিরন্তর চলতে থাকা মহাজাগতিক ঘটনা থেকে তৈরি গোলমাল বা নয়েজ নয়। পুরোপুরি মানে বোঝা না গেলেও তাদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য থেকে মনে হয় সুচিন্তিত ভাবে তাদের তৈরি করা হয়েছে।

ডঃ গুপ্ত বললেন, ''বিভিন্ন কারণে বিজ্ঞানীরা মনে করেন অন্য কোথাও বেড়ে ওঠা বুদ্ধিমান প্রাণীরাও পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আগ্রহী। তারাও একইরকমভাবে সিগন্যাল পাঠিয়ে নিজের দোসর খুঁজে যাচ্ছে। আসলে মহাবিশ্বে প্রাণের হদিস বার করার চেষ্টাটা খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার চেয়েও কঠিন।''

''অন্য জগৎ থেকে আসা বুদ্ধিমান প্রাণীদের আপ্যায়নের জন্য শেষে খড়! আর লড়াই করার জন্য সূঁচ!'' বলতে বলতে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডঃ মিত্র। ইনিও বিখ্যাত বিজ্ঞানী, মূলতঃ পদার্থবিদ্যা এঁর বিষয়। মাঝে মাঝে দুই বন্ধুতে একটু গল্প করেন; তবে সে গল্প তাতিয়ানার মত গবেষকদের কাছে গবেষণাপত্র পড়ার সমান।

দুই প্রবীণ অধ্যাপক হো হো করে হেসে উঠলেন। ডঃ গুপ্ত হাসতে হাসতে বললেন, ''এই মুহূর্তে অন্য জগতের জীব নয়, অন্য বিষয়ের পন্ডিত আমাদের সামনে হাজির। তাই খড় নয়, চা বা কফি আনাতে পারি। আর আপনার সঙ্গে লড়াই করার মতো প্রশ্ন আজ তাতিয়ানার হাতে আছে।''

''ওয়াও, মনটা অনেকক্ষণ চাতকের মতো চা চা করছিল। ওয়াও সিগন্যাল কী জানো?'' ডঃ মিত্র প্রশ্নটা করলেন তাতিয়ানার দিকে ঘুরে। তারপর ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, ''অফেন্স ইস দ্য বেস্ট ডিফেন্স।''

আবার একপ্রস্থ হাসি থামলে তাতিয়ানা বলল, ''যে সিগন্যালগুলোকে বুদ্ধিমান প্রাণীদের পাঠানো বলে মনে করা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত উনিশ'শো সাতাত্তরে পাওয়া 'ওয়াও সিগন্যাল'। ওহিও ইউনিভার্সিটির 'লম্বকর্ণ' (Big Ear) রেডিও টেলিস্কোপ প্রায় বাহাত্তর সেকেন্ড ধরে সিগন্যালটা পেয়েছিল; সেটার সুবিন্যস্ত গঠন বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়েছিল।''

ডঃ মিত্র প্রশ্ন করলেন, "নামটা কোথা থেকে এল জানো তো?"

তাতিয়ানা উত্তর দিল, "বিজ্ঞানী জেরি এহমান সিগন্যালটার মানে বোঝার চেষ্টা করছিলেন, হঠাৎ করেই বেশ কিছু প্যাটার্ন ওনার নজরে আসে। লাল কালিতে গোল দাগ দিয়ে তিনি আনন্দের চোটে পাশে লিখে দেন 'ওয়াও' (WOW)। তারপর কথাটা চালু হয়ে যায়।''

''বাঃ! এ মেয়ে তো জানে দেখছি; চালিয়ে যাও,'' ডঃ মিত্র হৈ হৈ করে উঠলেন। তাতিয়ানা প্রশংসা শুনে খুশি হল। ডঃ গুপ্ত চুপচাপ ধরণের লোক, কিন্তু মুখে হালকা হাসি ফুটে ওঠায় বোঝা গেল ছাত্রীর প্রশংসা শুনে তিনিও খুশি।

আবার একপ্রস্থ চা এল। চা খেতে খেতে ডঃ মিত্র তাতিয়ানার কাজের বিষয়ে খবরাখবর নিলেন। তারপর বললেন, ''চা খেয়ে গায়ের জোর বেড়ে গেছে, এবার বার কর তোমার হাতের অস্ত্র।''

ডঃ গুপ্ত মৃদু হেসে বললেন, ''তাতিয়ানা সময় নিয়ে খুব চিন্তিত। রেডিও মেসেজের গতি কম হওয়ায় যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ওর পছন্দ হচ্ছে না। দেখুন আপনি সাহায্য করতে পারেন কিনা!''

''কেন? রেডিও সিগন্যালের তরঙ্গ ধর্ম ওর পছন্দ নয়? বেশ দুলকি চালে চলা, গজেন্দ্রগমন,'' ডঃ মিত্র বললেন।

তাতিয়ানা বিব্রতভাবে বলল, ''তা নয় স্যার, আলোর বেগে চলে রেডিও মেসেজের মহাবিশ্বের এ কোণ থেকে ও কোণে পৌঁছতে হাজার-লক্ষ-কোটি কত বছর লাগবে জানা নেই; তাই আরও বেশি গতিবেগ সম্পন্ন যোগাযোগের মাধ্যম কিছু আছে কিনা জানতে চাইছিলাম।''

''ও, হাতিতে চলবে না, ঘোড়া চাই,'' মন্তব্য করলেন ডঃ মিত্র।

ডঃ গুপ্ত জুড়ে দিলেন, ''চিতা হলে ভালো হয়।''

ডঃ মিত্র বললেন, ''না ভাই, এখনও ঘোড়া বা চিতাকে জঙ্গল থেকে ধরা যায়নি, পোষ মানানো তো দুরের কথা!''

বিশদে বুঝিয়ে দিলেন ডঃ মিত্র। অঙ্ক বলছে, আলোর চেয়েও জোরে দৌড়তে পারে এমন কিছু থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। একদল বিজ্ঞানী ট্যাকিওন বলে একটা কণার কথা প্রথম বলেন বিশ শতকের ষাটের দশকে; তার মধ্যে দু'জন ভারতীয় বিজ্ঞানীও ছিলেন। যদিও সেই সময়ে এই 'ট্যাকিওন' নামটা তাঁরা ব্যবহার করেননি। একটা সময় এটা নিয়ে খুব গবেষণা হয়েছিল, কিন্তু অনেক পরীক্ষানিরীক্ষা করেও ট্যাকিওনের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়নি। পরে 'নিউট্রিনো' নিয়েও বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তার অস্তিত্বও প্রশ্নাতীত নয়। আবার শুধু অস্তিত্ব প্রমাণ করলেই হবে না, দরকার মতো তাকে জোগাড় করে নিয়ন্ত্রিত ভাবে নির্দিষ্ট দিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই তা যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারবে।

মন দিয়ে ডঃ মিত্রর কথা শুনছিল তাতিয়ানা। বারবার তার মনে হচ্ছিল মহাজাগতিক দূরত্ব আর রেডিও তরঙ্গের সীমাবদ্ধতার জন্য প্রতিবেশীকে খুঁজে পেলেও পরিচয় আদানপ্রদান সহজ হবে না। ভাব বিনিময় না হলে বন্ধু না শত্রুবোঝা যাবে কি করে!

আরও কিছুক্ষণ এটা ওটা আলোচনা করে তাতিয়ানা বাড়ি ফেরার জন্য উঠে পড়ল। ডঃ মিত্র নাসার সেমিনারের জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখলেন। ডঃ গুপ্ত বিষয়বস্তুটা আরেকটু সাজিয়ে নিয়ে পরের দিন আবার আসতে বললেন। তাঁর এই ছাত্রীটিকে তিনি একটু বেশিই পছন্দ করেন। অকারণে নয়, তাতিয়ানার চেষ্টা, ইচ্ছে, জেদ, অধ্যবসায় ইত্যাদি সত্যিই অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি, সবচেয়ে ভালো হল পড়াশুনোর অভ্যেস।

বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে নিজের ঘরে ঢুকে ল্যাপটপ নিয়ে বসল তাতিয়ানা। আজকে যে করেই হোক কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে। বিছানায় বসে বা আধশোয়া হয়ে ল্যাপটপে কাজ করা তার অভ্যেস। ল্যাপটপ খুলে ইন্টারনেট কানেক্ট করে কোনও জরুরি মেইল আছে কিনা দেখে নিল। তারপর যতটা লেখা হয়েছে সেটা একবার পুরো পড়ে ছোটোখাটো দু'একটা ভুল, যা নজরে এল, সেগুলো ঠিকঠাক করে নিল। লেখাটা বেশ ভালোই এগোচ্ছে সেটা নিজেই বুঝতে পারল। যেভাবেই হোক লেখাটা আজ রাত্রেই শেষ করে, কাল ডঃ গুপ্তকে দেখিয়ে নিতে হবে। ভাবনাগুলো একটু গুছিয়ে নিয়ে লেখার নতুন অংশটায় এবার হাত লাগাল তাতিয়ানা আর তরতর করে এগোতে লাগল তাতিয়ানার গবেষণাপত্র।

অনেকক্ষণ টানা টাইপ করার পরে তাতিয়ানা বুঝল চোখদুটোকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার, ঘাড়টাও টনটন করছে। পুরানো মোবাইলটায় বিপ শব্দ করে একটা মেসেজ ঢুকল বোধহয়। ল্যাপটপে 'সেভ' আইকনটা ক্লিক করে মোবাইলটা হাতে তুলে নিল সে। কিন্তু একবারের চেষ্টায় স্ক্রিনটা অন না হওয়ায় আবার রেখে দিল; থাকগে, পরে দেখা যাবে। ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখল "সেভিং ফাইল" দেখিয়ে চাকাটা ঘুরে যাচ্ছে। দু'মিনিট একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য চিৎ হয়ে শুয়ে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে লেখার পরের অংশটা ভাবতে লাগল তাতিয়ানা।

একটু পরে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আবার লেখায় হাত লাগাতে গিয়ে দেখল তখনও ল্যাপটপের স্ক্রিনে চাকাটা ঘুরে যাচ্ছে। মাউসটা নাড়াতেই হঠাৎ করে স্ক্রিনে চলে এল 'নট রেসপন্ডিং'। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। জোর করে ফাইলটা বন্ধ করতে গেলে যদি নতুন অংশটা সেভ না হয়! তেমন হলে ফাইলটা পরে খোলাই যাবে না ঠিকঠাক ভাবে। চাকাটা ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে।

মিনিটখানেক পরে দেখল ল্যাপটপের স্ক্রিনের ওপর একটা মেসেজ এসেছে - "কানেক্টিং টু রিমোট হোস্ট।" খুব অবাক হল তাতিয়ানা; একটু ভয়ও পেল - নতুন ধরনের ভাইরাস-টাইরাস নাকি! চেষ্টা করতে গিয়ে দেখল কিবোর্ডটাও আর কাজ করছে না। এখন চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া আর একটাই কাজ করা যায় - পাওয়ার অফ করে দেওয়া; তবে পরে 'ফাইল রিকভারি' না হওয়ার ভয়টা চেপে ধরল তাকে। বিনবিনে ঘাম ফুটে উঠল কপালে, ফ্যানের হাওয়াটা যেন গায়েই লাগছে না।



একটু পরে স্ক্রিনে ধীরে ধীরে একটা একটা করে চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল, মাঝে মাঝে ইংরেজি অক্ষর। এমন ভাইরাসের কথা কখনও শোনেনি তাতিয়ানা, ব্যাপারটা বোঝার জন্য নিরুপায় হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কিন্তু লক্ষ করে দেখল একটা প্যাটার্ন আছে চিহ্নগুলোর মধ্যে। আরও কিছুক্ষণ পরে ভুতুড়ে অক্ষরগুলো আর দেখা গেল না। তার বদলে ছাড়া ছাড়া ভাবে ইংরেজি শব্দ ফুটে উঠতে লাগল স্ক্রিনে; অর্থহীন নয়, যেন কেউ কিছু একটা বোঝাতে চাইছে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল তাতিয়ানা, সঙ্গে তীক্ষ্ণ নজর রাখল স্ক্রিনে।

ব্যাপারটা কিছু সময় পরে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। যার খোঁজে বিজ্ঞানীরা মাথা খুঁড়ে মরছেন বছরের পর বছর, তা আজ তাতিয়ানার নাগালের মধ্যে। এই লেখাগুলোর উৎস অন্তত পৃথিবীতে নয় – সে সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত হল সে। সুযোগটা কাজে লাগাতে তৎপর হল সে, সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে উধাও হয়ে গেল। কিবোর্ডটাও ততক্ষণে কাজ করা শুরু করেছে, তাই তাতিয়ানার পক্ষে তথ্য বিনিময় করা সহজ হয়ে গেল খুব; টাইপ করে প্রশ্ন করতে লাগল বা প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল। বহু সময় ধরে যা লেখালেখি চলল তা ছোটো করে বাংলায় লিখলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায়।

“তুমি পৃথিবীর মানুষ, আমাদের এই বার্তা বুঝতে পারছ? আমরা তোমাদের বন্ধু, তোমাদের পাঠানো মেসেজ পেয়েছি।”

“তোমরা কোথা থেকে বলছ?”

“মেসিয়ার-১৩ নক্ষত্রপুঞ্জের এক গ্রহ থেকে।”

“কী করে বুঝব তোমরা পৃথিবীর ক্ষতি করবে না?”

“বিশ্বাস করা ছাড়া তোমার কোনও উপায় নেই।”

“আমদের মেসেজ মানে কি আরাকিবো মেসেজ?”

“ঠিক তাই।”

“কিন্তু সেই মেসেজ তো ওখানে পৌঁছতেই কয়েক হাজার বছর লাগার কথা!”

“ঠিকই, কিন্তু সে হিসেব তোমাদের জন্য। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা অন্যরকম।”

“কী তোমাদের যোগাযোগের মাধ্যম?”

“ভরহীন একরকম কণা। তোমরা তার অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা জানলেও তাকে ধরতে পারোনি।”

“তোমরা কী করে ধরলে?”

“সে প্রযুক্তি আমাদের জানা আছে। আমরা বহু আগেই তাকে ধরে কাজে লাগিয়েছি।”

“আমাদের পৃথিবীকে খুঁজে পেলে কী করে?”

"অনেক দিন আগেই আমরা তোমাদের খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু তোমাদের ইলেকট্রন নির্ভর প্রযুক্তির সঙ্গে মিলে যেতে পারে এমন কিছু বানাতে আমাদের একটু সময় লেগেছে।"

"এমন কিছু বানালে কী করে?"

"তোমাদের একটা মহাকাশযান অনেকদিন হল খারাপ হয়ে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাকে আমরা কাজে লাগিয়েছি। বহুদিন তার যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করে আমরা তোমাদের প্রযুক্তি শিখেছি।"

"জানি, পায়োনিয়ার-১০, বহুদিন হল তার থেকে কোনও সংকেত আসেনি। তোমরা তাকে দখল করেছ কেন?"

"বন্ধু, ওটা খারাপ হয়ে মহাকাশে ভেসে বেড়াচ্ছিল, আমরা তাকে নিজেদের মত করে কাজে লাগিয়েছি। নতুন করে যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তাকে আমরা আমাদের আর পৃথিবীর মাঝে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে চালু রেখেছি। এভাবেই আমরা পৃথিবীর সম্বন্ধে জেনেছি।"

"কিন্তু পায়োনিয়ার-এ পৌঁছতে তোমাদের তো অনেক দিন লাগার কথা!"

"এখানেও তোমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আমরা। আমরা টাইম ট্রাভেল করতে পারি। 'ওয়ার্ম হোল' ব্যবহার করার বিজ্ঞানও আমাদের জানা। তোমরা যাকে 'রোজেন ব্রিজ' বল, আমরা তার ব্যবহারও জানি।"

"কীভাবে তোমাদের দেখা পাব?"

"তোমরা আমাদের দেখতে পাবে না, কারণ আলো ছাড়া তোমরা অন্ধ। আর আলো আমাদের শরীরে ধাক্কা খায় না।"

"তার মানে?"

"তোমাদের শরীর তৈরি হয় 'ডবল হেলিক্স' ডি.এন.এ দিয়ে, আমাদের গঠন অন্যরকম। যাকে তোমরা মেটামেটেরিয়াল বল, আমাদের শরীর তৈরি সেরকম কিছু দিয়ে। তাই তোমাদের চোখে আমরা অদৃশ্য।"

"তোমরা আমাদের দেওয়া নামগুলো জানলে কীভাবে?"

"তোমাদের যত রেডিও তরঙ্গ চারদিকে ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য তথ্য নিয়ে, সব আমরা ধরতে পারি বুঝতে পারি। তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা জ্ঞান আমরা ছেঁকে নিয়েছি।"

"অনেকদিন আগে আমরা কিছু মেসেজ পেয়েছিলাম, পৃথিবীর অতি প্রাচীন ভাষায়। তা কি তোমাদের পাঠানো ছিল?"

"ঠিক তাই। তবে পৃথিবীতে এত রকমের ভাষা - শুরুতে আমাদের খুব অসুবিধা হত। তাছাড়া পায়োনিয়ারকে তখনও আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারিনি।"

"কিন্তু বাছাই করা কয়েকজনকে কেন?"

"তোমরা যারা অনেক বড়ো হয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছ, যারা তার আগেই বই পড়াটাকে খুব অভ্যেস করে ফেলেছিলে, তাদের সঙ্গেই আমরা যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম?"

"কিন্তু কেন? তোমরা কী চাও পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে?"

"জ্ঞান। আমরা আলোতে অভ্যস্ত নয় বলে, যাকে তোমরা 'বইপড়া' বল আমরা তা পারি না। আমরা হিসেব করে দেখেছি পৃথিবীর মানুষ যত জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেছে, তার অতি সামান্য অংশ রেডিও তরঙ্গে পাওয়া যায়। তাই আমরা বইতে থাকা জ্ঞানের ভাগ নিতে চাই।"

"এত উন্নত তোমাদের বিজ্ঞান, তবু পৃথিবীর জ্ঞান নিয়ে কী করবে তোমরা?"

"বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্ঞান চাই না। আমরা চাই দর্শন, কাব্য, শিল্পের জ্ঞান - বিশেষ জ্ঞান। আমাদের ওখানে এসব চর্চা লক্ষ বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু প্রযুক্তির চর্চা করতে করতে আমাদের শেষ কয়েক প্রজন্ম দিশেহারা।"

"বিজ্ঞানের চর্চায় দিশেহারা কেন?"

"আমাদের কেউ অংক কষতে কষতে বইয়ের মার্জিনে দারুন সমাধান খুঁজে পাওয়ার কিন্তু জায়গার অভাবে অংকটা কষে রাখতে না পারার কথা লিখে রাখে না। আমাদের কেউ হঠাৎ নতুন কিছু দেখতে পেলে আনন্দে কাগজের ওপর 'WOW' লিখে রাখে না।"

"আমরা তো মনে করি বিজ্ঞানের চর্চাই একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ!"

"জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আনন্দ দেয়, কিন্তু শুধু প্রযুক্তির চর্চা একসময় একঘেয়ে হয়ে যায়। বিজ্ঞানচর্চা থেকে আনন্দটাই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এ ব্যাপারে তোমরাও একটু সাবধান থেকো।"

"নিশ্চয়ই বন্ধু।"

"কিন্তু জ্ঞান ভাগ করে নিতে তোমার আপত্তি নেই তো, বন্ধু?"

“কখনও থাকতে পারে না। প্রাচীন কাল থেকেই আমরা জানি জ্ঞান বা বিদ্যা কেড়ে নেওয়া যায় না, চুরি করা যায় না, দান করলে কমে যায় না।”

“পরে আবার যোগাযোগ করব। ভুলে যেও না। এখন বিদায়।”

তাতিয়ানা আর কিছু বলার আগেই স্ক্রিনে ফুটে উঠেছিল ‘রিমোট হোস্ট ডিসকানেক্টেড’। নতুন বন্ধুকে ঠিকভাবে বিদায় জানাতেও পারল না সে। কীভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে তাও জানা হল না।

****

মায়ের ঠেলাঠেলিতে উঠে বসল তাতিয়ানা। নিজের খাটেই যে সে বসে আছে, সেটা বুঝে উঠতে একটু সময় লাগল তার। চোখ কচলে দেখল সামনে মা সামনে দাঁড়িয়ে, বলছেন, “কী ঘুম রে বাবা, তখন থেকে ডাকছি! চোখ মুখ ধুয়ে খাবি আয় তাড়াতাড়ি।” হুঁশ ফিরতে নিজেই মনে মনে হাসল। ল্যাপটপটার স্ক্রিন কালো হয়ে আছে, পাওয়ারের বাটনটা দপদপ করছে। পুরানো মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখল। কপাল ভালো, একবারের চেষ্টাতেই কাজ করতে শুরু করল ওটা। মেসেজবক্স খুলে দেখল তিন চারটে মেসেজ এসেছে। মেসেজগুলো খুলে দেখতে শুরু করল, বিভিন্ন অদ্ভুত দেখতে চিহ্ন আর অক্ষরে ভর্তি। বুঝতে না পেরে বাধ্য হয়ে বন্ধ করার সময় বিপ শব্দ করে আবার একটা মেসেজ ঢুকল। এটা পরিস্কার ইংরেজিতে লেখা - “ফ্রেন্ড, ইট ওয়াজ নট ড্রিম। টাচ অন দিস মেসেজ টু কন্টাক্ট আস ইন ফিউচার। গুডবাই।”



পুজোর ছুটি ফুরিয়ে এল। বাতাসে শীত শীত ভাব। সকালের রোদ্দুরে হলুদ রঙের ছোঁয়া। মুন্নি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাড়িভর্তি লোকজন, ওর দিকে নজর নেই তেমন বড়োদের। পুতুলদের শরীর ভালো নেই। ওদের সক্কলের সর্দি হয়েছে বলে মুন্নি বেজায় ব্যস্ত। একা মানুষ, কী যে করে! ছেলে-মেয়েদের সকাল থেকে সারা গায়ে কাপড় জড়িয়ে রোদ্দুরে শুইয়ে রেখে এল ছাতের ঘরের দিকে।

"একা একা চল্‌লি কোথায় মুন্নি?" মা ডাকল রান্নাঘর থেকে।

"ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে।"

"কী হল আবার।"

"ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে আর পারি না! কথা শোনে না একদম। গায়ে জামা থাকে না, জুতো মোজা নেই পায়ে। দিন রাত্তির টো টো করে বেড়ায়।"

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ গো। খুব সর্দি হয়েছে সব কটার!"

"তোমার মাথায় টুপি কোথায় গেল?"

সাড়া না দিয়ে দুপ্‌দুপিয়ে পালাল মুন্নি, যেন শুনতেই পায়নি। ধরে ফেলতে পারলে মা এক্ষুনি ওকে তেল মাখাতে বসাবে।

"খালি পায়ে যাস না মুন্নি।"

পেছন থেকে মার চেঁচামেচি কানে এলেও এক দৌড়ে মুন্নি সোজা ছাতের ঘরে।

"ডাক্তারবাবু কী করছিস রে?"

ছোটমামা রং তুলি নিয়ে কাজে ব্যস্ত। মুন্নি এসে বসল সটান কোলের ওপর।

"আমার ছেলেমেয়েদের খুব সর্দি হয়েছে, ওষুধ দেনা রে ডাক্তারবাবু।"

"আপনার ছেলেমেয়েরা টুপি মাথায় দেয় কি?"

"না।"

"জুতো মোজা বা চটি পায়ে দেয়?"

"উহু।"

"গলায় স্কার্ফ জড়ায়?"

"নাঃ। জামা কাপড় স্কার্ফ সব খুলে ফেলে।"

"হুঁ! তবে তো খুব অসুবিধে আপনার!"

"খুব! কথাই শোনে না আমার।"

"আচ্ছা ওরা কি দুধ খাবার সময় কাঁদে?"

"হ্যাঁ তো! খুব কাঁদে। খেতেই চায় না।"

"তাই!"

"বকে বকে খাওয়াতে হয়। কী করে যে বড়ো হবে!"

"তবে তো ওষুধে হবে না। ইঞ্জেকশন দিতে হবে। তারপর তোকমারি দিতে হবে মাথান্যাড়া করে।"

"তোকমারি কী গো?"

"সে খুব খারাপ, যাকে দেওয়া হয় সে টের পায়। ইঞ্জেকশনের চেয়েও খারাপ।" ছোটোমামা খুব গম্ভীর। ডাক্তারবাবুদের যেমন হতে হয়।

মুন্নি গলা জড়িয়ে ধরল তাড়াতাড়ি। "না, না, ইঞ্জেকশন দিতে হবে না গো, ছোটোশিশির ওষুধ দিলেই চলবে। জ্বর হয়নি তো, শুধু সর্দি। এরপর থেকে জামা জুতো না পরলে আমি খুব বকব। তাহলে আর সর্দি হবে না।"

ডাক্তারবাবু মুন্নিকে কাঁধে নিয়ে নীচে যাবার আগেই গরম জলের বালতি আর তেলের বাটি হাতে মা এল ছাতে।

"আয় মুন্নি চান করিয়ে দিই।"



দুপুরবেলা ঘুম ভেঙে গেল মুন্নির। সারা বাড়িতে বেশ কাজের ধুম্ পড়েছে। ছবি আঁকা মাথায় উঠেছে, ছোটমামা ছাতের ওপর শতরঞ্চি পেতে পুরোনো তোরঙ্গ খুলে বসেছে। মা আছে পাশে। ছাতময় লেপ কম্বল কাঁথা মেলে রোদ খাওয়ানো হচ্ছে। আম গাছের ছায়ায় ডালা খোলা আদ্যিকালের তোরঙ্গ। ঢেউ খেলানো লোহার চাদরের ওপর উঁচু উঁচু আঙুরলতার কাজ করা তোরঙ্গের রং আগে কী ছিল কে জানে। এখানে ওখানে কিছু নীল সবুজ রঙের ছোপ, বেশির ভাগটাই রং উঠে গিয়ে কালচে।

ডালার ভেতর দিকে পারা খসে যাওয়া গোল আয়না। তার তলায় মর্চে রঙের পুরানো তুলোট কাগজে লেখা "শ্রীহরি সহায়, ঢাকা হইতে শিমলা, ভায়া কলিকাতা- সন ১৮৮০।" তোরঙ্গের ভেতর থেকে ছোটমামা একটা একটা করে ভাঁজ করে রাখা কাপড় বার করে দিচ্ছে, মা সেগুলো ভাঁজ খুলে যত্ন করে মেলে দিচ্ছে কাঁথার ওপর। মুন্নি ঘুম ঘুম চোখে ছোটমামার পিঠের ওপর ঝুলে থাকল। তোরঙ্গ থেকে কেমন পুরানো পুরানো গন্ধ ভেসে আসছে। ভালো লাগছে মুন্নির। সবে ঘুম থেকে ওঠা মুন্নি ভাঙা গলায় বানান করে আয়নার ওপর লেখাটা পড়বার চেষ্টা করছে। ইস্কুলে ভর্তি হয়নি বলে বেশিদূর বিদ্যে নয় ওর।

"বাক্সোর ভেতর কী লেখা গো মা?"

"শ্রীহরি সহায়। চুপ করো এখন সোনা, কাজ করছি।"

"নৌকোর মতো ওটা কী?"

"চন্দ্রবিন্দু। ওং। ওং শ্রীহরি।"

"তারপর?"

"ওঃ হো! তারপর ঢাকা সিমলা অনেক কথা। চুপ করে বসো।"

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মুন্নি। হাই তুলল।

ছোটোমামার পিঠ থেকে এবার মায়ের পিঠের ওপর।

"ছি হরির সামনে চন্নবিন্দু কেন গো মা?"

"মারা গেছেন তো তাই।"

"ছি হরি তো ভগবান।"

"মারা গেলে সবাই ভগবান হয়।"

"বুড়োদিদা কেন হয়নি?"

"জানিনা, যাঃ।"

মুন্নি কিছুক্ষণ চুপচাপ। কুলগাছের ফুল দেখছে। ডানা কাঁপিয়ে টুনটুনি পাখির নাচ দেখছে। কুলগাছের পাতা সেলাই করে বাসা বাঁধবে ওরা। একটা বুলবুলি পাখি এসে বসল ওই বকুলগাছের মগডালে। তারপর আরো একটা। ছাতের আলসের ওপর দিয়ে কাঠবেড়ালিরা ছুটোছুটি করছে। ওরাও নাকি শীতের আগে বাকসো টাকসো গুছিয়ে রাখে। কোথায় বসে কাঠঠোকরা গাছের গায়ে লম্বা ঠোঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে গর্ত করছে, শব্দ হচ্ছে ঠক্ ঠক্ ঠক্। দক্ষিণের মাঠে ছোড়দা ব্যাট বল খেলছে দাদাভাই আর সুমনদাদাদের সঙ্গে। দিদা আর দিদিভাই গল্প করছে নীচের ঘরে বসে। দিদা গান গাইছে। অনেক ওপরের আকাশে একা একা চক্কর দিচ্ছে চিল।

"ঢাকা কী গো ছোতমামা?"

"একটা দেশ। বড়ো বড়ো বাড়ি ঘর। মাঠ ময়দান, গাছপালা নদী নালা ধান দুব্বো। বুড়োদিদা থাকত।"

"থাকতেন বলতে হয়। বড়োদের থাকত বলবি না, বুঝলি।"

"সে আপনি যা বলেন।"

"সিমলা কী রে?"

"আর একটা দেশ। পাহাড় জঙ্গল বরফ ঝরনা। ভায়া কলিকাতা বুড়োদিদার দিদা গেল ঢাকা থেকে সিমলা পাহাড়ে।"

"আবার গেল বললি!"

"দিদা গেলেন।"

"কেন গেলেন রে ছোতমামা?"

"বিয়ে হল যে। শ্বশুরমশাইয়ের কোলে চড়ে শ্বশুরবাড়ি গেলেন।"

"ওমা! বড়োরা বুঝি কোলে ওঠে?"

"বড়ো কোথায়! বুড়োদিদার দিদা তখন তো ছোট্ট। ঠিক তোমার মতো। চার বছুরি। এই দ্যাখো ছবি।"

সুতো খুলে যাওয়া সোনালি অ্যালবামে ছোটো ছোটো ছবি। স্বপ্ন স্বপ্ন চোখে ঝুঁকে পড়ে দেখছে মুন্নি। মা আর ছোটোমামা দেখছে মুন্নিকে। একশো কুড়ি বছর আগেকার ছোট্ট নতুন বউ প্রিয়তমা দেবীর চেহারাটি অবিকল এখনকার মুন্নি! মেমসাহেবদের মতো লালচে উড়ু উড়ু চুল, টুকটুকে ফর্সা, পুতুল পুতুল গড়ন। মোটা সোটা শ্বশুরমশাইয়ের গলা দুহাতে জড়িয়ে ধরে কোলে বসে আছে দিব্যি। ঘোমটা মাথায় হাসিমুখ, সামনের দুটি দাঁত নেই। পাশে দাঁড়িয়ে লাজুকমুখে ছোট্ট-খাট্ট পাঠশালায় পড়ুয়া নতুন বর।



ছবিতে আঙুল ঠেকাল মুন্নি, "এতা বুড়োদিদার দিদার বর বুঝি?"

"হ্যাঁ গো পাকাবুড়ি। তোমার পছন্দ হয়?"

"পছন্দ হয়। তারপর কী হলো গো ছোতমামা? শ্বশুরবাড়ি গেল?"

"তুমি যাবে?"

"কোথায়?"

"সিমলায়।"

"বুড়োদিদার দিদার সঙ্গে দেখা হবে তো ওখানে! ওর সঙ্গে খেলা করব। আমার পুতুল দেব ওকে। আর রিমোট কন্টোলের গাড়ি দেব। ও আমার বন্ধু কিনা! ওকে খুব ভালোবাসি আমি।"

রাজ্যের জিনিসপত্তর ঠাসা তোরঙ্গের মধ্যে। আদ্যিকালের হলদে হয়ে যাওয়া চিঠির বান্ডিল, চশমার খাপে রাখা শুকনো নির্মালি, ছোট বড়ো জামা কাপড়, চন্দনকাঠের সাজগোজের বাক্সো, আরো কত কী! সাজের

বাক্সোর মধ্যে আতরের বাহারি শিশি, কাজললতা, ছোট্ট দুটি সিঁদুর মাখানো শাঁখা, সিঁদুর কৌটো, আর কোণের কাছে ছুঁচ সুতোয় 'প্রিয়তমা' লেখা ছোট্ট গোলাপি রুমাল। আর আছে গয়নার বাক্সো। সেখান থেকে বার করে ছোটোমামি মুন্নিকে পরালেন ছোটমাপের বালা, টিকলি, সিঁথিপাটি আর ঝুমকোদুল। দিদিভাই আর মুনিয়াদিদি যত্ন করে শাড়ি পরিয়ে মাঝে সিঁথি কেটে চুল বেঁধে দেবার পর চুপ করে তোরঙ্গের পাশে বসে রইল মুন্নি।



বিকেলবেলা ছাত সুনসান। দিদি ভাইরা সবাই মিলে বেড়াতে গেছে। মুন্নিকে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যায়নি আজ। ছোটোমামা ছাতের ঘরে কাজে ব্যস্ত। ওখান থেকেই নজরে রেখেছে মুন্নিকে। আজ আর একটুও দুষ্টুমি নেই ওর। নিমালিপুর বা মানির বাড়ি বা লম্বরিদিদির কাছে যাবে বলে বায়না করছে না রোজকার মতো। সেজেগুজে বসে আছে তো বসেই আছে ডালা খোলা তোরঙ্গের পাশে, মুখে কুলুপ এঁটে।

নীচের মাঠে দাদাভাইদের ব্যাটবল খেলা শেষ। পুকুর পাড়ের আধো অন্ধকার কলাঝোপে লুকিয়ে বসে ডাহুক ডাকছে কুপ-কুপ-চুপ-চুপ-চুপ। অনেকদূরের নিমগাছের ঝাড় থেকে বাসায় ফেরা কাক বক শালিকদের শোরগোল ভেসে আসছে। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। শেষ রোদের আবিরে আলোয় রাঙা মুন্নি বসে আছে খোলা তোরঙ্গের ডালায় পারা খসে যাওয়া গোল আয়নার দিকে চেয়ে। আয়নার ওপরে ছোট্ট খাট্টো নতুন বউ। ভারী মিষ্টি করে হাসল যেন মুন্নির দিকে চেয়ে!

"তুমি কে গো?"

"আমি পিওতমা। তুমি?"

"আমি তো মুন্নি। আমার একটা মেয়ে আছে, আর সাতটা ছেলে।"

"আমারও।"

"তুমি আমার খেলনা নেবে?"

"হ্যাঁ। তুমিও আমার সাজের বাক্সো নাও।"

"নেব। তুমি তো আমার বন্ধু। আমরা রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে খেলা করব , কেমন?"

পিওতমা বলল, "আচ্ছা।" মুন্নি আয়নাতে ঠোঁট ঠেকিয়ে আদর করে চুমো খেল। পিওতমাও তারপর তোরঙ্গের পাশে লেপের ওপর শুয়ে আকাশ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।"

ছবিঃ শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

যাত্রাপালার রাজা

রতনতনু ঘাটী



সে একলা ছোট্ট একটা দেশ। সে দেশে অনেক লোকজন বাস করে ঠিকই। তাঁতে কাপড় বোনা লোক, কাঠ কেটে আসবাব বানানো লোক, সোনা-মণি-মুক্তোর কাজ জানা লোক, বাড়ি তৈরি করা লোক, চাষবাস করা লোক, কী নেই? কিন্তু তার আশপাশে আর কোনও দেশ নেই।

ও মা, তার চারপাশে একটাও দেশ নেই? সে আবার কেমন দেশ?

শুধু কি তাই? সে দেশটার কোনও নামই নেই।

ও মা, দেশের নাম নেই? নাম ছাড়া আবার দেশ হয় নাকি? নাম নেই? সত্যি?

নাম নেই, তাতে কী? নাম না থাকলে কি সে দেশে নদী থাকতে নেই নাকি? সে দেশে দু'-তিনটে নদী আছে। নদী তো না। বড়সড় খালই বলা যায়।

তাতে সারা বছর কী হয় তা হলে?

তার কোনওটায় সারাদিন নৌকো বায় মাঝি। কোনওটায় বছর ঘুরতে না ঘুরতে দেশ ভাসিয়ে বানও আসে। কোনওটায় আবার বানটান কিছুই আসে না। শুধু ঢেউ আর ঢেউ। সে জলে চাষবাস হয়। তাই সে দেশের লোক ওদের নদী বলেই ডাকে।

নদী না হয় হল। পাহাড় আছে?

নেই আবার? চার দিকে চারটে পাহাড়ও আছে। যদিও তেমন বড়সড় টিলা ছাড়া সেগুলো আর কিছুই না। আমরা হলে ওগুলোকে টিলাই বলতাম। তবু সে দেশের সকলে ওগুলোকেই পাহাড় বলে।

দুর, টিলা আবার কোনও কালে পাহাড় হয়েছে নাকি? ও তো গায়ের জোরের কথা হল! পাহাড়ের ওপাশে কি কোনও দেশটেস আছে?

কে জানে? ওরা কেউ কখনও পাহাড় ডিঙিয়ে তা দেখতেও যায়নি। কোনও দেশ থাকলেও থাকতে পারে। আবার না থাকলে নেই। তাতে সে দেশের লোকের কিছু যায়-আসে না।

সে দেশে জঙ্গল নেই একটাও?

নেই আবার? হ্যাঁ, তাও আছে। দু'-তিনটে। সেগুলোকে অন্য দেশের লোক হলে জঙ্গলই বলত না। বলত 'বন'! মাত্র কয়েকশো গাছটাছ, লতাপাতা আছে এক-একটায়।

ও কি জঙ্গল নাকি, ও তো বনই! জঙ্গলই যদি বলো, বাঘ-সিংহ-হাতি-হরিণ আছে সে জঙ্গলে?

দুর, অত ছোটো জঙ্গলে বাঘ-সিংহ-হাতি-হরিণ থাকবে কী করে? তবে অনেক রকমের পাখি আছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতে অনেক ভিনদেশি পাখি আসে। এক সময় তারা চারদিকের চারটা পাহাড় পেরিয়ে আবার উড়েও চলে যায়।

ও তো পরিযায়ী পাখি! ওরা থাকতে আসে না। তাই উড়ে চলে যায়।

তা যাক, তবু ছোটো শিশুদের ঘুম পাড়াতে গেলে মা-ঠাকুরমাদের মুখে ওই সব জঙ্গলের বাঘ-সিংহর কথা এসেই পড়ে। সত্যি হোক মিথ্যে হোক, তাতে কিন্তু শিশুরা সেসব বাঘ-সিংহর কথা শুনে ঘুমিয়েও পড়ে।

সে দেশের যখন এত কথা আছে? তবে সে দেশের কি কোনও রাজা নেই?

সে কথাই তো বলছি। সে দেশের কোনও রাজাই নেই। লোকজন সকলে মিলেমিশে থাকে। সকলে মিলে পথঘাট বানায়, চাষবাস করে। কেউ কারও সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করে না। সে দেশে চুরি-ডাকাতি হয় না। তাই রাজার দরকারই পড়ে না তাদের।

দেশ থাকবে, তার রাজা থাকবে না, মন্ত্রী থাকবে না, সেনাপতি থাকবে না, তাই কি হয়? তা হলে সে দেশের রানিও নেই? রাজপুত্র-রাজকন্যেও নেই?

নেই-ই তো! সে কথাই তো বলছি। একদিন হল কী, কী যে খেয়াল চাপল তাদের মাথায়। যে লোকরা সোনা-রুপো-মণি-মুক্তোর কাজ জানত, তারা ক'জন মিলে অনেক দিনের চেষ্টায় একটা সোনার সিংহাসন বানিয়ে ফেলল। কী তার বাহার! সিংহের থাবার মতো দেখতে দুটো হাতল। পায়াগুলো সিংহের পায়ের মতো দেখতে। আর সিংহাসনের পিছন দিকটা? কী যে মণি-মুক্তোর কাজ করা চালচিত্র! সে যে না দেখেছে সে বিশ্বাসই করবে না।

সিংহাসন বানিয়ে কী হবে? রাজাই নেই, তার আবার সিংহাসন! ও কী কাজে লাগবে শুনি?

সে কথাই তো বলছি। সিংহাসন দেখে সে দেশের সমস্ত লোক পড়ল মহা ফ্যাসাদে। এই সিংহাসন নিয়ে কী করা যায়? এ ওকে জিজ্ঞেস করল, 'বলো না এই সিংহাসন নিয়ে কী করা যায়?'

সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'বলো না এই সিংহাসন নিয়ে কী করলে ভালো হয়?'

এ ওর মুখের দিকে তাকায়। সে তার মুখের দিকে। কারুর মাথায় আর কোনও বুদ্ধি খেলে না।

বুদ্ধি কি অত সোজা জিনিস নাকি? থাকলেই হল? বুদ্ধি হল খুব শৌখিন জিনিস। সকলের মাথায় থাকে না।

বলছি শোনো না! একদিন সে দেশের একটা লোকের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। যেমন করে আকাশে বিদ্যুৎ খেলে যায়, ওরকম করে আর কী!

কী বুদ্ধি খেলে গেল শুনি?

সে বলল, 'চলো, আমাদের দেশের তেপান্তরের মাঠটা তো খালিই পড়ে থাকে। বিকেলবেলা কোনও দিন মন হলে রামধনু ওঠে। তেমন মন হলে, আকাশে কালো মেঘ করলে ঝাপসা হয়ে বৃষ্টি নামে। ওখানে আমরা একদিন সকলে একটা মিটিং ডাকি। সেই মিটিংয়ে আমাদের মধ্যে থেকে একজন রাজা খুঁজে বের করতে হবে। সিংহাসন আছে, অথচ রাজা নেই, এ ভালো দেখায় না।'

মিটিং ডেকে রাজা ঠিক করা এমন তো কোনও দেশে হয়েছে বলে কখনও শুনিনি।

শোনোই না। সব কথা কি আগেভাগে শোনা যায় নাকি? কত কথা পরে পরে উড়ে আসে কানে। কী, বলো, আসে নাকি? সেরকমই সেদিনের মিটিংয়ে একজন লম্বা-চওড়া লোককে খুঁজে বের করা হল। দেখতে শুনতেও বেশ! বাঁশির মতো নাক। গায়ের রং ফরসার দিকেই। মুখের গড়নের মধ্যে একটা রাজা-রাজা ভাবও আছে দেখে মনে হল। বেশ বুঝেসুঝে রাজার ঢঙে কথাও বলে। মনে হয়, সে এর আগে কোথাও রাজা দেখেছে? কে জানে! কিছুকিঞ্চিৎ লেখাপড়াও জানে বলে মনে হচ্ছে।

এর মধ্যে কে যেন বলল, 'আরে এ তো আমাদের দেশের যাত্রাদলে রাজা সাজত। প্রথমটায় চিনতে পারিনি।'

রাজা সাজত মানে, এখন কি সে যাত্রাদল নেই? এখন আর রাজা সাজে না?

না, সে যাত্রাদল কবেই উঠে গেছে। আসলে যাত্রা তো নকল, অভিনয়, আসল তো নয়।

লোকটা শুনে বলল, 'তা এক সময় যাত্রাদলে রাজা সাজতাম বটে! কিন্তু এখন তো সত্যি রাজার কথা হচ্ছে! এর সঙ্গে তার কোনও মিলই নেই। সকলে যদি মান্য করে তবে আমি রাজা, না মান্য করলে রাজা নই।'

অনেকে অনেক রকম বলা কওয়া করে শেষে ঠিক করল, ও-ই তবে রাজা হোক। যাত্রাদলে যখন রাজাই সাজত লোকটা, আর যাত্রাদলটাও তো কবেই উঠে গেছে। এখন ও-ই তবে রাজা হোক। তার আগে লোকটাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেখা হোক, কেমন মানায়!

অনেক লোক গেল সোনা-মণি-মুক্তোর কাজ করে যারা, তাদের বাড়ি থেকে মাথায় করে বয়ে আনল সিংহাসনটা তেপান্তরের মাঠে। তারপর হঠাৎ করল কী, বলা নেই কওয়া নেই, লোকটা অমনি ধপাস করে বসে পড়ল সিংহাসনে।

ও মা, লোকটার কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আছে দেখছি!

কেউ বলল, 'এটা কি লোকটার ঠিক কাজ হল?'

তা দেখে কেউ বলল, 'বেশ মানিয়েছে!'

আবার কেউ বলল, 'দুর, যাত্রা-যাত্রা মনে হচ্ছে কেমন।'

শেষে সকলে মিলে একমত হল, লোকটার যখন যাত্রায় রাজা সাজার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে, তখন ওকেই রাজা করা হোক।

ব্যস, অমনি লোকটা সে দেশের রাজা হয়ে গেল?

রাজা হয়ে গেলেনই তো! তার পরই তো বাধল গন্ডগোল। রাজা বললেন, 'এমনি এমনি কি রাজা হওয়া যায় নাকি? আমার মণি-মুক্তো হিরে-জহরত বসানো রাজপোশাকের ব্যবস্থা করা হোক।'

সকলে এক সঙ্গে ঘাড় নাড়ল, তা কথাটা তো মিথ্যে নয়। রাজা থাকবে, রাজার রাজপোশাক থাকবে না, তা তো আর হয় না। যারা জামা-কাপড় তৈরির কাজ করত, তাদের কাছে আদেশ গেল, 'রাজার জন্যে মণি-মুক্তো বসানো রাজপোশাক বানিয়ে দাও যত তাড়াতাড়ি পারো।'

তারা রাজপোশাক বানাতে চলে যেতে না-যেতেই রাজা বললেন, 'আমার জন্যে হিরে বসানো নাগরা জুতো বানিয়ে দেওয়া হোক। নইলে কি খালি পায়ে রাজা হওয়া যায় নাকি?'

সকলে ঘাড় নেড়ে সে কথায়ও সায় দিল। আদেশ গেল জুতো-বানিয়ে লোকের কাছে। সে শোনা মাত্রই চলল রাজামশাইয়ের পাসের মাপ নিয়ে হিরে বসানো নাগরা জুতো বানাতে।

বিকেল গড়িয়ে এল। তেপান্তরের মাঠের কোণে রামধনু উঠল এক ফালি। তার রং এসে পড়ল রাজামশাইয়ের মুখে।

রাজা বললেন, 'আমি কোমন রাজা? আমার রাজমুকুট কোথায়? আমি মণি-মণিক্য খচিত রাজমুকুট না পেলে রাজা হবই না। রাজার নামের জায়গা থেকে আমার নাম কেটে দেওয়া হোক! এই আমি সিংহাসন থেকে নেমে যাচ্ছি।'

সকলে অমনি বলে উঠল, 'আ-হা-হা! তা কেন, তা কেন রাজামশাই? আপনি হলেন আমাদের রাজা। আপনি অমন করে অভিমান করবেন না। এখনই রাজমুকুটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আদেশ গেল রাজমুকুট বানিয়ে লোকের কাছে, 'কালই সকালে যেন রাজমুকুট তৈরি হয়ে যায়।'

সন্ধে নামতে আর বাকি নেই। পুব আকাশে এক ফালি চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। রাজা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর গর্জন করে উঠলেন, 'এই তেপান্তরের মাঠে তো আর সারারাত রাজা থাকতে পারেন না। রাতে কোথাও থাকার ব্যবস্থা করা হোক। আমার রাজাপ্রাসাদ তৈরির ব্যবস্থা করা হোক।'

সকলে রাজার গর্জন শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু রাজপ্রাসাদ কি আর একদিনে তৈরির হয়ে যাওয়ার কাজ নাকি? যারা ঘরদোর বানায়, তারা বলল, 'কম করে এ এক মাসের কাজ।'

শুনে রাজামশাই বললেন, 'তা প্রাসাদটা যেন ঠিক রাজপ্রসাদের মতো হয়। সে ক'দিন আমি না হয় আমার বাড়িতেই ফিরে যাব। আমি কিন্তু পায়ে হেঁটে যাব না। এখন আমি রাজা। সিংহাসন সুদ্ধ আমাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হোক!'

সিংহাসন সুদ্ধ রাজা চললেন তাঁর বাড়িতে?

তা তো চললেন। তারপর বাড়ি গিয়ে লোকলশকর সিংহাসনটা নামিটে রাখতে না রাখতে রাজা বায়না ধরলেন, 'আমি যখন আজ থেকে এ দেশের রাজা, আমি তো আর আগের ছেঁড়া বিছানায় শুতে পারব না। রাজপ্রাসাদ তৈরি হওয়া পর্যন্ত আমি এই রাজসিংহাসনে বসেই কাটিয়ে দেব।'

তাই হল। তারপর থেকে রাজামশাই সিংহাসনে বসেই খান, ঘুমোন, রাজকার্য পরিচালনা করেন। চার-চারটে পাহাড় ঢুঁড়ে নানা রঙের মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি হতে শুরু করল সাতমহলা রাজপ্রাসাদ।

হাতির দাঁতের পালঙ্ক বানানো হল রাজার ঘুমনোর জন্যে। দিঘি কাটানো হল প্রাসাদের সামনে। তাতে শ্বেতপাথরের ঘাট তৈরি হল। দিঘির জলে ভেসে বেড়াতে লাগল রাজহাঁসের দল। কত নাম না জানা ফুলের গাছ লাগানো হল সামনের বাগানে।

তারপর রাজা সকলকে ডেকে একদিন বললেন, 'অভিষেক না হলে কি রাজা হওয়া মানায়? মহা ধুমধাম করে আমার অভিষেকের ব্যবস্থা করা হোক।'

সকলে মরিপুড়ি করে রাজার আদেশ পালন করতে ছুটল। এমন সময় রাজা আর একটা নতুন বায়না ধরে বসলেন। এতদিন গরিব ছিলেন বলে তাঁর বিয়ে-থা করা হয়নি।

এবার বললেন, 'রানি ছাড়া এই মহামূল্যবান প্রাসাদে কি রাজাকে একা মানায়? একই দিনে আমার বিয়ে এবং অভিষেকের ব্যবস্থা করা হোক। তাই করা হল। অপরূপা সুন্দরী মেয়ে খুঁজে এলে রাজার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হল অভিষেকের দিনেই। রানি এলেন রাজপ্রাসাদে।

দেশের লোক রাজার এত সব বায়না মেনে নিল?

তাই তো নিল। এত বায়না মেটাতে গিয়ে হল কি, একদিন দেশটা একদম গরিব হয়ে গেল। লাটে উঠল চাষআবাদের কাজ। কেউ কারও জীবিকা ঠিকমতো করতে পারল না। রাজার ফাইফরমাশ খাটতে খাটতেই দিন গেল তাদের।

এমন সময় রাজা বললেন, 'আমার রাজকোষাগার নেই কেন? কেউ সেদিকে নজরই দেয়নি? এ আমি কেমন দেশের রাজা?'

কথা বলা মাত্রই তৈরি হল মূল্যবান ধাতু দিয়ে বিশাল রাজকোষাগার। রাজকোষাগারই যদি তৈরি হল, তাতে ধনরত্ন চাই তো!

রাজা ঢেঁড়া পেটানোর আদেশ করলেন, 'সমস্ত দেশবাসীর কাছ থেকে চড়া হারে খাজনা আদায় করা হোক। স্বেচ্ছায় কেউ খাজনা না দিলে তাকে কারাগারে এনে বন্দি করে রাখা হোক।'

খাজনা দেবে কী করে? সকলে তো রাজার বায়না মেটাতেই হিমশিস। কেউ কারও কাজই করতে পারেনি। ধু ধু করছে মাঠ। চাষআবাদ হয়নি।

বন্দি করে রাখতে রাখতে যখন উপচে পড়ল রাজকারাগার, তখন একদিন দেশের লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করল, 'আমরা রাজা চাই না।'

রাজপ্রাসাদ থেকে রাজাকে টেনে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল একটা গরিব লোকের মতো তৈরি কুটিরে। রানিকেও যেতে হল রাজার সঙ্গে। কেড়ে নেওয়া হল রাজপোশাক, রাজমুকুট, নাগরা জুতো, রাজউপাধি, হাতির দাঁতের তৈরি পালঙ্ক।

এর পরে রাজা কী করলেন?

রাজাহীন দেশটা আবার আগের মতোই চলতে শুরু করল। সুখ ফিরে আসতে লাগল মানুষের মধ্যে। এখন আর সে দেশে আগের মতোই কোনও রাজা নেই। মন ভালো করতে হলে এত সুন্দর রাজপ্রাসাদটা দেখতে আসে দেশের লোক।

আর রাজা?

রাজা এখন নিজে একাই একটা যাত্রাপালা তৈরি করেছে। সেখানে সে নিজে নিজে রাজা সাজে। দেশের লোক একজনও কেউ সে যাত্রাপালা দেখতে যায়, তা কিন্তু নয়।

ছবি:তন্ময়

অমর মিত্র



পি সি সরকারের ম্যাজিক

আমতলী গাঁয়ের সব চেয়ে সাহসী লোক ভুবন চোর। এত বাঁশবন, খড়বন, শ্যাওড়া গাছ, বটতলি, নিঃঝুম কালীতলা, কবরখানা, গাঙের ধারে শশ্মান, এত সব ভয়ডরস্থান, গা ছমছমে দুপুর, হাড় হিম করা রাত, রাতভর তেনাদের চলাফেরা, চাঁদের আলোয় পেত্নির পা দুলোন, পথে বাঁশ ফেলে রাস্তা আটকে দেওয়া, সব কিছুর ভিতরে ভুবন তার কাজ করে বেড়ায়। তার প্রধান কাজ চুরি। চুরি বিনে তার দিন কাটে না। সাত গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই চুরি, তারপর ফকিরহাটখোলায় গিয়ে বেচে আসা। কেনার জন্যবসে থাকত গুলু কুন্ডু। চোরাই মাল বেচে সে লাখপতি হয়েছে ক'বছর আগে। তখন বড় ভোজ দিয়েছিল। বামুন ভোজ, গরিব নারায়ণ ভোজন সব করিয়েছিল।

ভুবন খুব সাহসী বটে। নইলে দিনে রাতে বাঁশতলা, বটতলা, কালীতলা, শ্যাওড়াতলা করে বেড়ায়, কখনো ভয় পায়নি। তাকে দেখে তেনারা রাস্তা ছেড়ে দেয়, ভুবন বস্তা বোঝাই মাল নিয়ে মাঠ পেরিয়ে কবরখানার পাশ দিয়ে, শ্মশানে পড়ে থাকা কাঁথা মাদুর হাঁড়িকুড়ি পার হয়ে, মড়া পোড়ার ধোঁয়া ভেদ করে রাত দুপুরে ফকিরহাটখোলার গাঁয়ে গুল কুন্ডুর বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক মারে, ভুবন এল গো গুলুদা ও গুলুদা, গুলুবাবু, গুলকু। কু মানে কুন্ডু।

গুলু হল শুকনো বাঁশের মতো রোগা, সিড়িঙ্গে একটা লোক। সে জেগে থাকে ভুবনের ফোন পেয়ে। ভুবন চোর হলে কী হবে, রীতিমতো ফোনে কথা চালাচালি করে। মেসেজ পাঠায় খবর দিয়ে। ফোনটা সে নিজের টাকায় কিনেছে বসিরহাটের এক দোকান থেকে। সঙ্গে এক ডজন হাত সাফাই করেছিল দিনেদুপুরে। সাফাই করা মোবাইল সব গুলু কিনেছিল ডজন দরে। মোবাইলে খুব সুবিধে হয়েছে ভুবনের। যেদিন জিনিস দেবে, মানে চুরি হলো, ফোন করে সে গুলুকে জানিয়ে দেয়। চুরির মালের ছবি পাঠিয়ে দেয় হোয়াট'স অ্যাপে। আগে যখন ভুবন চোর ফোন ব্যবহার করত না সেই মাঝ রাত্তিরে এসে রীতিমতো হল্লা লাগিয়ে দিত। ততে ঘুমকাতুরে গুলুর খুব কষ্ট হতো ঘুম চটে গিয়ে। এখন সে অপেক্ষা করে ভুবনের ফোন আর হোয়াট'স অ্যাপ মেসেজের। ফোন না পেলে কষে ঘুমোয়। আর ঘুমের ভিতরে চোরাই মালের স্বপ্ন দ্যাখে। ইচ্ছে বড় একটা চোরা বাজার খুলবে ফকিরহাটখোলায়। আলপিন থেকে এরোপ্লেন সব বেচবে। ভুবন যদি এখন এরোপ্লেন হাতিয়ে আনতে পারে। বিমান ছিনতাই।

গুলুর সামনে পিঠ থেকে বস্তার বোঝা নামিয়ে ভুবন হাত পাতল, দাও কত দেবে।

রাত তখন অনেক। চাদ্দিক ঝিমঝিমে। ঘোলাটে জোছনায় উঠোনে নিজের ছায়া দেখলেই গা কেমন করে। গুলু বলল, কী আছে?

একটা সিন্দুক, ছবি পাওনি হোয়াট'স আপে?

খুলে কী দেখলাম ঘুম ঘোরে, তোর ছবি কী?

দূর, সিন্দুক, ভালো করে দেখো। ভুবন বলল।

ফোন ভিতরে, ছবি দেখে কী হবে আসলটা দেখা। গুলু কুন্ডু বলল।

সিন্দুক আছে বস্তায়, কত দেবা বলো। ভুবন আবার হাত পাতল।

সিন্দুক না হয় হলো, তার ভিতরে কী আছে?

ভুবন বলল, খুলে তো দেখিনি।

আগে দেখা কী আছে। গুলু কুন্ডু বলল।

তুমি কামার ডেকে চাবি করে নিয়ে খুলে দেখ। বলল ভুবন।

কোন কামার?

কেন উদো কামার। বলে ভুবন খি খি করে হাসতে থাকে।

নলকোড়ার উদো?

ভুবন বলল, হাঁ, সেই উদো, বেটার কী ঘুম, নাকের কী ডাক, ঘর কাঁপে থরথর করে।

তুই গিসিলি চাবি করাতে?

ভুবন বলল, ওই ধরতি পার গুলদা।

সিন্দুকটা কার ঘরের?

অত বলা যাবে না।

বাহ, না বললে হয়, আমি তো বেচব।

ভুবন বলল, বেচবা কেন, নিজির ঘরে রেখে দাও রং বদল করে।

কথাটা মনে ধরল গুলুর। একটা সিন্দুক বাড়িতে থাকলে সুবিধে কত। চোরাই সোনাদানা, গয়নাগাটি টাকার তাড়া সব রেখে দেওয়া যায়। একটা সিন্দুক থাকলে মনে হয় কিছু আছে বাড়িতে। উঠোনের ঝুপসি আলোয় বস্তা থেকে সিন্দুক বের করে দিল ভুবন। বেশ ভালো সাইজ, তার কপালে সিঁদুর। ভিতরে কী আছে? সিন্দুকে কি সোনা রুপো তামা থকবে? নোটের বান্ডিল আছে?

চাবি কই? জিজ্ঞেস করল গুলু।

বললাম তো নলকোড়ার উদো কামারকে ডেকে করে নিয়ো।

কেন, তুই চাবি আনিসনি?

কত দেবা বলো। ভুবন হাত পতে।

কত চাস তুই?

দু'হাজার দু টাকা গুণে দিও গুলুদা। বলল ভুবন।

অত হবে না, একশো এক দেব।

তাইলে চাবি পাবা, সিন্দুক পাবা না। বলল ভবন, বাতাসে চাবি ঘুরায়ে দেখো।

আমার আর দিবার সামর্থ্য নাই।

সামর্থ্য নেই তো তুমি নিও না, নিয়ে যাই। বলল ভুবন।

গুলু বলল, ভেতরে কী আছে বল দেখি।

বলা যাবে না। বলতে বলতে ভুবন বস্তায় সিন্দুকটা ঢুকিয়ে আবার কাঁধে তুলে নল। ক্ষমতাও আছে বটে। বস্তা নিয়ে চলল। তা দেখে গুলু বলে, আরে যাবি কোথায়?

গাঙে ফেলে দেব, আমি আমার ঘরে চোরাই মাল রাখিনে, চোরাই মাল ব্যাভার করিনে।

গাঙে তো ডুবে যাবে।

যাবে, তাতে আমার কী?

আচ্ছা দেড়শো এক টাকা দেব, রেখে যা।

ভুবন বলল, গুলুদা, দুই হাজার দুইয়ের এক টাকাও কম হবে না।

এমনি যখন দামাদামি হচ্ছে, তখন হঠাৎ করে একটা লোক নেমে এল যেন আকাশ থেকে, জোছনার ভিতরে অন্ধকার মেখে। বেঁটে আর মোটা। গোলগাল। থপ থপ। দেখে চেনা মনে হয় গুলুদার। কিন্তু মনে করতে পারে না। কিন্তু গা কেমন করে ওঠে। শীত শীত করে। এল কোথা থেকে। ভুবন বলল, বসতে আঁজ্ঞা হয়।

লোকটা গুলুর দিকে তকিয়ে বলল, তুই খুব ছ্যাঁচড়া লোক গুলু।

গুলু বলল, তুমি কে হে?

বহুক্ষণ থেকে শুনছি দরাদরি, ওরে গাধা, ওই সিন্দুক বয়ে আনতেই দু'হাজার টাকা মজুরি, তুই দেড়শ দিবি বলছিস, কান ধরে উঠবস কর।

গুলু রেগে যেতে যেতে মাথা ঠান্ডা করে। সে তো চোরাই মালের কারবার করে, তাকে সব সময় মাথা ঠান্ডা রাখতেই হয়। এই লোকটা কে? তার কাছে সস্তায় চোরাই মাল কেনে নাকি? নাকি পুলিশের খোচড়, সিন্দুক ঘরে ঢোকালেই দরজায় এসে কড়া নাড়বে? দেড়শো টাকায় কেনা সিন্দুক জলে যাবে। থানায় ঢুকিয়ে নিলাম করে দেবে। গুলু বলল, আপনি কে স্যার?

তোর জেনে কী হবে রে ছাগল, টাকা বের কর।

গুলুর মনে হলো ভুবন চোর এই লোকটাকে ফিট করে এনেছে সিন্দুক বেশি দামে বেচার জন্য। তার ঘটে কি বুদ্ধি নেই? সে চুপ করে থাকে। কিন্তু লোকটাকে তর্জন গর্জন করতে থাকে, এই গুলু, ফোন যখন করা হল, হ্যাঁ বললি কেন, তোরে ছবিও পাঠানো হল ইয়েস বললি কেন?

এত দাম আমি দিতে পারব না। গুলু কুন্ডু সাফ বলে দিল।

লোকটা তার মাথা দুলিয়ে বলল, দিতেই হবে, না দিবি তো তোর চোরাই কারবার ঘুঁচিয়ে দেব, এই গুলু, একশোবার উঠবস দে।

তুমি কে? গুলু জিজ্ঞেস করে, তোমার সঙ্গে তো কথা হয়নি।

কথা হয়নি মানে, এই তো হচ্ছে, যা বলছি কর গুলু মাছ না পাকাল।

এই, এসব বলবে না। গুলুর খুব রাগ হয়ে গেল। ভুবন তখন তফাতে বসে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছে। কখন এই কোঁদল শেষ হবে তারপর সে কথা বলবে। এতে যদি হাজার দুই আয় হয়, সে একটা চুরির যন্তর কিনবে। বিলিতি মাল। সবে বাজারে এসেছে। ব্যাটারিতে চলে।ব্যাটারি চার্জ দিতে হয়। সেই যন্তর দিয়ে নাকি সিঁদ কাটা যায় যেমন, আলমারি, সিন্দুক খোলা যায়। তালা বন্ধ বাড়ির সব তালা চিচিং ফাঁক করে খুলে দেওয়া যায়। গুলু বলল, ভুবন, তুমি যাও, আমার দরকার নেই।

নেই মানে, আলবাত আছে। লোকটা খরখর করে উঠল।

আমি নেব কি নেব না, আমি বুঝব, তুমি কেন মাথা গলাচ্ছ?

লোকটা বলল, আমার মাথা কই যে গলাব?

আরিব্বাস! মাথা তো নেই, গলাবে কী করে, সত্যি তো মাথা কই। গুলুর গা ছমছম করে ওঠে। আরে ভুবন চোর এ কাকে সঙ্গে নিয়ে এল? নমঃ নমঃ, রাম আম, আম রাম।

এই আম আম করবিনে, চোপ! মুন্ডহীন লোকটা ভুসভুস করে বলল কথাটা।

ভুবন বলল, একটু ঝিমিয়ে নিই গুলদা, তুমি কথা শেষ করে নাও।

গুলু তো বুঝতে পারছে আমতলীর তেনাদের কেউ। হায় হায় রাত দুপুরে এ কী হাঙ্গামা! সে হাত জোড় করল, স্যার, আমাকে ক্ষমা করুন, কিন্তু আপনি কে?

নিয়ে আয় তোর মোবাইল।

গুলু ভিতরে গিয়ে মোবাইল এনে ছবির গ্যালারি খুলেই দ্যাখে এই লোকটার মুখ। এইটাই পাঠিয়েছিল ভুবন। ঘুমঘোরে দেখেছিল বলে চেনা মনে হয়েছিল। এই হলো চোরাই মাল। ইয়ার্কি পেয়েছে ভুবন। ভুবন ভুবন, তুই কিসের ছবি দিয়েছিলি?

ঘুমিয়ে পড়েছে ভুবন, ঘুমঘোরেই জবাব দিল, সিন্দুক।

কই সিন্দুক? গুলু ভয়ও পাচ্ছে, আবার ভুবনের উপর তার রাগও হচ্ছে। দাঁত কিড়মিড় করতে ইচ্ছে হচ্ছে, আবার দাঁতে দাঁত ঠেকে যাচ্ছে। উনি আছেন সামনে। সে জোড় হাতে বলল, স্যার, সিন্দুকের ছবি পাঠায়নি ভুবন, আপনার ছবি।

দূর গাধা, আমার কি ছবি হয়, সিন্দুকেরই ছবি। তেনার ঘাড়ে আবার মুন্ডু ফিরে এসেছে। বলল, ঐটা সিন্দুকই।

ভুবন উঠে এল নাক ডাকা বন্ধ করে, বলল, আমি সিন্দুকের ছবি দিইছি গুলুদা, উনি সিন্দুকে থাকেন, সিন্দুকের ভূত, সিন্দুক মানে উনি, উনি মানে সিন্দুক, দেখুন ভালো করে, সিন্দুক মনে হচ্ছে তো, ও স্যার, সিন্দুকটা খুলে বেরিয়ে এস।

গুলু কুন্ডু আম আম করতে লাগল। বস্তার ভিতর থেকে নিজে নিজে বেরিয়ে এল সিন্দুক। তার ভিতর থেকে আবার লোকটা। সিন্দুকের ভূত। পি,সি,সরকারের ম্যাজিক হয়ে গেল অবিকল। ভিতর থেকে উনি বেরিয়ে আবার বললেন, গুলু টাকা দিয়ে ঘরে নিয়ে যা, আমি আর থাকব না ওর ভিতরে, তোর কোনো ভয় নেই, উদো কামার আমারে ঢুকিয়ে চাবি লাগিয়ে দিয়েছিল, জানে না, চাবি আমার কাছে চিচিং ফাক, বেরোতে পারি, ঢুকতে পারি বেরোতে পারি, সিন্দুক নিয়ে উড়তে পারি, ম্যাজিক ম্যাজিক ম্যাজিক পারি।

সেই সিন্দুক এখন গুলু কুন্ডুর ঘরে শোভা পাচ্ছে। উদো কামার এসে চাবি করে দিয়ে গেছে। যেতে যেতে সে বলেছিল, তার একটা এমনি সিন্দুক ছিল, ভূতে নিয়ে গেছে, বারো ভূতের জ্বালায় আর টিকতে পারে না সে।

এমনি সিন্দুক? গুলু জিজ্ঞেস করেছিল।

প্রায় এমনি, চাবি আর রংটাও এমনি প্রায়, কিন্তু এইটি হবে যে তা বলতে পারে না জোর দিয়ে। বলতে বলতে উদো কামার বাড়ির পথে হেঁটেছিল মনের দুঃখে। এই সিন্দুক দেখে তার হারানো সিন্দুকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যে খুব।



রাজকুমার রায়চৌধুরি

জীবরত্ন জানার একটা অদ্ভুত হবি ছিল৷ তাঁর চেনা জানা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন কেউ মারা গেলে শোক সভা শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে হাজির থাকতেন নিমন্ত্রণ থাকুক বা না থাকুক৷ বিখ্যাত মানুষদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম ছিল৷ তাঁর একটা ডায়েরি ছিল । তাতে মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য লেখা থাকত, যেমন জন্ম মত্যু সময় ও তারিখ, কী অসুখে মারা গেছেন, মদ্যপান বা/ও ধূম পান করতেন কিনা ইত্যাদি তথ্য৷ প্রায় দশ হাজার মানুষের এই সব তথ্য ওঁর ডায়েরিতে আছে । অবশ্য এর জন্য একটা নয় দশটা ডায়েরি লেগেছে৷ দশম ডায়েরি ও শেষ হওয়ার মুখে৷ ওনার এই ডায়েরির কথা কী করে আমেরিকা অবধি পৌঁছয় । দুজন আমেরিকান অধ্যাপক ওঁর ডেটাবেস কিনে নিতে চান মোটা দামে । জীবরত্ন ভাবছেন কী করবেন৷

জীবরত্ন একটা মফঃসল কলেজে পড়াতেন । সবে রিটায়ার করেছেন৷ দক্ষিণ কলকাতায় এক শহরতলি অঞ্চলে একটা এক কামরার একটা ফ্ল্যাট কিনে রিটায়ার করে এই ফ্ল্যাটে বসবাস করছেন৷ ফ্ল্যাটবাড়িটা পুরনো কিন্তু ভালো সারাই করে রাখবার দরুণ নতুনই দেখায় । নিরাপত্তার অভাব নেই৷ প্রাইভেসিও আছে৷ এর আগে উনি উত্তর কোলকাতার একটা ভাড়াবাড়িতে থাকতেন৷

জীবরত্নবাবুর এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে৷ ছেলে পুনেতে থাকে, মেয়ে জামাই দুজনেই ব্যাঙ্কে চাকরি করে৷ সল্টলেকে ভাড়াবাড়িতে থাকে৷ স্ত্রী দু বছর হল গত হয়েছেন৷ জীবরত্নকে এখন মুক্তপুরুষ বলা যেতে পারে৷

২

নিজের ফ্ল্যাটে এসে জীবরত্নের বেশ ভালোই লাগছে৷ উনি ঠিক করলেন ডায়েরি উনি কাউকে দেবেন না৷ ডায়েরিতে যত মৃত ব্যাক্তির নাম আছে তাঁদের সবার ফটো জোগাড় করবেন৷ সেলিব্রেটিদের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই৷ ইন্টারনেট সার্চ করলেই পাওয়া যাবে । অনেক ছবি ওঁর সংরক্ষিত আলবামে পাওয়া যাবে৷ কলেজে পড়ার সময় একটা ক্যামেরা কিনেছিলেন৷ তারপর আর একটা ভালো ক্যামেরা কিনেছিলেন৷ এ যাবত যত ছবি তুলেছিলেন সব আছে । যাদের ছবি আছে তাঁদের বেশির ভাগ মানুষই মারা গেছেন৷ তাঁদের ছবিগুলো তো এখনি ডায়েরির পাতায় সেঁটে দেওয়া যায়৷

জীবরত্ন কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন৷ ৩০ বছর কেমিস্ট্রি পড়ালে যা হয়, জীবন সম্পর্কে একটা ঔদাসিন্য আসতে বাধ্য৷ যে সব বিজ্ঞানী শেষ বয়সে সাধু হয়ে যান বা দার্শনিক হন,জীবরত্নবাবুর মতে তাঁরা সবাই কেমিস্ট৷

৩

নতুন ফ্লাটে এসে জীবরত্নবাবুর একটা কাজ হয়ে দাঁড়াল রোজ সন্ধেবেলা বসবার ঘরে বসে ডায়েরিগুলোর পাতা ওল্টানো৷ দশমটি ডায়েরিতে আর নতুন তথ্য লেখার জায়গা খুব বেশি নেই৷ ডায়েরির পাতা ঘাঁটলে জীবরত্নবাবুর মনে হয় টাইম ট্রাভেল করে অতীতেফিরে যাচ্ছেন৷ রিটায়ার করার পর জীবরত্ন একটা প্রাইভেট কলেজে পার্ট টাইম পড়ান৷ যতটা না টাকার জন্য তার চেয়ে বেশি সময় কাটানোর জন্য৷

৪

এক দিন সন্ধেবেলা ফিরে বসবার ঘরে বসে জীবরত্ন কফি খেতে খেতে ডায়েরির পাতা উল্টাচ্ছিলেন । অনেকগুলি তথ্য আরো যোগাড় করতে হবে , যেমন মৃত্যুর সঠিক কারণ কী ছিল সব জায়গায় লেখা নেই । যেমন বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে লেখা আছে ক্যানসার, কিন্তু শরীরের কোন অংশে প্রথম ক্যানসার শুরু হয়েছিল লেখা নেই৷ হার্ট অ্যাটাক বা সেরিব্রাল স্ট্রোক কয়েকটা জায়গায় লেখা থাকলেও অনেক সেলিব্রেটির ক্ষেত্রে লেখা আছে বার্ধক্যের কারণে মৃত্যু।

ঐ সব ভাবতে ভাবতে জীবরত্নের মনে হল ঘরের টেম্পারেচার একটু কম৷ অন্তত শোবার ঘরের তুলনায় । কয়েক দিনঝড় বৃষ্টি হওয়ায় খেয়াল করেন নি৷ কিন্তু আজ কাঠফাটা রোদ্দুর ছিল আর তার সঙ্গে তাল দিয়ে আর্দ্রতা৷ জীবরত্নের ফ্ল্যাটে এ সি নেই । সর্দির ধাত আছেবলে এসি কেনেননি৷

আরও একটা জিনিস ভাবিয়ে তুলেছে৷ জীবরত্ন আরো অনেক নিরীহ লোকের মত মারপিটের সিনেমা দেখেন টিভিতে৷ ইংরেজি চ্যানেলে যে ছবিগুলি দেখায় বেশির ভাগ কংফু বা ওই জাতীয়৷ প্রায় সব ছবিই হাতাহাতিতে শেষ হয়া ভিলেন আর নায়কের হাতে আধুনিকতম অস্ত্র থাকতেও কেন সব ছুঁড়ে ফেলে হাতাহাতি করে আগে বুঝতে পারতেন না৷ এখন মনে হচ্ছে এটা ইগোর ব্যাপার৷ গুলি করে একটা রোগাপটকা লোকও একটা পালোয়ানকে মেরে ফেলতে পারে৷

আর যেসব সিনেমা দেখানো হয় ভূত বা প্রেতাত্মার ছবি, নয় গডজিলা বা আনাকোন্ডা জাতীয় আযনিম্যালহরর ফিল্ম। ভূতের ছবিতে মানুষের, বিশেষ করে মেয়েদের দুষ্ট আত্মা আশ্রয় নেয় । অনেক সময় গোটা

বাড়িটাই ভূতে দখল নেয়৷ ওদের তাড়াতে বেশিরভাগ সময় যীশুখ্রিষ্টের নাম বা কাঠের ক্রসই যথেষ্ট৷ আমাদের দেশে ওঝারা অবশ্য ঝাঁটার উপরই বেশি ভরসা রাখে৷ আর একরকম ভূতুড়ে ছবি আছে যেখানে ভূত বা প্রেতাত্মা দেখা যায় না কিন্তু অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না৷ এর আর এক নাম প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিজ।

তবে জীবরত্নবাবু আগে এসব সিনেমা খুব বেশি দেখতেন না । কিন্তু কিছুদিন হল উনি এসব সিনেমাই বেশি দেখছেন অথচ শোবার ঘরে গেলে মনে হয় কেন ওই সব সিনেমা দেখলেন৷ একটা পরীক্ষা করার জন্য উনি আর একটা ছোট টিভি কিনে শোবার ঘরে রাখলেন৷ কেবল কানেকশানও একটু কম রেটে পেলেন৷ উনি যা ভেবেছিলেন তাই হল। নিজের পছন্দমত চ্যানেলগুলি্ দেখতে কোন সমস্যা হল না৷

জীবরত্নবাবু বিজ্ঞানের ছাত্র । অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করেন না৷ কিন্তু তবু মনটা খচখচকরতে লাগল৷ মনে হলঘরটার একটা নিজস্ব সত্বা আছে৷ এবং এটা এত শক্তিশালী যে ওঁর নিজের ব্যাক্তিত্বকে প্রভাবিত করছে৷ তারপরই মনে হল বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে এসব চিন্তাকে প্রশয় দেওয়া উচিত না৷

এইসব ভাবতে ভাবতে ডায়েরির পাতা উল্টাচ্ছিলেন হঠাৎ একটা ঠিকানায় চোখ আটকাল - ৫/৩ হরলাল বক্সী লেন । জীবরত্ন মনে করবার চেষ্টা করলেন কোথায় ঠিকানা টা দেখেছেন । চকিতে মনে পড়ল এখন যে বাড়ির ফ্ল্যাটে বসে আছেন এটা সেই বাড়ির আগের ঠিকানা৷ বাড়িটা পুরোনো ছিল৷ ফ্ল্যাট হবার পর ঠিকানা বদলে গেছে৷ এবার মনে পড়ল একজন লেখকের মৃত্যুর পর উনি তার স্মরণ সভায় গিয়েছিলেন রবাহূত হয়ে৷ লেখকের নাম বিনয় বক্সী , হয়ত হরলাল বক্সীর বংশধর৷ এখন যেখানে উনি বসে আছেন পুরানো বাড়ির সেই একতলাটা এখানে ছিল আর বিনয়বাবু এখানেই থাকতেন৷ মৃত্যুর কারণ লেখা আছে আকস্মিক হৃদরোগ। ভাবলেন মিহিরের কাছে পরামর্শ নিলে ও কিছু আলোকপাত করতে পারে৷

ওঁর বন্ধুবান্ধব খুব বেশি নেই৷ ফ্ল্যাট বাড়িতে দোতলায় থাকেন ডঃ ভবেশ ভাওয়াল নিউরোলজিস্ট । ন্যু ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে P h D করেছেন৷ ওঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের বিষ নিয়ে আলোচনা হয়৷ জীবরত্নের ডায়েরিতে যাদের নাম আছে তার মধ্যে ১০০ জন আত্মহত্যা করেছে৷ বেশির ভাগ ই বিষ খেয়ে৷ একজন তো স্বেচ্ছায় গোখরোর কামড় খেয়ে মরেছে৷

তবে ওঁর পূর্বতন কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক মিহির মুস্তাফীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে । মিহিরবাবু নাস্তিক বটে তবে নানান বিষয়ে পড়াশোনা করেন৷

৫

পরের রবিবারই জীবরত্ন মিহিরবাবুর বাড়িতে হাজির৷ মিহিরবাবু বিপত্নীক । পৈত্রিক বাড়িতে থাকেন৷ এক বিধবা দিদি থাকেন। উনিই সব দেখাশুনা করেন৷ মিহিরবাবু সারাক্ষণ বই বা কমপিউটার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন৷ জীবরত্ন আসাতে খুশিই হলেন৷ জীবরত্নের ডায়েরির ব্যাপার উনি ভালই জানতেন । মাঝেমাঝে ঠাট্টা করে বলতেন, “বুঝলে রত্ন, যদি ব্লাড গ্রুপ আর ডিএন এর স্যাম্পলটাও নিয়ে রাখতে তোমার ডায়েরি থেকে দুটো থিসিস হতে পারত৷”

আজও প্রথমেই সেই কথাটা বলতে জীবরত্ন বললেন, “ঠাট্টা করছ কর কিন্তু আমার যা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হচ্ছে কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারছি না৷”

মিহিরবাবু বললেন, “ঝেড়ে কাশো তো দেখি--”

জীবরত্নবাবু নতুন বাড়িতে আসার পর যা যা অভিজ্ঞতা হয়েছে সব খুলে বললেন৷ মিহিরবাবু শুনে হোহো করে হাসলেন, “আরে এর মধ্যে কোন অলৌকিক ব্যাপার নেই। সারাক্ষণ মৃত লোকদের নিয়ে পড়ে থেকে যে ভূত দেখনি এটাই আশ্চর্য৷ ”

“দেখ, এখানে আসার পর বিনয়বাবুর কিছু লেখা পড়লাম, সবই প্যারানর্মাল সংক্রান্ত৷ এছাড়া ওমেন, এক্সরসিস্ট, প্যারানর্মাল ইত্যাদি সিনেমার ওঁর ভালো কালেকশান ছিল। আমিও ওগুলো দেখছি৷ আচ্ছা একটা কথা বল৷ তুমি তো কিছুই বিশ্বাস কর না,অথচ তোমারবাড়িতে, অলৌকিক, ধর্ম এমনকি ভূতের বই গাদা গাদা রয়েছে দেখছি"

“দেখ রত্ন, প্রতিপক্ষ এইসব অলৌকিক ঘটনার কী যুক্তি দিচ্ছে না জেনে খন্ডন করবো কী করে? যদিও যত পড়ছি ততই অবাক হচ্ছি সমাজে শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত লোকদের মধ্যে ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার অভাব দেখে। এক শিক্ষিত ভদ্রলোক বললেন উনি গণেশকে দুধ খেতে দেখেছেন৷ তর্ক করতে গেলে ভাববেন ওঁকে মিথ্যেবাদী বলছেন গণেশ যে একটা কাল্পনিক দেবতা, তা ওঁকে কে বোঝাবে? আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার এমনভাবে মজ্জায় মজ্জায় মিশে রয়েছে যে তা দূর করতে হারকিউলিসও পারবেন না।”

“তুমি আমাকে সেই দলে ফেললে নাকি?”

জীবরত্নের প্রশ্ন শুনে মিহিরবাবু বললেন, “আরে না। তুমি যা বললে সবই ব্যাখ্যা করা যায়৷ হয়ত তোমার শোবার ঘর পশ্চিম দিকে, তাই বসবার ঘরের থেকে একটু গরম লাগে৷ আর বিনয়বাবুর প্যারানরমাল বিষয়ে আগ্রহ আছে জেনে তুমিও ঐসব সিনেমা দেখতে শুরু করলে। কেন করলে মনোবিদরা হয়ত বলতে পারবে।”

জীবরত্ন মন দিয়ে মিহিরবাবুর লেকচার শুনছিলেন৷ মিহিরবাবু থামার পরে বললেন, “তাহলে শোনো৷ আমার শোবার ঘর পশ্চিমদিকে নয় বরং আমার বসবার ঘর পশ্চিম দিকে৷ আর বিনয়বাবু সম্পর্কে কিছু জানার আগেই বসবার ঘরটা ঠান্ডা লাগত আর প্যারানরমাল ছবিও দেখতে যখন শুরু করি বিনয়বাবু এসবের চর্চা করতেন জানার আগে। আর আমার শোবার ঘরের টিভিতে কেন এসব সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে না?”

'ভাববার কথা। তবে পুরোটাই হ্যালুসিনেশান হতে পারে৷ তুমি তো কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ,মৃত লোক পোড়ানোর পর কোন অর্গানিক কমপাউন্ডই পড়ে থাকবে না হয়ত নাভি ছাড়া। সেটা তোমরাই বলতে পারবে।”

“তা ঠিক। ওইজন্যই আমিও ভূতপ্রেত এসবে বিশ্বাস করি না। হ্যালুসিনেশান বলছ হতেও পারে। কিন্তু হ্যালুসিনেশান এত সিল্কটিভ কেন হবে?”

“তবে কি তোমার মনে হচ্ছে বিনয়বাবুর প্রেতাত্মা তোমার উপর ভর করেছে?”

মিহিরবাবুর কথা শুনে জীবরত্ন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন, “তুমি ঠাট্টা করছ৷ কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ঘরটাই বিনয়বাবুর পার্স্নালিটি নিয়েছে৷”

“তাহলে তোমার ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে একটা নতুন ফ্ল্যাটে চলে যাও৷ যেখানে কারো ছায়া বা অপচ্ছায়া থাকবে না৷”

ওটাইতো মুশকিল৷ ঘরটায় থাকতে অস্বস্তি হচ্ছে অথচ ছাড়তেও ইচ্ছে করছে না৷”

"তাহলে একটা কাজ করা ডায়েরি ঘাঁটা বন্ধ কর আর কিছুদিন পাহাড় বা জঙ্গলে ঘুরে এস।"

"মন্দ বলনি।" জীবরত্ন আর কথা না বাড়িয়ে মিহিরবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

৬

জীববরত্নের ডায়েরিতে যে তথ্য নেওয়া বাকি ছিল সেগুলো তিনি সব জোগাড় করেছেন। একটা ছোট নোট বুকে টুকে রেখেছেন। পরে বড়ো ডায়েরিতে তুলবেন। ইতিমধ্যে তাঁর পরিচিত দুজন ভদ্রলোক মারা গেছেন, একজন ক্যানসারে ও আর একজন এক দুর্ঘটনায়। এছাড়া দুজন সেলিব্রেটি মারা গেছেন। একজন গায়ক ও আর একজন অভিনেত্রী। আর একটা ডায়েরি কিনতে হবে। আপাতত ছোট নোটবুকে এগুলিও টুকে রেখেছেন। জীবরত্ন বাবু এখন ডঃ ভাওয়ালের ফ্ল্যাটে এসেছেন কিছু পরামর্শ নেবার জন্য। মিহিরবাবু একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন জীবরত্নের দুটো ঘরের ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশনের ডিস্ট্রিবিউন মাপতে। এ ব্যাপারে উনি হেল্প করতে পারেন। প্ল্যন্ক ডিস্ট্রিবিউশন না হলে ভাববার কথা। মিহিরবাবু আর একটা সাজেশন দিয়েছেন ডঃ ভাওয়ালের কাছে জেনে নিতে নার্ভাস সিস্টেমের উপর রেডিয়েশনের প্রভাব কতটা। ডঃ ভাওয়াল এই প্রশ্ন শুনে বললেন এই বিষয় নিয়ে তিনি সবে গবেষণা শুরু করেছেন। অতি সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে খুব অল্প ডোজ রেডিয়েশন ও ব্রেনকে প্রভাবিত করে। জীবরত্ন যখন প্রশ্ন করেন রেডিযেশনের ফলে ব্রেন এমন কোন সিগনাল পাঠায় কিনা যার সঙ্গে বাস্তব ঘটনার কোন মিল নেই। যেমন ঠান্ডার অনুভূতিবা হ্যালুসিনেশান ইত্যাদি।

"খুব জরুরি প্রশ্ন করেছেন। তবে এ ব্যাপারে বিশেষ করে হ্যালুসিনেশান আর রেডিয়েশনের উপর খুব একটা বেশি কাজ হয়নি। তবে মিহিরবাবু যে ব্ল্যাকবডি রেডিয়শনের কথা বলেছেন তার কোন এফেক্ট নার্ভাস সিস্টেমের উপর থাকার কথা নয়।"

"কেন বলুন দেখি?"

"দেখুন আপনি তো জানেন একটা ঘর সূর্যের আলো শোষণ করে তাই বিকিরণ করে প্ল্যাঙ্কের সূত্র মেনে। রোজই তো সূর্যের বিকিরণ আপনার শরীরে উপর পড়ছে। খুব বেশিক্ষণ রোদের মধ্যে না থাকলে ক্ষতি হয় না। আর আপনি বললেন আপনার ক্যানসার হয়নি তাই গামা রেও নিতে হয়নি। কয়েকবছর আগে পায়ের এক্সরে করিয়েছেন তখন যখন কিছু হয়নি তাই এতদিন পরে কিছুই হবে না। তবে হ্যালুসিনেশান ব্যাপারটা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না।" এই বলে টেবিলের উপর রাখা একটা প্যাডের পাতায় খস খস করে কয়েক লাইন লিখে পাতাটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে জীবরত্নের হাতে দিয়ে তিনি বললেন, "আপনি একবার ডঃ পরিমল ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে দেখা করুন। উনি যে শুধু নাম করা সাইকিয়াট্রিস্ট তা নয়। রেডিয়েশনের এফেক্টের উপর জর্জ মেসন ইউনিভারসিটি থেকে P h D করেছেন। আমাদের একটা জয়েন্ট প্রজেক্টও আছে।"

জীবরত্নবাবু কাগজ নিয়ে উঠলেন বটে তবে একটু নিরাশ হলেন। সবাই তাঁর অভিজ্ঞতাকে হ্যালুসিনেশান বলছেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারছেন না। ভাবলেন কালকেই ড ঘোষদস্তিদারে সঙ্গে দেখা করবেন।

ভাওয়ালের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে জীবরত্ন নিজের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। মালতী এখনো আসেনি। মালতী এক মধ্যবয়সী মহিলা,সন্ধেবেলা এসে রান্না করে। জীবরত্ন ঘরে থাকলে কফিও করে দেয়। জীবরত্ন বাবুর আসতে দেরি হলে ভাওয়ালের ফ্ল্যাট থেকে চাবি নিয়ে আসে। কাজ শেষ হলে চাবি ফেরত দিয়ে চলে যায়। অবশ্য ততক্ষণে প্রায়দিনই জীবরত্নবাবু ফিরে আসেন।

ফ্ল্যাটে ঢুকেই জীবরত্নের চোখ গেল সোফার সামনে রাখা টেবিলের দিকে৷ এটা আসলে কফিটেবিলের মতন৷ সোফায় বসে ওই টেবিলের উপর ডায়েরিতে যা লেখার লেখেন৷ শোবার ঘরে একটা ছোট রাইটিং টেবিল আছে। ওটা ক্লাস নোট বা রিসার্চপেপার ইত্যাদি লেখার জন্য৷

কফি টেবিলের উপর যে ডায়েরিগুলি উনি গুছিয়ে রেখেছিলেন সব এলোমেলো ভাবে ছড়ানো৷ সব কটারই পাতা খোলা । কেউ যেন তন্ন তন্ন করে কিছু খোঁজার চেষ্টা করেছে । জীবরত্নবাবু খানিকটা মন্ত্রমুগ্ধের মত সোফাতে বসলেন৷ টেবিলে দুটো ডায়েরি রাখা পাতা খোলা অবস্থায়৷ এর মধ্যে একটা দশম ডাযেরি, যার শেষ পাতাটা খোলা৷ অন্য ডায়েরির খোলা পাতাটা দেখে কিন্তু জীবরত্ন খুব একটা চমকালেন না। এটাই তিনি আশা বা আশংকা করছিলেন৷ এই পাতাতেই বিনয় বক্সীর সব তথ্য দেওয়া আছে৷ পাতায় বিনয় বক্সীর একটা ছবিও আছে৷ জীবরত্নবাবুর মনে হলঘরটা আরো ঠান্ডা হয়ে গেছে৷ ওঁর হৎপিন্ডের স্পন্দনও মনে হচ্ছে বেড়ে গেছে৷ সবই কি হ্যাল্লুসিনেশান? হঠাৎ জীবরত্নবাবুর মনে হল বিনয় বক্সীর ছবিটা ক্রমশ বড়ো হচ্ছে । না ওঁর মাথা ঘুরছে না এটা উনি বুঝতে পারলেন৷ ঘরের অন্যান্য জিনিস তো ঠিকই আছে কিন্তু কোন অদৃশ্য জাদুকরের ম্যাজিকের মতন ছবিটা বড়ো হতে হতে টেবিল ছাড়িয়ে গেল৷



জীবরত্নবাবু ভাবলেন ডঃ ভাওয়ালকে ডাকবেন৷ কিন্তু তাঁর হাত পা যেন জমে বরফ হয়ে গেছে । চোখের সামনে দেখতে লাগলেন ছবিটাটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দেয়ালে সেঁটে গেল৷ কোনরকমে দশম ডায়েরিটা হাতে নিলেন তিনি৷ এর মধ্যে বিনয় বক্সীর ছবি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে। পরনে সাদা ধুতিপাঞ্জাবী। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা৷ মুখে মৃদু হাসি৷

৭

সন্ধে সাতটায় মালতী এসে জীবরত্নবাবুর ফ্ল্যাটে দরজার পাশে রাখা কলিংবেলটা টিপল৷ নীচের তলায় চাবি আনতে গিয়ে জানল জীবরত্ন বাবু ফ্ল্যাটেই আছেন৷ কিন্তু বেল টেপার পাঁচ মিনিট পরেও কোন সাড়া না পেয়ে ভাবল উনি হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন । কিন্তু এখন তো উনি কফি খান । মালতী আবার বেল বাজাল৷ আবারও কোন সাড়াশব্দ নেই৷ মালতী ভাওয়ালের ফ্ল্যাট থেকে চাবি নিতে নীচে নামল৷ ডঃ ভাওয়াল সবে বেরোচ্ছিলেন। মালতীর মুখ থেকে সব শুনে বললেন, “আশ্চর্য! কিছুক্ষণ আগেই তো আমার সঙ্গে কথা হল৷ চল তোমার সঙ্গে যাই।”

দুজনে জীবরত্নের ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখলেন জীবরত্নবাবু সোফায় বসে কিন্তু মাথাটা সামনে ঝুঁকে আছে।

“স্যার বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।”

ডঃ ভাওয়াল কোন কথা না বলে সোফায় বসা জীবরত্নবাবুকে সোফার উপর শুইয়ে দিলেন৷ নাকের নীচে হাত দিয়ে দেখলেন। খানিকক্ষণ নাড়ি পরীক্ষা করলেন৷ কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই৷ ডঃ ভাওয়াল একবার শেষ

চেষ্টা করলেন। দু'হাত দিয়ে বুকের উপর চাপ দিলেন যদি হার্ট আবার চালু হয়। কিন্তু জীবরত্নের দেহ নিথর। জীবরত্ন বাবু আর নেই। মারা গেছেন।

মালতী এতক্ষণ কান্না চেপে ছিল যদি ডাঃ বাবু স্যারকে বাঁচাতে পারেন। এখন আর চুপ থাকতে পারল না। হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করল। ডঃ ভাওয়ালের মেডিক্যাল ইমার্জেন্সিতে মাথা ঠিক থাকে। মালতীকে বললেন ডাঃ হালদারকে ডেকে আনতে। ডেথ সার্টিফিকেট হালদার দিলেই ভাল হয়।

হঠাৎ কী মনে হতে ডঃ ভাওয়াল জীবরত্নের হাতের ডায়েরিটা তাঁর হাত থেকে তুলে নেবার চেষ্টা করলেন। ভীষণ শক্ত করে মৃত জীবরত্ন ডায়েরিটা ধরে আছেন। গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ডঃ ভাওয়াল ডায়েরিটা ছিনিয়ে নিলেন। শেষ পাতার শেষ অংশটা সদ্য লেখা। মনে হচ্ছে জীবরত্নেরই হাতের লেখা। ডঃ ভাওয়াল মৃতের মুখের দিকে তাকালেন। প্রচন্ড ভয়ে মুখ বিকৃত হয়ে গেছে।

ডায়েরির শেষ পাতা পড়ে ডঃ ভাওয়াল থ হয়ে গেলেন। প্রায় স্বগত উক্তির মত পডতে লাগলেন, "জীবরত্ন জানা। জন্ম ১২ এপ্রিল ১৯৫৪। মৃত্যু ১৬ জুন ২০১৬। ধূমপান --না। মদ্যপান - না। মৃত্যুর কারণ – হার্ট ফেল।

ছবিঃ শিমুল



পুষ্পেন মণ্ডল

রোববারের বিকেলে সবে খেলার মাঠ থেকে ফিরে সনু হাতমুখ ধুয়ে এসে বসেছে কম্পিউটারের সামনে, এমন সময়ে বিশু কাকুর আগমন। আজকে বাবাও ঘরে আছে। তাই সন্ধ্যায় জমিয়ে আড্ডা বসবে। সেখানে সাধারণত সনুর প্রবেশ নিষেধ থাকে। কিন্তু আজকে হঠাৎ কাকু এসেই তাকে তলব করল। হাজির হতে হাতে ধরিয়ে দিল একটা 'একশো এক ভূতুড়ে গল্প' নামে একটা বই। দেখে তার আনন্দ আর ধরে না। বিশু কাকু বলল, "একটা কেসের ব্যাপারে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় গতকাল গিয়েছিলাম, আমার একটা বন্ধুর বইয়ের দোকান আছে ওখানে। সে এই বইটা গিফট করল। ভাবলাম, এ বইয়ের কদর আমার থেকে তোর কাছে ঢের বেশি। কী? ঠিক তো?"

"একদম!" সনু ঘাড় নাড়ল হাসিমুখে।

কিন্তু বাবা নাক কুঁচকে মন্তব্য করল, "তুই এত বড়ো পুলিশ অফিসার হয়ে শেষে ভূতের বই দিলি আমার ছেলেকে? তুই নিজে ভূতে বিশ্বাস করিস? যত সব কুসংস্কার।"

চোখ বড়ো বড়ো করে বিশু কাকু বলল, "কী বলিস বুম্বা! আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা শুনলে চমকে যাবি। তবে সেটাকে ভূত না বলে একটা অলৌকিক অভিজ্ঞতা বলতে পারিস। তাছাড়া পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষের মনে অনেকটা প্রভাব ফেলে। ফলে অনেক কিছু দেখা যায়, যার যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে কোন উত্তর পাওয়া যায় না।"

এরপর আয়েশ করে স্পেশাল দারুচিনির চায়ে চুমুক দিতে দিতে বিশু কাকু গল্পটা বলল –

ঘটনাটা ঘটেছিল উত্তরবঙ্গের এক জঙ্গলে। তখন আমি সদ্য পা দিয়েছি কর্মজীবনে। শিলিগুড়িতে পোস্টিং। সময়টা ছিল মার্চ এপ্রিল মাস। প্রচণ্ড গরম। সপ্তাহ খানেকের ছুটি পেয়ে বেরিয়ে পড়লাম একা একা। ভুটান লাগোয়া একটা নির্জন 'হোম স্টে'র খোঁজ পেয়েছিলাম। ওদিকে বেশ আরামদায়ক ঠাণ্ডা ছিল তখন।

আমি যে পুলিশের লোক সেটা এখানে প্রকাশ করিনি। তাক লেগে গেল বাংলোটার ইন্টিরিয়র দেখে। পালিশ করা কাঠের মেঝে, দেয়াল। তার উপর বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের স্টাফ। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরের লনে দাঁড়িয়ে দেখলাম বেশ কিছুটা দূরে পাহাড়ের ঢালে কলকল করে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী। দেখেই মনটা নেচে উঠল আনন্দে। দূরের আকাশটা পরিষ্কার, ঘন নীল। গতকাল রাতে যখন এখানে এসে পৌঁছেছি, তখন এই ছবির মত নৈসর্গিক দৃশ্যটা চোখে পড়ার সুযোগ ছিল না। পুরানো গাড়িটা অনলাইনে বেচে নতুন একটা ভালো ক্যামেরা কিনেছিলাম। ইচ্ছা, ফটোগ্রাফির দুনিয়ায় একটা ছাপ ছেড়ে যাওয়ার।

প্রথম দুদিন নিশ্চিন্তে ঘুরে ঘুরে বেশ কিছু সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ আর দুর্দান্ত সব পাখির ছবি ক্যামেরাস্ত করলাম। আর একটা জিনিস খেয়াল করলাম, এখানে টুরিস্টের ভিড় খুবই কম। ম্যানেজার দুজন কর্মচারী ছাড়া কাউকে দেখাই যায় না।

একদিন রাতে দেখলাম কোণের একটা টেবিলে এক ভদ্রলোক একা খেতে বসেছেন। কেন যেন খুব চেনা চেনা লাগল। গায়ে একটা ছাই রঙের ফুল হাতা জামা, মাথায় গোল সাদা কাপড়ের টুপি। মুখ ভর্তি সাদা দাড়িগোঁফের জঙ্গল। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা। এক মনে খাবার মুখে পুরছেন। আমি গুটি গুটি পায়ে গিয়ে বিনম্র গলায় জানতে চাইলাম সামনের ফাঁকা চেয়ারে বসা যাবে কিনা। তিনি সানন্দে অভ্যর্থনা করলেন।

একটু পরে প্রশ্ন করলাম, "কিছু মনে করবেন না, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি। প্রেসিডেন্সিতে আপনি কি একবার স্পিচ দিতে এসেছিলেন?"

তিনি হেসে বললেন, "না, আমি নয়।"

"ও আচ্ছা, তাহলে আমারই ভুল। ..... তা এখানে বেড়াতে এসেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ," মুখে একটা গ্রাস পুরে কিছুক্ষণ পর বললেন, "তবে আমার বেড়ানোটা একটু আলাদা। ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে আমি দুনিয়াকে দেখি না।"

কথাটার মধ্যে একটা শ্লেষ ছিল। বুঝলাম আমাকে নিশ্চয়ই কোন সময়ে ক্যামেরা হাতে দেখেছেন। আগ্রহ নিয়ে বললাম, "কী রকম?"

একটু থেমে তিনি বললেন, "খেতে খেতে কথা বলা পছন্দ করি না আমি। আমার কথা শুনতে হলে খাওয়ার পরে কিছুটা সময় দিও।"

"আমার এখন অখণ্ড সময়।"

খাওয়া সেরে আমরা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলাম নদীর দিকে। রাতের পরিবেশটা ভারি সুন্দর। কোটি কোটি নক্ষত্রের টিমটিমে আলো অগুণতি আলোকবর্ষ পেরিয়ে এসে পৃথিবীর অন্ধকার সামান্য হলেও দূর করছে।

কী একটা নিশাচর পাখি 'চিকচিক' আওয়াজ করে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। আর আমার মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল, "পাখিরা কি স্বাধীন, তাই না? যখন খুশি যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারে!"

দু হাত পিছনে দিয়ে হাঁটছিলেন ভদ্রলোক, হঠাৎ আমার কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "পাখিরা কি সত্যিই স্বাধীন?"

"মানে? ওরা যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারে। কী মজা ওদের!"

"হাহাহা..." করে দমকা হেসে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। "এ কথা ঠিক যে পাখিদের ডানা আছে বলে, ডানায় ভর দিয়ে ওরা যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারে। কিন্তু কোনদিন ভেবে দেখছ কি, যে পাখিরা দূর দূরান্তে, অনেক সময়ে হাজার হাজার মাইল উড়ে বেড়ায়, তা কি শুধু বেড়াতে ভালবাসে বলে? না। ওরা যে উড়ে বেড়ায় সেটা মোটেই নিজের খেয়ালে নয়। প্রয়োজনের তাগিদে। পাখিদের বাসা বদলানোর অভ্যাস গড়ে উঠেছে লক্ষ বছর ধরে অসংখ্য প্রজন্মের জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ হেটে গিয়ে আবার বললেন, "যেমন ধর, পাখিরা সব জায়গায় উড়ে বেড়াতে পারে। কিন্তু কখনও দেখেছ যে কাকা, চড়াই বা ঘুঘুর মত একেবারে সমতলের পাখি কখনও উত্তরের দেবদারু বার্চের জঙ্গলে উড়ে বেড়াচ্ছে? সেটা কোন দিনই সম্ভব নয়। দুনিয়ার প্রত্যেকটা পাখির নিজের নিজের জায়গা আলাদা। কেউ বাস

করে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে, কেউ বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে আবার কেউ সমুদ্রের ধারে। অদৃশ্য দেয়াল দিয়ে সব ভাগ করা আছে। আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু ওরা পায়।"

হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা লম্বা পাইন গাছের নিচে এসে দাঁড়ালাম। মাথা উঁচিয়ে উপর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুধু অদৃশ্য দেয়াল নয়। এই যে জঙ্গল দেখছ সেটা ভাগ করা আছে বেশ কয়েকটা তলাতে। শহুরে মানুষ যখন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তখন সে একটাই জঙ্গল দেখে। কিন্তু এর মধ্যেই আছে ভিন্ন ভিন্ন বন, আলাদা আলাদা তলা। যেমন পাইন গাছের বন সাধারণত দোতলা, কি তিনতলা। আবার শাল বা সেগুন গাছের বন হয় সাততলা। মানুষ প্রায়ই বাসা বদল করে। উঠে যায় অন্য তলায়। কিন্তু জঙ্গলের বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে অন্য তলার বাসিন্দাদের সাথে বাড়ি বদল করা একেবারে অসম্ভব। বন মোরগ তার স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘর ছেড়ে কক্ষণো শুকনো খটখটে চিলেকোঠায় উঠে আসবে না, আবার চিলেকোঠার বাসিন্দা চিল, সেও তার ঘর ছেড়ে গাছের গোড়ায় বাসা বাঁধতে যাবে না।"

আমি বললাম, "বাবা! কত কিছু জানার আছে!"

"গাছের মাঝামাঝি তার ভিতরটা কিন্তু খুব ঠাণ্ডা। শীতকালে সেখানে কেউ থাকলে জমে যাবে। গ্রীষ্মকালে অবশ্য বেশ আরামদায়ক। বিশেষত পেঁচা আর বাদুড়দের পক্ষে। দিনের বেলা তারা কোথাও কোন জঙ্গলের কোণে ঝিমিয়ে কাটিয়ে দেয়। কাজে বের হয় রাতের শিফটে।"

"আপনার তো দেখছি এসব বিষয়ে বিশাল জ্ঞান। সারা জীবন জঙ্গলেই কাটিয়েছেন মনে হয়।"

"তা একরকম ঠিকই বলেছে। পৃথিবীর এমন কোন বড়ো জঙ্গল নেই যেখানে আমার পা পড়েনি। বছর পনের আগে আমাজনের জঙ্গলে মরতে বসেছিলাম প্রায়।"

"তাই! কীভাবে?"

"একটা এক্সপিডিশানে গিয়েছিলাম। নতুন ধরনের কিছু প্রাণীর খোঁজ করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। 'মানাকাপুরু' থেকে সোলিমস নদী ধরে প্রায় দেড়শ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে 'আনোরি' নামে এক জায়গায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে এক ধরনের লাল রঙের বাদুড়ের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে সাধারণত যে লালচে বাদুড় দেখা যায় তার থেকে এটা আলাদা। এদের রং ঘন খয়েরি, কানগুলো অন্য বাদুড়ের থেকে অনেকটা লম্বা। আর সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল এদের খাদ্যাভ্যাস। এরা অন্য বড়ো প্রাণীর রক্ত চুষে খায়।"

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর কী হল?"

হঠাৎ গম্ভীর গলায় বললেন, "আজকে অনেক রাত হল। আমার একটা জরুরি কাজ আছে। এখন তুমি ঘুমাতে যাও। পরে কথা হবে।"

আমি বললাম, "চলুন এক সাথে ফিরব।"

"না, আমি পরে ফিরব। তুমি যাও।" বলে নদীর দিকে চলে গেলেন। আমি একটু হকচকিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে উঠে ক্যামেরাটা নিয়ে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময়ে পিছন থেকে আওয়াজ এলো, "নতুন কিনলেন? এতে নাইট ভিশান আছে?"

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি মাঝারি উচ্চতার একজন মধ্যবয়স্ক লোক। মাথায় গোল টুপি, গায়ে ফুল হাতা ঢলঢলে সবুজ রঙের জামা, আর টেরিলিনের প্যান্ট। সূচালো মুখের উপর ঝোলা গোঁফ। কোঠোরে বসা চোখ। তার উপর গোল গোল চশমা। বয়েস পঞ্চাশের উপরে।

হেসে বললাম, "হ্যাঁ, তা আছে।" বলেই পাশ কাটিয়ে এগোতে যেতে আবার পিছন থেকে মন্তব্য করলেন, "এদিকে কি প্রথম এলেন নাকি মশাই?"

দাঁত চেপে গম্ভীর গলায় বললাম, "হ্যাঁ।"

"আমি অনেক দিন ধরে আসছি। আপনি যদি জঙ্গলের ছবি তুলতে চান আমাকে বলবেন, এমন জায়গায় নিয়ে যাব যে চমকে যাবেন। চারিদিকে শুধু বড়ো বড়ো গাছের সারি। যেখানে মাটিতে সূর্যের আলো পৌঁছায় না।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি গাইড?"

"হা হা হা! আমাকে দেখে কি তাই মনে হয় নাকি! আমি বনের মধ্যে থেকে ঔষধি গাছগাছড়া সংগ্রহ করি।"

আমি থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "মানে আয়ুর্বেদিক, আপনি কবিরাজ?"

হেসে বললেন, "ঠিক ধরেছেন, অধমের নাম শ্রী রমেশচন্দ্র বৈদ্য। শিলিগুড়িতে একটা ডিস্পেনসারি আছে। এই রিসর্টের মালিকেরই দোকান ওটা। তাই এক আধ দিন কাটিয়ে যাই বিনা পয়সায়। হেহে!"

"আচ্ছা?"

"হ্যাঁ, আমার দেয়া ওষুধ খেয়ে ভদ্রলোকের বহু পুরানো হাঁপানি সেরে গেছে। তাই আমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন।"

আমি বড়ো ইউক্যালিপটাস গাছটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু লোকটি আমার পিছু ছাড়লেন না। পিছন পিছন এসে বললেন, "তা আপনার এই ছবি তোলার শখটা তো একেবারেই নতুন, তাই না?"

"কী করে বুঝলেন? আপনি কি আয়ুর্বেদের পাশাপাশি জ্যোতিষচর্চাও করেন?"

"ও ঠিক বোঝা যায়। প্রফেশনালরা যেখানে সেখানে ক্যামেরা তাগ করে না।"

কথাটা শুনে একটু মানে লাগল। কোন সাড়া না দিয়ে পাথর বেয়ে খাড়াই কিছুটা উঠে মোটা গাছের নিচে এসে দাঁড়ালাম। গাছের গোড়ায় নাম না জানা পাহাড়ি ছোটো ছোটো রঙিন ফুল গুলো কি সুন্দর! হাঁটু মুড়ে বসে গোটা কতক ক্লিক করলাম। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, এখান থেকে একটা ভালো ভিউ পাওয়া যাচ্ছে নদীটার। তারপরে শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। আর একদিকে পাহাড়ের ধাপে চায়ের বাগান। ঐ দিকে দু চারটে ক্লিক করে ঘাড় ঘোরাতেই দেখি ভদ্রলোক আবার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখাচোখি হতে বললেন, "হেহে... রাগ করবেন জানি, তবু আজকে আপনার পিছন ছাড়ব না।"

"কেন বলুন তো?"

গম্ভীর গলায় বললেন, "আসলে আপনার সাথে আমার একটা দরকার ছিল। এবং সেটা একটু গোপনে।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম, "মানে? সবে দু মিনিট আগে আপনার সাথে আমার আলাপ হল। এখনও আমার নাম পর্যন্ত আপনি জানেন না। তা আমার সাথে গোপন কি দরকার থাকতে পারে?"

"আপনার নাম আমি জানি। কৌস্তব দত্ত। বাড়ি বেহালা, কলকাতা।"

আমি ভ্রূ কুঁচকে তাকাতে হেসে বললেন, "আপনি যখন রেজিস্টারে নাম লিখছিলেন আমি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, খেয়াল করেননি।" তারপর একটু ইতস্তত করে চাপা গলায় বললেন, "আসলে ব্যাপারটা সবাইকে বলা যাবে না বুঝলেন। আর বললে সবাই বিশ্বাসও করবে না। সপ্তাহখানেক হল আছি এখানে, একটা অদ্ভুত লোককে দেখছি। আচরণটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। সারা দিন ঘুমায়। আর রাত্রিবেলা চুপি চুপি বেরিয়ে যায়। আবার ভোরবেলা ফিরে আসে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "তা আমি কি করব? পুলিশে খবর দিন। টেররিস্ট হতে পারে।"

"না ওসব নয়। এটা অন্য কেস।"

"সেটা আপনি জানলেন কি করে? আপনিও কি নিশাচর নাকি?"

"না না, তা কেন? আসলে ঐ লোকটার আর আমার রুম একেবারে সামনা সামনি। তাই আমি খেয়াল করেছি ব্যাপারটা। আর দুদিন আগে রাতে আমি চুপি চুপি লোকটার পিছনে ধাওয়াও করেছিলাম।"

"ধাওয়া করেছিলেন? কেন?"

"আসলে তার আগের দিন, ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে নদী পেরিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিলাম কিছু ঔষধি গাছের সন্ধানে। হঠাৎ দেখি ঐ লোকটা বেরচ্ছে জঙ্গলের ভিতর থেকে। আবছা আলোয় যা দেখলাম, তাতে পিলে চমকে গেল। লোকটার কষে রক্ত তখনও লেগে আছে।"

"রক্ত? অন্ধকারে রক্ত বুঝলেন কী করে?"

"লোকটা চলে যাবার পর জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে দেখলাম, একটা পূর্ণবয়স্ক শিংওয়ালা সম্বর তখনও থরথর করে কাঁপছে। কাছে গিয়ে দেখি তার গলায় দুটো ফুটো। শরীরের পুরো রক্ত শুষে খেয়ে নিয়েছে।" বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, "লোকটা আসলে একটা ভ্যাম্পেয়ার!"

"মানে রক্তচোষা বাদুড়?"

"একদম। ওঁর কাণ্ডকারখানা খুব ভয়ানক বুঝলেন? ওদের একটা দল আছে। আমি একা এগোতে ঠিক সাহস পাচ্ছিনা। তাই বলছিলাম কি, আপনি যদি আমার সঙ্গ দেন তাহলে লোকটাকে একেবারে হাতে নাতে ধরতে পারি।"

"হা.. হা.." করে আমি এত জোর হেসে উঠলাম যে পাশের গাছ থেকে দুটি পাহাড়ি মুনিয়া ভয়ে উড়ে পালাল।

তিনি রেগেমেগে বললেন, "আমার কথা তাহলে বিশ্বাস হল না। বেশ, ঠিক আছে।"

ভদ্রলোক উলটো দিকে পা বাড়ালেন। আমি বললাম, "আরে দাঁড়ান মশাই। রেগে গেলেন নাকি! বলছিলাম ভদ্রলোকটি কে?"

আমার কথা শুনে রমেশবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এসে বললেন, "ঐ তো যার সাথে আপনি কথা বলছিলেন সেদিন রাতে। অমরনাথ বরকন্দাজ।"

আমি অবাক গলায় বললাম, "উনি তো খুব ভালো মানুষ। জঙ্গলের উপরে কত জ্ঞান।"

"আরে রাখুন মশাই, জঙ্গলের উপরে জ্ঞান ওর থেকে আমার ঢের বেশি।"

"আচ্ছা! তা সে কথা বাদ দিন। রাতে পিছনে ধাওয়া করে কী অদ্ভুত কাণ্ড দেখলেন সেটা বলুন।"

একটু চুপ করে থেকে বললেন, "কদিন আগে, খাওয়া দাওয়া সেরে হাঁটতে হাঁটতে লন পেরিয়ে পাইন গাছের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি সবে। অন্ধকারের মধ্যেও হালকা আলোতে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল চারপাশ। আমার ধূমপানের অভ্যাস বহুদিনের। সিগারেটটা ধরিয়ে সবে টান দিতে শুরু করেছি, এমন সময়ে দেখি লোকটা চুপিসাড়ে বেরিয়ে এল বাংলোর গেটের বাইরে। এদিক ওদিক লক্ষ করে দেখল কেউ কোথাও নেই। আমি ততক্ষণে আগুনটা নিভিয়ে লুকিয়ে পড়েছি গাছের আড়ালে। দেখি সুড়সুড় করে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। আমিও কৌতূহল চাপতে না পেরে কিছুটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করলাম। কিছুটা গিয়ে নদীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। অবাক হয়ে দেখলাম খালি পায়ে কনকনে বরফ গলা জলে নেমে পড়লেন। চোখের পলকে নদীটা পেরিয়ে আবার সেঁধিয়ে গেলেন ওদিকের জঙ্গলে।"

"তারপর?"

"আমিও নাছোড়বান্দা। নামলাম জলে। খুব গভীর নয়। হাঁটুজল থেকে উঠে নুড়ি বালি পেরিয়ে ওপারে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। প্রথমে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে, বেশ কিছুটা গভীরে ঢুকে হঠাৎ চোখ গেল একটা মোটা গাছের নিচে লোকটার গায়ের কোট, জুতো আর টুপিটা পড়ে রয়েছে। উপরে তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক মাকড়শার মত গাছটার মগডালের দিকে এগুচ্ছেন। গাছে তো আমিও উঠতে পারি। তা বলে মশাই ঐ রকম খাড়াই গাছে এই বয়েসে ওঠা কোন মানুষের কম্ম নয়। বললে বিশ্বাস করবেন না, কিছুক্ষণ পরেই একঝাঁক বাদুড় তেড়ে এলো আমার দিকে। পড়িমরি করে দৌড় লাগালাম।"

বললাম, "আপনার কথাগুলি শুনতে বেশ মজা লাগল। কোন ছোটো বাচ্চাকে বললে সে হয়ত রাতে দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে। আমার মনে কোন রেখাপাত করেনি।"

কথাটা শুনে মুখটা কাঁচুমাচু করে বললেন, "বেশ, বিশ্বাস আপনাকে করতে হবে না। শুধু একটা অনুরোধ, দূর থেকে একটু লক্ষ রাখবেন।"

তা সেই তথাকথিত ভ্যাম্পেয়ার ওরফে অমরনাথবাবু আর কবিরাজ দুজনকেই দূর থেকে লক্ষ রাখছিলাম ক'দিন। দিনের বেলা সব কোথায় থাকে কিছুই বোঝা যায় না। যত কার্যকলাপ শুরু হয় সব রাতে। কিছু একটা সন্দেহজনক ব্যাপার তো আছে।

একদিন রাতে খাওয়ার পর ভাবলাম অমরনাথবাবুকে ফলো করব। প্রতি রাতে কোথায় যান একবার দেখতে হবে। আসলে পুলিশের লোক তো, সন্দেহজনক কিছু দেখলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। দেখি কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে সামনের ছোটো জঙ্গলটা পেরিয়ে নদীর পাড়ে নেমে গেলেন।

এমন সময়ে কবিরাজমশাই অন্ধকার ফুঁড়ে এসে পাকড়াও করলেন আমাকে। ফিসফিস করে জানতে চাইলেন, "কী বুঝলেন মশাই?"

আমি গলা ঝাড়া দিয়ে বললাম, "কী আবার বুঝব?"

"এত রাতে কোথায় যাচ্ছে দেখবেন না একবার?"

বললাম, "আমি দেখে কী করব? সব ব্যাপারে কৌতূহল দেখানো ভালো নয়।"

"আপনি দেখছি ভিতু মানুষ। ভয় পেয়েছেন, সে কথাটা পরিষ্কার করে বলুন না।"

কথাটা মানে লাগল। রেগেমেগে বললাম, "এতে ভয় পাওয়ার কী আছে? এখন রাতবিরেতে ওঁর পিছনে ধাওয়া করতে গিয়ে যদি আমরাই কোন বিপদে পড়ি? জঙ্গলে সাপ-খোপ, বিছে কত কিছু আছে, চিতাবাঘ, ভাল্লুক, বুনো হাতি।"

"আরে না না, ওসব প্রাণীদের সামনাসামনি পড়ার সম্ভাবনা খুব কম। চোখ কান খোলা রেখে একটু যেতে হবে এই যা। আগে আপনার ঐ ক্যামেরাটা নিয়ে আসুন।"

"ক্যামেরা দিয়ে কী হবে?"

"নাইট ভিশান আছে তো? অন্ধকারে ছবি তোলা যাবে। লোকটার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ চাই।"

কী মনে হল, আমি দৌড়ে গিয়ে রুম থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখি আর একজন টুপি পরা লোক কথা বলছেন কবিরাজমশাইয়ের সঙ্গে। বেঁটেখাটো চেহারা, ছোটো ছোটো চোখ, মুখের গড়ন নেপালীদের মত, আনুমানিক তিরিশের আশেপাশে বয়েস। কোমরে গোঁজা একটা বড়ো ভোজালি। পিঠে একটা কালো ব্যাগ। কবিরাজ মশাই পরিচয় করিয়ে দিলেন, "এ হল দেবা। পাশের গ্রামে থাকে। কিছুদিন হল এদের গ্রামের পোষা জন্তুগুলো ঐ রক্তচোষা বাদুড়দের শিকার হচ্ছে।"

পিছু নিলাম ওদের। নদীর পাড়ে নামতে দেখি বালি আর নুড়ি গুলি রাতের অন্ধকারে চকচক করছে। জলের স্রোত কিছুটা দূরে। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে তীর বেগে ছুটে চলেছে হিমালয় থেকে নামা বরফ গলা জল। কবিরাজ বললেন, "এবার জুতো গুলো খুলে হাতে নিন। আর প্যান্টটা গোটান।"

তাই করলাম। জলে পা দিতেই মনে হল পাটা বুঝি কেউ কেটে নিয়ে চলে গেল। এত ঠাণ্ডা। নদীটা পেরিয়ে একটা পাথরের উপর বসে আবার পরে নিলাম জুতো। পকেটে একটা ছোটো পেনসিল টর্চ রাখা ছিল। জঙ্গলে আসব বলে কিনেছিলাম। টর্চটা জ্বালতেই হাঁহাঁ করে উঠলেন কবিরাজ মশাই। "করছেন কি? নেবান, নেবান। খবরদার আলো জ্বালবেন না।" জঙ্গলের গভীরে ঢুকতেই একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। এত নিঝুম শান্ত বন আগে কখনো দেখিনি। নিশাচর প্রাণীরাও যেন সব লুকিয়ে পড়েছে। যদিও মাঝে মাঝে রাতজাগা পাখিদের ডাক কানে আসছিল। আমি কবিরাজের পিছন পিছন এগোচ্ছি। সবার সামনে দেবা। মনের মধ্যে একটা ভয় চেপে বসছে। এই সদ্য পরিচিত লোক গুলোর সাথে দুম করে এত রাতে জঙ্গলে চলে আসাটা কি ঠিক হল! সার্ভিস রিভলভারটাও সঙ্গে নেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর বললাম, "অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যাচ্ছি আমরা? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

"চিন্তা করবেন না। এ জঙ্গল আমার হাতের তালুর মত চেনা। আরও কিছুটা যেতে হবে।"

চোখটা সয়ে গেছে ততক্ষণে। অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি চারপাশটা। পাহাড়ের সানু দেশে এসে পড়লাম। এদিকে যত এগোচ্ছি বন আরও ঘন হচ্ছে। ঝোপ ঝাড় ঠেলে চলতে গিয়ে গুল্ম কাঁটায় ছড়ে গেল হাত। শুকন পাতার উপর আমাদের পায়ের শব্দ 'মচ মচ' করে কানে আসছে শুধু। শেষে একটা মোটা গাছের নিচে এসে দাঁড়ালাম। উপরে তাকিয়ে দেখি লম্বাতেও বিশাল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটা পেঁচা চিৎকার করতে করতে উড়ে গেল। বহু দূর থেকে শুনতে পেলাম হায়েনার হাঁসি।

কবিরাজ মশাই ফিসফিস করে বললেন, "এই সেগুন গাছের উপরে হচ্ছে ওদের বাসা।"

"এখানে তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।"

"সব দেখতে পাবেন। আসুন আমার সাথে।" বলে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে, পাশে একটা ঝোপ টেনে ফাঁক করে বললেন, "দেখুন তো এখানে কী আছে?"

আমি পকেট থেকে পেনসিল টর্চটা বের করে এক ঝলক দেখেই চিনতে পারলাম। অমরনাথবাবুর গায়ের জামা, প্যান্ট, টুপি সব এখানে পড়ে আছে। লোকটা গেল কোথায়? আশ্চর্য!

চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা কী করব এখন?"

"ঐ পালের গোদাটাকে খতম করব।"

"আমরা কেন? বনদপ্তরের লোককে বলুন?"

"সরকারি লোকজন সব ফাঁকিবাজ। এত গভীর জঙ্গলে ওরা আসে না। তাই দেখতেও পায় না। যা করার আমাদেরই করতে হবে। এবং সেটা খুব তাড়াতাড়ি। কারণ আজকালের মধ্যেই এরা ছড়িয়ে পড়বে বিভিন্ন জঙ্গলে। তখন আর এদের আটকানো যাবে না।"

"আপনি কী বলছেন কিছুই ঢুকছে না আমার মাথায়।"

"মাথায় ঢোকার দরকার নেই। শুধু জেনে রাখুন, ঐ লোকটা দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গল থেকে শয়তানকে সঙ্গে করে এনেছে। এই জঙ্গলের সমস্ত জন্তুজানোয়ার শেষ হয়ে যাবে।"

এরপর কবিরাজ মশাই দেবাকে কানে কানে কীসব বললেন। সে সেই মোটা গাছাটার ফুটদশেক দূরে অন্য একটি লম্বা গাছে উঠে গেল নিঃশব্দে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ক্যামেরাটা চোখে লাগিয়ে দেখুন তো এই গাছটার মাথার দিকে কিছু দেখতে পান কিনা।"

আমি ক্যামেরার নাইট ভিশান চালু করে আই হোলে চোখ দিলাম। জুম করতে ফিল্ম নেগেটিভের মত সাদাকালো ছবি ভেসে উঠল। প্রায় পঞ্চাশ ষাট ফুট উপরে গাছের ডালপালা আর পাতার আড়ালে কিছু প্রাণীর নড়াচড়া বেশ বোঝা যাচ্ছে। এবং প্রাণীগুলি যে বাদুড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাদা চোখগুলি চকচক করছে। এরা তো নিশাচর প্রাণী। সেগুন গাছের কাণ্ডের মধ্যে একটা বড়ো ফোকর চোখে পড়ল। কিন্তু ওটা কী? একটা মানুষ! পা উপর দিকে আর মাথা নিচের দিকে করে ঝুলছে একটা মোটা ডাল থেকে। আশ্চর্য! আরও জুম করতে, দেখলাম ঠিক মানুষ নয়, তবে মানুষের মতই বড়োসড়ো চেহারা। কানটা সূচালো লম্বা, থ্যাবড়া মুখ, হাতের সাথে জোড়া বাদুড়ের মত ডানা। স্থির হয়ে নেই। ক্রমাগত দুলছে। গাছের ডালে পাটা আটকে দুলতে দুলতে কিছু একটা জিনিস ফোকরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ওটা কি অমরনাথ বাবু!

এই পর্যন্ত বলে বিশু কাকু আমাদের গোল গোল চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সনু প্রশ্ন করল, "তারপর?"

বিশু কাকু খালি চায়ের কাপটা রেখে আবার শুরু করল।

সেই রাতে প্রাণ হাতে করে পালিয়ে আসতে পেরেছি আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য ভালো। কবিরাজ আর সেই ছোকরার সাংঘাতিক প্ল্যানের কথা যদি আগে থেকে জানতাম, তাহলে ওদের সাথে কখনই যেতাম না।

আমি অমরনাথ বাবুর ঐ চেহারা দেখে যখন রীতিমত ঘাবড়ে গেছি, কবিরাজ কানের কাছে এসে বললেন, "যা দেখছেন রেকর্ড করে রাখুন। পরে কাজে আসবে।"

আমি রেকর্ডিং সুইচটা অন করতে আবার বললেন, "ওটার পাশের লম্বা গাছটায় দেখুন তো, কোন কিছু লক্ষ পড়ছে?"

ক্যামেরার মুখটা ঘুরিয়ে পাশের গাছটায় ফোকাস করতে দেখি, দেবা কখন সেখানে উঠে গেছে। ফিস ফিস করে প্রশ্ন করলাম, "ও কী করছে?"



"দেখুন না কী করছে।"

দেখলাম দেবা দু পা মুড়ে একটা ডাল থেকে ঝুলে পড়ল। তারপর পিঠের ব্যাগ থেকে একটা ছোটো বাক্স বের করে দড়ির সাহায্যে সেটাকে ঘোরাতে শুরু করল। তারপর টুক করে ছেড়ে দিতে সেটা সাঁ করে গিয়ে ঢুকে গেল ওক গাছের বড়ো ফোকরের মধ্যে।

"কী আছে ঐ বাক্সের মধ্যে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

হিসহিসে গলায় কবিরাজ বলল, "ডিনামাইট।"

ডিনামাইট! তরতর করে নেমে আসছে দেবা। আচমকা বেশ কিছু বাদুড় উড়ে গিয়ে তাকে কামড়ে দিল। দেবা আর্তনাদ করে উঠল যন্ত্রণায়। তারপর গাছের উপর থেকে হাত ফসকে ডালপালা ভাঙতে একদম নিচে এসে পড়ল। চিৎকার করে শুধু বলল, "পালাও!" দেখলাম পোশাকের উপর দিয়েই পাঁচ ছটা বাদুড় তার সারা গায়ে কামড়ে বসে আছে। আর সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেগুলোকে ছাড়ানোর।

পাশে ঘুরে দেখি কবিরাজমশাই ততক্ষণে দৌড় লাগিয়েছেন। আমিও ঘাবড়ে গিয়ে ছুটলাম তাঁর পিছনে। কিন্তু হঠাৎ উড়ে এসে কবিরাজের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল সেই বিশাল বাদুড়। চোখগুলো অন্ধকারের মধ্যে সবুজ বাল্বের মত জ্বলছে। হিংস্র দাঁতগুলি ফুটিয়ে কামড়ে ধরলেন তাঁর গলায়। তিনি মাটিতে পড়ে চিৎকার করে উঠলেন। এই দৃশ্য দেখে আমার তখন আত্মারাম খাঁচাছাড়া। তারপরেই মাথার উপরে একটা কানফাটা বিকট বিস্ফোরণের শব্দ। সাথে তীব্র আলোর ঝলকানি। ছিটকে পড়ে গেলাম। কেঁপে উঠল বনপাহাড়। একটা আগুনের গোলা তেড়ে আসছে। কানে তালা লেগে গেছে, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছিনা। বড়ো গাছটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে। কোন রকমে উঠে দৌড় লাগালাম। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আবার পড়লাম লতানে গাছে পা জড়িয়ে, মাথাটা গিয়ে লাগল একটা পাথরে। গড়িয়ে গেলাম একটা খাদের মধ্যে। আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম একটা কুঁড়ে ঘরে বাঁশের বিছানায় শুয়ে আছি। অচৈতন্য অবস্থায় আদিবাসীরা খাদের মধ্যে থেকে ভোরবেলা তুলে এনেছে আমাকে। রাতে প্রচণ্ড আওয়াজে সবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ভোরে জঙ্গলে গিয়ে দেখে অনেকটা জায়গা জুড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। একটু ধাতস্থ হতে দু জন আদিবাসীর কাঁধে ভর দিয়ে ফিরলাম বাংলোয়। তখন সূর্য মাথার উপরে। দামী ক্যামেরাখানা আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরে ম্যানেজারকে প্রশ্ন করতে বলল, "সেই দিন রাত থেকে অমরনাথ বরকন্দাজ আর রমেশচন্দ্র আচার্য দুজনেই বেপাত্তা। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, তবে এখানে আঠারো মাসে বছর।"

হোটেল ছাড়ার সময়ে দুজনেরই নাম ঠিকানা নোট করে নিয়েছিলাম। পরে বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ খবর নিয়ে যা জানলাম, সেটা খুবই সাংঘাতিক।

কবিরাজের আসল নাম সুহাস আচার্য। অমরনাথবাবু আর সুহাস আচার্য দুজনেই জুলজিস্ট, মানে প্রাণীবিদ। বছর পনের আগে অমরনাথ বাবু একটা অভিযানে গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনের জঙ্গলে। সেখানে ওঁর সঙ্গী ছিলেন সুহাস বাবু। দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে এক ধরনের নতুন প্রজাতির রক্তচোষা লাল বাদুড়ের খোঁজ পেয়েছিলেন ওনারা। এই বাদুড়গুলি ছিল লুপ্ত প্রায় প্রজাতির। অতি কষ্টে দুটি নমুনা সংগ্রহ করে এনেছিলেন সেখান থেকে। পরে বাদুড়গুলিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা যায় এদের লালার মধ্যে একধরনের ব্যাক্টিরিয়া রয়েছে যার থেকে ক্যান্সার সমেত বেশ কিছু জটিল রোগের এন্টিভাইরাস তৈরি করা সম্ভব। আরও কিছু জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল তাদের শরীরে।

এই তথ্যগুলি আমাকে দিলেন প্রফেসার বিজয়া রমন। ইনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ওঁদের কলিগ ছিলেন। যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যে ল্যাবরেটরিতে একটা দুর্ঘটনায় সুহাস বাবুর একদিকের মুখ পুড়ে যায়। অমরনাথ বাবুর অসাবধানতার জন্যই এটা হয়েছিল। কিন্তু সুহাসবাবুর ধারণা সেটা তিনি ইচ্ছা করে করেছিলেন। তারপরেই সেই বাদুড়দুটি হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যায়। বিজ্ঞানের একটা নতুন আবিষ্কার থমকে যায়। পরে আবার একটা টিমকে আমাজনে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা আর খুঁজে পায়নি বাদুড়ের ডেরাটিকে।

এদিকে সুহাস আচার্য ওরফে কবিরাজ প্ল্যাস্টিক সার্জারি করিয়ে ফিরে আসেন দেশে। পরে ভুটানের জঙ্গল লাগোয়া ঐ বাংলোর মালিক সুরিন্দর সিংএর সাথে হাত মিলিয়ে চোরাচালান করছিলেন বেশ কয়েক বছর ধরে। গণ্ডার আর হরিণের সিং, হাতির দাঁত, জন্তুদের চামড়া বিদেশে পাচার করতেন। হঠাৎ করে সেই বাংলোয় হাজির হন অমরনাথবাবু। আর প্রতি রাতে জঙ্গলে যাওয়া শুরু করেন। এতে সুহাসবাবুদের কাজের অসুবিধা হয়। কারণ রাত্রিবেলাই জন্তু জানোয়ার ধরা বা মারার কাজটা হত। সুহাসবাবু তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু অমরনাথবাবু চিনতে পারেননি তাঁর পুরানো সহকর্মীকে। নিজের চেহারা অনেক পালটে ফেলেছিলেন সুহাস আচার্য।

অমরনাথবাবু সেই বাদুড়গুলিকে এতদিন ধরে সযত্নে লালন পালন করে বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন নিজের তত্ত্বাবধানে। বাকি ছিল শুধু তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া। সেটাই করতে গিয়েছিলেন জঙ্গলে। কিন্তু বাদ সাধলেন সুহাসবাবু। পুরানো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এমন সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাননি তিনি। এদিকে আমি গিয়ে পড়লাম ওদের মাঝখানে। আমাকেও মেরে ফেলার প্ল্যান ছিল। আসলে কোন সাক্ষী রাখতে চায়নি অপরাধীরা। কিন্তু ঘটনাক্রমে ওঁরাই মারা গেলেন। আমি বেঁচে গেলাম কপাল জোরে।

এতটা বলে বিশু কাকু থামলেন। সনু কিছুক্ষণ ভেবে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, অমরনাথবাবু বাদুড় হয়ে গেলেন কী করে?"

"এই প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া মুশকিল। এমন হতে পারে যে ঐ বাদুড়গুলির কামড়ে তাঁর শরীরে জিনগত পরিবর্তন এসেছিল। ফলে রাত হলেই তাঁর চেহারাটা বাদুড়ের মত হয়ে যেত। কিছুদিন আগে একটা বইয়ে পড়ছিলাম, ঘাসের বনে এক রকম পিঁপড়ে থাকে, তারা লম্বা লম্বা ঘাসের গোড়া বেয়ে নিচে থেকে উপরে ওঠে আর ঝুপ করে নিচে পড়ে। আবার উপরে ওঠে। সারাদিন এই করতে থাকে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ঐ পিঁপড়েগুলোর মস্তিষ্কের মধ্যে 'ল্যাংসেট ফ্লুক' নামে এক ধরনের প্যারাসাইট বাসা বেঁধে থাকে যারা তৃণভোজী প্রাণীর পেটের ভিতরে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করে। ঐ প্যারাসাইটগুলোই নিয়ন্ত্রণ করে পিঁপড়েকে। মানে গরু, ছাগল বা এই ধরনের কোন প্রাণী ঘাস খাওয়ার সময়ে ঐ পিঁপড়েগুলিকে খেয়ে ফেলবে। তখন তার পেটের মধ্যে গিয়ে ওরা

বংশবৃদ্ধি করবে। আবার 'নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম' নামে এক ধরনের ফিতাকৃমি প্যারাসাইট আছে যারা গঙ্গাফড়িঙের মস্তিষ্কে বাসা বাঁধে, ফলে গঙ্গাফড়িং জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে, যাতে ঐ ফিতাকৃমিগুলি জলের মধ্যে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। সেরকম হয়ত এখানেও ঘটেছিল। অসাবধানতাবশত ঐ বাদুড়গুলি হয়ত কামড়ে নিয়েছিল অমরনাথবাবুকে। আর তাদের লালার মধ্যে থাকা কোন ব্যাকটেরিয়া ওনার মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করছিল। ফলে রাত হলেই তাঁর আচরণ পালটে যেত। তিনি হয়ে যেতেন ভ্যাম্পায়ার!"

এতক্ষণ পরে মা বলল, "আবার এমনও তো হতে পারে যে, মানসিক চাপে আপনার দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল। আপনি সেই মুহূর্তে যা দেখেছিলেন, সেটা ছিল আপনার কল্পনা।"

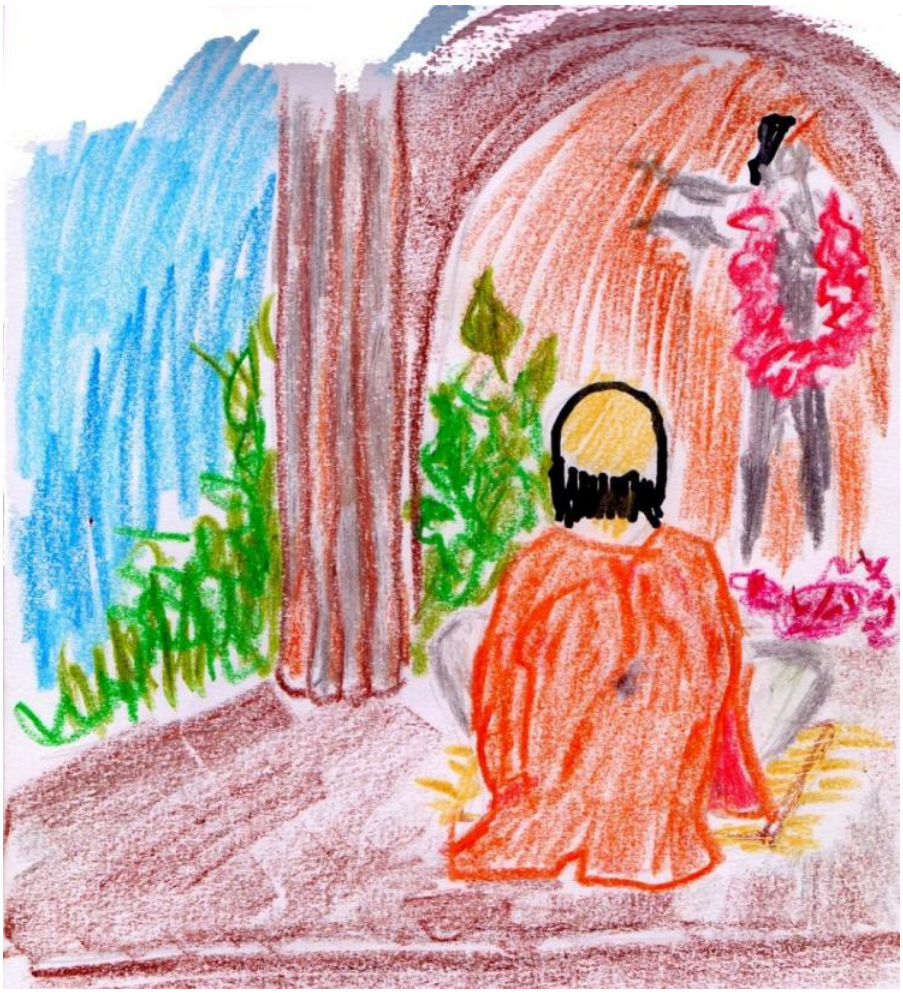
"হ্যাঁ, তাও হতে পারে। সেটা তো আমি শুরুতেই বলেছি।"

সনু গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ বইয়ের পাতাটা ওলটাল। আর সূচিপত্রের মধ্যে চোখে পড়ল, একটা গল্পের নাম "আমাজনের আতঙ্ক"। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল, আরে গল্পবইটা তো বিশুকাকু আগেই পড়ে নিয়েছে। সেটাই শুনিয়ে গেল এতক্ষণ ধরে!

ছবিঃ শিমুল

পুরোহিতমশাই

সাগরিকা রায়



খুব সকালেই স্নান সেরে নেন কালীবাড়ির পুরোহিতমশাই গোকুল ভটচায। স্নান করতে করতে মিউজিক সিস্টেমে 'ওঁ ভুর্ভুবস্য তৎসবিতুর্বরেণ্যম ভার্গোদেবস্য ধীমহি…' শুনছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নড়ছে তাঁর। শ্যামলাল পাড়ার দয়াময়ী মন্দিরের পুরোহিত তিনি। এমন নিষ্ঠার সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, যে শোনে, সেই ভক্তিতে গলে পড়ে। তো সেদিন ও স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরে মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। অল্প অল্প রোদের তাপে স্নান- শীতল শরীরে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। প্রসন্নমুখে ' মা কি আমার কালো রে শ্যামা, মা কি আমার …' গাইতে গাইতে হাঁটছেন। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে তিনি পৌঁছে যাবেন মন্দিরে। ততক্ষণে কাদামণি মন্দির ধুয়ে মুছে রাখবে। মনিং ওয়াকারেরা ফুল দিয়ে যায় মন্দিরে। সকালে প্রচুর ফুল জড়ো হয়। কাদামণি সেই ফুলের মালা গাঁথে।

গোকুল ভটচায মোবাইল ফোনটা বের করে সময় দেখলেন। ছটা বেজে দশ। এতক্ষনে কাদামণির মালা গাঁথা হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করে পা চালান পুরোহিত মশাই।

মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলেন কাদামণি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে! যেন এতক্ষণ তার জন্যই অপেক্ষা করছিল কাদামণি। অবাক হলেন গোকুল ভটচায। দশ বছর ধরে এই মন্দিরে কাজ করছে কাদা, এমন কান্ড কখন করেনি কাদা, বা তিনিও কাদার এই চেহারা দেখেননি। কী হল? গতকাল কাদামণির গ্রাম কেষ্টপুরে প্রাণীসুমারির কাজ চলছিল। কাদা আতঙ্কে ছিল ওর শশী মোরগটাকে বাবুরা ধরে নিয়ে না যায়। কারণ হাঁস মুরগি, গৃহপালিত গবাদি পশুর সংখ্যা গণনার সময় শশী যদি কাউকে ঠুকরে দেয়! শশীর স্বভাব ভাল না। তেমনই কিছু হল নাতো?

না, তেমন কিছু নয়। কাদা কেঁদে ককিয়ে খবর দিল, "মন্দিরে চুরি হয়ে গেছে ঠাউরমছাই, ছব্বসসো নিয়ে গেছে!"

পুরোহিত মশাই ছুটে মন্দিরে ঢুকে দেখেন মায়ের গয়নার বাক্স খোলা পড়ে আছে। প্রণামীর বাক্সটাও ফাঁকা! থালাবাসন? কাদামণি চোখ মুছতে মুছতে বলে, "না ঠাউর মছাই, কিচ্ছুটি নেই, ছব নিয়ে গেছে।"

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন পুরোহিত মশাই । মন্দিরের ট্রাস্টিবোর্ডকে খবর দিতে হবে । মন্দির কমিটির লোকেরা কী ডিসিশন নেন দেখা যাক । এরপর আছে পুলিশ । সারাদিন হুজ্জোতি চলবে । এখন কথা হল , গত মাসে ঠাকুর গোপাল মন্দিরেও চুরি হয়েছিল । আজ পর্যন্ত চোরের টিকি দেখা যায় নি । আজ হল বেস্পতিবার । গত সোমবার গভীর রাতে পরপর চারটি দোকানে আর দুটো বাড়িতে চুরি হয়েছে । বাড়ি থেকে ল্যাপটপ , মোবাইল , ক্যামেরা চুরি করেছে । দোকানের শাটার ভেঙে চুরি হয়েছে । মনে হয় একই লোক বা গ্রুপের কাজ ! যে বা যারা চুরি করে , তাদের স্পাই আছে খবর পৌঁছে দেওয়ার । থাকতেই হবে । এত নিপুণ কাজ , একার পক্ষে অসম্ভব । অন্যদিন পুরোহিত মশাইয়ের ভাগ্নে বিশু মন্দিরে রাতে শোয় । গতকাল ও মালদায় গিয়েছিল । এস এস সি পরীক্ষার সিট পড়েছে ওখানে । চোরের দল জানল কী করে যে বিশু রাতে থাকবে না !

ওষুধের দোকানের ক্যাশ ভেঙে ছত্রিশ হাজার টাকা চুরি হয়েছে । সরাফত আলির পেটের ব্যথাটা বাড়ায় সেদিন ক্যাশ বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেননি । সেই টাকার খবর কে দিল চোরকে ? কে আছে এর পেছনে? সরাফত নিজেই অবাক , "হরবখত আমি রূপিয়া পইসা ঘরে লে যাই । কাল নিয়ে গেলাম না । চোরকো পতা কৈসে লগা?"

নাহ , খোঁজ কর , কে আছে আড়ালে ? মন্দিরে সারাক্ষণ ভক্ত সমাগম লেগে থাকে । গতকাল ছিল অমাবস্যা । পুজো হয়েছে গভীর রাতে । জনাসাতেক লোক ছিল । হারু মোক্তারের মা , কাকি , তুলসীর জেঠিমা , দাদু , কমল , নকুল রাঠি , ···আর যে কে মনে পড়ছে না । তিনি অবশ্য পুজো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কাদামণি পুজোর জোগাড়যন্ত্র করছিল । রাধু চক্কোত্তি ভোগপ্রসাদ রাঁধতে ব্যস্ত ছিলেন । তিলির মা মশলা বাটছিল মনে হচ্ছে। এর মধ্যে স্পাই এল কোথা থেকে , গেলই বা কোথায় ?

এরই মধ্যে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে । জিজ্ঞাসাবাদ করে যখন তারা গেল , বেলা তখন পড়ে এসেছে।

পুরোহিত মশাই ভাবলেন এতক্ষণ মাকালী পুজো পাননি । জলমিষ্টি ভোগ পাননি । না , তাড়াতাড়ি মন্দিরের পেছনের পুকুর থেকে স্নান সেরে নিয়ে পুজোয় বসবেন । মন উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে । স্নানের পর শীতল হবে। শান্ত মনে পুজো করা উচিৎ ।

তিনটে ডুব দিয়ে মা কালীর স্তবপাঠ করতে করতে পুরোহিত গোকুল মশাইয়ের মনে হচ্ছিল এই পুকুরে তিনি যেন একা নন । যেন আরও কেউ আছে ! চারধারে ভাল করে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেলেন না । চিন্তিত মনে ওঁ করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী জপতে জপতে উঠে পড়লেন পুকুর থেকে । তিলি গুচ্ছের পেয়ারা নিয়ে যাচ্ছিল ফল প্রসাদের জন্য । ছেলেটা ভাল । ওর মা ফল কেটে সাজিয়ে দেবে ঠাকুরের সামনে । যা গেল সারাদিন ! ।

পুজোতে বসেও মনের খচখচানি গেল না । কী যেন একটা ভুলে ভুলে যাচ্ছেন ! মানুষের দুটো মন থাকে । একটা হল চেতন , যে সবকিছু সরাসরি দেখে । অন্য মনের নাম অবচেতন । যে দেখে , কিন্তু , লুকিয়ে দেখে । আজ পুরোহিতমশাইএর অবচেতন মনটা তাঁকে কিছু বলতে চাইছে । কিছু যেন মনে করিয়ে দিতে চাইছে । কী সেটা ?

কাদামণি ফুল গুছিয়ে দিচ্ছিল । কাদামণির হাতে সোনার বাউটি । কানে সোনার ফুল । এত সোনা কাদামণি কোথায় পেল ? এতদিন তো খেয়াল হয়নি !

"ঠাকুরমশাই , পেয়ারা কেটে দিচ্ছি ," তিলির মা রোজের মত ফল প্রসাদের থালা সাজিয়ে দিচ্ছে । একপাশে হাতজোড় করে বসে আছে তিলি । পুজোর শেষে অঞ্জলি দেবে ।

আজ মন্ত্র বলতে ভুল হয়ে যাচ্ছে পুরোহিত গোকুল ভটচাযের । চোখ বুজলেই কাদামণির সোনার বাউটি চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠছে । পুরোহিত মশাই প্রার্থনা করেন, "মাগো করালবদনী , মনটা শান্ত করে দাও মা !"

কোনরকমে পুজো শেষ করে প্রণাম সেরে যখন উঠে দাঁড়ালেন , তখন মন অনেক শান্ত হয়ে গেছে । আর তখনই বুঝে ফেললেন অবচেতন মনটা কী বলতে চাইছে ! মনে পড়ে গেল, তিনি যখন স্নান করছেন , তিলি

পেয়ারা নিয়ে আসছিল । তিলির গলা পর্যন্ত ভেজা ছিল । তিলির পায়ে পুকুরের তলার কাদা ! পেয়ারা পেড়েছে গাছে উঠে , তাহলে পায়ে কাদা কেন ? গা ভেজা কেন ?

চেপে ধরতেই তিলি ভয়ে কেঁদে ফেলল । বলতে চায়নি প্রথমে । কিন্তু গোকুল ভটচাযের জেরায় সামলাতে পারল না নিজেকে । জানাল ওই-ই স্পাই । ওষুধের দোকানের খবরটা অবশ্য ও দেয়নি চোরেদের । তবে মন্দিরের খবরদাতা তিলি-ই । মাল সরানো যায়নি । কাদামণি শেষ রাতে ফুল তুলতে চলে আসে । ও আসাতে মাল রেখে পালাতে হয়েছে চোরেদের । চোরেরা দলে ছিল চারজন ।

মোবাইল ফোনে পুলিশকে ডাকলেন পুরোহিতমশাই, "আসুন ইন্সপেক্টর , চোরের খোঁজ পাওয়া গেছে।" পুলিশের সঙ্গে ঠাউর মছাইএর কথাগুলো শুনে কাদামণি অবাক, "মাল কোথায় গো ঠাউর মছাই?"

"পুকুরে । তাই না তিলি?"

ঘাড় নাড়ে তিলি । ঠিক । ব্যাগে পুরে রাখা আছে সব । পুকুরের মাঝখানে , যেখানে পানা জমে আছে , তার নীচে আছে মাল । সারাক্ষণ পাহারা দিচ্ছে ও । যাতে কেউ ওখানে পৌঁছতে না পারে । স্নান করতে নেমে পুকুরের মাঝ বরাবর কেউ যাচ্ছে দেখলে তিলি যে করে হোক আটকে দেবে ভুলিয়েভালিয়ে। পুরোহিতমশাই পুকুরের এদিকটাতে চান করছিলেন , কী করে উনি বুঝে ফেললেন তিলি চোরের দলে আছে ? মাল পুকুরে আছে ? পুরোহিত মশাই যে 'গোন্দা' তিলি বুঝতে পারেনি ।

পুরোহিতমশাই অবাক হন এই ভেবে যে , তিলি সামনেই আছে , অথচ ওকে সন্দেহ হয়নি । ওর মা মন্দিরের কাজে সাহায্য করে । তিলি মাঝে মাঝে আসে , অঞ্জলি দেয় । মন্দিরের বাগান থেকে পেয়ারা , কলা পেড়ে আনে । চোখের সামনেই আছে , কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে নেই বলে মন ওকে নিয়ে ভাবেনি । একেই বলে অপরাধ জগতের অদৃশ্য মানুষ । চেস্টারটনের একটা লেখায় এই রকমই পড়েছিলেন । একটি রহস্য গল্পে পড়েছিলেন , অপরাধী ছিল গাড়ির ড্রাইভার । কিন্তু তার গাড়ি চেপে যারা এসেছিল , পুলিশ তাদের সন্দেহ করেছিল অপরাধী বলে । ড্রাইভারের কথা কারও মাথায় আসেনি । তিলি সেই অদৃশ্য মানুষ । স্নান করতে করতে তিনি বুঝতে পারছিলেন , আশপাশে কেউ আছে । সেটা যে তিলি বুঝতে পারতেন না , যদি না তিলির শরীর অতোটা ভেজা থাকত । পায়ে কাদা থাকত !

তিলির মা লজ্জায় মুখ লুকিয়ে আছে । তিলি আজ মায়ের সম্মান নষ্ট করে দিয়েছে । মান সম্মান না থাকলে কী থাকে আর ?

কাদামণি এখন সাহস ফিরে পেয়েছে । তিলিকেও সাহস দিচ্ছে, "পুলিছকে ছব বলে দিবি । তাহলে বেছি মারবে না । এপ্পর থেকে গোন্দা মছাইএর কাছে পত্তে বছিছ । কত বুদ্ধি এনার বাবা !"

পুরোহিত মশাই অবাক, "গোয়েন্দা মশাইটি কে ?"

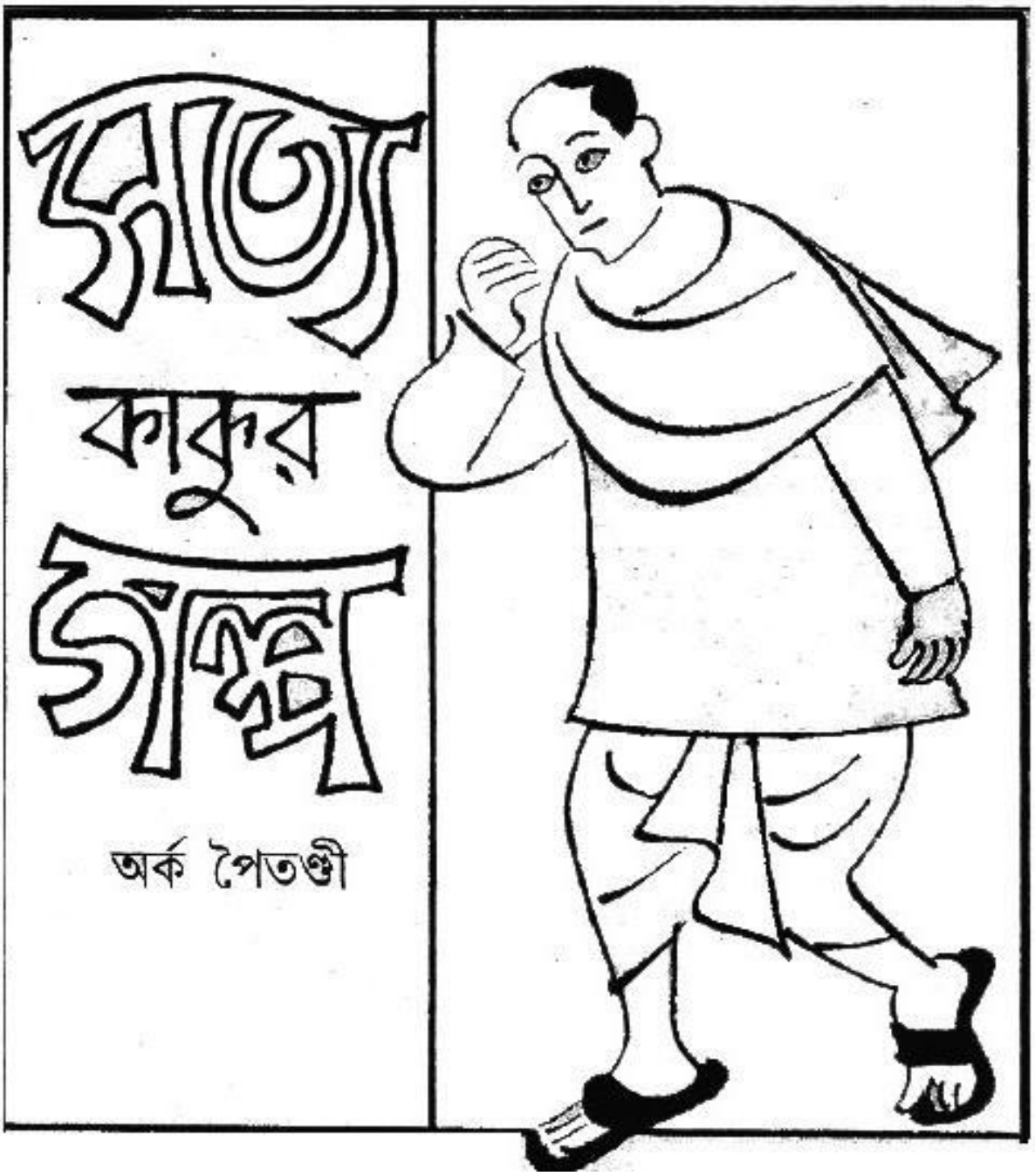
কাদামণি প্রণাম করে, "আপনি গো !"

কাদামণির গায়ে ঝলমল করে গয়না । গোয়েন্দা সাবধান করেন, "এত গয়না পর কেন ? দিনকাল ভাল না ।"

কাদামণি হেসে সারা, "এগুলো ছিটি গোলের গয়না ঠাউর মছাই । নকল । আছল কি ছহজে মেলে?"
ঠিক বলেছে কাদামণি । মানুষও নকল হয়ে উঠেছে । তিলির মত সাদাসিদে ছেলেটা যে গিলটি হয়ে উঠছে , বোঝা গিয়েছিল কি ? সত্যিকারের সোনার মানুষ কবে বানাবেন ভগবান কে জানে !

তিলির মনটাকে পাল্টাতে হবে । অন্তত চেষ্টা তো করা চাই । পুরোহিতমশাই পুলিশের সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন । একটা সুযোগ পাবে কি তিলি ভাল ছেলে হওয়ার ?

ছবিঃ অংশুমান



আজ যে গল্পটা লিখতে বসেছি সেটা নিছক গল্প নয়। আমার জীবনের একটা সত্যি ঘটনা। তাই গল্পটার নামকরণ কী করব সে বিষয়ে অনেক ভেবেছি। অবশেষে যে নামটা দিলাম সেটা যথার্থ হল কি না সে বিচারের ভার পাঠকেরই রইল।

আমি তখন নতুন চাকরিতে ঢুকেছি। খুব বেশিদিন হয়নি। আগে নিয়মিত খেলাধুলো করতাম। চাকরি পাওয়ার পর কিছুটা সময়ের অভাবে আর কিছুটা সময়ের অভাবে আর কিছুটা আলসেমি করে খেলা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ফলে শরীরের ওজনও লাগামছাড়া ভাবে বাড়তে শুরু করল। পুরোনো জামাকাপড় আর আঁটে না! সে এক যা-তা অবস্থা। বুঝলাম, আবার খেলাধুলো শুরু করতে হবে।

আমার দুই বন্ধু সোহম আর পিন্টু সকালবেলা কুমিরডাঙার মাঠে ফুটবল প্র্যাকটিশ করে। চাকরি পাওয়ার আগে আমিও খেলতাম ওদের সঙ্গে। একদিন সকালবেলা উঠে ট্রাকস্যুট গায়ে গলিয়ে পুরোনো দিনগুলোর মতোই আমি হাজির হলাম কুমিরডাঙার মাঠে। মাঠটা আমাদের পাড়ারই লাগোয়া। সেখানে এই সাত সকালেও বেশ কিছু শরীর সচেতন মানুষ বিচিত্র ভঙ্গিমায় কসরত করছেন তাদের মধ্যে থেকে সোহম আর পিন্টু আমাকে দেখে হইহই করে এগিয়ে এল। সোহম বলল, "কুঁড়ের বাদশা! এলি তাহলে! চল চল। আগে মাঠটা চারপাক দৌড়ো তারপর ফ্রি-হ্যান্ড আর ফুটবল।" পিন্টু আমার পেটে টোকা মেরে বলল, "চিন্তা করিস না গুরু। তোর ভুঁড়ি আমরা দুই সপ্তাহে সরু করে দেব। চল, দৌ শুরু কর।"

অতঃপর দৌড় শুরু হল। আমার ভুঁড়ি সরু করার সাধু উদ্দেশ্যে আমার দুই বন্ধু আমাকে বগলদাবা করে মাঠময় চরকি পাক দিতে শুরু করল। এতদিনের অনভ্যাস। তার উপর মাঠটাও বেশ বড়। দু'পাক দিতেই আমি গলদঘর্ম হয়ে গেলাম।

ওরা হাসতে হাসতে বলল, "কী রে! এতেই দম ফুরিয়ে গেল? এখনো যে দু'পাক দৌড়ে বাকি রয়েছে।"

আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, "মাঠের এরিয়াটা যেন বেড়েছে মনে হচ্ছে?"

সোহম চোখ পাকিয়ে বলল, "মাঠের এরিয়া বাড়েনি, তোর ওজন বেড়েছে। চল, চল, দৌড়ো।" বলে আমাকে ফের বগলদাবা করে আবার দ্বিগুন উদ্যমে দৌড় শুরু করল।

ফ্রি-হ্যান্ড হয়ে গেলে পিন্টু বলল, "তোর অনারে আজ এই অবধিই থাকল। ফুটবল না হয় কাল খেলব।" ধুলোমাখা ফুটবলটা তর্জনীর উপর ঘোরাতে ঘোরাতে সোহম বলল, "চল তাহলে শচীনদার দোকানে বসি।"

মাঠের দক্ষিণে যে চায়ের দোকানটার উনুনে সবেমাত্র অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে আমরা তার দিকে এগোলাম।

এই সাতসকালে দোকান প্রায় ফাঁকা। দোকানের বাইরে বেঞ্চে একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। এই গরমেও গায়ে তাঁর চাদর জড়ানো। আনমনা হয়ে সম্ভবত চায়ের গেলাসটির জন্য অপেক্ষা করছেন।

ওঁকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই সোহম বলল, "এই রে! গুলকাকু যে দেখছি আজ তাড়াতাড়িই চলে এসেছেন।"

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, "গুলকাকু? গুলকাকু আবার কে?"

পিন্টু ভ্রুভঙ্গি করে বলল, "গুলকাকু বড় সাংঘাতিক লোক। রোজ সকালে এখানে চা খেতে আসেন। চা খান আর আমাদের পেলে এন্তার গুল ঝাড়েন। উনি নাকি সমস্ত পৃথিবী চষে বেড়িয়েছেন। আন্দামানে জারোয়াদের সঙ্গে কিত্-কিত্ খেলেছেন, হিমালয়ে ইয়েতি শিকার করেছেন।"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, "তাই নাকি? সত্যি?"

সোহম হেসে উঠল, "তুই কি পাগল হয়েছিস? পিন্টু হয়ত একটু বাড়িয়েই বলল মজা করে, কিন্তু ওঁর গল্পগুলো এ'রকমই প্রায়। আর সেজন্যই তো আমরা নাম দিয়েছি গুলকাকু।"

আমি মনে মনে হাসলাম। গুলকাকু! বেশ মজার নাম দিয়েছে তো সোহমরা। আমার বন্ধুগুলো এই বয়সেও দুষ্টুমি করা ছাড়তে পারল না।

দোকানের সামনে পৌঁছে সোহম বলল, "এ কী কাকু, এই গরমেও চাদর?"

প্রৌঢ়, মানে সোহমদের গুলকাকু গায়ের চাদরটা আরো ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, "তোমাদের বয়স কি আর আমার আছে কি ভাই? একসময় লেদারের জ্যাকেট গায়ে দিয়ে সাইবেরিয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছি। কিচ্ছু হয়নি। তখন রক্ত ফুটত টগবগ করে।"

পিন্টু আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। মানে, এইবার শুরু হল গুল। সোহম খোঁচাল, "সাইবেরিয়া কেন গিয়েছিলেন, কাকু?"

"কাজের জন্য তো অনেক জায়গায় যেতে হত। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের কি এক জায়গায় থাকার জো আছে? তবে সাইবেরিয়া বেড়াতেই গিয়েছিলাম। বেড়ানোর নেশাও খুব ছিল তো।"

গুলকাকু মৃদু হেসে কথা শেষ করতেই পিন্টু আরেকটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। বলল, "সাইবেরিয়ায় শুনলাম নাকি ম্যামথের ফসিল পাওয়া গেছে। আপনিও সে'রকম কিছু দেখেছেন নাকি?"

গুলকাকু নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা গালে হাতে বুলিয়ে বললেন, "ম্যামথ-ট্যামথ দেখিনি। তবে হাতি বিস্তর দেখেছি। সাইবেরিয়ায় নয় আফ্রিকায়। কেনিয়ার জঙ্গলে একবার হাতির পালের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। ভাগ্য ভাল বলে বেঁচে ফিরেছি।"

পিন্টু বলল, "তা একটা হাতির বাচ্চা-টাচ্চা ধরে আনলে পারতেন। পুষতেন।"

আমি আর সোহম খুক খুক হেসে উঠলাম। কিন্তু গুলকাকু পিন্টুর রসিকতা যেন বুঝতেই পারলেন না। বললেন, "ওরকমভাবে ধরে আনা যায় নাকি? আচ্ছা বুদ্ধি তো তোমাদের! তাছাড়া জেনে রাখো আফ্রিকান হাতি পোষ মানে না। ধরে রাখলে না খেয়ে খেয়ে উপোস করেই মরে যায়।"

গুলকাকু একটু থেমে আমাদের উপর চোখ বুলিয়ে বলতে শুরু করলেন, "হাতি আনিনি ঠিকই, তবে কেনিয়ার এক উপজাতি গ্রাম থেকে মাসাই যোদ্ধার মূর্তি খোদাই করা একটা হাতির দাঁত এনেছিলাম।এত অপূর্ব জিনিস তোমরা কখনো দেখনি।"

পিন্টু বলল, "আমি কখনো হাতির দাঁতই দেখিনি। তাহলে তো একদিন আপনার বাড়ি যেতেই হবে দেখছি।"

পিন্টুর কথা শুনে গুলকাকু মুখ দিয়ে একটা আক্ষেপসূচক শব্দ বের করে বললেন, "ওটাই তো মুশকিল। আমার বাড়িটা যে বড্ড ছোট। একটাই মোটে ঘর। আমার স্ত্রীও খুবই অসুস্থ। ঐ ঘরেই শয্যাশায়ী। ঐ রুগির বাড়িতে আর তোমাদের কী করে আসতে বলি বল?"

পিন্টু আমার কানে কানে বলল, "বাড়ি যাওয়ার কথা বললেই এড়িয়ে যায়। না হলে গুলগুলো সব ধরা পড়ে যাবে যে!"

সোহম বলল, " হাতির দাঁতটা তাহলে এখানেই আনুন না একদিন।"

গুলকাকু আঁৎকে উঠলেন, "এই বুড়ো মানুষটাকে শেষে জেল খাটাতে চাও নাকি? জানো না, ওসব জিনিস এখন বে-আইনি? দেখতে পেলেই পুলিশ ধরবে।"

গুলকাকু চা খেয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। পিন্টু বলল, "কী চালাক লোক দেখেছিস। কিছুতেই ফাঁদে পা দেন না।"

তবে পিন্টুরা যা-ই বলুক না কেন আমার কিন্তু গুলকাকুকে বেশ ভালোই লাগল। গুলবাজরা মজার মানুষ হন। ওঁদের কল্পনাশক্তিও প্রবল হয়। আমাদের গুলকাকু তো আবার ওঁর মনগড়া, বানানো গল্পগুলোর সুরক্ষার জন্যও অনেকরকম গল্প বানান।

পরদিন সকালেও একই কাণ্ড। মাঠ থেকে ফেরার সময় শচীনদার দোকানে ঢুকতেই গুলকাকু আমাদের পাকড়াও করলেন বললেন, "কী হে তিনমূর্তি, তোমারা তো দেখছি সাঁতার কেটে এসেছ।"

সত্যিই আমরা দারুণ ঘেমে ছিলাম। ফুটবল খেলাটা আজ জমেছিল খুব। পিন্টু বলল, "যা বলেছেন কাকু। এত গরম লাগছে যেন মনে হচ্ছে আগ্নেয়গিরির মধ্যে বসে আছি।"

অমনি কাকুর চোখ ছোটোছোটো হয়ে এল। বললেন, "আমি দেখেছি।"

সোহম আমার পায়ে চিমটি কাটল। অর্থাৎ গুল আরম্ভ হতে চলেছে। গুলকাকু বলতে শুরু করলেন, "সাউথ অ্যামেরিকায় একটা আগ্নেয়গিরির চূড়ায় ওঠার অভিজ্ঞতা হয়েছিল।"

পিন্টু ফুট কাটল, "লাভা আনতে গিয়েছিলেন বুঝি বোতলে ভরে?"

আগেই দেখেছি গুলকাকু রসিকতা বোঝন কম। এটাও বুঝলেন না। বললেন, "আরে ভাই, লাভা কি সবসময় তরল অবস্থায় পাওয়া যায়? সে তো অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন আগ্নেয়গিরি শান্ত। আর জ্বালামুখে একটা হ্রদ তৈরি হয়েছে। আমাদের দলের একজন সায়েন্টিস্ট ঐ জলের স্যাম্পেল নিয়ে টেস্ট করেছিলেন। খুব সালফার ছিল ঐ জলে। আমি সেবার আগ্নেয়গিরির চূড়ার আশপাশ থেকে কিছু পাথর এনেছিলাম। ওরকম পাথর তোমারা কখনো দেখনি।"

সোহম বলল, "তাহলে একদিন আপনার বাড়িতে...।"

সোহমের কথা শেষ হওয়ার আগেই গুলকাকু চা শেষ করে বাড়ির পথে হাঁটা দিলেন।

এরকমই চলছিল কয়েকমাস ধরে। সকালে মাঠে কসরত আর তারপর শচীনদার দোকান থেকে চা সহযোগে গুলককুর গপ্পো। আচমকা একদিন আমরা গুলকাকুকে বেকায়দায় ফেলার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

সেদিন মাঠ থেকে শচীনদার দোকানে যেতেই গুলকাকু বললেন, "গুটেন মর্গেন।"

আমরা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। পিন্টু চাপা গলায় বলল, "মাথাটা বিগড়েছে মনে হচ্ছে।"

গুলকাকু মিটিমিটি হাসলেন, "এর মানেটা জানো না বুঝি?"

আমরা মাথা নাড়লাম। না। জানি না। গুলকাকু বললেন, "জার্মান ভাষায় গুড মর্নিংকে বলে গুটেন মর্গেন। অর্থাৎ আমি তোমাদের সুপ্রভাত জানালাম।"

সোহম বলল, "আপনি জার্মান ভাষা জানেন?"

"জানি তো।" গুলকাকু বললেন, "আমি আরো সাতটা ভাষা জানি। তাছাড়া আমার ছেলেও জার্মানিতে থাকে।"

"তাই নাকি?" আমরা অবাক, "বলেননি তো আগে! কী করে আপনার ছেলে?" আমরা আশা করছিলাম এবার গপ্পো আরম্ভ করবে, কিন্তু না। গুলকাকু খুব নির্লিপ্ত উত্তর দিলেন, "ডাক্তার।"

হঠাৎ আমার মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। গুলকাকুকে একটু প্যাঁচে ফেললে কেমন হয়? বললাম, "আপনার ছেলে আপনাকে চিঠিপত্র লেখে নিশ্চয়ই?"

এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে গুলকাকু থতমত, "কেন বল তো?"

"না মানে...তাহলে আপনি আমার একটা উপকার করতে পারবেন। আমি বললাম।



গুলকাকু আরো অবাক। বললেন, "উপকার?" আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম আমার বন্ধুরাও কম অবাক হয়নি।

আমি বন্ধুদের দিকে চোখ টিপে বলতে শুরু করলাম, "আসলে আমি ডাকটিকিট মানে স্ট্যাম্প কালেকশন করি। বলতে পারেন এটাই আমার একমাত্র নেশা। কত দেশের যে স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেছি তার ঠিক নেই। কেবল জার্মানির স্ট্যাম্পই আজ অবধি জোগাড় করতে পারিনি। তাই আপনার ছেলে জার্মানিতে থাকে শুনে একটা আশা জাগল মনে। আপনার ছেলে নিশ্চয়ই আপনাকে চিঠি লেখে জার্মানি থেকে। তার থেকে একটা- দুটো স্ট্যাম্প যদি আপনি আমাকে দেন তো খুব উপকার হয়।"

এই ঘটনাটা যে সময়ের তখন বাজারে মোবাইল ফোন আসেনি। ঘরে ঘরে এত টেলিফোনও থাকত না। ই-মেল তো অনেক দূরের বস্তু। সেই সময় চিঠিপত্রের কোন বিকল্প ছিল না। ডাকবিভাগের সাম্রাজ্য তখন মধ্যগগনে। সুতরাং গুলকাকু কোনও অজুহাত খাড়া করতে পারলেন না। অস্বস্তিতে পড়লেন। সেদিন আড্ডা জমল না। গুলকাকু চুপচাপ চা খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

পিন্টু আর সোহম এতক্ষণ অবাক মুখে গোল গোল চোখ করে আমাকে দেখছিল। গুলকাকু চলে গেলে আমি ওদের সব বুঝিয়ে বললাম। ওরা তো শুনে হেসেই খুন। পিন্টু বলল, "গুলকাকু কাল এলে আবার চেপে ধরব। হয় জার্মানির স্ট্যাম্প দিতে হবে নয়তো স্বীকার করতে হবে যে ওঁর গপ্পোগুলো সব মিথ্যে।"

গুলকাকু আমাদের ফন্দিটা হয়তো আঁচ করেছিলেন। পরদিন থেকে আমরা আর ওঁর দেখা পেলাম না। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এবার আমাদের খারাপ লাগল। বয়স্ক মানুষটার সঙ্গে এতটা মজা না করলেও হত। বানিয়ে বানিয়ে গল্প বললেও তো মানুষ হিসেবে উনি খারাপ ছিলেন না। বাড়ি গিয়ে দেখা করারও উপায় নেই। গুলকাকুর বাড়ির ঠিকানা আমরা কেউ জানি না। এমনকি অবাক ব্যাপার, আমরা কেউ এখনো গুলকাকুর ভালো নামটাও জানি না।

পৃথিবীতে, বিশেষ করে হয়তো মানুষের মনে কোনও ব্যাপারই বেশিদিন স্থায়ী হয় না। গুলকাকুও তার ব্যতিক্রম হলেন না। ধীরে ধীরে আমাদের মন থকে উনি পুরোপুরি মুছে গেলেন। গুলকাকুর অধ্যায়টা আমাদের জীবনে এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু হল না। ব্রহ্মাণ্ডের সেই অদৃশ্য গল্পকার হয়তো শেষটা অন্যরকমই ভেবেছিলেন।

এরপর পাঁচটা বছর কেটে গেছে। অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে। সোহম আর পিন্টুও চাকরি পেয়ে গেছে। সকালে আর ব্যায়াম করতে যাওয়া হয় না। পিন্টুই ছিল ফুটবল খেলায় সবচেয়ে বেশী উৎসাহী। ও চাকরি নিয়ে জামশেদপুর চলে গেছে। সুতরাং আমাদের তিন-জনের টিমটাই আর নেই। সোহমও আজকাল দারুণ মুটিয়েছে খেলা ছেড়ে দিয়ে।

একদিন হঠাৎ আমার জামাইবাবু আমাকে খবর পাঠালেন যে উনি বদলি হয়ে আমাদের শহরে মানে বোলপুরে আসছেন। আমি যেন তার জন্য একটা বাড়ি দেখে রাখি। উনি কিনবেন। সেই কথা শুনে আমি পরিচিতদের একটু খোঁজখবর নিতে বললাম। প্রথম খবরটা সোহমই আনল। বাগানপাড়ায় একটা একতলা বাড়ি বিক্রি আছে। জামাইবাবু ওদিক থেকে ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছেন, তাই ঠিক করলাম দু-এক দিনের ভেতরই গিয়ে বাড়িটা দেখে আসব।

সেইমতো একদিন আমি আর সোহম হাজির হলাম বাড়ি দেখতে। একতলা বাড়ি, রঙচটা। কোনও এককালে রঙ করানো হয়েছিল হয়তো। কিন্তু এই সন্ধেবেলা দেখে বুঝতে পারলাম না যে সেটা সবুজ না নীল। তবে বাড়ির সামনের বাগানটা খুব ভাল লাগল। বাড়ির ভেতরে বিশেষ দেখার কিছু নেই। একটা ঘর, সঙ্গে বাথরুম আর রান্নাঘর। দক্ষিণে একচিলতে বারান্দা। যে ভদ্রলোক আমাকে বাড়িটা দেখাচ্ছিলেন তার নাম সুকোমল রায়চৌধুরী। বাড়িটা ওঁর দাদার ছিল। দাদা কিছুদিন হল মারা গেছেন। বর্তমানে উনিই মালিক। আমি জিগ্যেস করলাম, "কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিগ্যেস করি। আপনার দাদা কি নিঃসন্তান ছিলেন?"

প্রশ্নটা শুনে সুকোমলবাবু কিছুক্ষন চুপ করে থাকলেন তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "নিঃসন্তান ছিলেন না। এক ছেলে আছে। তবে থেকেও নেই। বিদেশে থাকে। আসত না, এমনকি চিঠিপত্রও লিখত না। বাবা-মার সঙ্গে কোনও যোগাযোগই রাখত না।"

"সেকী?" আমরা অবাক। এরকম উত্তর আশা করিনি।

সুকোমলবাবু চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন, "দাদা কত খরচ করে ছেলেকে ডাক্তারি পড়াল। বিদেশে রেখে। ফিরল ছেলে? ছেলের জন্য দুঃখে বৌদির মনের রোগ হয়ে গিয়েছিল। শেষদিকে বাড়িতে যে আসত তাকেই খোকা বলে ভাবতেন। যার জন্য দাদা বাড়িতে কাউকেই আসতে বলত না। বৌদি মারা যাওয়ার পর খবর পাঠানো হয়েছিল। তা-ও ছেলে এল না।"

আমি জিগ্যেস করলাম, "এরকম কেন করল?"

সুকোমলবাবু বললেন, "শুনেছি কোনো একটা বিষয়ে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল ছেলের। তা বলে তার সাজা তুই মাকে দিবি? এটা তো ঠিক না।"

ঘরের পরিবেশ আচমকা ভারী হয়ে গেল। ঘরের অল্প পাওয়ারের আলোটা যেন পরিবেশটাকে আরো বিষাদময় করে তুলছে। আমি ঘড়ি দেখে সোহমকে বললাম, "চল, এবার উঠি।"

সোহম উত্তর দিল না। ও তাকিয়ে আছে ঘরের একমাত্র কাচের শো-কেসের দিকে।

শো-কেসে হরেক রকমের জিনিস ঠাসা। ছোট-বড় মূর্তি, নানারকম পুতুল, এমনকি দু"একটা পাথরও চখে পড়ল। অবশেষে যে জিনিসটার উপর আমার চোখ আটকাল সেটা সোহম আগেই দেখেছে। সেটা একটা যোদ্ধামূর্তি খোদাই করা হাতির দাঁত। অত সুন্দর জিনিস আমি কখনো দেখেছি।

সুকোমলবাবু বললেন, “ওটা মাসাই মূর্তি। আমার দাদা এনেছিল আফ্রিকা থেকে। আমার দাদা মেরিন ইঞ্জিনিয়ার ছিল তো, তাই অনেক দেশ...।”

সুকোমলবাবুর আর কিছু বলার দরকার ছিল না। আমরা ততক্ষণে দেওয়ালে ঝোলানো রজনীগন্ধার মালা দেওয়া ফটোটা দেখে ফেলছি।

সুকোমলবাবু বললেন, “উনিই আমার দাদা সত্যব্রত রায়চৌধুরী।”

সোহম বিস্মিত হয়ে বলল, “গুলকাকু।”

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, “আরে গুলকাকু বলিস না রে। গুলকাকু মারা গেছেন। বল সত্যকাকু। সত্যকাকুরা কখনো মরেন না। চিরদিন বেঁচে থাকবেন আমাদের মনের গভীরে।” বাইরে বেরিয়ে রাতের আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। সত্যকাকু আজ হয়তো ওখানেই আছেন। তারাদের মাঝে অথবা অসীম শূন্যে একা।

ছবিঃ লেখক



সিদ্ধার্থ সিংহ

কলিং বেল বাজতেই দরজার কাছে দৌড়ে গেল রিমি- "বাবা এসেছে বাবা এসেছে..." গোড়ালি উঁচু করে সামনের আঙুলগুলোর ওপর ভর দিয়ে লম্বা হয়ে নব ঘোরাল।

দরজার কাছে একটা পাল্লা খুলতেই ও আঁতকে উঠল। চিৎকার করে দু'হাতে মুখ ঢেকে পিছন ফিরে দৌড়ে- বাঘ বাঘ বাঘ.....

দৌড় তো দিল, কিন্তু এখন সে যাবে কোথায়? ঘরে মা ছিলেন। মায়ের কোলের মতো নিরাপদ জায়গা আর কোথায় আছে! কিন্তু সেই মা-ই তো তাকে সাজাতে সাজাতে হঠাৎ হরিণ হয়ে গেছেন।

বাঘের চেয়ে হরিণ অনেক ভাল। তাই ছুটে এসে সেই হরিণকেই জাপটে ধরল সে । তার পিছু পিছু ঢুকলেন সেই বাঘটা। জুতো না-খুলেই সোজা ঘরে ঢুকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "রিমি ওভাবে দৌড়লে কেন?"

"তুমি এসে গেছ, দেখো না, সেই তখন থেকে–" কথা শেষ করতে পারলেন না রিমির মা। গলা জড়িয়ে এল। জাপটে থাকা রিমির মাথায় পিঠে হাত বোলাতে লাগলেন।

এর কাছ থেকে তার কাছ থেকে তার থেকে ওর কাছে ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল রিমির খবর। যে তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, তাকেই নাকি সে কোনও না কোনও জন্তু জানোয়ার পশুপাখি আদলে দেখছে।

আস্তে আস্তে রিমিকে দেখতে ভিড় জমতে লাগল বাড়িতে। এল পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন। এমনকী তার বাবার অফিসের লোকজনও। বাবার অফিসের বসকে দেখে ওর মনে হয়েছিল একটা ধূসর রঙের ঘোড়া। রাঙামাসিকে মনে হয়েছিল, পেখমমেলা ময়ূর। পাশের বাড়ির প্রিয় বন্ধু প্রিয়াকে মনে হয়েছিল প্রজাপতি।

কেউ কোনও কথা বললেই চোখ মুখ কুঁচকে দু'হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরেছে কান। কারও কথা তার কাছে মনে হয়েছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ, কারও কথা কোকিলের কুহু কুহু, আবার কারও কথা মনে হয়েছে সাপের হিস হিস। রিমির খাওয়াদাওয়া বন্ধ। ঘুম বন্ধ। বন্ধ করে দিতে হয়েছে স্কুলও। সারাক্ষণ কী একটা ভয়ে সে সিঁটিয়ে থাকছে। আর যত দিন যাচ্ছে আর ততই তাকে দেখতে ভেঙে পড়ছে গোটা পাড়া। এ পাড়া সে পাড়া। ভিড় উপচে পড়ছে বাড়িতে। সামাল দেওয়া দায়।

রিমিকে তার মা একটা ঘরে সামলাচ্ছেন। ঘরটা রাস্তার ধারে। সেই ঘরের জানালায় টান টান করে টেনে দেওয়া পর্দা। পর্দাটা একটু খাটো। নীচের দিকে সরু একচিলতে ফাঁক, সেই ফাঁক দিয়ে। ওকে দেখার জন্য কী হুড়োহুড়ি। যেন রিমিকে নয়, একটা আজব জীব দেখতে এসেছে ওরা।

এ বলছে হাওয়া লেগেছে। ও বলছে জিনে পেয়েছে। সে বলছে মসজিদ থেকে জলপড়া এনে খাওয়াতে। রিমির মা ইতিমধ্যেই গঙ্গাজলের ছিটে দিয়েছেন কতবার, হিসেব নেই। স্নান করিয়েছেন বেশ কয়েকবার। ঠাকুরের আসনের ঘট থেকে ফুল নিয়ে সেটা ধুইয়ে খাইয়েছেন বার কতক। যে যা বলছে তা-ই করছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

অবশেষে ডাকা হল হরিপদ ওঝাকে। মেয়ে তখন ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছে। ওর দু'পাশে দু-তিনটে করে বালিশ দিয়ে উঁচু করে দেওয়া হয়েছে। যাতে পাশ ফিরতে গিয়ে পড়ে না যায়। তাকে পাহাড়া দিচ্ছে মাসি পিসি মামি কাকি ছাড়াও পাড়ার মেয়ে বউ ঝিয়েরা। বয়স্ক দু-চারজন পুরুষও রয়েছেন তাদের মধ্যে। ফিসফাস কথায় আর শ্বাস প্রশ্বাসে ঘরটা যেন কেমন হয়ে উঠেছে।

পাশের ঘরে তখন কেবল রিমির মা-বাবা আর হরিপদ ওঝা। চায়ে চুমুক দিতে দিতে তিনি জানতে চাইলেন, এটা কখন থেকে ওর শুরু হয়েছে।

এ ক'দিনেই একদম ভেঙে পড়া দিশেহারা রিমির মা বলতে শুরু করলেন, "ওকে স্নান করিয়ে এনে জামাকাপড় পরাচ্ছিলাম তা জামাকাপড় পরানোর আগে পাউডার টাউডার দিয়েছি। টিপ ফিপ পরিয়েছি, তখনও কিছু না, চোখে কাজল দিতেই ও কেমন ভাবে যেন আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর ওরকম চাহনি আমি কোনও দিন দেখিনি। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে বলল, হ...রি...ণ। সেই থেকে ও আমাকে হরিণ দেখছে। বাবাকে বাঘ দেখছে। ওকে এটা দেখছে। তাকে সেটা দেখছে।"

"ওই কাজল পরানোর পর থেকেই?" ওঝা ফের প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।"

"ওটা কীসের কাজল?" খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইলেন ওঝা।

"কীসের মানে?.....আসলে ওটা তো আমি পাতিনি। দিন কতক আগে এক বেদেনি এসেছিল। তার সঙ্গে কয়েকটা ঝাঁপি টাপি ছিল। সাপ টাপ ছিল। মা মনসার নামে সিধে চাইল। তা আমি একটু চাল, দু-তিনটে আলু, আর একটু সরষের তেলও দিলাম। ও শিকড় বাকড় মাদুলি টাদুলি দিতে চাইল, আমি নিতে না চাওয়ায় ঝোলা থেকে বাটির মতো দেখতে একটা সমুদ্রের ফেনা বার করল। কচুপাতা দিয়ে ঢাকা। সেটা থেকেই একটা ছোট সামুদ্রিক ঝিনুকে করে তুলে আমাকে দিয়ে বলল, 'এই কাজলটুকু রাখো।' রিমি তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে, ওকে দেখিয়ে বলল, ওকে পরিও। এ কাজল আর কোথাও পাবে না। বারো ভূতের মেলায় অপঘাতে মরা ডোম-কন্যার খুলিতে মাহেন্দ্রক্ষণে পাতা কাজল। এ কোথাও পাবে না গো। এ কোথাও পাবে না। এটা পরলে ওর চোখ খুলে যাবে। যার চরিত্র যেমন, ও তাকে সে রকমই দেখবে। তার গলার স্বরও সেই রকমই শুনবে। তখন কী আর বুঝেছিলাম যে, এ রকম হবে..."

শেষের কথাগুলো কেমন কেঁপে কেঁপে গেল। আঁচলের কোণ দিয়ে চোখের কোল মুছতে লাগলেন রিমির মা।

"কোথায় সেটা? দেখি।" ওঝা চাইতেই রিমির মা তাড়াতাড়ি উঠে গেল ড্রেসিং টেবিলের কাছে। বেদেনির দিয়ে যাওয়া কাজলের ঝিনুকটা ড্রয়ার থেকে বার করে এনে ওঝার হাতে দিল। ওঝা ঝিনুকটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলেন। তারপর তিন বাবার ফঁ ফঁ করে বাঁ হাতে ঝিনুকটা ধরে মাঝের আঙুল দিয়ে তিনবার কাজলে ঠেকিয়ে নিজের চোখে দিলেন। চোখে হাত দিয়ে হাত নামাবার সময়টুকু পেলেন না। কয়েকবার পিটপিট করেই বড় বড় হয়ে উঠল তাঁর চোখ। একবার রিমির বাবার দিকে তাকালেন, একবার মায়ের দিকে। রিমির বাবাকে ওঝার মনে হল মোরগ। মাকে খরগোশ। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ঝোলাঝুলি ফেলেই দ্রুত হাঁটা দিলেন সদর দরজার দিকে। যেতে যেতে বাঁদিকের পাশের ঘরে চোখ পড়ল। লোক নয়, ওঝার মনে হল গভীর জঙ্গল থেকে একটা একটা করে জন্তুজানোয়ার তুলে আনা হয়েছে এখানে। আর এক মুহূর্ত নয়, দরজা হাট করে খোলাই ছিল, বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দড়াম করে পাল্লা দুটো টেনে তিরবেগে ছুট লাগালেন রাস্তায়।

ওঝার পিছু পিছু ছুটে গেলেন রিমির বাবা। তার পিছু পিছু রিমির মা। পাশের ঘরে ছিল যারা, দৌড়াদৌড়ি দেখে তারাও বেরিয়ে এল পথে। ওঝা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছেন। ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

ওঁর সঙ্গে ছুটে কি আর রিমির বাবা-মা পারবে? কিছুটা গিয়ে ফিরে আসতে লাগলেন ওঁরা আর ভাবতে লাগলেন, ওঝার হাতেই তো রয়ে গেল কাজলের সেই ঝিনুকটা। তবে কি এই কাজলটার জন্যই এতকিছু। এখন তো রিমি ঘুমিয়ে আছে। তাহলে কি আলতো হাতে আস্তে আস্তে করে ওর চোখের কোল থেকে মুছে দেবে কাজল ?

ভাবতে ভাবতেই রিমির ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন ওঁরা। রিমির বাবার বুকে তখন কাঁটার মতো খচখচ করে বিঁধছে একটা সংশয়, ওঝার হাতের ওই ঝিনুকটা যদি পড়ে যায় , কিংবা ওঝা নিজেই যদি ফেলে দেয় ছুড়ে , আর সেটা কুড়িয়ে পেয়ে আবার যদি কেউ চোখে দেয়? তখন?

ছবিঃ তন্ময় বিশ্বাস



সেখানে সাতরঙা রামধনুর রং ছড়িয়ে উড়ে এল দুটো মৌটুসি পাখি। দিনটা বসন্তের রোদ্দুরে উজ্জ্বল। শীতের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা আর নেই, কিন্তু সূর্যের তেজও বেশি নয়। ওরা দু'জন। একজন পুরুষ, আর এক জন মেয়ে – দেখতে একেবারে আলাদা। পুরুষটা প্রায় কালো, কিন্তু রোদের আলো পড়লেই চোখ ঝলসানো ময়ূরকণ্ঠী রঙের বাহার! কখনও নীল, কখনও সবুজ, কখনও বা বেগনে। মেয়েটা অতো উজ্জ্বল না। পিঠের দিকে গাঢ় কালচে, পেটের দিকটা সাদাটে। ছোট্ট পাখি, আমার বুড়ো আঙুলের মতো, কিন্তু ওড়ে বিদ্যুতের বেগে।

ছোটো জংলা বাগানটায় খানিকক্ষণ ইতিউতি উড়ে বেড়ালো দুজনে। বাড়িটা একেবারেই ভাঙা, পায়রা আর চামচিকের বাসা, একটা কুকুর, আর কয়েকটা সাপের আস্তানা। বাগানের যত্ন নেবার আর কেউ নেই, কিন্তু গাছে গাছে বসন্তের ফুল হয়েছে। মৌটুসিরা ফুল থেকে মধু খেল, গাছের মগডালে বসে গলা ছেড়ে গান গাইল। তার পরে উড়ে নেমে এল মাটির কাছে। ঘন ঝোপের মধ্যে একটা জায়গা পেল যেখানে বাসা বাঁধা যায়।

কেউ সাফা করতে আসে না, তাই বাগানের জমিতে পরতে পরতে জমে আছে শীতের ঝরাপাতা, আর ভাঙা ডালপালা। বাগানে ভর্তি মাকড়শার জাল। ঠোঁটে করে তাই ছিঁড়ে এনে ওরা পাতাগুলো একটা আর একটার সঙ্গে আটকে নিল – তৈরি হল বাসা।

ছোট্ট পাখির ছোট্ট বাসা। বটুয়ার মতো দেখতে। মা মৌটুসিটা ভেতরে আরাম করে বসল শুকনো পাতা আর পায়রার ঝরা পালকের নরম বিছানায়। তিনটে ডিম পেড়ে তা দিতে শুরু করল, নিজের শরীরের গরম দিয়ে।

পাশের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা ছেলে ওদের দেখছিল। সঙ্গে ওর কাকা একটা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছিল। ক্যামেরার লেন্সটা কী বিরাট! একেবারে বন্দুকের মতো! ছবি তুলতে তুলতে কাকা ভাইপোকে পাখিদের সম্বন্ধে বলছিল।

"দেখ," বলে কাকা একটা বই খুলে ওকে ছবি দেখাল। "মৌটুসি। ইংরেজিতে বলে পার্পল সানবার্ড। কতো রং দেখেছিস? আসলে বেগুনি, কিন্তু কোনও কোনও সময়ে দেখায় কালো, কখনও বা নীল। ওই রঙীনটা পুরুষ, অন্যজন মেয়ে। খাটো লেজ, লম্বা ঠোঁট, তরোয়ালের মতো বাঁকা।"

কাকা-ভাইপোর মতো এক জোড়া কোকিলও গাছের ডালে বসে মৌটুসিদের নজর করছিল। কোকিল বেশ বড়ো পাখি। কাকের সমান প্রায়। পুরুষটা কুচকুচে কালো। মেয়েটা বাদামি, সাদার ছোপ।

কোকিল ভালো গান গায়, সে তো সবাই জানে। কোকিলের গান শোনে পাখিরাও। কিন্তু সে অন্য কারণে।

বাড়ির ভেতরে কাকাও দেখেছে কোকিল দুটো। ভাইপোকে ডেকে বলল, "দেখেছিস, কেমন বসে বসে দেখছে। কেন জানিস? ওরা নিজেরা বাসা বাঁধে না। অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। তারা বুঝতে পারে না, নিজের বাচ্চা মনে করে বড়ো করে। সাধারণত কাকের বাসায় ডিম দেয় - কাক সেই জন্য ওদের একেবারে সহ্য করতে পারে না। ডাক শুনলেই তেড়ে যায়।"

ছেলেটা অবাক হয়ে বলল, "কী পাজি! অন্যের বাসায় ডিম পাড়ে কেন? নিজেদের বাসা বানায় না কেন?"

"ওরা ওমনিই। প্রকৃতি ওদের ওমনি করেই বানিয়েছে। আমরাও তো গাছ কেটে, জঙ্গল সাফ করে, জলাজমি ভরাট করে বাড়ি বানাই। হাজার হাজার পশুপাখি আমাদের জন্য মরে যায় যাতে আমরা বাঁচতে পারি।"

ভাইপো উত্তর শুনে চুপ করে গেল।

কোকিল সুযোগ পেলে মৌটুসির বাসাতেও ডিম পাড়ে বইকি! এই দু'জন মৌটুসি অবশ্য সেটা জানত না। তারা এতোদিন একটা ছোট্ট বাগানে থাকত, সেখানে কোনও কোকিল ওদের বাসা অবধি পৌঁছতেই পারত না। তাই কোকিলরা যে ওদের নজর করছে, সেটা ওরা বুঝতেও পারেনি।

যেমনই বাসা বানিয়ে মা মৌটুসি ডিম পেড়ে তা দিতে বসল, ওমনি কোকিল তারস্বরে গান শুরু করল। সাধারণত এই সময়ে বাসা ছেড়ে পাখিরা কোকিলকে তাড়া করে, আর সেই সুযোগে কোকিলনী খালি বাসায় ঢুকে নিজের ডিম পেড়ে আসে।

এই দুজন মৌটুসি তো আগে কোকিলের পাল্লায় পড়েনি, তাই ওরা কোকিলকে তাড়া করতে গেলই না। মা মৌটুসি যেমন রোজ তা দেয়, তেমনই দিতে থাকল, আর বাবাটা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াতে লাগল। কোকিলনীকে পরদিন সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হল - মা মৌটুসি সকালে উড়ে গিয়ে লাল কৃষ্ণচূড়া গাছে গিয়ে যেমনই মধু খেতে লেগেছে, ওমনি গিয়ে কোকিলনী উড়ে গিয়েছে তাদের বাসায়। ছোট্ট বাসার থেকে একটা একটা করে ডিম নিয়ে ফেলতে লেগেছে বাইরে। এইভাবেই কোকিলরা ডিম পাড়ে। অন্য পাখির বাসায় নিজের ডিমের জায়গা বানায়। কিন্তু তিনটে ডিমই ফেলতে পারল না। আড়চোখে দেখল মা মৌটুসির মধু খাওয়া শেষ প্রায়, তাই দুটো ডিম ফেলে একটা রেখেই তার পাশে নিজের ডিম পেড়ে চলে গেল।

মা মৌটুসি এসে দেখে তার ছোট্ট একটা ডিমের পাশে মস্তো একটা ডিম। অবাক হয়ে বাবা মৌটুসিকে জিজ্ঞেস করল, "এটা আমাদের ডিম?"

বাবা মৌটুসি বলল, "আরে, আমাদের বাসা, আবার কার ডিম হবে?"

মা মৌটুসি বলল, "তুমি বলছ? কিন্তু এতো বড়ো ডিম আমি পাড়তে পারব?"

বাবা বলল, "বাসায় আছে যখন, তখন তা তো দিতেই হবে।" বলে উড়ে গেল।

অনেক কষ্টে মা মৌটুসি বিশাল ডিমটার ওপর তা দিতে বসল। কোকিলের ডিমটা ওর চেয়েও বড়ো। বাসায় আর জায়গাই বাকি নেই! নিজের ছোট্ট ডিমটা তা দেবে কী করে? বার বার এক বার বড়ো ডিমের ওপরে বসে, তার পরে ছোটো ডিমের ওপরে - এমনি করে তা দিতে থাকল।

গাছের নিচে, মাটিতে দুটো ভাঙা ডিমের চারপাশে হাজার পিঁপড়ের মেলা।

পাশের বাড়ির ছেলেটা বাইনোকুলার দিয়ে দেখছিল। কাকাও ছবি তোলা শেষ করে ভাইপোকে বুঝিয়ে দিল, অতো বড়ো হওয়া সত্ত্বেও পাখিরা বুঝতে পারে না, যে ডিমটা ওদের না। - ছোটো ছোটো পাখিও বিরাট বিরাট কোকিলছানা বড়ো করে নিজের বাচ্চা মনে করে।

*

কিছু দিনের মধ্যেই দুটো ডিম ফুটেই বাচ্চা বেরোলো। মৌটুসির বাচ্চাটা পুঁচকে, কোকিলের ছানাটা বিশাল। জন্মাবার কিছুদিনের মধ্যেই কোকিলছানাটা মৌটুসির বাচ্চাটাকে ঠেলে ঠেলে বাসা থেকে নিচে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে শুরু করল। ওদের মায়েরা যেমন ডিম ফেলে দেয়, কোকিলছানারাও বাসায় অন্য ডিম বা বাচ্চা থাকলে তাদের বাইরে ফেলে দেয়, যাতে তারা মা-বাবার আনা সমস্ত খাবারটাই একা পায়।

কিন্তু মা মৌটুসি দেখে ফেলেছে! নিজের বাচ্চা মনে করে কোকিলের বাচ্চাটাকে দিয়েছে এক ধমক, "রানিচরিকে ধাক্কা দিচ্ছ কেন? ও তোমার বোন না?"

বাবা মৌটুসি জানতে চাইল, "ছোটোটার নাম রানিচরি?"

মা মৌটুসি একটু গর্বের সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ। আমার রানি পাখি।"

বাবা বলল, "ওই ধুমসোটার নাম কী?"

মা বকে বলল, "এমন বিশ্রী করে বলছ কেন? ওর খারাপ লাগবে না?"

বাবাকে বকা সত্ত্বেও মা মৌটুসি কিন্তু বড়ো ছানাটার কোনও নাম দিল না।

বাবা বলল, "কালিচরি নাম দাও। বাবাঃ, অমানিশার মতো কালো!"

নামটা রয়ে গেল।

মৌটুসি মা দু'দিনেই বুঝে গেল যে কালিচরি খুব হ্যাংলা। মা বাবা খাবার নিয়ে আসলেই গলা বাড়িয়ে খেতে চায় - বাবা মৌটুসি বোঝে না, বার বার খালি ওকেই খাইয়ে দেয়।

মা কিন্তু অতো বোকা না। বলে, "কালী, নামো, নামো... এই মাত্র বাবা তোমাকে দু'বার খাইয়ে গেল। আমি দেখেছি। রানিকে খেতে দাও।"

বাবা মৌটুসি বাচ্চাদের বকতে পারে না। গাছের ডালে মাথা নিচু করে বসে থাকে। নিজের বাসা থেকে মা কাক গলা বার করে মৌটুসিদের বাসা দেখে বলল, "ও, তোমাদের বাসায় দেখি কোকিলের বাচ্চা!"

বাবা মৌটুসি রেগে বলল, "কী? কী বললে?"

বাবা কাক এসে উড়ে বসল পাশের ডালে। বলল, "ওই বিরাট বাচ্চাটা যে তোমাদের না তোমরা বুঝতে পারছ না? তোমাদের চেয়েও কতো বড়ো!"

মৌটুসিরা ভালো করে দেখল।

বাবা বলল, "জানো, কাক বোধহয় ঠিকই বলেছে।"

মা মৌটুসিও চিন্তিত। বলল, "হুঁ।"

মা কাক বলল, "আমারও মনে হচ্ছে আমার ডিমগুলোর মধ্যে একটা কোকিলের ডিম ছিল। কিন্তু আমার ডিম আর কোকিলের ডিম এতোই একরকম, যে আমরা আলাদা করতে পারি না। এই বাচ্চাগুলোর একটা কোকিল। আমরা চিনতে পারি না। সবাইকেই খাওয়াতে হয়।"

রাগ করে বাবা কাক বলল, "আর কোকিলের বাচ্চারা এতোই পাজি, যে আমাদের ডিম আর বাচ্চাগুলো বাসা থেকে ঠেলে ঠেলে ফেলে দেয় - শেষ অবধি আমরা কেবল মাত্র একটা কোকিলের বাচ্চাই বড়ো করি!"

মৌটুসিরা আবার তাকিয়ে দেখল, একটা বিশাল বাচ্চার পাশে ওদের ছোট্ট পুঁচকে বাচ্চা - ভয়ে বুক কেঁপে উঠল ওদের।

বাবা কাক বলল, "একটাই রাস্তা আছে। ঠেলে ঠেলে ওই বিরাট বাচ্চাটাকে ফেলে দাও। আমাদেরও তাই করা উচিত, কিন্তু আমরা তো বুঝতে পারি না। তোমরা তো বুঝছ।"

মা কাক রেগে বলল, "তুমিও যেমন! ওরা ওইটুকু পাখি - কী করে ওই বিরাট বাচ্চাটাকে ফেলে দেবে?" বলে মৌটুসিদের বলল, "তবে খাওয়াতে হবে না আর। খাওয়ানো বন্ধ করলেই তো মরে যাবে ও।"

সে দিন সূর্য ডোবার পরে মৌটুসিরা রাতের অন্ধকারে ব্যাপারটা আলোচনা করতে বসল। বাবা মৌটুসি বলল, "বাবা-কাক ঠিক বলেছে। ওকে বাইরে ফেলা আমাদের সাধ্য নয়। কিন্তু মা কাকের বুদ্ধিটা তোমার কেমন লাগছে?"

মা মৌটুসি বলল, "একটা বাচ্চাকে না খাইয়ে মেরে ফেলব? ও যে আমাদের বাসায় জন্মেছে, সেটা কি ওর দোষ?"

বাবা বলল, "ঠিক। কিন্তু এখন থেকে ওকে সাবধানে রাখতে হবে।"

মা বলল, "হ্যাঁ। হয় তুমি নয় আমি এখন থেকে বাসায় থাকব।"

দিন কাটে। মানুষের বাচ্চার চেয়ে পাখির বাচ্চা অনেক তাড়াতাড়ি বড়ো হয় - এক দিন কাকের বাসা থেকে কুহু কুহু করে সুরেলা ডাক ভেসে এল। রেগে আগুন কাক মা-বাবাকে ফেলে একটা কুচকুচে কালো কোকিল উড়ে বেরিয়ে গেল।

রানিচরিও বাসা ছাড়ার জন্য তৈরি। ওর বাচ্চাবয়সের পালক খসে গেছে। ওর মায়ের মতো ওর পিঠ গাঢ় ছাইছাই আর পেট সাদাটে হয়ে এসেছে। আজকাল ও প্রায়ই বাসার ধারে বসে ডানা ঝাপটায়। কিন্তু এখনও উড়তে পারে না।

কালিচরিই করল কাণ্ডটা। একদিন রানিচরি বাসার ধারে এসে ডানা ঝাপটে পাশের গাছের ডালে উড়ে যাবার চেষ্টা করছে চারপাশে গোল হয়ে উড়ে উড়ে মা-বাবা ওকে উৎসাহ দিচ্ছে ডেকে ডেকে।

হঠাৎ, কথা নেই বার্তা নেই, কালিচরি তাড়াহুড়ো করে বাসা থেকে বেরিয়ে এল। বিরাট পাখি এখন কালিচরি। গাঢ় বাদামি রং, তাতে সাদা ছোপ - দেখেই চেনা যায় - মাদি কোকিল। এখন সে চলে যেতে চায়। ওইটুকু বাসায় আর ধরছে না। বাসার ধারে লাফিয়ে উঠে দু'বার ডানা ঝাপটেই উড়ে গেল কালিচরি।

রানিচরি ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গেছে। গাছের ডালে পাতায় ধাক্কা খেতে খেতে পড়তে লেগেছে নিচে। প্রাণপনে ডানা ঝাপটে উড়তে চেষ্টা করছে, কিন্তু পাতা আর ডালের ভীড়ে ডানা মেলতে পারছে না।

তারস্বরে চিৎকার করে রানিচরিকে ডাকতে ডাকতে উড়ে বেড়াচ্ছে মা আর বাবা মৌটুসি।

বাবা কাক মা কাকের দিকে ফিরে বলল, "বলেছিলাম, খেতে দিস না, মেরে ফেল কোকিলটাকে।"

রানিচরি পড়তে পড়তে গাছের শেষ ডালের নিচে এসেই ডানা মেলতে পারল। যতো জোরে পারে ডানা ঝাপটাতেই দেখল, আরে! উড়ছে! উঠতে লেগেছে! আস্তে আস্তে, ডালপালা-পাতার মাঝে ফাঁক খুঁজে খুঁজে রানিচরি উঠতে থাকল, আর দেখতে দেখতে গাছের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে বেরিয়ে দেখল মা বাবা তখনও ওকে খুঁজছে নিচে।

ডেকে বলল, "এই যে আমি!"

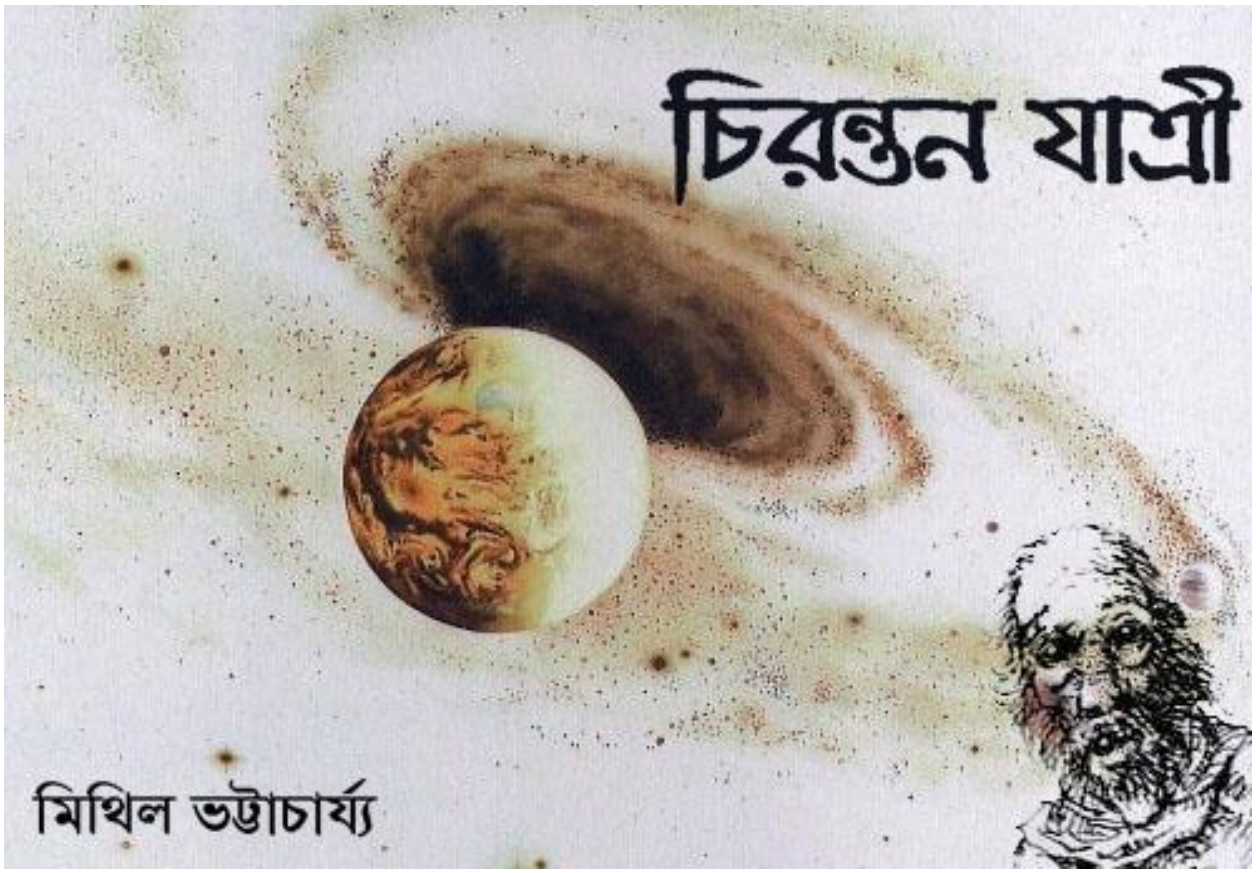
ওরা উড়ে এল। তিনজনে গিয়ে বসল গাছের ডালে। তার পরে কালিচরিকে বকার জন্য মা-বাবা ফিরে দেখে, কই, কোথায় কালিচরি! ভাঙা বাসা পড়ে আছে, কালীর দেখা নেই কোথাও। উড়ে গেছে। এর পর ও-ও একদিন ফিরে আসবে, অন্য পাখির বাসায় ডিম পাড়তে।

বাবা কাক বলল, "বাপরে! নাটক দেখলাম বটে!"

*

জানালা থেকে কাকা ভাইপো দেখল মৌটুসিরা উড়ে চলে গেল নীল আকাশে।

কাকা বলল, "ব্যাস! এ বছরের মতো হয়ে গেল।" বলে ক্যামেরা নিয়ে গেল কম্পিউটারে - ছবি কেমন হয়েছে দেখার জন্য। "আবার আসবে ওরা, আগামী বছর।"



জুলাই ১৬, ২৪৪৫, মানব সভ্যতার ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল দিন বলে ঘোষিত হতে চলেছে আজকের এই দিনটি। অবশেষে আনথ্রোপোসিন যুগের ৫০০তম বার্ষিকীতে মানবসভ্যতা তার সব থেকে বড় স্বপ্নকে সাকার করতে চলেছে, চতুর্মাত্রিক মহাবিশ্বকে অবশেষে তারই ভাষায় জবাব দিতে ত্রিমাত্রিক জগতের অধিবাসীরা শতাব্দীর সাধনার পর বিজ্ঞানের মন্ত্রবলে জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে স্থান ও কালের সীমারেখাকে অতিক্রম করে যাওয়ার আধিভৌতিক স্বপ্নতোরণ কৃত্রিম কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোলের। কয়েক শতাব্দী ধরে যে স্বপ্ন দেখছিল মানবসভ্যতা, অবশেষে সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে। সৌরজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাসট্রোফিজিসিস্ট ডক্টর এন. রিচার্ড এর নেতৃত্বে আজ সফল হতে চলেছে কয়েক শতাব্দীর এই প্রয়াস। স্পেস স্টেশন থেকে মহাবিশ্বের কালো অমানিশার গর্ভে জন্ম নেওয়া এই নির্মীয়মান কৃষ্ণ গহ্বরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে যেন ভুলে যাওয়া অতীতকে আরো একবার ফিরে দেখতে পাচ্ছিলেন এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানসাধক।

বিজ্ঞানী রিচার্ডস এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর প্রিয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিষ্য ডক্টর আদিত্য রায়। মাত্র ৩০ বছর বয়সেই এক সার্থক বিজ্ঞানভিক্ষু হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন এই নবীন বিজ্ঞানী। আর তার সাথে জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছেন সৌরমন্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানতপস্বীর ঐকান্তিক স্নেহ। নম্র স্বরে ডক্টর আদিত্য বলে উঠলেন, "স্যার, সময় হয়ে এসেছে, এবার কৃষ্ণগহ্বর প্রকৃত অর্থে জন্ম নিতে চলেছে। কিন্তু এত দিন থাকতে আপনি আজকের দিনটাকেই কেন বেছে নিলেন এই যুগান্তরকারী পদক্ষেপ এর জন্য?"

বৃদ্ধ বিজ্ঞানী তাঁর গভীর দৃষ্টি তাঁরই হাতে নির্মিত মহাশক্তি থেকে সরিয়ে আনলেন তাঁর পুত্রবত প্রিয় এই নবীন শিষ্যের দিকে, হাসিমুখে বলে উঠলেন, "আজ থেকে ৫০০ বছর আগে এই দিনটিতেই আমাদের আজকের এই আনথ্রোপোসিন যুগের শুভারম্ভ হয়েছিল আদিত্য। আর তাই আজ ৫০০ বছর পর এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ

পদক্ষেপটি নিয়ে সেই মানহাটান পারমাণবিক প্রজেক্ট এর মহাবিজ্ঞানীদের প্রতি একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করাই আমার আজকের এই দিনটি বেছে নেওয়ার একেমেবাদ্বিতীয়ম কারণ ডিয়ার।"

খানিক বাদে শান্ত কণ্ঠে আদিত্য বলে উঠলেন, "স্যার,আপনার স্পেসশিপ তৈরি হয়ে গেছে ,আপনি সৌরমন্ডলের ভেতরে এবার ফিরে যেতে পারেন আপনার সৃষ্ট কৃষ্ণগহ্বরকে জন্ম নিতে দেখতে, কিন্তু এটা কি সত্যি প্রয়োজন? আপনি জানেন কতটা বিপদজনক এই পদক্ষেপ, তা সত্বেও কেন আপনি এগিয়ে চলেছেন এই মহাশক্তির এত কাছে?"

ডক্টর রিচার্ড হাসি মুখে বলে উঠলেন, "নিজের সন্তানকে জন্ম নিতে নিজের চোখেই দেখতে হয় আদিত্য। যুগ যুগ ধরে বহু বিজ্ঞানীদের সাধনার ফল আজ বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে চলেছে। তাদের প্রতিনিধি রূপে এই মহাসন্ধিক্ষণের সাক্ষি তো আমায় হতেই হবে ডিয়ার।"

"কিন্তু এই কৃষ্ণগহ্বর সৌরমন্ডলের ভিতরেই জন্ম দেবার কি সত্যি প্রয়োজন ছিল ডক্টর? সৌরমন্ডলের বাইরের অসীম মহাকাশের বুকেও এর জন্ম দেওয়া যেত।"

ডক্টর রিচার্ড এবার কিছুটা গম্ভীর স্বরে বলে ওঠেন, "তুমি জান আদিত্য আমি নিজেই চাইনি সৌরমন্ডলের ভেতরে এই কৃষ্ণগহ্বরকে জন্ম দিতে। কিন্তু আমার ইচ্ছার থেকেও এখানে বড় হয়ে উঠেছিল এই মহা প্রকল্পকে যে সমস্ত রাষ্ট্রনায়কেরা স্পন্সর করছেন তাঁদের আদেশ। এঁরা আজ একে অপরকে চূড়ান্ত অবিশ্বাস করেন আদিত্য। তাই প্রত্যেকেই চেয়েছেন তাঁদের দৃষ্টির সামনে , তাঁদের তত্ত্বাবধানে এই কৃষ্ণগহ্বরকে জন্ম দিতে। এই অবিশ্বাসের সামনে যে কোনো বিপদের আশঙ্কাই অনেক ছোট হয়ে গেছে ডিয়ার।"

"কিন্তু ডক্টর, বিভিন্ন গ্রহ ও উপগ্রহের মহাকর্ষীয় শক্তি, সৌররশ্মি, এই কৃষ্ণ গহ্বরের প্রকৃতিকে অনিয়ন্ত্রিত করে তুলে পারে, আপনি কি জানাননি এই সত্য তাদের? কত বড় মহাবিনাশ তাদের এই অন্ধ জেদের মাশুল হিসেবে আসতে পারে এর ধারণা কি নেই তাদের ?"

ডক্টর রিচার্ড বিষণ্ণ গলায় বলে ওঠেন, "তুমি এখনো নবীন মনের আদিত্য, অবিশ্বাস এবং ঈর্ষার আগুন মানুষের দৃষ্টিকে কতটা অন্ধ করে দিতে পারে সেই ধারণা নেই তোমার। সব জেনেও ,সব বলার পরেও এঁরা তা শুনতে চান না, বুঝতে চান না। যারা বুঝতে চান না তাঁদের বোঝানো কয়েক কোটি আলোকবর্ষ পার করার থেকেও কয়েকশগুন বেশি দুরূহ মাই ডিয়ার। যাই হোক ,আর দেরি করা ঠিক হবে না। চল এবার স্পেসশিপে উঠে আমায় এগিয়ে চলতে হবে আমার এত বছরের প্রতীক্ষিত স্বপ্ন সার্থক হতে দেখতে। "

স্পেসস্টেশন থেকে শিপে ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে ডক্টর রিচার্ড তার প্রিয় ছাত্রের হাত ধরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন, "যদি কোনো মহাবিনাশের জন্ম দেয় আমাদের এই আবিষ্কার তবে এই স্পেসস্টেশনের প্রধান হিসেবে তুমি একে সৌরমন্ডলের সীমার থেকে বহুদূরে নিয়ে যাবে আদিত্য। মানবসভ্যতার ইতিহাসের চিহ্ন হয়ে তোমাদের জীবিত থাকা সমস্ত মানবজাতির দাবি। সেটাই হবে তোমার এই গুরুর প্রতি তোমার গুরুদক্ষিণা।"

"এরকম কোনো মহাবিনাশের আভাস দেবেন না ডক্টর। এমন গুরুদায়িত্ব নেবার যোগ্যতা নেই আপনার এই শিষ্যের, " আদিত্য কাতর স্বরে বলে উঠল।

ডক্টর রিচার্ড হাসি মুখে বলে উঠলেন, "কোনো মানুষের যোগ্যতা তখনই সে জানতে পারে যখন সেই যোগ্যতার সমতুল্য দায়িত্বের ভার পরে তার উপর ডিয়ার। তোমার যোগ্যতা তুমি জান না ,কিন্তু বিশ্বাস কর এই বৃদ্ধ চোখদুটি মানুষ চিনতে ভুল করে না। তোমার কর্মনিষ্ঠা এবং কর্তব্যবোধ বহুকাল আগেই চিনে নিতে পেরেছিল এই স্বার্থপর বৃদ্ধ মানুষটি। তাই জীবনে প্রথমবার সুপারিশ করে তোমাকে এই স্পেসস্টেশন এর কর্ণধার হিসেবে নিযুক্ত করেছি। কারণ এই গুরুদায়িত্ব অন্য কাউকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে আমি পারতাম না আদিত্য। তোমার কাছ থেকে আমি প্রতিশ্রুতি চাই যদি কোনো মহাবিনাশ হয় তবে মানব সভ্যতার ইতিহাসের চিহ্ন হয়ে যত কাল সম্ভব তোমরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবে এই মহাবিশ্বের বুকে। "

কিছুটা নীরব সময় কেটে গেল গুরুশিষ্যের। অবশেষে আদিত্য বলে উঠল, "ডক্টর, যদি সে'রকম কোনো মহাবিনাশ সত্যি হয়, তবে তার প্রতিকার কী?"

ডক্টর রিচার্ড একটা প্রাণখোলা উদাস হাসি হেসে বললেন, "আমাদের সাধ্য কী ডিয়ার, মানবসভ্যতা আজ এত বৃহৎ মহাশক্তির কাছে অসহায়। না উপায় আমাদের হাতে নেই আদিত্য, আছে শুধুই একজনের হাতে।"

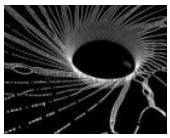
আদিত্য ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল, "কার কাছে ?"

"সৌর মন্ডলের মহাধিপতি, এর জন্মদাতা দিবাকর সূর্যের হাতেই। "

আদিত্য বিস্মিত স্বরে বলে ওঠেন, "কীভাবে ডক্টর ?"

"এই কৃষ্ণগহ্বর প্রাকৃতিক নয় আদিত্য, কৃত্রিম। তাই এর শক্তি এবং আয়ু সীমাবদ্ধ। সূর্য এই কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্বকে কখনই মেনে নিতে পারবে না। সংগ্রাম চলবে এই মানবনির্মিত কৃত্রিম কৃষ্ণগহ্বর এবং দিবাকর দিনমণির মধ্যে।

“এই কৃষ্ণগহ্বর প্রাকৃতিক হলে অনেকগুণ বেশি ক্ষমতাশালী হত। কিন্তু এই কৃত্রিম কৃষ্ণগহ্বরের শক্তি সীমাবদ্ধ, তাই যুগের পর যুগ ধরে সংঘাতের পর একসময় এর অস্তিত্ব মুছে যাবে সৌরমন্ডলের বুক থেকে। কিন্তু কতকাল, কতযুগ পার করে এই সংগ্রাম চলবে তা কেউ জানে না।"



ডক্টর রিচার্ড এর স্পেসশিপ প্রবল বেগে এগিয়ে চলেছে এই মহা রহস্যময় কৃষ্ণকায় গোলকধাঁধার দিকে। একটু একটু করে পূর্ণরূপ পেতে চলেছে শত বিজ্ঞান সাধকের কয়েক শতাব্দীর এই সাধনার ফসল। অবশেষে ডক্টর রিচার্ড এর চোখের সামনে ফুটে উঠল তাঁর এত বছরের স্বপ্ন এত সাধনার ফসল, তাঁর সন্তানসম এই কৃষ্ণগহ্বর। এক অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন ডক্টর রিচার্ড তাঁর নবনির্মিত এই মহারহস্যের দিকে। আর শুধু তিনি নন, তাঁর সাথে যেন যুগ যুগের কত শত বিখ্যাত এবং নামহীন বিজ্ঞানের সাধকের দল আজ অপার বিস্ময় ও গর্বের সাথে তাকিয়ে রয়েছে বিজ্ঞানের এই মহাশক্তির দিকে। এই শক্তি যা আজকের এই যুগের সর্ব শ্রেষ্ঠ কীর্তি। যা বদলে দেবে পৃথিবী তথা সৌরমন্ডলের মানব ইতিহাসকে.....

হঠাৎ একটা প্রচন্ড আকর্ষণে আসন থেকে ছিটকে পড়লেন ডক্টর রিচার্ড। দৃষ্টি পড়ল মহাকাশের বুকে জন্ম নেয়া তাঁর সাধনার ফসল এই কৃষ্ণগহ্বরের দিকে। এক ভিন্ন রূপে যেন ফুটে উঠছে তা অন্ধকার মহাকাশের বুকে! একটা অচেনা তরঙ্গের স্রোত যেন প্রবাহিত হয়ে চলেছে এর কেন্দ্রবিন্দু থেকে। সে অদ্ভুত স্রোত যেন একটু একটু করে গ্রাস করে নিচ্ছে সমস্ত সৌরজগতকে। ডক্টর রিচার্ড একটা অদ্ভুত টান অনুভব করতে লাগলেন নিজের মধ্যে–

একইসাথে শারীরিক ও মানসিকভাবে ,তাঁর মন যেন এক অচেনা গতিতে এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত ফেলে আসা অতীতের দিকে , আর তার শরীরে ঘটে চলেছে এক অদ্ভুত পরিবর্তন! বৃদ্ধ ডক্টর রিচার্ড সময়ের বিপরীত উজানে হারিয়ে গিয়ে ফিরে যাচ্ছেন তাঁর প্রৌঢ় বয়সে, আরো অতীতের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছেন তিনি-- প্রৌঢ়ত্ব থেকে যৌবনে এগিয়ে চলেছে তাঁর ক্লান্ত মন এবং জরাগ্রস্ত শরীর!

কিন্তু এখানেই আর থেমে থাকছে না সময়ের অদ্ভুত খামখেয়ালিপনা ,আরো পিছিয়ে যাচ্ছেন তিনি যৌবন থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে শৈশবে, উল্টো করে চালানো একটা সিনেমার রিলের মত তাঁর ফেলে আসা জীবনের বহু মানুষ যেন একে একে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে আর তারই সাথে একে একে আবার এক গভীর অসীমতায় হারিয়ে যাচ্ছে, শৈশব থেকে আরো অতীতে হারিয়ে যাচ্ছেন তিনি!

একটা সময় তাঁর সমস্ত শরীর সংকুচিত হতে হতে শুধুমাত্র একটি ভ্রুণে পরিণত হল, আর তা থেকে শেষ অবধি শুধুমাত্র একটি কোষে,আর তারপর ডক্টর রিচার্ড এর আর কোনো অস্তিত্বই রইল না। সময়ের অদ্ভুত খামখেয়ালিপনায় মহাবিশ্বের এই যাত্রাপট থেকে মুছে গেলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞান তাপস ডক্টর রিচার্ড।

কিন্তু সেখানেই থেমে থাকল না কৃত্রিম কৃষ্ণগহ্বরের অদ্ভুত পাগলামি। সমস্ত সৌরমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ল তার অদ্ভুত প্রভাব। গোটা সৌরমন্ডল ক্রমশ সময়ের অদ্ভুত গোলকধাঁধায় একটু একটু করে এক অজানা সময়ে হারিয়ে যেতে লাগল। আর সৌরমন্ডলের বাইরের একটি স্পেস স্টেশন থেকে টেলিস্কোপের লেন্সে চোখ রেখে এই অদ্ভুত পাগলামি দেখে বিস্ময়ে ,আতঙ্কে এবং সর্বোপরি নিদারুণ অসহায় ক্ষোভে ছটফট করে উঠল সেই স্পেসস্টেশন এর কর্ণধার এক ৩০ বছর বয়সী নবীন বিজ্ঞানী---



আমার নাম আদিত্য, আদিত্য রায়। কাজ কী করি? কাজ হিসেবে বলতে পারি সৌরমন্ডলের বাইরের এই স্পেসস্টেশনের কর্ণধারের দায়িত্ব পালন করা। যদিও আমার প্রকৃত দায়িত্ব এখন কী তা আমি নিজেও ভালোভাবে আর জানি না। বয়স কত আমার ? এটা ভারী সমস্যার প্রশ্ন করলেন মশাই। এক হিসেবে তা ৩৪ আর অন্য হিসেবে ৪০০৩৪ বছর। কী? আঁতকে উঠলেন নাকি ? কী করব বলুন? আমি নিজেও মাঝে মাঝে সবটা ভাবলে আঁতকে উঠতাম আগে।

এখন আর কোনো ভয় নেই, সে অনুভূতিটাই আজ ভেতর থেকে মরে গেছে। শুধু পড়ে রয়েছে এক প্রতিশ্রুতি এবং অপরিসীম দায়িত্ববোধ। প্রতিশ্রুতি নিজের গুরুর প্রতি আর দায়িত্ববোধ সমস্ত মানবজাতির প্রতি। আজ থেকে ৪০০০০ বছর আগে সৌরমন্ডলের মধ্যে নবনির্মিত কৃষ্ণগহ্বরের যে অদ্ভুত পাগলামি ঘটেছিল তার প্রভাব পড়ে সমস্ত সৌরমন্ডলের উপর। অভিশপ্ত হয়েছিল সমস্ত মানব সভ্যতা। কিন্তু সব থেকে বড় অভিশাপ বোধ হয় পড়েছিল আমার উপর।

সে'দিন আমার শিক্ষক মহান বিজ্ঞানসাধক ডক্টর রিচার্ড যে আশংকা করেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। সৌরমন্ডলের সীমার মধ্যেই কৃষ্ণগহ্বর নির্মাণের যে অবুঝ স্বার্থপর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাষ্ট্রনায়কেরা ,তার মাশুল সেদিন দিতে হয়েছিল সমস্ত মানবসভ্যতাকে। সদ্য তৈরি কৃষ্ণগহ্বর বদলে দিয়েছিল সৌরমন্ডলের মহাকর্ষীয় শক্তির ভারসাম্যকে। আর তার ফলেই দেশকালের বুনোটে এক অজানা পরিবর্তন ঘটে গিয়ে, ১০০০০ বছর পেছনে চলে গেছিল সমস্ত সৌরজগত।

মানবসভ্যতা নিজেদের সমস্ত সত্বা হারিয়ে ১০০০০ বছর আগের অতীতে চলে গিয়েছিল, আর শুধুমাত্র এক নীরব দর্শক হয়ে এই মহাবিনাশের সাক্ষি হয়ে রয়েছিলাম আমি। না। শুধু আমি একা নই, পৃথিবীর বুকে কয়েকটি স্থান যা পদার্থবিদদের সাধনায় "রক্ষক" তরঙ্গ দিয়ে সুরক্ষিত ছিল তারা ও কোনক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল, যদিও বহুদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারা। তাদের জীবন হয়ে উঠেছিল অভিশপ্ত। তাদের স্মৃতিতে বেঁচে রয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগ কিন্তু তারা পৌছে গেছে ১০০০০ বছর আগের প্রাচীন অতীতে। তবুও হার মানেনি এই মানবসন্তানেরা। দুর্যোগের পর ওই কয়েকটি কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আবার তারা বিজ্ঞানের আলো,সভ্যতার দীপ্তি পৌছে দেওয়ার সংকল্প করেছিল এ গ্রহের প্রতিটি প্রান্তে।

এরপর কেটে যায় আবার একে একে দশ হাজার বছর। এই সময় নিজের প্রতিশ্রুতিকে বাঁচিয়ে রাখতে স্পেস স্টেশন এর সমস্ত কর্মীদের নিয়ে হাইবারনেশনে চলে যেতে হয় আমাকে। আশা করেছিলাম দশ হাজার বছর পর জেগে উঠে আবার নিজের চেনা পৃথিবীটিকে ফিরে দেখতে পাব। কিন্তু সেই আশা দুরাশা হিসেবেই রয়ে গেল।

দশ হাজার বছরের গভীর ঘুম থেকে উঠে যখন দেখেছিলাম পৃথিবীসহ সমস্ত সৌরজগতকে আবার সভ্যতার চূড়ান্ত শিখরে উঠে যেতে, যখন ভেবেছিলাম অবশেষে কৃষ্ণগহ্বরের অভিশাপ কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছে সমস্ত সৌরজগত, তখন আমার মূর্খামিতে হেসে উঠে আবার নিজের অভিশপ্ত সত্বার প্রকাশ ঘটিয়ে ছিল লুকিয়ে থাকা ওই কৃষ্ণগহ্বর। না এবার কেউ তা নির্মাণ করেনি। শুধু প্রকৃতির কোন আশ্চর্য লীলায় দশ হাজার বছর পরপর মানুষের হাতে নির্মিত ওই কালো অভিশাপ আবার নিজের পুরনো সত্বায় ফিরে আসে একটু একটু করে। আর অবশেষে ১০০০০ বছর পর ১৬ জুলাই এর সেই অভিশপ্ত দিনটিতেই আবার আত্মপ্রকাশ করে সে।

এই ভাবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে গত ৪০০০০ বছর ধরে। প্রতি দশ হাজার বছর পর আমি ঘুম থেকে জেগে উঠি। তাকিয়ে দেখি আমার চিরপরিচিত অথচ আজকের অচেনা সৌরজগতকে, অসহায়ের মত দেখি আবার তাকে অভিশপ্ত হতে, বোঝার চেষ্টা করি এই অভিশাপের মূল রহস্য, খোঁজার চেষ্টা করি এর কোনো প্রতিকার। তবে তা করি সৌরমন্ডল এর সীমারেখা থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে, কারণ একবার ওই সীমায় প্রবেশ করলে আমরাও হারিয়ে যাব সময়ের ওই গোলকধাঁধায়, একবার ওই চক্রব্যুহে প্রবেশ করলে তার থেকে

বেরোনোর পথ আর নেই ,তাই শত ইচ্ছা সত্বেও আমরা ফিরে যেতে পারিনা নিজেদের এত সাধের ওই বসুন্ধরার বুকে।

বারংবার এক ঘটনা, একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। স্টেশন এর কর্মীরা যখন অধৈর্য হয়ে ওঠে , আমাকেই তাদের শান্ত করতে হয় ,বোঝাতে হয় আমাদের দায়িত্ব ,কর্তব্য, আমাদের অপেক্ষার মূল্য। তারপর আবার একদিন ঘুম থেকে উঠে গভীর উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে থাকতে হয় আশায় বুক বেঁধে।

তবে এই নিরাশার সমুদ্রেও আশার আলো অবশেষে জেগে উঠেছে। সত্য প্রমাণিত হতে চলেছে আমার পথ প্রদর্শনকারী সেই মহান বিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎবাণী। প্রত্যেক কালবৃত্তে একটু একটু করে কৃষ্ণগহ্বরের প্রভাব কমছে সূর্যের অভিকর্ষের প্রভাবে। দিবাকর দিনমণি অবশেষে তার সংগ্রাম শুরু করেছে ওই কালো অভিশাপের বিরুদ্ধে , প্রবল যুদ্ধে নিজের রাজ্যকে শাপমুক্ত করার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছে সে ,আর তার সাথে অতুল উৎকণ্ঠা নিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি তার বিজয়ের দিনটির স্বপ্ন নিয়ে, যে দিন অবশেষে এই মানব নির্মিত কালো অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে মানবসভ্যতা। আর অবশেষে আমরা ফিরতে পারব আমাদের নিজেদের গৃহে ,জানাতে পারব তাদের প্রকৃত ইতিহাস তাদেরকে, তুলে ধরতে পারব আমাদের এত সহস্রাব্দীর বিজ্ঞান সাধনার ফসল তাদের সামনে।

ডক্টর রিচার্ড পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলিকে ভালবাসতেন, তাদের কাহিনী পড়ে শোনাতেন আমাকে ,একবার তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণের এক রাক্ষসের কথা যে নাকি ৬ মাস ঘুমিয়ে ১ দিন জেগে থাকত।

আজ আমিও বোধ করি সেই একই জীবন যাপন করে চলেছি। বরং আরো বেশি অদ্ভুত এক জীবন। দশ হাজার বছরের নিদ্রা তারপর এক বছরের জাগরণ। তবুও আশার আলোয় ভর করে তাকিয়ে রয়েছি সৌরমন্ডলের নিয়ন্ত্রক শক্তি সূর্যদেবের দিকে। প্রতিদিনের মত আজও স্পেস স্টেশনের জানালা দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর নামের সমার্থক নামের এই ক্ষুদ্র মানবসন্তান তাঁকে জানায় এক ভুলে যাওয়া ভাষায় প্রণাম.....

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥

হেড স্যার

উপাসনা পুরকায়স্থ



ব্রজমোহন হাই স্কুলের হেডস্যার দিগন্ত সান্যাল মহাশয় গুড্ডুদের ক্লাশে ভূগোল পড়ান। গুড্ডু এখন ক্লাশ সিক্সে পড়ে। সাদামাটা মাঝবয়সী সান্ন্যাল বাবু রাশভারি লোক। বেশি কথা বলেন না, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, চোখে সাবেকি আমলের কালো ফ্রেমের চশমা আর হাতে সরু চামড়া বাঁধানো লিকলিকে এক চাবুক-যা দেখলেই স্কুলের ছেলেদের বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

তবে ভূগোল বিষয়টা এমনিতে খারাপ লাগে না গুড্ডুর,মাঝে মাঝে কেবল স্যারের রক্তচক্ষুর ভয়ে দ্রাঘিমারেখা অক্ষরেখা আর সাগর মহাসাগরের বেড়াজালে খেই হারিয়ে ফেলে সে। তারপর আবার গুড্ডুর বাবা মাঝে সাঝেই বাড়িতে থাকেন না,কাজেকর্মে বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। তাইতে গুড্ডুর পড়াশুনো নিয়ে বাবার যত রাজ্যের চিন্তা। পড়াশুনো ঠিকঠাক হচ্ছে না শুনলে বাবার রাগ সপ্তমে-

"ভালো করে পড়াশুনো করো গুড্ডু-নয়তো মহাবিপদ-"

তা বিপদ তো গুড্ডুর আর একটা না! বিপদের কি কোন শেষ আছে! এই হেড স্যারের সাথে গুড্ডুর বাবার আবার অনেক দিনের চেনাজানা-বন্ধুত্ব। তাইতে বাবা বাড়ি থাকলে মাঝে মধ্যে স্যার গুড্ডুদের বাড়ি বেড়াতে আসেন। একথা সেকথার পর বাবা গুড্ডু সম্পর্কে জানতে চান, "পড়াশুনো কেমন চলছে ছেলের আমার? একটু চোখে চোখে রাখবেন ,ভারি দুষ্টু–"

গুড্ডু সব শোনে,বুকটা ঢিপ ঢিপ করে ওঠে ওর। যা মাথা গরম লোক সান্যাল স্যার, কী বলতে আবার কি বলে বসেন! এদিকে বাবা রেগে গেলেও তো আবার মহাকেলেঙ্কারী।

কিন্তু নাঃ-আজ অবধি গুড্ডু সম্পর্কে বাবার কাছে কোন খারাপ মন্তব্য করেননি উনি। অন্যদিকে স্যার রাগী লোক হলে কী হবে, ভূগোলের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো অত সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন যে, তা আর বলার না। মনে যেন গেঁথে যায়। তারপর আবার ক্লাশের প্রতিটি ছাত্রের দিকেই স্যারের কড়া নজর।

তা সেদিন হঠাৎ করে গুড্ডু পড়ে গেল মহাবিপদে। ক্লাশরুমের বাইরে জানালার কাছ ঘেঁসে মস্ত বড় এক বট গাছ। চৈত্রমাস- তাইতে পাতায় পাতায় হলুদ রঙ্ ধরেছে। তারপর দিন কয় না যেতে সব পাতা ঝরে গিয়ে একাকার। দেখতে দেখতে পুরো গাছটাই ন্যাড়া হয়ে গেল। গুড্ডু বসে জানালার পাশের একটি বেঞ্চিতে। ন্যাড়া গাছটাকে আজ ক'দিন ধরেই দেখছিল গুড্ডু, গাছটার ডালে মগডালে বেশকিছু কাকের বাসা। হাতির শুঁড়ের মতো অসংখ্য বটের ঝুরি মাটি ছুঁয়েছে। গাছের তলায় জিভ বের করা মা-কালীর এক মূর্তি। একটা

কাকের বাসা-দুটো বাচ্চা কাক---অপলক তাকিয়েছিল গুড্ডু। দুটো ঠোঁট ফাঁক করে বুঝিবা খাবারের অপেক্ষায় বসে। গায়ে পালক গজায়নি, উড়তেও শেখেনি।

কতক্ষণ ওদিকে দেখছিল গুড্ডু নিজেই জানে না। হঠাৎ করে সান্ন্যাল স্যারের বজ্র হুংকার কানে যেতে গুড্ডুর মূর্চ্ছা যাবার জোগাড়-

"এই যে গুড্ডু ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যাও---এক্ষুনি বেরোও বলছি। এদিকে আমি পড়াচ্ছি আর উনি বাইরের দিকে তাকিয়ে–বাইরেই যাও এবারে।"

হতচকিত গুড্ডু মুখে টুঁ শব্দটি না করে ক্লাশের বাইরে বেরিয়ে আসে। ওটাই নিয়ম স্যারের। কিন্তু এ কী হল আজ? অমন অন্যমনস্ক আজ কী করে হয়ে পড়ল ও! ভীষণ কান্না পাচ্ছিল গুড্ডুর।

অতবড় এই ইশকুলে অত লম্বা বারান্দা, সামনে ফাঁকা শুনশান মস্ত এক মাঠ, চারদিক খাঁ -খাঁ, কেউ কোথাও নেই -কী করবে সে এখন! আজ আর ক্লাশে ঢুকবার অনুমতি সে পাবে না- ওটা সে ভাল করেই জানে। কিন্তু কোথায় যাবে সে এখন!

এমনিতে গুড্ডু যথেষ্ট সাহসী। সাপ ব্যাঙ জোঁক কোন কিছুকেই সে ভয় পায় না। এমন কি ভূত যে ভূত- ভূতেও না। সেবারে তো একটা জলঢোঁড়া সাপকে লাঠিতে পেঁচিয়ে হাতের কায়দায় পুকুরের জল থেকে টেনে তুলে তারপর লাঠির ঘায়ে ঘায়ে মেরেই ফেলেছিল সে। সাপ দেখে তো বাড়ির লোকের সে কী চিৎকার! এমন আরো কত কী! কিন্তু সান্যাল স্যার রেগে গেলে যে সাপের চেয়েও ভয়ংকর মনে হয় ওর!

ক্লাশরুমের বাইরে দরজার ওপাশে বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল গুড্ডু। কী লজ্জা কী লজ্জা! কত কথাই না মনে আসছিল ওর। রোজ রোজ কত ছেলেই তো সান্যাল স্যারের হাতে শাস্তি পায়। আর বেশির ভাগ সময় ক্লাশ থেকেই বের করে দেন উনি। কিন্তু গুড্ডুর যে আজ প্রথম।

প্রতিটি ক্লাশ থেকে শিক্ষক- শিক্ষিকার গলায় পড়ানোর আওয়াজ কানে আসছে।এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল গুড্ডু -কেউ দেখে ফেলছে না তো! এখন প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক একটি ঘন্টা। একসময় ক্লাশ শেষ হল, ঘন্টা পড়ল, হেডস্যার গুড্ডুদের ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এলেন। দরজার বাইরে একপাশে দাঁড়ানো গুড্ডুর দিকে চোখ পড়তে বললেন, "যাও ক্লাশে গিয়ে বসো গে যাও।এ কী চোখে আবার জল দেখছি যে?"

ঘাম দিয়ে বুঝি জ্বর ছাড়লো গুড্ডুর। হাতের চেটোয় চোখের জল মুছে ক্লাশে ঢুকতে যাবে কী- সব ছেলে ওর দিকে দিকে চেয়ে দেখছে এখন। মন খারাপের চূড়ান্ত।

বাড়ি ফিরেও গুড্ডু চুপচাপ। মা জিজ্ঞাসা করল, "কী রে গুড্ডু মন খারাপ দেখছি যে বড়! কানমলা খেয়েছিস্ বুঝি ইশকুলে?"

গুড্ডু চুপ। মুখে কথা নেই। ভাবছিল বিষয়টা এখানেই মিটে গেলে হয়,বাবার কানে উঠলে আর রক্ষে কোথায়! এমনিতে বাবা জানবে কী করে- কিন্তু হেডস্যার যদি ওদের বাড়ি বেড়াতে এসে বলে বসেন, "আপনার ছেলেটি পড়াশুনোয় বড্ড অমনোযোগী। এদিকে ক্লাশে পড়াচ্ছি-আর ও বাইরে তাকিয়ে–"

অতসব ভাবতে ভাবতে আজ বিকেলে মাঠে আর খেলতে যাওয়া হলো না গুড্ডুর। বারান্দায় বসে বসে মায়ের দেওয়া আখ চিবোতে চিবোতে বড় রাস্তার ওদিকটায় তাকিয়ে ছিল সে। এরই মধ্যে ছাতা বগলে -সাদা ধূতি পাঞ্জাবী গায়ে কে আসছে এদিকে? হেডস্যার নয় তো!

যা ভেবেছে ঠিক তাই। হেডস্যারই বটে আর গুড্ডুদের বাড়ির এদিকেই আসছেন। কী হবে এবারে? নিশ্চয়ই গুড্ডুর ব্যাপারে কথা বলতে চান বাবার সাথে।

বাড়ির বৈঠকখানার ওদিকটায় যেতে যেতে বারান্দায় বসা গুড্ডুকে দেখে স্যার বললেন, "কী রে গুড্ডু? আখ খাচ্ছিস বুঝি? খুব ভাল- খুব ভাল।"

পর্দা সরিয়ে স্যার সোজা ঢুকে পড়লেন বৈঠকখানা ঘরে। ওখানে বসে বাবা কী সব কাগজপত্র ফাইল নাড়াচাড়া করছিলেন। ওপাশে দরজার পেছনে গা ঢাকা দেয় গুড্ডু। ধীরে ধীরে বাবার সাথে স্যারের পুরনো দিনের গল্প গুজব জমে ওঠে। মা চা দিয়ে গেলেন। চা খাওয়া সেরে খানিক একথা সেকথার পর স্যার এবারে উঠে দাঁড়ালেন, "এবার তবে আসি। তা বিপিন তোমার ছেলে কোথায়?"

বাবা হাঁক পাড়লেন, "ওরে ও গুড্ডু–কোথায় রে?"

দরজার পেছন থেকে গুড্ডু পায়ে পায়ে এসে হাজির। হাসি হাসি মুখ- যেন কিচ্ছুটি জানে না।

গুড্ডুকে দেখে স্যার বললেন, "ঐ দেখো যে জন্যে আসা সেটাই বলা হয়নি।"

গুড্ডুর বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। ওরে বাবা রে! একথা সেকথায় বোধকরি ভুলে বসেছিলেন,গুড্ডুকে সামনে দেখে ফের মনে পড়ল।

কিন্তু নাঃ। অবাক কান্ড! ওসব কিচ্ছুটি না,মুখ ফিরিয়ে বাবাকে উদ্দেশ্য করে স্যার বললেন, "গুড্ডুকে আমার সাথে একটু নিয়ে যাচ্ছি বিপিন। ফের সাথে করেই দিয়ে যাব।"

তারপর গুড্ডুর কানে ফিসফিসিয়ে বললেন, "গুড্ডু কাকের ছানা দেখবি চল। কাক না হয়ে এ আবার কোকিল ছানাও হতে পারে, বুঝলি? কারণ দুষ্টু কোকিল তো আবার কাকেদের বাড়িতে ডিম পেড়ে রাখে।আর বোকা কাক কোকিলের ডিমকে নিজের ডিম ভেবে বসে বসে তা দেয় তাই না?"

বাবা মাথা নেড়ে অনুমতি দিলে হেড স্যার গুড্ডুর হাত ধরলেন, "চল গুড্ডু তাড়াতাড়ি চল। স্কুলে যেতে হবে তো।"

গুড্ডুর চোখ থেকে বুঝি বা জল বেরিয়ে আসবে।ওর সব ধারণাই তবে মিথ্যে! স্যার গুড্ডু সম্পর্কে বাবাকে তো কিছু বললেনই না উল্টো আবার হাত ধরে কাকের ছানা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন!

হাঁটতে হাঁটতে ওরা ইশকুলে এসে পৌঁছোল। ঐ তো শেকড়বাকড়ে ঘেরা সেই বট গাছ। শেষ বিকেলে



সূর্যাস্তের রক্তিম আভা গাছের ডালে মগডালে আর পাখির বাসায়। বড্ড সুন্দর দেখাচ্ছে এখন! কাছেপিঠে কোথাও একটা ব্যস্ত কোকিলের কূহু ডাক শোনা যাচ্ছে, যেন শেষ বিকেলে ঘরে ফেরার আগে অমন ডেকে ডেকে প্রকৃতিকে সে আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছে।

গুড্ডুর পিঠে স্যারের আলতো হাতের স্নেহ স্পর্শ, "বাগান থেকে মইটা নিয়ে আসব নাকি রে? তাহলে আরো ভাল করে দেখতে পাবি। কিন্তু ওদের বেশি বিরক্ত করলে তো আবার ওরা ঠুকরে দেবে মাথায়। চল্–তার চেয়ে স্কুলের উঁচু বারান্দাটায় একটু তফাতে দাঁড়িয়েই দেখি বরঞ্চ।"

এতক্ষণে হুঁশ ফেরে গুড্ডুর। এ কোন হেড স্যার! গুড্ডুদের ইশকুলের হেডমাস্টার দিগন্ত সান্যাল বাবু কি? যাঁর ভয়ে ইশকুলের ছোট-বড় সকলেই থর থর কাঁপে, কই-মনে হচ্ছে না তো!

ছবিঃ অংশুমান

সোমঙ্কর লাহিড়ী



কাঠুরে লোকটাকে দেখলে মনে হত যেন কাঠেরই তৈরি। রুক্ষ শুষ্ক চেহারা, আর হাত দুটো ছিল বেজায় শক্ত পোক্ত। দেখেই মালুম হত। বুধনদের কলোনির বাড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েছে তারপরে জঙ্গলের শুরু, লোকটা কাঁধে করে কুঠার নিয়ে যখন যেত বাড়ির বাগানের বা টবের গাছগুলো যেন কেমন নেতিয়ে যেত। সবাই বুঝতে পারত না, কিন্তু যারা গাছগাছালি ভালবাসে কেবল তারাই বুঝত। তারপর দূর থেকে শোনা যেত ঠকঠক শব্দ। দুই একদিন বাদে একটা ট্রাক্টারের পিছনে চেপে একটা মৃত গাছ চলে যেত সভ্যতার পেটে।

লোকটা সাধারণ কাঠুরেদের মত ছিল না। জঙ্গলে যারা আদিবাসী তারা গাছ কাটার পক্ষে নয়, ভাঙা ঝরা ডাল শুকনো পাতা আর মৃত গাছ থেকেই তারা তাদের জ্বালানীর কাঠ জোগাড় করে নিত। কিন্তু এর যেন গাছেদের সাথে শত্রুতা ছিল। আগে কাঁধে থাকত কুঠার, প্যান্টটা ঢলঢলে, কারখানার কোন বড় সাহেবের থেকে পাওয়া পুরানো, জামাও তাই। কিন্তু গাছ মেরে লোকটা ক্রমশ কেতাধারী হয়ে উঠছিল। একদিন দেখা গেল কলোনির শেষে যেখানে জঙ্গলের শুরু সেখানকার মাটিতে সব ঘাসের রং লাল। কেউ দেখতে পেয়েছে কিনা বুধন জানত না। কিন্তু শুখার কাল নয়, কিছু নয়। কিন্তু ঘাস লাল দেখে ওর মনে হয়েছিল যে অন্য কোন ব্যাপার আছে।

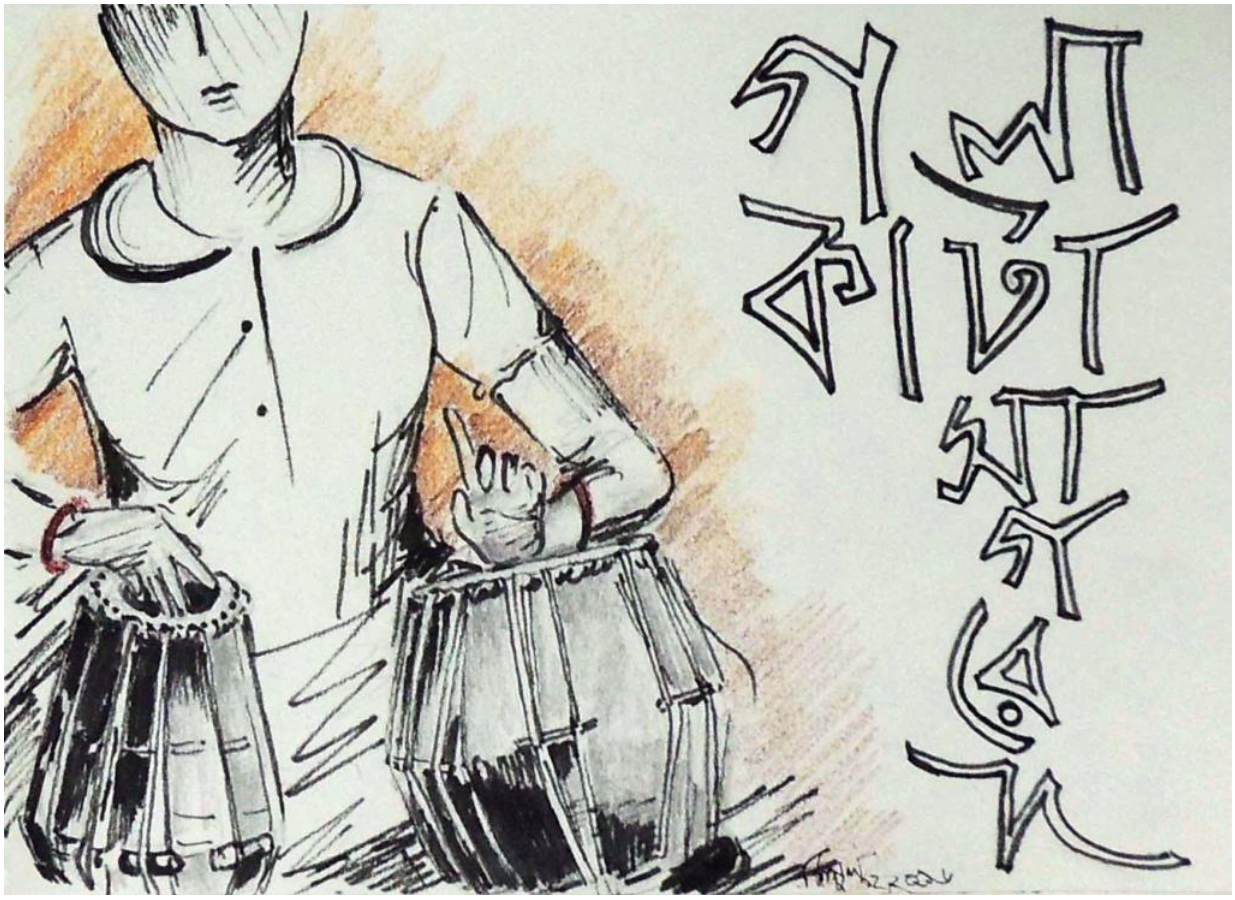
তারপরেই দেখল সেই কাঠুরে লোকটা যাচ্ছে। কাঁধে নয় আজ হাতে ঝোলানো একটা লম্বা বাক্স। বুধনকে দেখে লোকটা হাসল। সাদা দাঁতের সারি দেখে বুধনের মনে হল করাত। হাতের জিনিসটা দেখিয়ে বুধন জানতে চাইল সেটা কি? লোকটা সেটা উপর দিকে তুলে বুধনকে দেখিয়ে বলল “এটা কে বলে চেন স, এটা দিয়ে গাছের গায়ে মারতে হয় না। শুধু চালিয়ে ধরলেই গাছ কাটা হয়ে যায়, দেখবি? আয় আমার সাথে।”

বুধন ওর অবোধ্য গোঙানোর মত ভাষায় কাঠুরেকে দেখাতে গেল যে আজ ঘাসের রং লাল হয়ে গেছে, দেখ। কাঠুরের চোখে কিছুই পড়ল না, সে বুধনকে পিছনে রেখে চলে গেল জঙ্গলে, গাছ মারতে। কিছু বাদে শোনা গেল চেন সয়ের চালু হওয়ার শব্দ ঘ্ররররররররররররররর। বুধন ঘাসেদের দিকে আবার তাকাল। তারপরে ফিরে গেল ওর আস্তানায়। ঘাসগুলো দুলছিল।

লোকটা ফিরে যেত রোদ পড়ে গেলে। আজ বুধন দেখল লোকটা ফিরল না। কলোনির পুরুষেরা কেউ কাজ থেকে ফেরেনি, বাকিদের কারো খেয়ালও নেই। বুধন আজ জঙ্গলে ঢুকল খানেকটা ভেতর দিকে যাওয়ার পরে দেখল কাঠুরে লোকটা মাটিতে পড়ে আছে আড়াআড়ি কাটা। আরো অবাক হয়ে গেল লোকটা পুরো কাঠের হয়ে গেছে, আড়াআড়ি কাটা দেহটার থেকে বিন্দু মাত্র রক্ত বেরচ্ছে না। আর গাছটার একটা কাটা ডালের নীচে পড়ে রয়েছে সেই চেন স। আর কাটা ডাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে গাছের নীচটা লাল হয়ে গেছে।

ফেরার পথে বুধন দেখল ঘাসগুলো সব সবুজ হয়ে হাওয়ার ছোঁয়ায় দুলছে।

ছবিঃ শিমুল



সুব্রত রুজ

প্রত্যেক বছর চব্বিশ আর পঁচিশে ডিসেম্বর আমাদের শহরের রবীন্দ্রভবনে একটা ক্লাসিক্যালের প্রোগ্রাম হয়। প্রোগ্রামটা নেহাত খারাপ হয় না। প্রচুর লোকজন হয়। কলকাতার কোন বড় শিল্পী আসেন। প্রতিবছর স্যারের ভজন দিয়ে প্রোগ্রাম শুরু হয়। তারপর অন্য শিল্পীদের গান কিম্বা বাজনা শুরু হয়। স্যার ছাড়াও আরও কয়েকজন নামকরা শিল্পী আছেন। ব্রজকিশোর লাহিড়ি সেতার বাজান, সমর্পণ ঘোষ স্বরোদ, অভয় চ্যাটার্জি বাঁশি। এছাড়াও সীমন্তিনী ভট্টাচার্য খেয়াল গান, আর শাশ্বতী প্রামাণিক বাজান গিটার।

প্রথম দিকটায় উঠতি শিল্পীরা থাকে। তাছাড়া সুনন্দা ঘোষালের কত্থক , সীমা লখতিয়ার ওড়িশি নাচও হয়। পরের দিন স্যার খেয়াল গান। অতিথি শিল্পীর গান অথবা বাজনা দিয়ে আসর শেষ হয়। এবারেও জমাটি হবে। কলকাতা থেকে খেয়াল গাইয়ে বাবা সোহনলাল আসছেন, সঙ্গে তবলায় পণ্ডিত আনন্দগোপাল। উনি আবার স্যারের বন্ধু বিক্রম স্যার, মানে বিক্রমজিতের গুরু। বিক্রম স্যার এখানকার নামকরা তবলচি। উনি ছাড়াও তবলায় স্বপন বসাক আছেন, আর আছেন অনিমেষ ভট্টাচার্য।

স্যার মানে আমার গানের স্যার অনিল মুখোপাধ্যায়। ওঁর কাছে বছরপাঁচেক হল গান শিখছি। প্রথমে মা'র কাছে হাতেখড়ি হয়েছিল, তারপর মা স্যারের কাছে ভর্তি করে দিয়েছে। আমাদের গানের স্কুলটার নামটা খুব সুন্দর, "সারস্বত সাধনা" ।

প্রথমদিন স্যারের সাথে আমাকেও স্টেজে বসতে হবে। স্যার একটা টিম নিয়ে গাইতে ওঠেন। এ'বছর স্যারের সঙ্গে অতনুদা আর মিমিদি বসবে। ওরা স্যারের সঙ্গে গাইবে। বিক্রমস্যার তবলায় থাকবেন , আমি ভজনের সময় মন্দিরা বাজাব। এখন আমার ফোর্থ ইয়ার চলছে। সামনের বছর ফিফথ ইয়ারে উঠব। স্যার বলেছেন তখন স্টেজে গাইতে হবে; এখন থেকে স্টেজে না উঠলে নাকি স্টেজ ফ্রি হব না।

বাস থেকে নামলাম। মা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে। রোজ এখান থেকে মা-ই আমাকে নিয়ে যায়। মা কে দেখে এগিয়ে গেলাম। মা আমার হাত থেকে ব্যাগটা নিতে নিতে বলল, "মাস্টারমশাই ফোন করেছিলেন একটু আগে।"

বললাম, "জানি তো। স্যার আগের ক্লাসেই তো বলে দিয়েছেন চারটের মধ্যে ওঁর বাড়িতে চলে যেতে। চারটে থেকে পাঁচটা রিহার্সাল করে একটু রেস্ট নিয়ে আমরা বেরোব।"

মা বলল, "ঠিক আছে। বাড়ি চ, ড্রেস ট্রেস ছাড়, ভাত টাত খা, তারপর অটো ধরে দুজনে চলে যাব'খন।"

স্যারের বাড়ির সামনে যখন এসে দাঁড়ালাম তখন প্রায় চারটে বাজে। উঠোন পেরিয়ে হলঘরে, মানে যে ঘরটায় আমাদের ক্লাস হয়, পা দিয়েই আমার চক্ষু চড়কগাছ। স্যার মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। স্বরমণ্ডল পায়ের কাছে গড়াগড়ি যাচ্ছে। অতনু দা স্যারের ডানপাশে যেমন বসে, বসে আছে। হাত গালে। সামনে হারমোনিয়াম। একপাশে তবলায় হাত রেখে কচু বসে আছে। বাঁদিকটায় মিমিদি কিম্বা অলকাদি বসে।ওখানটা ফাঁকা, কেবল তানপুরা শুয়ে আছে। দরজার দিকে পিঠ করে স্যরের মুখোমুখি বিক্রম স্যার বসে। গায়ে চাদর জড়ানো।

আমি ঘরে ঢুকেছি স্যার খেয়ালই করলেন না। অতনুদা স্যারের দিকে তাকিয়ে ছিল, ও ও দেখেনি। কচু শুধু দেখে মুচকি হাসল। ওকে ইশারায় বললাম, "কী হয়েছে রে?"

কচু স্লিঙে হাত ঝোলাবার ভঙ্গি করল, তারপর চোখের ইশারায় বিক্রমস্যারকে দেখিয়ে দিল। তার মানে বিক্রমস্যারের হাত ভেঙেছে।

বুঝতে পারলাম আমার চোখগুলো আস্তে আস্তে গোল হয়ে যাছে আর চোয়ালটা নিচের দিকে আপনিই নেমে যাচ্ছে। সব্বনাশের মাথায় বাড়ি! আর একটু পরেই যে প্রোগ্রাম! বিক্রম স্যার তো কেবল স্যারের সঙ্গেই বাজাবেন না, সমর্পণ ঘোষের সঙ্গেও বাজাবেন। অন্যরা যে যার তবলচি নিয়ে আসেন। কিন্তু এই দুজনের কী হবে?

ঘরের হাওয়া দেখে মা-ও হকচকিয়ে গেছে, "কী হল মাস্টারমশাই?"

মার গলা পেয়ে স্যার মুখ তুললেন, "ও আপনি? আর বলেন কেন, সব গ্রহ তারা নক্ষত্র একসঙ্গে ঠিক করেছে আমায় আজ ডুবিয়ে ছাড়বে। এদিকে সকালবেলা খবর এল কাল রাত থেকে মিমির তেড়ে জ্বর এসেছে, কাকে তানপুরায় বসাই সেই চিন্তায় মরছি, সিনিয়র স্টুডেন্ট বলতে তো আর তেমন কেউ নেই। তমোনাশ অলকানন্দা ছিল, ওরা দুজনে ছেলেকে নিয়ে অজন্তা ইলোরা দেখতে গেছে। ওদিকে বিজুর অবস্থা দেখুন। আজ সকালে স্কুটার সুদ্ধু পিছলে পড়েছে, নিয়ে হাত ভেঙে বসে আছে। এখন তবলায় কে বসবে?"

মা কার্পেটের ওপরে বসতে বসতে বলল, "তানপুরা নিয়ে এত ভাবছেন কেন মাস্টারমশাই ? আমি তো আছি। ওদের মত ভাল করে আপনার সঙ্গে গলা দিতে পারব না ঠিকই, কিন্তু তানপুরাটা তো আমি ধরে দিতে পারব।"

স্যার পুরো এক মিনিট মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "তানপুরাটা ধরে দেবেন বলছেন?"

মা বলল, "দেব, ধরে দেব। আপনি তানপুরা নিয়ে টেনশন করবেন না। তবলার ব্যাপারটা ভাবুন। আচ্ছা মাস্টারমশাই বিক্রমবাবু নয় বাজাতে পারবেন না; ওঁর ওই ছাত্র আছে তো, ওই যে কী নাম যেন,মেঘ না কী?"

"মেঘ শ্রাবণ? সে থাকলে তো বখেড়া মিটেই যেত। সে তো নেই। কোম্পানির কাজে বম্বে গেছে। বলছি না আজ শনি মঙ্গল রাহু কেতু সবাই মিলে পিছনে পড়েছে! "

মা এবার হেসে ফেলল, "বেশ। কেউ নেই আপনার মেয়ে তো আছে। ও তো বাড়িতে আপনার সাথে বাজায়, স্টেজে পারবে না? "

স্যার কচুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "সেটাই ভাবছি।"

কচু স্যারের একমাত্র মেয়ে। ওর ভাল নাম কস্তুরী। ও জন্ম থেকেই ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব। মেশিন ছাড়া কানে শুনতে পায় না, কথাও বলতে পারে না। স্যারের কাছেই শুনেছি ও তখন এই এতটুকু, স্যার ওকে নিয়ে ভেলোরে গেছিলেন। দুই কানে কীসব অপারেশন হয়েছে, তারপর ডাক্তাররা মেশিন লাগিয়ে দিয়েছেন। এখন কানে শুনতে পায়, কিন্তু কথা প্রায় বলতেই পারেনা। দু একটা লাইন যা বলে সে এমন জড়ানো, স্যার আর কাকিমা ছাড়া কারও বোঝবার ক্ষমতা নেই। আমাদের সঙ্গে ইশারায় কথা বলে।

কথা না বলতে পারলে কী হয়, কচুর তবলার হাত একদম ফাটাফাটি। মিমিদি একদিন ওর তবলা শেখার গল্প বলেছিল। কচু তখন ছোট । ওদের ক্লাস চলার সময় একপাশে চুপটি করে বসে শুনত, আর পায়ে তাল দিত। তাই দেখে ওর যখন পাঁচ বছর বয়েস, বিক্রমস্যার ওকে একটু একটু করে তবলা শেখাতে শুরু করেন। এই বছরসাতেকের মধ্যে কচু ভাল বাজাতে শিখে গেছে। ও আর আমি একসঙ্গেই আরম্ভ করেছি। আমিও পাঁচ বছরে হারমোনিয়াম ধরেছি। দু বছর পরে যখন স্যারের কাছে আসি, কচু আমাদের সঙ্গে বসত। আমরা তখন সবে তবলার সাথে গাইতে শিখেছি। আমরা গাইতাম, ও ঠেকা দিত। এখন তো অতনুদা, মিমিদিদের ব্যাচে বাজায়। শুনেছি স্যার যখন রেয়াজ করেন বিক্রম স্যার এক আধদিন না এলে কচু দিব্যি চালিয়ে দেয়।

তবে স্টেজে ও তো তেমন ভাবে বাজায়নি। স্টেজে যে ক'বার উঠেছে সে'সব স্কুলের ফাংশনে। হঠাৎ করে ওকে এত বড়ো জায়গায় স্টেজে তুলতে স্যার যে ভরসা পাবেন না সেটা তো আমিই বুঝতে পারছি।

কিন্তু কচুকেই বা স্টেজে তোলার দরকার কী? এত বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে, আমাদের শহরের তো প্রায় সব ক'জন নামকরা তবলচি থাকবেন। অন্য কেউও তো স্যারের সঙ্গে বাজিয়ে দিতে পারেন!

আমার মনের কথাটাই মা বলে দিল, “আচ্ছা মাস্টারমশাই, আরও তো তবলচি থাকবে। শুনলাম অনিমেষবাবু আসবেন, স্বপন বসাক থাকবেন। ওঁরাও তো কেউ আপনার সঙ্গে বসতে পারেন।”

স্যার কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, “কাল তখন তো প্রব্লেম নেই। বাবুদার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, উনি খেয়ালের সময় আমার সঙ্গে বসবেন। প্রব্লেম তো ভজনের বেলায়। ছটায় প্রোগ্রাম আরম্ভ হবে। উদ্বোধন বক্তৃতা এইসব হয়ে আমার বসতে বসতে সাতটা ধরুন। বাবুদা আজকে শাশ্বতীর সঙ্গে বাজাবেন। ওঁদের টাইম নটায়। সাড়ে আটটার আগে কেউ ঢুকবে না। রিহার্সাল টিহারসালের ব্যাপার আছে তো। "

বিক্রমস্যার বললেন, “কথাটা সেটা নয়। কেউ যদি নাও থাকত, গুরুজিই তো বসতে পারতেন। কচুই বসুক আজ। বড় আসরে আজ নয় কাল তো বসতেই হবে। আর রানা, তুই এত টেনশন করছিস কেন বল তো? ভজন তো সোজা গান। ঠেকা ধরে থাকবে, মুখে এসে ছোট ছোট কাজ করবে। ওটুকু কচু পারবে। ওর ওপর ভরসা না থাকলে আমি গুরুজির সামনে ওকে বসাতাম? আমাদেরও তো মান সম্মানের ব্যাপার আছে।"

স্যার একটা নিশ্বাস ফেললেন , “ বেশ, রিহার্সালটা তো করে নিই । রেডি হও সবাই।ঐশী, মন্দিরা নাও । "

মা উঠে গিয়ে স্যারের বাঁদিকে বসে তানপুরা ধরল। আমি হাতে মন্দিরা তুলে নিলাম। স্যার স্বরমণ্ডলে একটা টান দিয়ে গান ধরলেন 'ওঁ নম: ভগবতে বাসুদেবায়'।

আমরা যখন রবীন্দ্র ভবনে ঢুকলাম তখন ছটা বেজে গেছে। গ্রিনরুমে হারমোনিয়াম তবলা রেখে আমরা হলে গিয়ে বসলাম। একটু পরেই প্রোগ্রাম শুরু হল। আজকের প্রোগ্রামটা এই রকম : প্রথমে উদ্বোধন, বক্তৃতা, তারপর স্যারের ভজন। তারপর সীমা ম্যাডামের ওড়িশি, তারপর তথাগত বর্মণ বলে সমর্পণ ঘোষের একজন স্টুডেন্টের সরোদ। তারপর শাশ্বতী প্রামাণিকের গিটার, শেষে পণ্ডিত আনন্দগোপালের তবলা লহরা।

প্রথমে পণ্ডিতজি, আর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করলেন। তারপর ভাষণ শুরু হলে আমরা ভেতরে চলে এলাম। স্যার আর অতনুদা তানপুরা হারমোনিয়াম মেলাতে শুরু করলেন। পন্ডিতজিকে আগে টিভিতে কিম্বা দূর থেকে স্টেজে দেখেছি। আজ সামনাসামনি দেখলাম। প্রোগ্রাম শুরুর আগে বিক্রম স্যার ওঁকে গ্রিনরুমে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা ওঁকে প্রণাম করলাম। টি ভিতে দেখেছি কেমন গম্ভীর গম্ভীর মুখ করে বাজান। আসলে কিন্তু বেশ হাসিখুশি।

শুনতে পাচ্ছি স্টেজের চেয়ার টেবিল সরান হচ্ছে। এবার আমাদের বসার পালা। মা চট করে আমার আর কচুর চুল টুল ঠিক করে ফেস পাউডার আর লিপস্টিকটা আর একবার বুলিয়ে দিল।

পাঁচ মিনিট পরেই একজন ভলান্টিয়ার উঁকি মারল , “ রানাদা রেডি? “

স্যার বললেন , “রেডি।"

“ তাহলে হারমোনিয়াম তবলা স্টেজে লাগিয়ে দিচ্ছি । কইরে আয় তোরা, এগুলো স্টেজে তোল। "

প্রথমে স্যার, পিছন পিছন আমরা গিয়ে স্টেজে গোল হয়ে বসলাম। স্টেজে এখন পরদা ফেলা। মাঝে স্যার বসলেন, ওঁর বাঁদিকে মা, মার পাশে কচু। ডান পাশে অতনু দা তার পাশে আমি।

অতনুদা মাইক সেট করতে শুরু করল। তার মাঝেই ফিসফিস করে বলা হয়ে গেল, “দুই ধারে দুই কলাগাছ।"

আমি ইশারায় কচুকে কথাটা রিলে করলাম। মা একবার কটমট করে আমার দিকে তাকাল।

পরদা উঠল। স্যার অডিয়েন্সকে প্রণাম করে 'ভগবতে বাসুদেবায়' শুরু করলেন। সোজা গান। কচু সুন্দর উতরে দিল। মাঝে একটা কাজ করতে হাততালিও পড়ল। বিক্রম স্যার ফার্স্ট রোতে পণ্ডিতজির পাশে বসেছিলেন। উনি হাত নাড়লেন।

তারপর ' ঠুমক চলত রামচন্দ্র' তারপর 'প্রভুজি তুম চন্দন হাম পানি '। স্যার ব্যাপক ভজন করেন। যাকে বলে একবারে মনপ্রাণ ঢেলে। আজও গাইলেন। প্রচুর হাততালি পড়ল। নমস্কার করে স্যার উঠতে যাবেন, হইহই শুরু হল, “ রং দে চুনরিয়া, রং দে চুনরিয়া”। ভজনে স্যারের সেরা হল ' রং দে চুনরিয়া '। কিন্তু গানটা একটু শক্ত। কটা ভাঙা মাত্রার কাজ আছে। তবলায় কচু বসেছে বলে স্যার আজ বাদ দিয়েছেন।

হইচই শুরু হতেই স্যারের মুখ শুকিয়ে গেল। মাইক বাঁচিয়ে বললেন, “ এই রে।"

কচুর কিন্তু হেলদোল নেই। পাশ থেকে হাতুড়িটা তুলে নিয়ে বাঁয়াটা একবার ভাল করে ঠুকে নিল। স্যার ওর দিকে তাকিয়ে বোধহয় সাহস পেলেন। একটু হেসে সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে স্বরমণ্ডলে টান দিলেন।

দুটো চরণ গাওয়া হয়ে গেল। স্যার গানের মধ্যে একবারে ডুবে গেছেন। চোখ বুজে গাইছেন 'বিনা রঙ্গায়ে ম্যায় তো ঘর নাহি জাউঙ্গি '। হারমোনিয়ামে অতনুদার আঙুল খেলে বেড়াচ্ছে। হল গমগম করছে। অডিয়েন্স যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। ।

ওদিকে আমারও দম বন্ধ হয়ে আসছে। এর পরই সেই শক্ত জায়গাটা। একটা সরগম করে তারপর সম আসবে। এইখানটার মাত্রার ক্যালকুলেশনটা খুব টাফ। অতনুদারা এতদিন ধরে শিখছে, ওরাও দেখেছি এই জায়গাটা হাতে কিম্বা পায়ে তাল রেখে গায়।

স্যার সারগম করছেন। কচু স্রেফ ঠেকা ধরে আছে। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছে। সমটা কচু যদি না ধরতে পারে?

স্যার যেই সমে পড়বেন, কচু আচমকা চাবুকের মত একটা তেহাই দিল। তারপর স্যারের সঙ্গে সমে পড়ল। হাততালির ঝড় বয়ে গেল। বিক্রমস্যার দেখলাম একবারে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

গান শেষ হয়ে পরদা পড়তে আমরা উঠে পড়লাম। এত ঠাণ্ডাতেও কচুর কপালে ঘাম বিনবিন করছে। গ্রিনরুমে ঢুকে মা ব্যাগ থেকে টিসু পেপার বার করে ওর কপালে গালে বোলাতে লাগল।

বিক্রমস্যার হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন, " এই কচু, রানা, আয়। গুরুজি ডাকছেন।"

ওঁর সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই গেলাম। কচু গিয়েই প্রথমে পণ্ডিতজি, তারপর স্যার আর বিক্রমস্যারকে প্রণাম করল। পণ্ডিতজি ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, "সাবাস বেটি। খুব সুন্দর বাজিয়েছ। শেখ, মন দিয়ে শেখ। তুমি আমাদের ঘরের নাম রাখতে পারবে। "

স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বেটির আমার বুদ্ধি আছে। কে বলবে ওর সবে ফোর্থ ইয়ার। পাকা বাজিয়ের মত এমন লাগসই করে ঠেকার ওপর তেহাইটা ফিট করে দিল, পাবলিককে বুঝতেই দিলনা ও আজ প্রথমদিন বড় আসরে বসেছে। চমৎকার। ও অনেক ওপরে যাবে অনিল।"

স্যার ধরা গলায় বললেন, " আপনাদের আশীর্বাদ।"

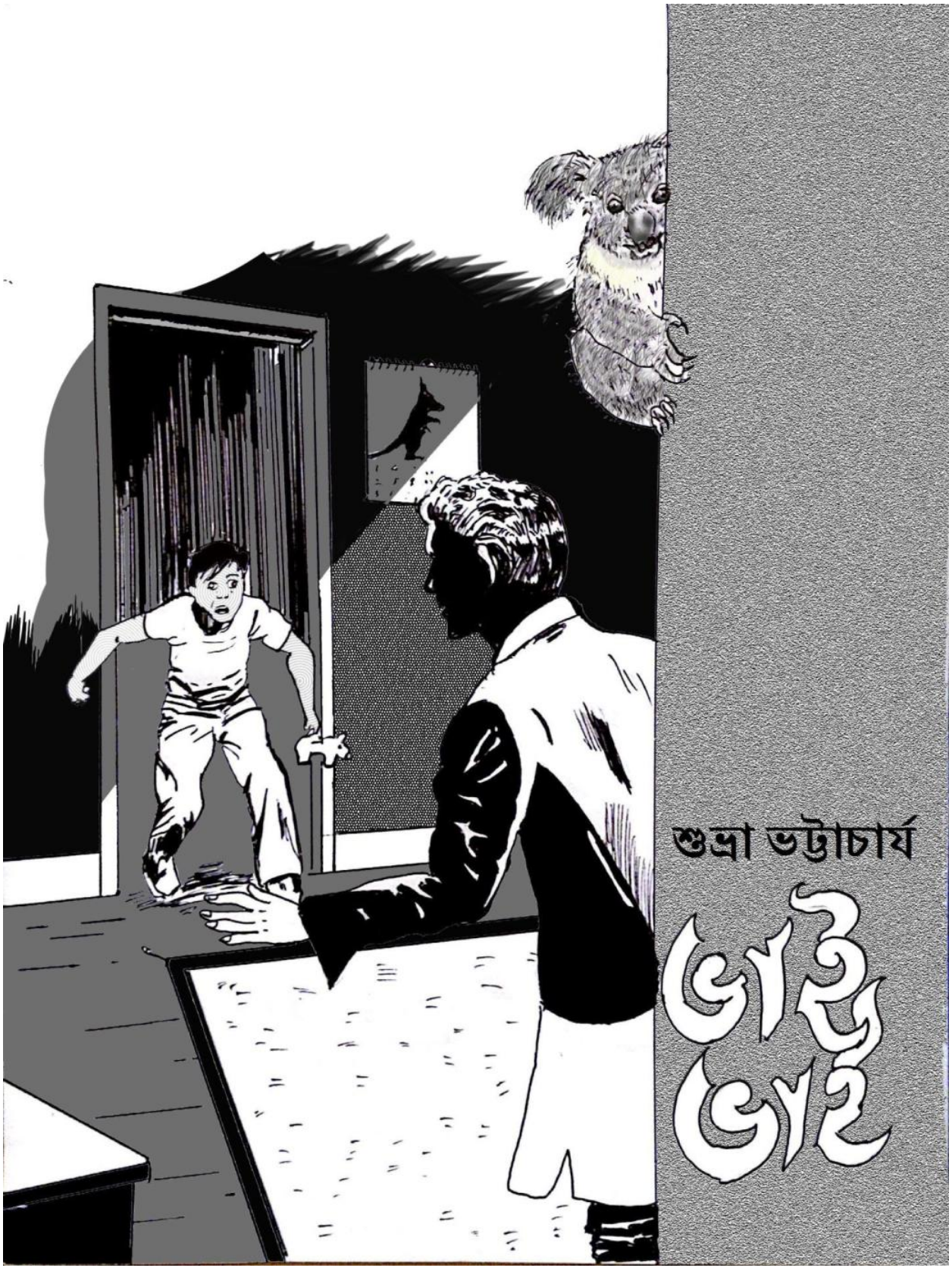
বিক্রমস্যার বললেন, "কচু কথা বলতে পারে না বলে মেয়ের নামে কত কী বলেছে রানা। কচু, গলাকাটা সাগরেদ,আরও কত কী। আজ কি বলবি?"

স্যার দু কানে হাত দিলেন, "আমি মাপ চাইছি।"

পণ্ডিতজি হাসছেন, কিন্তু কেমন ধমকে বললেন, "তোমার মাপ চাওয়াই উচিত। একটা মাত্র মেয়ে, তার নাম রেখেছ কচু। ছ্যা ছ্যা, আর নাম পাওনি? তার মানে তুমি ধরেই নিলে ও যখন কথা বলতে পারবে না,তখন আর অন্য কিছু ওকে দিয়ে হবে না। হোয়াই সো? কলাশ্রীকে দেখনি তুমি? একটা পা নেই, তাতে নকল পা লাগিয়ে নাচছে। তোমার মেয়েই বা পারবে না কেন? ওকে ওই নামে কেউ ডাকবে না। দিস ইজ মাই অর্ডার।"

ইতিমধ্যে আশপাশে আরও লোকজন জড়ো হয়েছে। স্যারের বকা খাওয়া দেখে সবাই হাসছে। স্যারও হাসছেন। ডানহাত কচুর কাঁধে। চোখে জল। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে পাঞ্জাবি ভিজিয়ে দিয়েছে।

ছবিঃ শিমুল



শুভ্রা ভট্টাচার্য

ভোট ভোট

জন্মের পর সাধারণত বাচ্চারা মা-বাবা অথবা মম-ড্যাড এ জাতীয় কথাই প্রথম শেখে । কিন্তু ডোডোর ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম। ডোডো জন্মের পর প্রথম যে কথাটা শিখেছে তা হল 'বু' । মা-এর পর এই 'বু'-ই তার সমস্ত দুনিয়া । ব্রো বা ব্রাদার (বা ভাই) , যে একটি এক বছরের শিশুর বুলিতে 'বু'-এ পরিণত হয় , সে আসলে একটি কোয়ালা । ডোডোর বাবা একদিন ফরেস্ট থেকে কুড়িয়ে পান সঙ্গী হারা ছোট্ট কোয়ালাটিকে । বাড়ি নিয়ে এসে খুব অল্প দিনের মধ্যেই পোষ মানিয়ে নেন ।

ডোডো জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই মা কে হারায় । তখন থেকেই মা হারা ডোডোর একমাত্র সাথী বু । ডোডোদের কম্পাউন্ডে নানা রকমের গাছ আছে । সেখানেই সারাদিন বু-এর সঙ্গে খেলাধূলা করে চার বছরের শিশুর সারাটা দিন কাটে । বু -কে নিজে হাতে ফল খাইয়ে তবেই সে খায় । সকালে ঘুম থেকে উঠে থেকে বু -এর সাথে খুনসুটি , ঘুমন্ত বু -কে ঠেলে ঠেলে জাগানো , খাওয়ানো , স্নান করানো , গা ব্রাশ করে দেওয়া এই সব কাজ তো মায়ের থেকেই শেখা । এর মধ্যেই বু আবার বারে বারে ঘুমিয়েও পড়ে । ফল খাওয়াতে খাওয়াতে বা যখন গায়ের লোম চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দেওয়ার সময় বু ঘুমে ঢুলতে থাকে, ডোডো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ।

উত্তর কলকাতা নিবাসী সাগর বিশ্বাস চাকুরী সূত্রে প্রায় আট বছর ধরে স্ত্রীকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় থাকছিলেন। ডোডোর জন্মের পরই খুব জটিল একটা রোগে তাঁর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন । অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসার কোনও ত্রুটি রাখেননি তিনি । তাঁর সঞ্চিত প্রায় সমস্ত অর্থ দিয়েই তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন । তবু শেষ রক্ষা হল না । স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই বিদেশ বিভূঁইএ একা ছেলেকে নিয়ে খুব অসহায় হয়ে পড়েন । ডোডোর দেখাশুনার জন্যে তিনি অনেক কষ্টে একজন পরিচারকের ব্যাবস্থাও করেন । কিন্তু এভাবে আর কতদিন চালানো যাবে তা নিয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তায় ছিলেন । কারণ যা অর্থ সঞ্চয়ে আছে তা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মত এত ব্যায়বহুল স্থানে বাড়ি ভাড়া সমেত অন্যান্য খরচ বেশিদিন বহন করা যাবে না । অতঃ কিম তিনি পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে এক সঙ্গে বাড়তে থাকা দুই ভাইয়ের বন্ধুত্বও উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বু আজকাল আবার গাছের চেয়ে ডোডোর খাটটাই ঘুমোবার জন্যে বেশি পছন্দ করছে। একটা মাত্র সিঙ্গল বিছানা দুজনের শোবার জন্যে যথেষ্ট নয়, তবু ওইটেতেই গুঁতোগুঁতি করে দুজনের শোয়া চাই। সুযোগ পেলেই ডোডো বু-কে নিয়ে পড়াতে বসে। আর পড়তে পড়তে এতদিনে অর্ধেক বইটাই বু -এর পেটে হজম হয়ে গেছে ।

সাগরবাবু দক্ষিণ কলকাতায় একটি বেশ বড় সড় ফ্ল্যাট কিনেছিলেন স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে থাকবেন ভেবে । পরবর্তী কালে কলকাতা ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় বদলি হয়ে গেলেন। তিনি ঠিক করলেন ডোডোকে নিয়ে উত্তর কলকাতার বাড়িতে না গিয়ে তিনি ফ্ল্যাটেই গিয়ে উঠবেন । কিন্তু বু-কে এখানেই রেখে যেতে হবে তাছাড়া কোনও উপায় নেই । এ কথা ডোডোকে জানাতেই তার চোখ ছলছল করে উঠল। সে জেদ ধরে বসল যে কোনও উপায়েই বু -কে সে এখানে রেখে যেতে রাজি নয় । সাগরবাবু ছেলেকে বোঝালেন, "বু অস্ট্রেলিয়ার জল হাওয়ার বাইরে কিছুতেই বাঁচবে না । আর আমাদের কাছে এত টাকা নেই যে আমরা এই বাড়িতে বেশিদিন থাকতে পারব।"

"বাড়িতে থাকতে হলে টাকা দিয়ে থাকতে হয়? আর টাকা দিতে না পারলে কী হবে বাবা ? "

"টাকা দিতে না পারলে আমাদের আর এই বাড়িতে থাকতে দেবে না সোনা । আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে।"

ডোডো তবু মুখ ভার করে রাখে । তার চোখে অপার বিস্ময় । সে ভাবতেই পারছে না যে বু -কে না নিয়েই তাকে চলে যেতে হবে ।

“বাবা, আমরা না থাকলে বু -কে কে খাইয়ে দেবে ? কে ঘুম পাড়িয়ে দেবে আর চান করিয়ে দেবে?” চার বছরের শিশু ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকে তার বাবার দিকে। কিন্তু তার বোধযোগ্য সদুত্তর সাগরবাবুর অজানা। তিনি অনেক কষ্টে অসহায় ছেলেকে শান্ত করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছেন। দেশে ফিরতে তাঁকে হবেই। ডোডোকে দেখাশুনার জন্যে একজন বয়স্ক পরিচারককে তিনি রেখেছিলেন। তাঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব শুনে তিনিও খুব কান্নাকাটি করলেন। সাগরবাবু তাঁর প্রাপ্য বকেয়া সব মিটিয়ে দিলেন। এমন সময় তাঁর পাঞ্জাবীতে একটা ছোট্ট টান পড়ল। ফিরে দেখেন ডোডো দাঁড়িয়ে আছে বু-কে নিয়ে। তার দুই গাল বেয়ে নেমে এসেছে অভিমানী জলের ধারা। আর তার হাতে ধরা তার সাধের পিগিব্যাঙ্কখানা ।

“তুমি আমার সব টাকা গুলো নিয়ে ওদের দিয়ে দাও বাবা । তাহলে তো আর কেউ আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না বলো ? আমরা বু-কে ছেড়ে যাচ্ছিনা তো বাবা?”

সাগরবাবু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। অপরাধীর মত হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন ছেলের সামনে। ডোডোকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললেন ।

এরপর দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে সাগরবাবু ডোডো আর বু কে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার “কুমা” শহরের অনতিদূরে অন্য একটি ছোটো বাড়িতে শিফট হলেন । বাড়ি বদলের ব্যাপারে অফিস থেকেও সাহায্য পাওয়া গেল। ডোডোর আর বু -কে ছেড়ে থাকার ভয় নেই। বাবা কথা দিয়েছেন বু -এর জন্যে আরেকটা খাট বানিয়ে দেবেন । দুই ভাই পাশাপাশি থাকবে ।

ছবিঃ তন্ময়

কুলফিমালাই আর আজব ফেরিওয়ালা

সোনালি



অর্চি।মানে অর্চিষ্মান বন্দোপাধ্যায়। মায়ের পাটু বাবু পটলা।

পড়তে শিখছে পাটু।দিদির মত অত তাড়াতাড়ি নয়।কিন্ত শামুকের মতন ও নয়।ঐ যুক্ত অক্ষর হলে একটু মনে মনে বানান করে নেয়।

দিদি ত পাকা বুড়ি থুরথুরি। পুলপুলি দেবী। পাটুর চাইতে পুরো দু বছরের বড়ো।সে ছেলেবেলা থেকে দাদাইয়ের কোলে বসে অ-চ-ল অ-ধ-ম করেছে তো।তাই ইস্কুলে ঢোকার আগেই রিডিং পড়ার অভ্যেস হয়ে গেছে।

কেমন গিন্নিমার মত মুখ করে বলল," কিছুই যে পড়িস না ভাই,শেষে কি গোমুখ্যু হবি?"

হুঁ! শক্ত শক্ত শব্দ বলতে গিয়ে ওর সামনের খুদি খুদি সাদা দাঁতগুলো টপটপ করে খুলে পড়ে যায়নি এদ্দিনে যে, এই না ঢের।

দোষের মধ্যে কী না অর্চি, এই ফুটকি থেকে পেন্সিল দিয়ে ওই ফুটকি অব্দি লাইন টেনে টেনে কার্সিভ রাইটিং এর পাতা ভর্তি জি,এইচ লিখছিল না। কেবলই এই পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কেটে হাত ব্যথা করতে কাঁহাতক ভাল লাগে?

দাদাইয়ের সোফার পিঠটায় চড়ে বসেছিল পটলকুমার পাটুবাবু। সামনেই গ্রিল দেওয়া পুবদিকের জানালাটা। পাশে চৌকো চৌকো রঙিন কাচ দেয়া ভাঁজ করা দরজা পেরিয়ে দোতলার ঝোলানো বারান্দা। বারান্দার মাথায় ঢালু লাল টালি। রোজ পুবের আলো বারান্দা পেরিয়ে রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে "জবাকুসুমসঙ্কাশং" বললেই দাদাই এসে সুর্যকে প্রণাম করেন। ওপরে ঠাকুরঘরে ঠাকুরকে গুড মর্নিং করে,কই গো বললেই, আম্মু ধোঁয়া ওঠা নেসক্যাফে আর গুড ডে বিস্কুট নিয়ে হাজির।

গরমের ছুটতে পাটু আর তার পুলপুলিদিদি, বেশির ভাগ সময়টাই দাদা আম্মুর বাড়ি "সীমাস্বর্গ"তে থাকে। খুউব মজা তখন। তার মধ্যে কেন হোম ওয়ার্ক টোম ওয়ার্কের খারাপ কথাগুলো মনে করা?

সোফার উঁচু পিঠটার দুদিকে পা দিয়ে বসে অর্চি ট্রাক চালায়। বিলকুল ট্রাকের মতই আওয়াজ হয় মুখ দিয়ে। বাঁইবাঁই করে স্টিয়ারিং ঘোরে দুই হাতে। সোফায় বসে দাদাই অনেক সময় ব্যাংকের কাগজ, হিসেবপত্র, এটা ওটা লেখেন। তাতে অর্চির কোন অসুবিধে হয় না। দাদার ঘাড়ের ওপরে হেলান দিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকে সে। দাদা মাঝেমাঝে বলেন, “ভাই গাড়ি তো আমার ঘাড়ের ওপরই চালিয়ে দিলে, কাজ করব কী করে?”

কিন্ত তাতে কারো কোনই হেলদোল হয় না। অর্চি জানে, দাদা কখনো বকেন না।আর তার গাড়িভক্তির পাঁচালিতে দাদাই তার একমাত্র পার্টনার। সামনের বাড়ির দুটো তিনটে বাইক এলেই, কে দৌড়য় পাটুর সংগে, হ্যাঁ? দাদা সাথেসাথেই, ভাই আয় আয় লাল গাড়িটা এল,নীল গাড়িটা এল--- বলে ওর সংগে বারান্দায় গিয়ে

দাঁড়ান কিনা? বুঝবে আর কেউ লাল নীল ভ্রুম করে এসে দাঁড়ানো মোটরবাইকের মাহাত্ম্য? একটা গানও আছে ওদের। চুপিচুপি দুজনে মিলে গায়-

" লাল গাড়িটা কোথায় গেলি
নীল গাড়িটা কোথায় গেলি
জজ্জা জানলা কোথায় গেলি....."

আসলে,ভাইকে রংপেন্সিল দিয়ে নানারকম গাড়ি যেই এঁকে দ্যান দাদাই, অমনি তার খুদি খুদি জরজা জানলা দেখে ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়ে দাদার সোনার গুল্লিভাই, শ্রীমান অর্চিষ্মান বন্দোপাধ্যায়। দাদা,বাবা, পিসেমশায়, যেখানে যত গাড়ি কিনতে পাওয়া যায়,সব এনে জড়ো করেন সবাই শ্রীমান ভাইয়ের জন্যে। ট্রাক, সাইকেল, পুলিশের জিপগাড়ি, এরোপ্লেন, ট্যাক্সি --কী যে নেই!

গত জন্মদিনে দাদাই আবার সত্যিকারের মত একটা রেললাইন আর মস্ত ট্রেন কিনে দিয়েছেন। গোল করে লাইন পেতে সুইচ টিপে ট্রেন চালিয়ে দিলেই রেলগাড়ি চলতে থাকে। দিব্যি তার মধ্যেখানে বসে থাকে অর্চিষ্মান। মোট কথা দাদাই আর পটলু ভাই,এই দুজনেই গাড়ি বোদ্ধা।

সেদিন দাদাই বাজারে। তাই হরলিক্স আর বিস্কুট খেয়ে একাই সোফায় ট্রাক চালাচ্ছিল অর্চি। নিচে একতলার রাস্তা থেকে কত রকম সকাল বেলার আওয়াজ ভেসে আসছে।

“বা স ন নেবেন না কি। বোম্বে ইস্টিল.....”

“এইচ্চাবি....”

“শিল কাটাউ--”

হঠাৎ বারান্দার নিচে খুব জোরে কে বলল," কামড়ে নিবু"। চমকে উঠল অর্চি। রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে আম্মুকে দেখা যাচ্ছে না কিন্ত। কেমন গা ছমছম লাগল। আবার খুব জোরে কে বলল, " কামড়ে নেব ।"

চমকে ধড়াস করে ওঠে বুকের ভেতর। পাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোফা নেমে বসল পাটু সড়াৎ করে। ডাকব আম্মুকে? নাঃ। আর তো শোনা যায়নি গলাটা।

আবার উপরে উঠে বসতে যাবে যেই,ফের, " কামড়ে নেব।"

নাঃ আর এখানে থাকলে চলবে না। সাবধানে পা ঝুলিয়ে দিয়ে সোফা থেকে আলগোছে নেমে পড়ে অর্চি। এক পা, দু পা টিপিটিপি গিয়েই ধাঁ করে দৌড়ে খাবার আর রান্নার জায়গার মাঝখানে পৌঁছে গেল। গ্যাসের ওপরে ভাত টুগবুগ করে ফুটছে আর গন্ধ ছড়াচ্ছে হাঁড়ি থেকে। ঝকঝকে রান্নাঘরে রোদ। কিন্তু আম্মু তো নেই। তবে কি কেউ নিয়ে চলে গেলো আম্মুকে? পিছিয়ে পিছিয়ে আম্মুর শোয়ার ঘরের দিকে যেতে থাকল অর্চি।

আম্মুর ঘরের পিছন দিকে, পশ্চিমের বারান্দা থেকে পুলপুলিদিদির গলা ভেসে এল হঠাৎ, “ভাই,এই ভাই,কই গেলি রে,দেখে যা কুচি কুচি কত পেয়ারা হয়েছে গাছে।”

দিদিভাইউর গলা! বেঁচে গেলো পাটুবাবু। এক দৌড়ে আম্মুর ঘরের পাশের ছোট দরজা দিয়ে পিছনের বারান্দায়। দিদি সেখানে মস্ত লগা হাতে বীরের মত দাঁড়িয়ে।

“কী রে?”

“দ্যাখ ভাই দ্যাখ, পেয়ারা ফুল আর ছোট্ট ছোট্ট পেয়ারায় গাছ ভর্তি রে।”

“তাই তো! তুই লক্কা নিয়ে কী করছিস?”

মস্ত একখানা বাখারি।তার মাথায় কাস্তের মত বাঁকানো লোহা নারকেল দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খুউব শক্ত করে বাঁধা আছে। ওই দিয়েই টেনে টেনে আম্মু,দাদাই,রান্নার বউমা, নিম পাতা, পেয়ারা, আম সব পাড়ে গাছ থেকে। আরও নানা সাইজের লাঠি আছে এবাড়িতে। দুই ভাইবোনেরই তার প্রতি অনন্ত লোভ।আম্মু লাঠি লক্কা নিয়ে টানাটানি করতে বারণ করেন।পাছে ছোট হাতে চোঁচ ফুটে যায়। বা নিজেদেরই মাথায় টাথায় লেগে যায় বেমক্কা। তাই আরো বেশি লোভ। আর লাঠি তো লাঠিই।এই লম্বা জিনিষটা লক্কা। পাটু দিদির কাছ ঘেঁষে আসে।

“ওই দিদিরে, নিচে একটু আগে কে একটা চেঁচাল।”

“কে?”

“কী জানি। বারবার বলছে, কামড়ে নেব, সত্যি।”

ভুরু কুঁচকে গেলো পুল্লিদিদির, “কই,চল দেখি।”

“লক্কাটা নিয়ে যাবি দিদি?”

“অ্যাঁ, না। দরজা দিয়ে বের করা বড্ড ঝামেলা। বারান্দার দরজা কত ছোট দেখছিস না! তার চে একটু দেখে আসি আগে। দরকার হলে,মায়ের ঠাকুরদাদার কালো পেয়ারার ডালের সেই যে লাঠিটা, মাথায় ওয়াইএর মত,ওইটা বরং নিয়ে যাব।”

হাত ধরে চলে দু ভাইবোনে।এ ঘর থেকে মাঝের সরু প্যাসেজ। তারপর দাদার ঘরের দরজা। ঘর পেরিয়ে সামনের বারান্দার কাছে গিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে। দিদি বলে, “ধুত, শুধু শুধু ভয় পাস ভাই। কই, কেউ তো নেই।”

“বলছি আছে! কামড়ানোর কথা বলছিল।”

“কামড়ানো না হাতি।”

বাঘ সিংহদের আবার ভারি পছন্দ পুলপুলিদিদির। ভাইকে রোজ তার পোষা হাতির গল্প শোনায়। ছোট্ট মতন হাতির ছানা।নাকি,শুঁড় দুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে দৌড়ে আসে।পুচকে লেজ টিংটিং করে নাড়ে পিছনে। ওতে চড়ে দিদি নাকি ইস্কুল যাবে। ধ্যুত। এ তো নীল ভেলভেটের নরম ছোট্ট হাতু পুতুল।

না নাকি। দরকার পড়লেই দিদি ওর লম্বা কানে ফুঁ দিলেই ও বেলুনের মত ফুলতে ফুলতে বড়ো হয়ে যায় দিদিকে পিঠে নেবে বলে। দিদি কেমন চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, “সে কী? তুই দেখিসনি কখনো? কী হাঁদা রে---”

চুপ করে থাকে ভাই। কিন্তু বিশ্বাস হয় না। তো সে যাকগে। এখন তো সত্যিই কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না বারান্দার নিচে। দিদি দৌড়ে দাদার বুককেসের সামনে চলে গেল। সেখানে আয়নার সামনে সোনালি রঙের কাজ করা কানা উঁচু পেতলের মোরাদাবাদি থালা।ওপরে আম্মুর কাশ্মীরি কাজের গোল সিঁদুর কৌটো। থালার তলায় ধোপার হিসেব, মুদির দোকানের খাতা,কেবল টিভির রসিদ, সব চাপা দিয়ে রাখা। সেই সংগেই রাখা থাকে দিদিভাইউর পরম সম্পত্তি। হলুদ সেরেল্যাকের পুরোনো বাক্স কেটে দাদার বানানো অপূর্ব সব "চম" অর্থাৎ চশমা। কোনটা চৌকোনো,কোনটা নেতাজির ছবির মত গোল, কোনটা চোখের মত কোণা কোণা কায়দার। সে’রকমই একটা চশমা নাকের ডগায় লাগিয়ে গম্ভীর মুখে দিদি এগিয়ে গেলেন বারান্দায়। সাদা পিল্পের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল নিচে।

“কে রে ভাইকে ভয় দেখাচ্ছিল? ও মা! ও ভাই,দেখবি আয়।ও কামড়াবে না রে। ওই দ্যাখ, পাশে রাজাবনিদের বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে। ও তো ফলওয়ালা কাকু। ওই যে মাথার ঝাঁকা নামিয়ে আম্মুর সংগে কথা বলছে। ওই যে রে,রোজ আমাদের জন্যে মুসাম্বি,কলা,আপেল দিয়ে যায় যে। আজকে কমলা লেবু এনেছে। এ বছর এই প্রথম কমলা লেবু রে, কী মজা! বুঝলি কী? কামড়ে নেবু না। বলছে কমল নেবু। আম্মু কমলা কিনছে ওর কাছ থেকে।”

আহ্লাদে গলাগলি বসে থাকে দুই মিষ্টি মানুষ। এইবার শীতকাল আসবে।

যেদিন উড়েছিলাম



ঊর্মী মুখার্জি

https://youtu.be/rXwTooIU5nU

না, প্লেনে করে ওড়ার কথা বলছি না। সে রকম তো রোজ লাখে লাখে লোক উড়ে বেড়াচ্ছে। আর ওতে মজাই বা কী আছে? যদি মুখে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা না লাগল, যদি কানের পাশ দিয়ে শনশন করে বাতাস না বয়ে গেল, যদি দু-চারটে গাছের পাতায় আঙুল না ছুঁয়ে গেল, তবে আর কী ওড়া হল!

আমি বলছি প্যারাগ্লাইডিং-এর কথা। এক ধরনের সরু, লম্বাটে প্যারাশুট হয়, অনেকটা পাখির ডানার মতই দেখতে, তাকে বলে প্যারাগ্লাইডার। কোনও উঁচু জায়গা থেকে লাফ মেরে, তাতে ভর করে যতক্ষণ খুশি আকাশে উড়ে ইচ্ছেমত আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে আসা যায়। এই হল প্যারাগ্লাইডিং। এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্ট।

এই ধরনের আকাশে ওড়ার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্ট আরও তিনটি আছে। প্যারাসেলিং, স্কাইডাইভিং, আর বেস জাম্পিং। প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা মজা আর উত্তেজনা আছে। প্যারাসেলিং এর ক্ষেত্রে তোমাকে একটি খোলা প্যারাশুটের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হবে। আর একটা লম্বা দড়ির একদিক বেঁধে দেওয়া হবে একটি মোটর বোটের সঙ্গে। অন্য দিকটির সঙ্গে তুমি বাঁধা থাকবে। বোট চালু হলে তার টানে আর প্যারাশুটে হাওয়া ঢুকে তুমি আকাশে উড়ে যাবে। বোট থামলে আস্তে আস্তে নেমে আসবে। এটা সমুদ্রের ধারে অনেক টুরিস্ট স্পটেই করা হয়ে থাকে।

স্কাইডাইভিং আর বেস জাম্পিং অনেক কঠিন। স্কাইডাইভিং-এর ক্ষেত্রে প্লেন থেকে লাফ মারতে হয়। অনেকটা হু-হু করে মাটির দিকে পড়তে হবে, যাকে বলে ‘ফ্রি ফল’। তারপর প্যারাশুট খোলার পালা। বাকিটা প্যারাশুটে ভর করে হাওয়ায় ভেসে নামতে হবে। তবে সবচেয়ে কঠিন বোধহয় বেস জাম্পিং। কোনও উঁচু জায়গা থেকে লাফ মারতে হয়, প্যারাগ্লাইডিং-এর মতোই। তবে প্যারাশুট না খুলে। বেশ খানিকটা ফ্রি ফলের পর প্যারাশুট খোলার পালা।

বেস জাম্পিং ছাড়া বাকি তিনটিই কিন্তু পর্যটক হিসেবে, কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়া করা যায়। প্যারাসেলিং-এর ক্ষেত্রে সঙ্গে কোনও ট্রেনর বা পাইলট লাগে না। প্যারাগ্লাইডিং আর স্কাইডাইভিং দুটোই পাইলট নিয়ে করা যায়। পাইলট যা করার করবে, তুমি তার সঙ্গে বাঁধা থাকবে। সেইভাবেই আমি প্যারাগ্লাইডিং করেছিলাম সিকিমের রাংকা বলে একটা জায়গায়। তারই গল্প বলব এবার।

আমার প্রথম ট্রেক সবে শেষ করেছি। সিকিমের গোয়েচালা বিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘার বেস ক্যাম্প বলে। সেই ট্রেকটাই করেছি। আট দিন পাহাড়ে, জঙ্গলে হেঁটে হেঁটে ঘুরে, হাজার ফুট উঠে আর হাজার ফুট নেমে, তারপর গ্যাংটক পৌঁছেছি। পা ফুলে ঢোল। কিন্তু ঠিক করেছি যখন প্যারাগ্লাইডিং করব, তখন আমায় আটকায় কে!

'ফ্লাই সিকিম অ্যাডভেঞ্চার' বলে একটা সংস্থার ফোন নম্বর ছিল আমার কাছে। আগের রাতে কথা বলে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম রাংকার উদ্দেশ্যে। রাংকায় রেশিথাং বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে পরপর বেশ কয়েকটি এরকম সংস্থা আছে যারা প্যারাগ্লাইডিং করায়। গ্যাংটক থেকে ঘন্টাখানেক লাগে গাড়িতে।

দুরকম ওড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। 'মিডিয়াম ফ্লাই' আর 'হাই ফ্লাই'। কতটা ওপর থেকে লাফানো হবে আর কতক্ষণ আকাশে ভেসে থাকবে তার ওপর নির্ভর করবে। 'হাই' হলে বেশি ওপরে নিয়ে যাবে আর বেশিক্ষণ আকাশে থাকতে পারবে। আমি অবশ্য মিডিয়ামটাই নিয়েছিলাম। সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরা নিতে চাইলে নেওয়া যায়। আমি সেটা নিয়েছিলাম।

আমাকে সংস্থার গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল যেখান থেকে লাফাতে হবে সেখানে। প্যারাগ্লাইডিং করে নামতে হবে রাংকার স্টেডিয়ামে। আমার গাড়ি সেখানে অপেক্ষা করবে। বেশ খাড়া চড়াই দিয়ে আধঘণ্টা ওঠার পর একটা বিরাট বাড়ির মতো দেখতে জিনিসের সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল সেটাও স্টেডিয়াম জাতীয় কিছু।

আমরা অবশ্য ভেতরে ঢুকলাম না। একপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। সেটা দিয়ে ছাদে পৌঁছে গেলাম। উঠে তো মোটামুটি আমার চক্ষু চড়কগাছ। ছাদটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। আর গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে পড়লে একেবারে হাজার-দুহাজার ফুট 'ফ্রি ফল' নিশ্চিত। নিচে মেঝেটাও করকরে, পা টা যেন পিছলে যাচ্ছে। আমি তো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ভাবছি একবার যদি গড়িয়ে পড়ি তো, যাকে বলে, পপাত চ মমার চ।



আমার সঙ্গে অনেকগুলো ছেলে এসেছিল গাড়িতে। তখন ভেবেছিলাম এতজন কেন লাগবে। এখন বুঝলাম যে প্যারাগ্লাইডারটা খুলতে একাধিক লোক লাগে। দু-তিনজন মিলে আমায় 'সেফটি গিয়ার' পরিয়ে দিল। মাথায় হেলমেট। আর গাদা গাদা স্ট্র্যাপ দিয়ে আমার পাইলট তাশির সঙ্গে বাঁধা। তাশি ঠিক আমার পেছনে দাঁড়িয়ে। আমার কোমর থেকে আবার একটা দড়ি দিয়ে একটা ছোট্ট বসার জায়গা বাঁধা। ঠিক যেমন দোলনার সিট হয়। সেটা আমার হাঁটুর ঠিক পেছনে ঝুলছে। সব মিলিয়ে হাস্যকর দেখতে লাগছে।

তারপর অবশ্য ওরা যা বলল তাতে আমার হাসি-টাসি শুকিয়ে মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। আমাকে নাকি ওই খাদটার দিকে হেঁটে যেতে হবে। এবং একদম লাফাবার আগের মুহূর্তে যখন ওরা বলবে তখন সিটটায় বসে পড়তে হবে। আমার মনে হল আমি কিছুতেই মাথা ঠাণ্ডা রেখে এতকিছু করতে পারব না।

'ভয় পাবেন না। সব ঠিকঠাক হবে। আমরা সবাই আপনার সঙ্গে ছাদের ধার অবধি যাব,' একটি ছেলে বলল। কিন্তু তাও দেখি বুকে দামামা বাজাটা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। 'যদি ঠিক সময়ে বসে না পড়তে পারি?' শুকনো ঠোঁট চেটে জিজ্ঞেস করলাম। 'ও আপনি এমনিই বসে পড়বেন। একটা হেঁচকা টান লাগবে আর আপনি বসে পড়বেন,' একজন বলল। সেটা শুনেও বিশেষ ভরসা পেলাম না।

সব শেষ হল। পেছনে প্যারাশুট খোলা। আমাদের সব গিয়ার পরানো। তখন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা অনুকূল বাতাসের জন্য। সেই এক মিনিটের অপেক্ষাটা বোধহয় আমার জীবনের সবচেয়ে লম্বা অপেক্ষা। আর একবারই এরকম দমবন্ধ করা প্রতীক্ষার অভিজ্ঞতা আছে আমার। সেটা দুর্গাষ্টমীতে পাঁঠাবলি দেওয়ার আগে ঠিক সময়ের জন্যে অপেক্ষা। তফাতটা হল, এখানে বলির পাঁঠাটা আমি নিজেই ছিলাম।

এক একবার ভাবছি পালিয়ে যাই। পালাবই বা কী করে? দু'দিক থেকে দুজন শক্ত করে হাত ধরে আছে। পেছনে ট্রেনর। আরও বেশ কয়েকটি শক্তপোক্ত ছেলে। নিজেকে অনেক বোঝালাম, 'ছিঃ ঊর্মি, এইটুকুতেই ভয়! হাজার দু-হাজার ফুটই তো লাফাতে হবে একটা খাদের ধার থেকে। সেটা কী-ই বা এমন কাজ? নিজে তো তাও পাইলটের সঙ্গে বাঁধা, আর দুজনে প্যারাশুটের সঙ্গেও বাঁধা। ওই ছেলেগুলোর তো তাও নেই। তাও ওরা খাদের ধার অবধি যাবে...।' এত বুঝিয়ে টুঝিয়েও দেখি পালানোর অদম্য ইচ্ছেটা যাচ্ছে না!

অপেক্ষা করতে করতে একটা ছোট্ট ঘটনা বলে নেওয়া যাক। কিছুদিন আগে কলকাতায় সায়েন্স সিটিতে একটা ভালো ইংরেজি ছবি দেখলাম। নাম 'আড্রিনালিন রাশ'। আড্রিনালিন একটা হরমোন। মানুষ কোনও বিপজ্জনক অবস্থায় পড়লে তার শরীর এই হরমোন তৈরি করে তাকে সেই বিপদে লড়তে সাহায্য করে। বেশি পরিমাণে কিছু এলে তাকে বলে 'রাশ'।

কিন্তু এই 'অ্যাড্রিনালিন রাশ' অনেক মানুষের কাছে একটা নেশা হয়ে গেছে। 'আড্রিনালিন রাশ' পাওয়ার জন্যে মানুষ নিজেকে বিপজ্জনক অবস্থায় ইচ্ছে করে ফেলে। যেমন এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। অন্য কোনও প্রাণী শখ করে দু-হাজার ফুট ওপর থেকে লাফায় না। যাই হোক, 'অ্যাড্রিনালিন রাশ' ছবির বিষয়বস্তু শুধু সেটাই নয়।

রেনেসাঁ যুগের বিখ্যাত ইতালিয় শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির নাম নিশ্চয়ই জানো। অবশ্য শিল্পী বললে কিছুই বলা হবে না। তিনি ততটাই বড় মাপের বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান আছে। তাঁর অনেক আবিষ্কারের মধ্যে একটি হল যাকে আমরা এখন প্যারাশুট বলে জানি।

লিওনার্দো একটি পিরামিডের আকারের কাপড়ের প্যারাশুটের কল্পনা করেছিলেন। তার অনেক মাপজোক দিয়েছিলেন। এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ওই মাপে জিনিসটি তৈরি করে, মাপ অনুযায়ী দড়ি ধরে সেইটি থেকে ঝুলে পড়লে একজন মানুষ হাওয়ায় ভেসে থাকতে পারবে, পড়ে যাবে না।

১৪৮৫ সালে লিওনার্দো এই প্যারাশুটের কল্পনা করেছিলেন। তারপর পাঁচশো বছরের ওপর কেটে গেছে। বিজ্ঞান কত উন্নতি করেছে। আধুনিক প্যারাশুট বেরিয়ে গেছে কত আগে। কিন্তু লিওনার্দোর সেই প্যারাশুট পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে বা সাহস কারুর হয়নি।

হঠাৎ ২০০০ সালে ক্যাটারিনা ওলিকাইনেন নামে এক সুইডিশ মহিলা ভাবলেন সেটা পরীক্ষা করে দেখবেন। পৃথিবীর তা-বড় বিশেষজ্ঞরা বললেন, অসম্ভব। লিওনার্দোর ডিজাইনে নাকি গলদ আছে। কোনোমতেই তাতে হাওয়ায় ভেসে থাকা সম্ভব নয়।

ক্যাটারিনা কিন্তু প্যারাশুট তৈরি করলেন। এবং সেটা পরীক্ষা করলেন তাঁর লন্ডন-বাসী বন্ধু এড্রিয়ন নিকোলাস, যিনি সাড়ে ছ' হাজারের বেশি স্কাইডাইভ করেছেন। সাউথ আফ্রিকার এক মরু অঞ্চল সাক্ষী হয়ে থাকল এক ঐতিহাসিক ঘটনার যখন আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মুখে চুন-কালি মাখিয়ে এড্রিয়ন আর ক্যাটারিনা প্রমাণ করে ছাড়লেন যে লিওনার্দো ভুল বলেননি। তাঁর প্যারাশুট সত্যিই মানুষকে আকাশে ভাসিয়ে রাখতে পারে। গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো ঘটনা নয় কি?

যাই হোক, এবার ফেরা যাক আমার নিজস্ব আড্রিনালিন রাশে। অনুকূল বাতাসটা ঠিক কোন সময়ে এল ঠিক বুঝলাম না। কিন্তু হঠাৎ দেখি আমি খাদের দিকে পাঁইপাঁই করে ছুটছি। মানে ঠিক আমি ছুটছি না। আমাকে টানতে টানতে বাকিরা ছুটছে। অগত্যা আমাকেও ছুটতেই হচ্ছে।

খাদের ধারটা যত কাছে আসছে তত হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে এসে লাফাচ্ছে। খালি মনে হচ্ছে, আর বাড়ি ফেরা হবে না এ-যাত্রা। হয়ত আমাকে ছুঁড়েই ফেলে দেবে খাদের মধ্যে। প্যারাশুট-টুট ছাড়াই।



এবার খাদ থেকে দু ফুট দূরে। হৃৎপিণ্ডটা বোধহয় মুখের বাইরেই বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ বুঝলাম আমি পড়ে যাচ্ছি। খাদেই কি? না, সিটটার ওপর বসে পড়েছি। কী করে বসে পড়লাম কে জানে।

আমি ততক্ষণে ছাদের ধারটা পেরিয়ে গেছি। পায়ের নিচে দু-হাজার ফুট খাদ। এবার অনেকগুলো গলায় হইহই, চেঁচামেচি। কিছু গণ্ডগোল হল নাকি? প্যারাগ্লাইডারটা কি ঠিকমতো খোলেনি? পপাত চ মমার চ? না, ঠিক পরের মূহুর্তেই দেখলাম আমি উড়ছি। ডানা মেলে খোলা ছাদটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, দূরের পাহাড়গুলোর দিকে।

তাশি দেখি নির্বিকার। ঝুলন্ত অবস্থায় স্ট্র্যাপ-ট্যাপগুলো ঠিক করছে। আমার হাতে ভিডিও ক্যামেরাটা একটা লম্বা ডাণ্ডার আগায় লাগানো। যাকে সেলফি স্টিক বলে। সেটা অবশ্য স্ট্র্যাপের সঙ্গেও লাগানো। সেটাও তাশি ঠিকঠাক করে আমায় জিজ্ঞেস করল আমি ঠিক আছি কিনা। ঠিক মানে? আমি তো তখন সপ্তম স্বর্গে!

শোঁ শোঁ করে হাওয়া কেটে এগিয়ে যাচ্ছি। বহু নিচে সিকিমের সবুজ পাহাড়, মাঠ-ঘাট সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। রাস্তাঘাট, গাছপালা, মানুষজন পুঁচকে পুঁচকে দেখাচ্ছে। আর তাদের দু'হাজার ফুট ওপরে আমি পাখির মতো উড়ছি! সে আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতাই আমার নেই।

ভিডিওটা এখন দেখে বুঝতে পারি তাশি কিন্তু সমানেই তার কাজ করে যাচ্ছে। প্যারাগ্লাইডারের গতি নিয়ন্ত্রণ করছে, গাছপালার কাছ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যাতে আমি পাতা-টাতা ছুঁয়ে দেখতে পারি। 'শুধু গাছে আটকে যেয়ো না যেন,' বললাম আমি। তাশি হাসল।

আমার আনন্দ দেখে তাশি আমাকে একটু বেশিক্ষণই উড়িয়েছিল। কেউ ভয় পেলে তাকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দেয়। এবার আমার ফুলে-ঢোল-হওয়া পা দুটো দেখে জিজ্ঞেস করল আমি সেগুলো সোজা করতে পারব কিনা। আমি সঙ্গে সঙ্গে সোজা করে দেখিয়ে দিলাম। বলল, 'গুড। নামবার সময়ে তোমাকে পা দুটো সোজা রাখতে হবে।'

ওড়ার সময় শেষ হওয়ার পর আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে নামতে লাগলাম নিচে। নিচে তখন সেই স্টেডিয়ামটা দেখতে পাচ্ছি যেখানে নামব। মাটি থেকে কুড়ি ফুট ওপরে যখন, তখন তাশি আমায় বলল পা

দুটো সোজা করতে। একদম মাখনের মতো ল্যান্ডিং হোল। আমি সিটের ওপর বসা অবস্থায় মাটিতে এসে নামলাম।

দেখি আমার ড্রাইভার চন্দন দৌড়তে দৌড়তে আসছে। আমায় জ্যান্ত এবং আস্ত দেখে মহা খুশি। ওর কাছে আমার ক্যামেরা দিয়ে গেছিলাম। ছবিও তুলেছে। চন্দনের গাড়িতে করেই ফ্লাই সিকিম অ্যাডভেঞ্চারের আপিসে ফিরে গেলাম। আমার ভিডিও ফিল্মটা একটা সিডি-তে ভরে দিয়ে দিল। ফিডব্যাক ফর্ম দিল। আমি তো আনন্দের চোটে সবেতেই ফুল মার্ক্স দিয়ে দিলাম। অবশ্য না দেওয়ার কোনও কারণও ছিল না।

সিকিম ছাড়া আমাদের দেশের অনেক জায়গায় প্যারাগ্লাইডিং হয়। হিমাচলে হয় সবচেয়ে বেশি। বির বিলিং তো বিখ্যাত প্যারাগ্লাইডিং-এর জন্যে। মানালির কাছে সোলাং উপত্যকাতেও প্যারাগ্লাইডিং করা হয়। হিমালয়ের আনাচে কানাচে এরকম আরও অনেক জায়গা আছে।

তাই, যদি কখনও সুযোগ পাও, ওড়ার আনন্দটা ছেড়ে দিওনা কিন্তু। একটু ভয় লাগবে, কিন্তু ভয়টাকে জয় করাটাই তো আসল। ওই যে একটা বিজ্ঞাপনে বলে না, 'ডর কে আগে জিত হ্যায়'? ঠিক সেরকম। একবার উড়ে দেখো। মজাটাই আলাদা।

লেখকের ক্যামেরায় তাঁর ছবিঃ বাহনচালক চন্দন



আকাশের মাঠ ছুঁয়ে ছুঁয়ে

দুই আটপৌরে বেড়িয়েছি সেবার। উত্তরকাশির গঙ্গা ঘাটে বসেছি। শান্তনুদার একটি তথ্যে হকচকিয়ে গেলাম একেবারে। গঙ্গা নদী এখানে উত্তরবাহিনী - অর্থাৎ সে এইখানে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের বৈচিত্রের আরেক উদাহরণ যেন। উত্তরকাশির কিঞ্চিৎকর হোটেলেও এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল সেবার। রাত্রে শোয়ার সাথে সাথে শান্তনুদা ঘুমের জগতে। কিন্তু আমার আর ঘুম আসে না। নতুন পথে হাঁটার উত্তেজনায় আমার দু'চোখের পাতা যেন আর বোজে না। হঠাৎ কীসের যেন খুটখুট আওয়াজ। চোর এল নাকি?

আলো জ্বালিয়ে দেখি, না, দরজা ঠিকঠাক বন্ধ আছে। শব্দটাও আর নেই। আলো নেভাই। কিছুক্ষণ বাদে আবার আওয়াজ। কিন্তু আলো জ্বাললেই আবার সব নিস্তব্ধ। বালিশের পাশে টর্চটা নিয়ে শুলাম এবার। যেই আবার আওয়াজ হয়েছে, টর্চ জ্বালাতেই ধরা পড়ে গেল। একটি মূর্তিমান ধেড়ে ইঁদুর। টেবিলের উপর রাখা কিছু খাবার প্যাকেটের লোভে সে যারপরনাই উদগ্রীব। প্রমাদ গুনলাম আমি। অন্যায় জেনেও ফাঁকা জলের জাগটি ছাড়া অস্ত্র আর কিছু পেলাম না। এক পরম মুহূর্তে সে যখন মনোযোগ সহকারে আমাদের বিস্কিটের প্যাকেটটা ফুটো করতে ব্যস্ত, দিলাম জাগটি উল্টো করে চাপা দিয়ে। তার উপর চাপিয়ে দিলাম একটা ভারি জুতো। এরপর সেই মহামহিম বহু চেষ্টা চালিয়েছিল জাগটিকে উল্টোনোর। তারপর একটা সময় সব নিশ্চুপ হয়ে যায়। তারপর আস্তে আস্তে ঘুম নেমে আসে চোখে, ঘুমের আগে একবার দেখি পাশে শুয়ে থাকা যোগী মানুষটিকে, ঘটনাটি তিনি জানতি পারলেন না এক বিন্দু।

যাত্রা শুরু করলাম উত্তরকাশি থেকে এক গাইড আর একজন নেপালি মালবাহক বন্ধুকে সঙ্গী করে। দায়ারা বুগিয়াল থেকে ডোডিতাল, তারপর দারোয়া পাস অতিক্রম করে হনুমানচটি নেমে যাব - এই ছিল পরিকল্পনা। তার মাঝে পথটিকে একটু রোমাঞ্চকর করার লক্ষে ঠিক করেছিলাম বন্দরপুঞ্ছ শিখরের পার্শ্ববর্তী একটা রিজ ধরে কিছুটা ঘুরে নামব ডোডিতালের আগে মাঞ্চি বলে জায়গাটিতে।

পথ শুরু হয়েছিল চমৎকার। দায়ারা বুগিয়ালের অতুলনীয় রূপে বুকের মধ্যে ঢেউ খেলে গেল। মনে হল অবলীলায় পেরিয়ে যাব পরিকল্পিত পথ। কিন্তু দায়ারার পরের ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পথে এসে বোঝা গেল আমাদের গাইডমশাইয়ের এই পথের সঠিক সন্ধান জানা নেই। বেশ আশঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমরা দুজনেই। এইরকম এক সময় ঘন জঙ্গলের মধ্যে আমাদের দাঁড় করিয়ে গাইডমশাই সামনের রাস্তা খুঁজতে গেলেন। আমাদের মালবাহক বন্ধু তখন অনেক পেছনে।



দুজন দুজনের দিকে তাকাই আর চারপাশে ঘার ঘুরিয়ে দেখি কোন বিপদ উদয় হয় কিনা। কারণ আমাদের জানা ছিল এই জঙ্গল হিংস্র শ্বাপদে ভরা। এইরকম বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ গাইডমশাই-এর ডাক কানে আসে। আমরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করি তিনি যেদিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, ডাক আসছে তার উল্টোদিক থেকে। সম্বিত ফিরে পেয়ে আমরা দুজন হুড়মুড় করে কাঁটাঝোপ, গাছের ডাল অগ্রাহ্য করে তার কাছে পৌঁছলাম। তারপর কোনক্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই জঙ্গলের অঞ্চল অতিক্রম করে একটা ফাঁকা ঘাস জমিতে পৌঁছে তাঁবু টাঙানো হল।

একটু ধাতস্ত হওয়ার পর সেদিনের দুপুরের গল্প শুনতে গিয়ে আমরা তাজ্জব হয়ে যাই। রাস্তা খুঁজতে গিয়ে গাইড মশাই এক ভয়ানক দর্শন ভাল্লুকের প্রায় সামনে পড়ে গিয়েছিলেন। কোনক্রমে তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। আর তার থেকেও বড়ো ব্যাপার, সেই ভাল্লুক আমাদের খুব কাছেই ছিল, কিন্তু আমরা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি।

সে যাত্রায় অল্পের জন্য আমরা বেঁচে গেলাম আর ঠিক করে নিলাম আর ঘুরপথ নয়, সোজা নেমে যাব মাঞ্জি, যেখানে পথ অনেক পরিচিত, অজানা অচেনা বিপদের ভয় অনেক কম।

মাঞ্জি পেরিয়ে তারপর পৌঁছলাম ডোডিতাল। তালের সামান্য আগে একটি বড় পাকা ঘর নগণ্য ভাড়ায় পেয়ে গেলাম থাকার জন্য। ঘরের সামনে একটা ঘাসে ছাওয়া প্রায় সমতল উঠোন। বুক চিরে তার বয়ে যাচ্ছে একটি শীর্ণ কিন্তু স্রোতস্বিনী নালা - একেবেঁকে। ঘরের দাওয়ায় বসে দেখলাম একদল সেনানীর গাছে উল্টো করে ঝুলিয়ে একটি খাসি কাটার কসরত। একটু বিকেল গড়িয়ে এলে নেপালী মালবাহক বন্ধুটিকে নিয়ে ওই স্রোতস্বিনীর বুকে নেমে পড়লাম, মাছ ধরার জন্যে। সেই ব্যর্থ চেষ্টা বেশ কিছুক্ষণ চালিয়ে তারপর ইতিউতি ক্যামেরাটা নিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি, দু-একটি ছবি আঁকা, ধীরে রাত নেমে এল সেই অরুপরতন ঘাটিতে।

পরদিন সুয্যিমামা ওঠার আগেই পাকদণ্ডী পথ চলা শুরু, বেদম চড়াই, অবশেষে দারোয়া পাসের মাথায় উঠে আসি। অপর দিকে ঢেউ খেলে নেমে গেছে বুগিয়াল। নামার পথ ধরি। নেমে আসি কানশার বুগিয়ালে। হিমালয়ের বেশ কিছু বুগিয়ালের সৌন্দর্য নিয়ে মানুষকে দেখেছি উচ্ছ্বসিত হতে, গুণগানে মুখর হয়ে উঠতে। কিন্তু এই কানশার সম্বন্ধে তো সেরকম শুনিনি। শুনিনি সীমা বুগিয়াল সম্বন্ধে। কিন্তু জোর গলায় বলতে পারি - হিমালয়ের যে কোন বুগিয়ালের সাথে এরা কাঁধে কাঁধে টক্কর দেবে। অন্যদিকে ভাবি, যতদিন সর্বগ্রাসী মানুষের মন ও মননের বাইরে এই বুগিয়ালগুলি রোদে-ঝড়ে- বৃষ্টিতে আপন খেয়ালে জেগে আছে, ততদিন আমাদের মত একলাচোরা মানুষদের জন্য ভাল।

আমরা তাঁবু ফেলব অসীম সবুজের এই সমারোহে, বন্দরপুঞ্ছ শিখর থেকে অভিসম্পাতের মত ধেয়ে আসা হিমেল হাওয়া নাড়িয়ে দেবে আমাদের খুঁটি, সেই অসহনীয় ঠাণ্ডার সাথে যুঝে থাকার জন্য রাতের পর রাত আমরা জ্বেলে রাখব প্রণম্য আগুন। এক সমদর্শী বয়স্ক মানুষ তাঁবু ছাড়া বিধ্বস্ত অবস্থায় এসে পৌঁছবেন এই উপনিবেশে। এক কাপ গরম চা এগিয়ে দিয়ে সেই বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটির সাথে হেঁটে যাব তাঁর যুবা সময়ে, যে'সময় তিনি উমাপ্রসাদবাবুর সান্নিধ্যে পাহাড়কে চিনতে শিখছেন। আমরা রোমাঞ্চিত হব, আমাদের শ্বাস ঘন হয়ে আসবে, সমমনস্ক মানুষদের মধ্যে গড়ে উঠবে এক আত্মিক যোগসূত্র।

ক্রমে শীতার্ত রাত্রি শেষ হয়ে আসে, সীমা বুগিয়াল ছেড়ে আমরা নীচে নিশনি গ্রাম হয়ে হনুমানচটির পথ ধরি। পরবর্তী কাকভোরে আমরা দুই আটপৌরে এগিয়ে যাই যমুনোত্রী মন্দিরের দিকে। দূরে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। হিমালয়ের গহনে স্নেহ নিয়ে, মমতা নিয়ে, মুক্তি নিয়ে মা যমুনা আমাদের প্রতীক্ষায় অধিষ্ঠিত আছেন ওই মন্দির গর্ভে।

‘ভির’ ও ‘দে ওজেন’

দে ওজেন

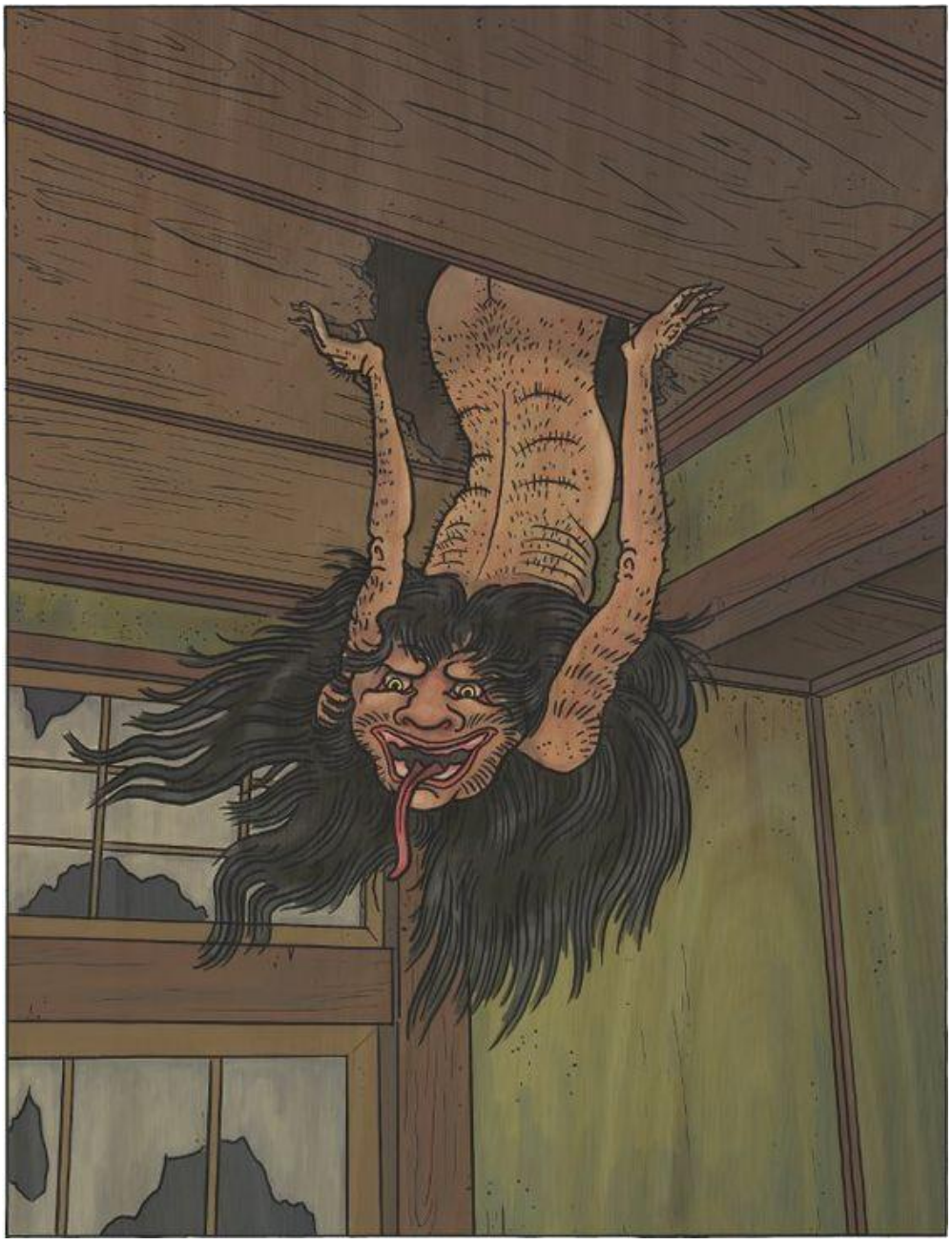


বেলজিয়ামের ব্রাসেলসের কাছে সোনিয়ান জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তা গেছে সে পথে রাতের বেলা যেতে অনেক দুঃসাহসীই দু বার ভাবেন। সেহানে ‘দে ওজেন’-এর বাস। নির্জন পথে অন্ধকার রাস্তায়গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎই চালকের নজরে পড়েরসাতার মাঝখানে গজিয়ে উঠেছে সবজেটে আলো-আঁধারি একতাল কুয়াশা। আর সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে একটা বিরাট চোখ। ওই থেকে ডাচ ভাষায় দে ওজেন বা ‘দ্য আই’ নামের উৎপত্তি।

কুয়াশার মধ্যে থেকে অন্ধকার কিছু ছোটোছোটো মানুষের ছায়া গাড়ি আটকে রাস্তার ওপরে এদিকওদিক ছোটোছুটি করে, ভেসে আসে শিশুদের খিলখিল হাসির শব্দ। রাস্তা থেকে গাড়িকে ছুঁড়ে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। কখনো কখনো গাড়ির কাচ ফুটে অঠে ছোটোছোটো রক্তাক্ত হাতের ছাপ। তারপর নিজেনিজেই ফের মিলিয়ে যায় তারা।

আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে ও জঙ্গলে এক পাগল খুনী নাকি বেশ কিছু শিশুকে খুন করে তাদের ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছিল সে জঙ্গলের আনাচেকানাচে। সে খুনীর সন্ধান মেলেনি কোন। শুধু সেই শিশুদের আত্মা নাকি এখনো সবুজ কুয়াশা, ছায়ামানুষের দল আর রক্তমাখা হাতের ছাপদিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয় একলা

মোটরিস্টকে নাগালে পেলে। তাদের মিলিত চেতনা এক অতিকায় চোখ হয়ে চেয়ে থাকে জীবন্ত মানুষের দুনিয়া থেকে আসা আগন্তুকের দিকে। হতভাগা মানুষগুলো আর তাদের ভূত ওই দে ওজেন নিয়ে একটা বই আছে। তার নাম *De Kinderen van Het Bezeten Bos বা ভৌতিক অরণ্যের শিশুরা।*



ভির

ভির হল নেপাল ও ভারতের কোন কোন জায়গার গ্রহপালিত ভূতের নাম। সে ভূত জন্ম থেকেই ভূত। কোন মানুষ মরে তার সৃষ্টি হয় না। তবে মানুষের সাথে তার সম্পর্ক গভীর। বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে তাকে বাঁধলে সে যিনি মন্ত্র বলছেন তাঁর পুষ্যি হয়ে যায়। ঘরের সব কাজকর্ম করে মুখ বুঁজে।

মালিকের ঘরের ছাদে পা দিয়ে মাথা নীচু করে সে ঘুরে বেড়ায়। দশ বিঘে জমি সে এক রাত্রে চষে দেয় মালিকের হুকুম পেলে।

তবে ভির পোষবার বিপদও কম নয়য়। কখনো মন্ত্রে ভুলটুল হলে যদি একবার সে ছাড়া পায় তাহলে মালিকের বংশের লোকুনকে জন্ম জন্ম ধরে মাথা গন্ডগোল করিয়ে রাখবে ভির। কাজেই সাবধান। ওসব যেন পুষতে না যাওয়াই ভালো।

ভূতের বাড়ি



স্যালি হাউস

এ বাড়ির জাত আলাদা। পুর্ণ চেহারার ভূতেরা হেঁটে বেড়ায়, জিনিসপত্র হাওয়ায় উড়ে যায়, এক জায়গা থেকে হারিয়ে গিয়ে ফের ফেরত আসে আরেক জায়গায়। শোনা যায় অদৃশ্য আসবাবপত্র টানাটানি করবার শব্দ, জন্তুজানোয়ারের চিৎকার, অশরীরি মানুষের গলার স্বর।



তবে শুধু চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করেই ক্ষান্ত নন এখানকার তেনারা। ভূত খোঁজারুদের অনেকেই এখান থেকে অদৃশ্য হাতের খিমচি, কিলচড়, ছ্যাঁকা খেয়েছেন। তবে এসব আক্রমণ সবচেয়ে বেশি ঘটেছে টোনি পিকম্যানের ওপরে। তাঁর ওপরেই সবচেয়ে বেশি রাগ ছিল এ বাড়ির তেনাদের।

১৯৯৩ সাল নাগাদ বউ আর ছোটো এক বাচ্চাকে নিয়ে টোনির, অ্যাচিসন কানসাস-এর ৫০৮ নর্থ সেকেন্ড স্ট্রিট-এর এ বাড়িতে প্রবেশ আর তার সঙ্গেসঙ্গেই ভূতেদের রোষদৃষ্টিতে পড়া। খবর ছড়াতে সে সময়ের সেরা দুই ভূত খোঁজারু, পিটার জেমস ও বারবারা কোনর এসেছিলেন তাঁকে সাহায্য করতে। ফল হয়নি। সেই থেকে এখনও এ বাড়ির ভূতদের নিয়ে গবেষণা চলছে। প্রথম প্রথম ভাবা হয়েছিল টোনি নিজেই বুঝি কোন কায়দাকানুন করছেন সস্তায় বিখ্যাত হবার

জন্য। কিন্তু ১৯৯৪ সালের অক্টোবরে ভূতের ভয়ে সপরিবারে বাড়ি ছাড়বার পরও ভূতশিকারীরা তাঁদের যন্ত্রমন্ত্র নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকে মহা আশ্চর্য সব শব্দবাদ্য রেকর্ড করে ফেলেছেন। অনেকে বলেন, ভূতটুত নয়, এই বাড়িটারই একটা অশুভ চেতনা আছে। অনেকের মতে, এখানে কিছু দুঃখী ভূতের বাস, যারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে প্রাণপণে।

এ বাড়িতে এখন নিয়মিত ভূত গবেষকদের যাতায়াত। ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডার, অবলোহিত ও তাপ সংবেদি ভিডিও ক্যামেরা, তড়িচ্চুম্বকীয় মিটার এমন সব যন্ত্রপাতি নিয়ে নিয়মিত এ বাড়িতে চলে অশরীরি উপস্থিতি খোঁজবার কাজ। কেউ কেউ তো এ বাড়িতে প্ল্যানচেট করে তার অলৌকিক বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপচারী করবার চেষ্টাও করে চলেছেন।



বাড়িটার নাম অবশ্য হয়েছে টোনির নামে নয়। ১৯০৫ সালে এ বাড়িতে স্যালি ইজাবেল হল নামে এক মহিলা মারা যান। লোকজনের ধারণা সে-ই এ বাড়ির ভূত সমাজের আদি বাসিন্দা। টোনি একবার তাকে দেখতে পেয়ে তার একটা স্কেচও করেছিলেন। সে স্কেচ একটা বাচ্চা মেয়ের। সঙ্গে সে স্কেচ রইল। ইতিহাসের স্যালি ছিলেন রীতিমতন একজন মহিলা। এইটেও একটা রহস্য এ বাড়ির। একই মানুষ জীবন্তে একরকম, আর মারা যাবার পর অন্য রূপ। সে যাই হোক, এই স্যালির কথাটাই বিখ্যাত হয়ে গিয়ে বাড়ির নামই হয়ে গেছে স্যালি হাউস। তবে পরবর্তী সময়ে নতুন নতুন উপদ্রবের লিস্টি ক্রমাগত বেড়ে চলায় অনেকেরই ধারণা এ বাড়িতে নিত্যনতুন অশরীরি বাসিন্দাদের হাজিরা বেড়ে চলেছে।

টোনি আর ডেবরা অবশ্য এ বাড়ির মায়া কাটাতে পারেননি। এখানকার তেনাদের নিয়ে গবেষণায় তাঁরা এখনো জড়িত। তৈরি করে ফেলেছেন একটা সংস্থাই, যার কাজ এ বাড়ির ভূতগবেষণায় মদত জোগানো। তা সেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এ বাড়ির ভূতদের যা কথাবার্তা রেকর্ড হয়েছে তার মধ্যে থেকে অশরীরি বাসিন্দাদের একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেটা এইরকমঃ

অ্যাগনেস ফিনিঃ এ বাড়ির আদি মালিকের কন্যার পেত্নী।
ব্র্যান্ডনঃ ভারিক্কি গলা। রসিক। আচ্চাদের ভালোবাসেন। ভৌতিক কার্যকলাপের লক্ষ থাকে বাচ্চাদের মজা দেয়া।
চার্লস ফিনিঃ বুড়োটে গলা। মেয়েদের পোশাক পরে ঘুরতে ভালোবাসেন। পেশায় ডাক্তার। শ দেড়েক বছর আগে জ্যান্ত দশায় তিনি একবার এলাকার মেয়র হয়েছিলেন, কিন্তু মদ সংক্রান্ত আইন ভাঙায় তাঁর চাকরি যায়। এখনো তাই নিয়ে তিনি রেগে আছেন।
এডিথঃ বুড়ি থুত্থুরি ভূত। কানে কম শোনে। এক কোণে পড়ে আছে নিরীহ আত্মা।
এথেলঃ এ বাড়ির আরেক প্রাক্তন মালিক।
ফ্র্যাংক জুনিয়রঃ কানসাস শহরের বাসিন্দা ফ্র্যাংক ১৯০৬ সালে মারা যায়। তার মা জোয়ানা ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের ঘরের গ্যাস কানেকশানের ছিপি খুলে দিয়েছজিলেন। সে এখন স্যালি হাউসে এসে জুটেছে।
ফ্র্যাংক সিনিয়রঃ মাঝেমধ্যে জোয়ানা বাড়িতে বেজায় ঝামেলা জুড়লে সে ঝামেলা মেটাবার জন্য উদয় হন। ভূত ভালো তবে কিনা জোয়ানার সাথে বেজায় খটাখটি তাই বেশিক্ষণ টিকতে পারেন না।
জোয়ানা বার্নস্- এ বাড়ির ভূতসমাজের সবচেয়ে শক্তিময়ী সদস্যা। ১৯০৬ সাল অবধি এ বাড়ির কাছাকাছিই তার বাস ছিল। তারপর ফ্র্যাংক সিনিয়ারকে বিয়ে করে কানসাস সিটিতে চলে গেলেও সেখানে সেই গ্যাস দুর্ঘটনায় ছেলের সঙ্গে নিজেও মারা যায়। এখন সে স্যালি হাউসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাপেত্নী। তবে তেজি হলেও জোয়ানা লোক মন্দ নয়।
পলঃ এ ছিল এক ক্রীতদাস ছেলে। গণোধোলাইতে মৃত্যু হয়। এ বাড়িতে আগুণের যেসব ভূতুড়ে খেল দেখা যায় সেগুলো এই পল-এর কীর্তি। জোয়ানা পলকেচোখের আড়াল করেন না। কখনো নিজে ব্যস্ত থাকলে অন্য কোন বয়স্ক ভূতের ওপর দায়িত্ব পড়ে পলকে নজরে রাখবার।



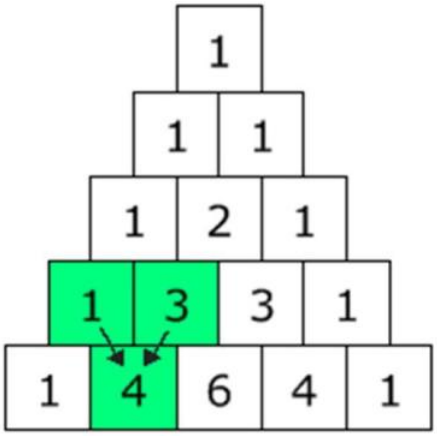
রায়ানঃ স্যালি্র ভাই।
স্যালিঃ ভারী মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। পিকম্যানের বাচ্চাটিকে বড়ই ভালোবাসত। তবে যেহেতু তার ভাই ও বাবা এ বাড়িতেই থাকেন তাই পিকম্যানরা বাড়ি ছাড়বার পরেও সে এখানেই রয়ে গেছে।
টম বার্নস্- ১৮৮৫ সালে জন্ম। মিসৌরি রেলরোডের ট্রেনচালক ছিলেন। পরে সেলসম্যান হন। এখনো ট্রেনচালকের উর্দি পরেই ঘুরতে দেখা যায় তাঁকে। অনেকে তাঁকে সিভিল ওয়ারের সৈনিক বলেও মনে করেন।
টম বার্ন্স (২) ১৯৫৯ সালে মৃত্যু। স্যালি হাউসের খানিক দূরে বাড়ি ছিল। ওষুধের দোকানের মালিক ছিলেন।
এই দুই বার্নসই ক্যাথলিক ছিলেন। একই কবরখানায় দুজনের কবর আছে। দুজনেই ফিনির বিশেষ পরিচিত। ফিনি ডাক্তারের বার্নস(২) এর ওষুধের দোকানে যাতায়াত ছিল, আর তিনি মিসৌরি রেল কোম্পানিতে ডাক্তারের চাকরি করায় বার্ন্স,(১) কেও চিনতেন। মরবার পর তাই দুই বার্ন্স এসে ফিনির বারিতে ঘাঁটি গেড়েছেন।
ওয়ান্ডাঃ জোয়ানার সখী। ডাকলে দিব্যি সাড়া দেন।

বিশেষজ্ঞদের অনুমান, স্যালি হাউসে ভূতেদের এহেন মেসবাড়ি আসলে কোন ভয়ানক অশুভ অস্তিত্বের মালিকানায় তার অঙ্গুলীহেলনে চালানো হয়। সেই অশুভ অস্তিত্বের উপস্থিতি টের পাওয়া গেলেও সে মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ দর্শন এখনো মেলেনি।



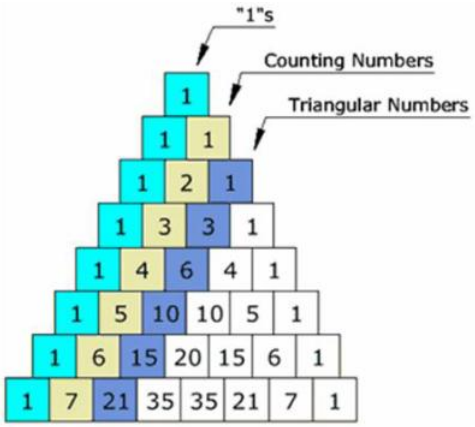
বৈজ্ঞানিক।

পাস্কালের ত্রিভূজ



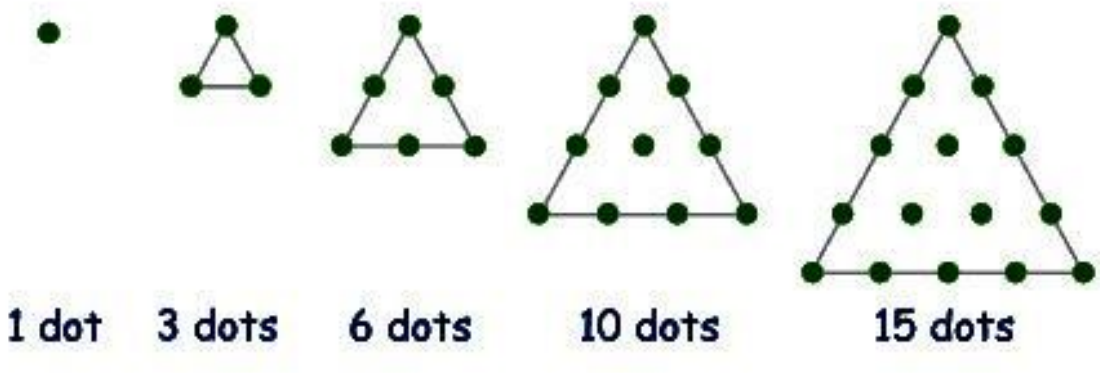
পাশের ছবিটার মত করে একটা ত্রিভূজ বানাও। সবার ওপরে ১।
তার তলায় দুটো ঘরে ১, ১
তার তলায় দুপাশে ১, ১ আর মাঝখানে, সে ঘরটার ঠিক মাথার ওপরের দুটো ঘরের সংখ্যার যোগফল, মানে ২
তার তলায় দুপাশে ১,১ আর মাঝখানের ঘরগুলোর প্রতিটায় সে ঘরের ঠিক মাথার ওপরের দুটো ঘরের সংখ্যার যোগফল।
এইভাবে যতখুশি বাড়িয়ে যেতে পার।

এবারে জাদু ত্রিভূজের মজাটা দেখ। ওর সবুজ রঙা সারিটা শুধু ১ দিয়ে তৈরি।
হলদে রঙা দ্বিতীয় সারিটা হল পূর্ণ সংখ্যার সার।



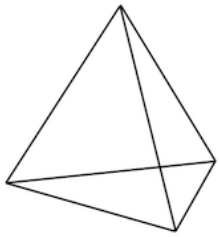
তৃতীয় সারিটা (নীল রঙ) হল ত্রিভূজ সংখ্যার সার।

ত্রিভূজ সংখ্যার সারিতে কারা থাকে?
খেয়াল করে দেখ, শূন্য আয়তনের একটা ত্রিভূজ মানে একটা বিন্দু (যেকোন শূন্য আয়তনের ক্ষেত্রই একটা বিন্দু) ওর চেয়ে বড়ো ত্রিভূজ গড়তে সবচেয়ে কম কটা বিন্দু লাগবে? তিনটে।

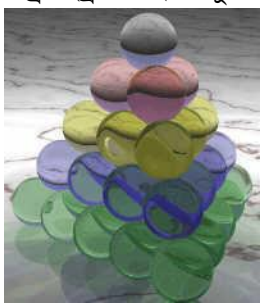


ওর চেয়ে ঠিক বড়ো সাইজের ত্রিভূজ গড়তে? ছ'টা। তারপর ১০টা----
এইখানে একটা কায়দা বলে দি। ত্রিভূজ সংখ্যা বানাবার কায়দা এইরকমঃ
ধরো, 'ক' যেকোন একটা সংখ্যা। তাহলে ক(ক+১)/২ এইটে সবসময় একটা ত্রিভূজ সংখ্যা হবে।

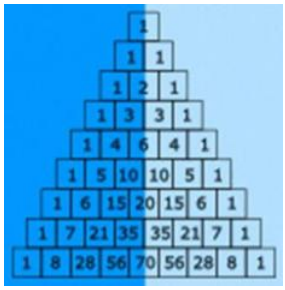
আরো আছে। পাস্কাল ত্রিভুজের চতুর্থ সারিটা টেট্রাহেড্রাল (চতুঃশির) সংখ্যার সার।(চারচুড়োওয়ালা ঘনবস্তু হল টেট্রাহেড্রন। পাশে তার ছবি)



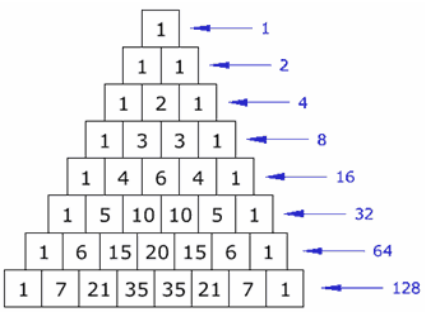
টেট্রাহেড্রাল সংখ্যা বুঝতে এই চতুঃশিরটাকে দেখঃ



এইবারে কয়েকটা গোলক দিয়ে (মানে ধরো মার্বেল এই চতুঃশিরকে বানাতে হলে, তার চুড়োয় লাগবে একটা মার্বেল। দ্বিতীয় স্তরে লাগবে ৩টে, তৃতীয় স্তরে লাগবে ৬টা, চতুর্থ স্তরে ১০টা---
তার মানে কোন স্তরে কটা মার্বেল লাগছে সে সংখ্যাগুলো আসএ ত্রিভূজ সংখ্যা তাই তো?
এবারে যদি বলি, দুই স্তরের একটা চতুঃশির বানাও, তাহলে মোট কটা মার্বেল লাগবে? ১+৩=৪খানা।
যদি বলি তিন স্তরের একটা চতুঃশির বানাও তাহলে মোট কটা লাগবে? (১+৩+৬)=১০টা
চার স্তরের হলে মোট লাগবে (১+৩+৬+১০)=২০টা
এই মোট সংখ্যাগুলোর সার মানে ১,৪,১০,২০----- হল চতুঃশির সংখ্যা।



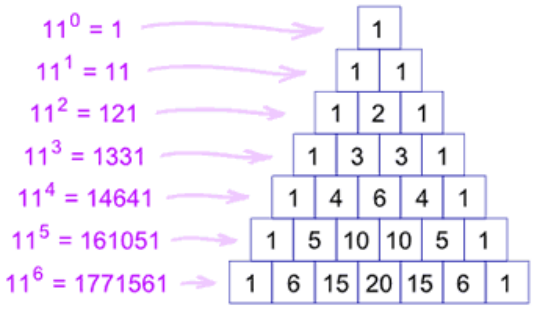
জাদু ত্রিভূজের আরেকটা মজা খেয়াল করেছ? ওর বাঁ ধারটা, ডান ধারটার প্রতিবিম্ব।(খেয়াল করে দেখ। বুঝিয়ে দিচ্ছি না।)



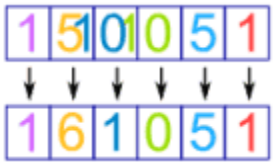
আরেকটা রহস্যময় বৈশিষ্ট্যঃ সঙ্গের ছবিটা দেখ। পাস্কালের ত্রিভূজের আনুভূমিক লাইনগুলোর প্রত্যেকটাতে সংখ্যাগুলোর যোগফলগুলো হল–

১, ১X ২, ১ X ২ X ২, ১ X ২ X ২ X ২, ১ X ২ X ২ X ২ X ২–

ত্রিভূজের প্রত্যেকটা লাইন আবার ১১কে বারবার ১১ দিয়ে গুণ করলে যা পাবে তার সমান। এই দেখঃ

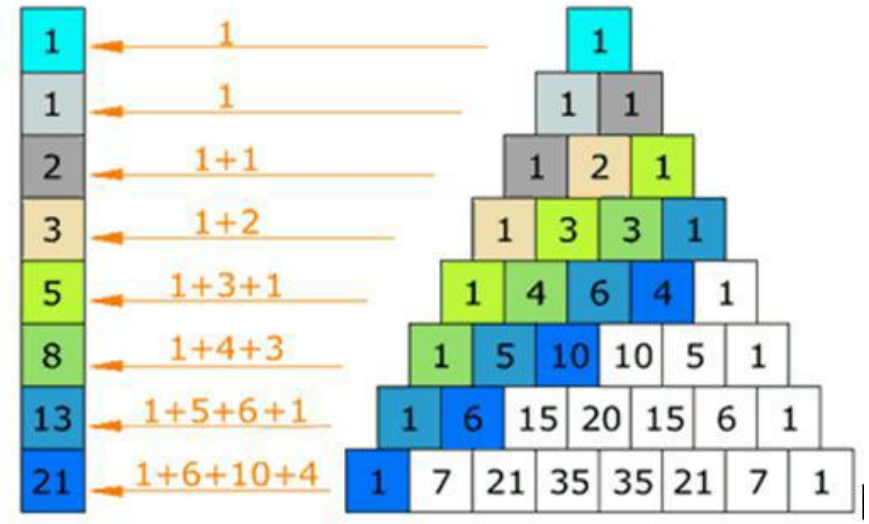


বললাম তো বটে, কিন্তু ১১কে ১১ দিয়ে পাঁচবার গুণ করে হচ্ছে ১৬১০৫১। অথচ ত্রিভূজ বলছে অন্য। উঁহু ওটা একটু ধাঁধালো। সঙ্গের ছবিটা দেখঃ



তার পরের লাইনটা কীভাবে হবে তা তুমি নিজেই ভেবো, কেমন?

এইবারে আরেকটা মজার জিনিস দেখঃ



একটা পাস্কাল ত্রিভূজ নাও। এবারে তার সবার নীচের সারির সবচেয়ে বাঁপাশের সংখ্যাটা ধর। এবারে তার ওপরের সারের বাঁপাশের পরপর দুটো সংখ্যা ধর।

এবারে তার ওপরের সারের বাঁপাশের তিনটে সংখ্যা ধর। এইভাবে চলতে চলতে যে সারে এসে সারির সবকটা সংখ্যা ধরা হয়ে যাবে তার ওপরের সারগুলোড় সবগুলোকেই ধরে নাও। সঙ্গের পাস্কলা ত্রিভূজে এ কায়দা করলে ধরে নেয়া

সংখ্যাগুলোকেমন দেখতে হবে সেইটে রঙ করে দিয়েছি।

এবারে, কোণাকুণিভাবে ত্রহাকা নির্বাচিত সংখ্যার সারদের যোগ কর (আলাদা আলাদা রঙের কালার কোড) যোগ করো।
তাতে যে সারটা পাবে সে এক আশ্চর্য সংখ্যার সার। ১,১,২,৩,৪,৮,১৩,২১----- একে বলে ফিবোনাচি সার।
এর বৈশিষ্ট্য হল, এর প্রত্যেকটা সংখ্যা তার ঠিক আগের দুটো সংখ্যার যোগফল।

ভারী আশ্চর্য, রহস্যময় সংখ্যার সার এই ফিবোনাচি সংখ্যারা। ত্রয়োদশ শতকে ফিবোনাচি তার কথা বলবার বহু আগে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে সে সার বীরহঙ্ক সংখ্যা নামে বহুল পরিচিত ছিল। তুচ্ছ শামুকের খোলের গড়ন থেকে অজস্র আলোবছর জুড়ে ছড়ানো বহু গ্যালাক্সির রূপ সে সংখ্যাদের শাসণ মেনে চলে। তাকে মেনে চলে প্রাচীন ভারতীয় কাব্যে অক্ষরবিন্যাস, কিংবা এক্স ক্রোমোজোমের উত্তরাধিকারের গভীর প্রাকৃতিক সূত্র।

কী, কৌতুহল হচ্ছে? তাহলে পরের সংখ্যায় ফিবোনাচির গল্প।

ক্রমশ



দিনে আকাশের দিকে তাকালে নীল আকাশ আর আমাদের কাছের তারা সূর্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না। স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে আকাশে কি আর কিছুই নেই? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে রাতের আকাশে তাকালে। তখনই বোঝা যাবে কত রহস্য লুকিয়ে আছে এই মহাকাশে। সূর্য অস্ত গেলে নেমে আসে অন্ধকার। আর তখনই মহাকাশ ধীরে ধীরে ভরে ওঠে আলোর মালায়। কোনোটি মিটমিট করে জ্বলছে, কোনোটির রঙ লাল, কোনোটি নীল, কোনোটি আবার ধবধবে সাদা। আদিমকাল থেকেই এই নক্ষত্রখচিত মাহাকাশ আমাদের কাছে বিস্ময়। আজও আমাদের এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। কত না রহস্য ছড়িয়ে আছে এই আদি-অন্তহীন মহাকাশের আনাচে কানাচে।

বিগব্যাং-এর পর তৈরি হল মহাবিশ্ব। মহাকাশে জন্ম হল অসংখ্য কোটি নক্ষত্রর। এরা নিজেদের মিধ্যে জোট বাঁধল। তৈরি হল ‘গ্যালাক্সি’ বা ‘তারাজগৎ’। মহাকাশে কতগুলি তারাজগৎ আছে? এর সঠিক উত্তর বিজ্ঞানীদেরও জানা নেই। কারণ মহাবিশ্ব বা মহাকাশের খুব সামান্য অংশই আমরা দেখতে পাই। বেশিরভাগটাই চোখের আড়ালে। তাই বলা যেতে পারে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য কোটি তারাজগৎ।

মহাবিশ্ব যেন এক সীমাহীন মহাসমুদ্র। সেখানে ভেসে বেড়ানো তারাজগৎগুলি একা একা থাকে না। থাকে দল বেঁধে। এরকম এক একটি দলকে বলা হয় এক একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠী। এই আঞ্চলিক গোষ্ঠী আবার একটি সু-বৃহৎ তারাজগৎগুচ্ছের অংশ। ‘আবেলি 2744’ (Abeli 2744) একটি সু-বিশাল তারাজগৎগুচ্ছ। চলতি কথায় একে বলা হয় ‘প্যান্ডোরাস তারাজগৎগুচ্ছ’ (Pandora’s Cluster)। এই তারাজগৎগুচ্ছ থেকে বেরিয়ে আসছে একধরনের ভৌতিক আলো। এই বিস্ময়কর ঘটনা কয়েক বছর আগে হাবল স্পেস টেলিস্কোপের চোখে ধরা পড়েছে। কোথা থেকে আসছে এই হালকা নীল আলো? উৎসুক বিজ্ঞানীরা শুরু করে দেন খোঁজাখুঁজি।

যখন তারাজগৎগুলি নিজেদের মধ্যে জোট বেঁধে আঞ্চলিক গোষ্ঠী বা তারাজগৎগুচ্ছ তৈরি করে তখন অনেক সময় দু’টি তারাজগতের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষরত দুটি তারাজগতের একটি সাধারণত উপবৃত্তাকার হয়ে থাকে। হাবল্ স্পেস টেলিস্কোপ এমনি এক সংঘর্ষরত তারাজগতের সন্ধান দিয়েছে অশ্লেষা নক্ষত্রমণ্ডলীতে। এখানে যে তারাজগৎ দুটির মধ্যে সংঘর্ষ চলছে তার একটি হল ESO 510 এবং অপরটি হল G 13। প্রায় এক কোটি আলোকবর্ষ দূরে আরও দুটি তারাজগৎকে সংঘর্ষরত অবস্থায় দেখা গেছে। এদের একটি দৈত্যাকার উপবৃত্তাকার তারাজগৎ এবং অপরটি তুলনায় অনেক ছোট একটি সর্পিল তারাজগৎ। ধনুরাশির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে এদের দেখা গেছে। এই বিধ্বংসী সংঘর্ষে তারাজগৎ দুটির আকৃতি যেমন বদলে যায় তেমন বহু তারা নিজ নিজ তারাজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরা তখন সেই তারাজগৎগুচ্ছে ভবঘুরের মতো একা একা

ঘুরে বেড়াতে থাকে। টফির দু'টি প্রান্ত ধরে টানলে যেমন মাঝখানটা সরু হতে হতে একসময় ছিঁড়ে যায় তেমন সংঘর্ষের ফলে ও মহাকর্ষ বলের টানে কখনও কখনও কোনো কোনো তারাজগতেরও তেমনি দশা হয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে নিষ্প্রভ এই তারাজগৎগুলি তারাজগৎগুচ্ছের মধ্যে মৃতবৎ অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। প্যান্ডোরাস তারাগুচ্ছের মধ্যে ছয় বিলিয়ন বছর ধরে ছিন্নভিন্ন হওয়া এরকম ছ'টি মৃতবৎ তারাজগৎ আছে। যেখানে যেখানে এই তারাজগৎগুলি আছে সেই অঞ্চলগুলি গাড় অন্ধকারে ডুবে আছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ছিন্নভিন্ন তারাজগৎগুলির যে তারাগুলি ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সেগুলি দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের তারা। এগুলির জ্বালানী শেষ হয়ে গেছে। কেন্দ্রে জমে আছে অক্সিজেন, কার্বন ও নাইট্রোজেন-এর মতো ভারী মৌলগুলি। পুরো তারাজগৎগুচ্ছটিতে এই ধরনের তারা আছে ২০০ বিলিয়নের মতো। এই তারাগুলি নিষ্প্রভ হলেও এগুলি থেকে এখনও এক ধরনের হাল্কা নীলাভ আলো বেরিয়ে আসছে। এই আলোর পরিমাণ সমগ্র তারাজগৎগুচ্ছ থেকে যে পরিমাণ আলোর বিকিরণ হচ্ছে তার প্রায় দশ শতাংশ।

আবেলি 2744 তারাজগৎগুচ্ছে দৃশ্যমান যে তারাজগৎগুলি আছে তাদের প্রত্যেকটি দেখতে নীলাভ-সাদা। অথচ সম্পূর্ণ তারাজগৎগুচ্ছটি দেখতে নীলাভ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এমনটা ঘটচ্ছে মৃত তারাজগৎগুলি থেকে বেরিয়ে আসা ওই নীলাভ ভৌতিক আলোর প্রভাবে।

এই প্রসঙ্গে বলি, আমরা যে তারাজগতের বাসিন্দা তার নাম ছায়াপথ বা মিল্কিওয়ে। কখনও কখনও একে আমরা আকাশগঙ্গাও বলে থাকি। আমাদের পড়শি তারাজগৎগুলির মধ্যে অন্যতম অ্যান্ড্রোমিডা। শরতকালে একে প্রায় সারা রাত ধরে দেখা যায়। ছায়াপথ থেকে এর দূরত্ব প্রায় কুড়ি লক্ষ আলোকবর্ষ (এক সেকেন্ডে আলো তিন লক্ষ কিলোমিটার পথ যায়। এই হিসেবে এক বছরে আলো যতটা পথ যায় তাকে বলে এক আলোকবর্ষ)। অ্যান্ড্রোমিডা এগিয়ে আসছে ছায়াপথের দিকে। বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে দেখেছেন যে প্রায় ৩০০ কোটি বছর পরে অ্যান্ড্রোমিডা ও ছায়াপথ তারাজগৎ দু'টির মধ্যে এক বিশাল সংঘর্ষ ঘটবে। দুটি তারাজগৎই দৈত্যাকার। অকল্পনীয় সেই সংঘর্ষের পর দু'টি তারাজগৎই তালগোল পাকিয়ে যাবে। বদলে যাবে তাদের আকৃতি। তখন আমরা কেউই থাকব না। কারণ সৌরজগৎই থাকবে না। কে বলতে পারে সেই সময় অন্য কোনো গ্রহে বসবাসকারী কোনো উন্নত প্রাণী এই অঞ্চলে কোনো ভৌতিক আলো দেখবে না?

তথ্যসূত্রঃ

1. The Universe – Iain Nicolson; 1996 Horus Editions.
2. Philip's Atlas of the Universe – Patrick Moore; 2001 Chancellor Press.
3. Galaxies and the Universe – Allan Sandage, Mary Sandage and Jerome Kristian.
4. Star Clusters – James E. Hesser.
5. Wikipedia
6. মহাবিশ্বের বিস্ময় (প্রথম খণ্ড) - অরুণাভ চক্রবর্তী; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
7. মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ - শঙ্কর চক্রবর্তী; বেস্ট বুক্স্, কলকাতা।
8. মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় - প্রশান্ত প্রামাণিক; জ্ঞান বিচিত্রা, আগরতলা।

****

কিং সলোমন'স মাইনস?



ঋজু গাঙ্গুলী

সেদিন বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছিল। তাও, বাড়িতে ঢোকার আগে দরজার বাইরে পাপোশের পাশে জুতোর সংখ্যা দেখে বুঝলাম, শনিচক্র ফুল ফোর্সে তখনও উপস্থিত। ঢুকে দেখলাম ড্রইং-কাম-ডাইনিং স্পেস খালি, এবং ভেতরের ঘর থেকে কথা আর হাসির হুল্লোড় ভেসে আসছে। সংসারী মানুষ মানেই জানেন, এর অর্থ হল কোথাও বেরোনোর জন্যে বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের তরফে জাঁকালো সাজসজ্জা চলছে।

প্রমাদ গুণলাম, কারণ এর অর্থ এখন চা পাওয়া যাবে না। সৌভাগ্যক্রমে শনিচক্রের সদস্যরা তখন একটি নিমন্ত্রণ-রক্ষা করে ফিরেছিলেন, তাই চা পাওয়া গেল। তবে, চায়ের কাপটা হাতে নিয়েই দেখলাম যে আমার আশেপাশের সোফার গদিগুলো দখল করে আমার বউ, মেয়ে মেঘনা, মধুরিমা, আর তোষালি বসে পড়েছে। বুঝলাম, আজ চা খাওয়ার ফাঁকে ফেসবুক আর হোয়াটস অ্যাপ করা মাথায় উঠল।

কিন্তু, এহেন মানসিক প্রস্তুতি নিয়েও মেয়ের মুখ থেকে যে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল, সেটার জন্যে আমি একেবারেই তৈরি ছিলাম নাঃ "আচ্ছা বাবা, হিরে কীভাবে পাওয়া যায়?"

ম্যানেজার এবং বাবা, এই দুই পোস্ট যাঁরা সামলান তাঁদের কোনো অবস্থাতেই ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চেহারা দেখাতে নেই। আমিও অক্লেশে হিরের উৎপত্তি নিয়ে ফান্ডা দিতে যাচ্ছিলাম। ঠিক সেই সময় তোষালি প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, যদি রাজা সলোমনের সেই হিরের খনি এখন খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে কি এত হিরে পাওয়া যাবে যে হিরে সস্তা হয়ে যাবে?"

হাঁ করা মুখটা বেশ চেষ্টা করে বন্ধ করতে হল। তারপর, চায়ে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে ছোটোখাটো প্রশ্ন করে বুঝলাম, যে বিশেষ নিমন্ত্রণটি রক্ষা করতে গেছিল শনিচক্রের সদস্যরা, সেখানে মেয়েদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে একদা বিজ্ঞাপিত হিরের দ্যুতি কিছু বেশি পরিমাণেই তাদের চোখ ও মন ধাঁধিয়েছে। অতঃপর রাজা সলোমনের হিরের খনি নিয়ে টানাটানি পড়েছে।

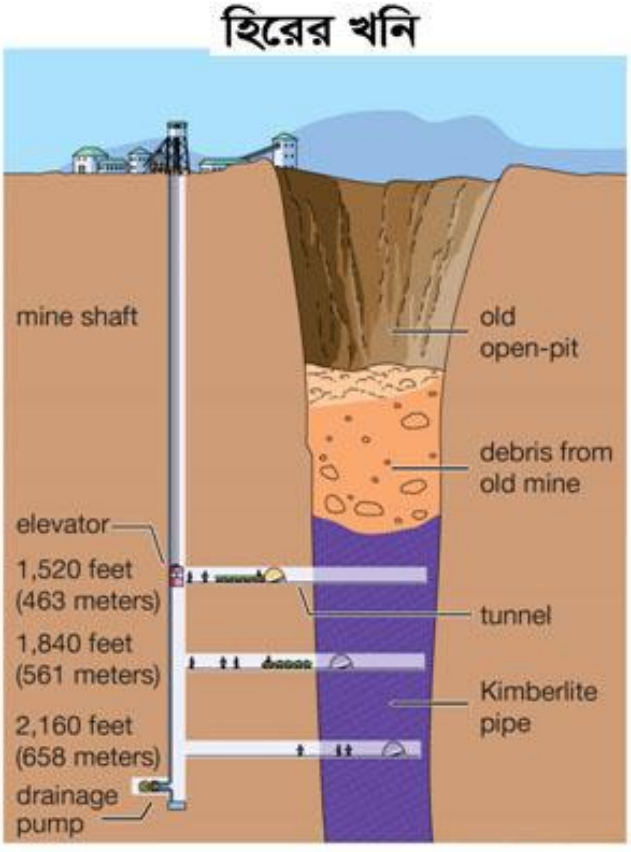
চা শেষ করে আমি হিরের কথা শুরু করলাম।

“কার্বন পরমাণু, যা কয়লা আর গ্রাফাইটেও থাকে, একটা বিশেষ ঘনকের মতো চেহারায় এলে হিরে তৈরি হয়। এর এই বিশেষ গঠনের জন্যেই এটি একইসঙ্গে পৃথিবীর কঠিনতম, এবং সুন্দরতম পদার্থগুলোর অন্যতম। কিন্তু এই বিশেষ গঠন বা ক্রিস্ট্যাল ল্যাটিস পাওয়ার জন্যে কার্বনকে যে অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয় তা, এককথায়, মারাত্মক।

বায়ুমণ্ডলের চাপের প্রায় ৪৫ থেকে ৬০ গুণ চাপে, আর ৯০০ থেকে ১৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে হিরে তৈরি হয়। পৃথিবীতে এইরকম পরিবেশ পাওয়া যায় মূলত কন্টিনেন্টাল প্লেটের সবথেকে পুরু, স্থিতিশীল, এবং পুরোনো জায়গাগুলোর নিচে, ম্যান্টলের লিথোস্ফেরিক অংশে, যাকে ক্রেটন বলা হয়। সাধারণত ১৪০ থেকে ১৯০ কিলোমিটার গভীরতায়, ১০০ কোটি থেকে ৩৩০ কোটি বছর পুরোনো ক্রেটনের স্তরে, হিরে তৈরি হয়। সমুদ্রের তলায় পৃথিবীর গভীরে তাপমাত্রা খুব দ্রুত বাড়তে থাকে বলে ওখানে হিরে পাওয়া যায় না।

এছাড়া কোথাও উল্কাপাত হলে সেখানেও খুব ছোটো-ছোটো হিরে, যাকে মাইক্রোডায়মন্ড বা ন্যানোডায়মন্ড বলা হয়, পাওয়ার নজির আছে। তবে সেগুলো এতই কম যে তাদের নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভালো।

পৃথিবীর গভীরে তৈরি হওয়া এই হিরে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ম্যাগমা, মানে গলন্ত লাভা, পাথর, আর গ্যাসের সঙ্গে ওপরে উঠে আসে। এই ভলক্যানিক ম্যাটার উঠে আসে যে পাইপগুলো বেয়ে, তাদের মধ্যে যাতে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে হিরে পাওয়া যায়, তাদের বলা হয় কিম্বার্লাইট পাইপ। যে পাইপে জলের প্রবাহ হয়, তাতে হিরে কম থাকে, এবং তাদের বলা হয় ল্যাম্প্রোয়াইট পাইপ।



ভলক্যানিক পাইপে কিছু-কিছু বিশেষ জিনিসের উপস্থিতি দেখে হিরের সন্ধানী বা প্রসপেক্টররা আন্দাজ করেন, কোথায় হিরে পাওয়া যাবে”।

“হ্যাঁগো”, এবার প্রশ্নটা তোলে আমার বউ, “ইতিহাস বইয়ে তো পড়েছি যে একসময় ভারতের গোলকোন্ডায় হিরে পাওয়া যেত। এখনও ওখান থেকে হিরে তোলা হয়?”

“ইতিহাসে হিরে নিয়ে সবথেকে বেশি আলোচনা ভারতীয় পুঁথিপত্রেই হয়েছে বলে অধিকাংশ মানুষই মনে করেন যে ৩০০০ বছর বা তারো বেশি আগে সম্ভবত ভারতেই প্রথম হিরে পাওয়া যায়”, আমি বলি।

“ভারত থেকেই হিরের সন্ধান পায় গ্রিকরা, যারা ‘অ্যাডামাস’ শব্দ থেকে এই বিশেষ জিনিসটির নামকরণ করে এর কাঠিন্য তথা অপরিবর্তনেয় চরিত্রের জন্যে।

মানুষ অষ্টাদশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসে পৌঁছনোর আগে অবধি সারা পৃথিবীর মোট হিরের প্রায় ৯০ শতাংশের জোগান দিত ভারতই, আর তার প্রধানতম খনি ছিল গোলকোন্ডা। তারপর, ১৭২৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাজিলে হিরে পাওয়া যায়।

তবে হিরের এবং মানবসভ্যতার ইতিহাস পালটে যায় ১৮৬০-এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লির কাছে হিরের খনি আবিষ্কৃত হলে। ১৮৬৬ সালে অরেঞ্জ নদীর তীরে প্রথম হিরে পাওয়া যায়, আর নাম রাখা হয়ঃ ইউরেকা ডায়মন্ড। এরপর ১৮৬৯ সালে কোলসবার্গ এলাকায় ডি বিয়ার্স ভাইদের মালিকানাধীন একটি পাহাড়ে একটা বেশ বড়োসড়ো হিরে পাওয়া যায়। ব্যাস! শুরু হয়ে যায় ওখানে ‘ডায়মন্ড রাশ’। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এত লোক হিরের সন্ধানে ওই পাহাড়টাকে কেটে আর খুঁড়ে ফেলে যে পাহাড়ের বদলে ওখানে



তৈরি হয় একটা বিশাল গর্ত। এই বিশাল গর্ত, যার আনুষ্ঠানিক নামই হল 'দ্য বিগ হোল', থেকে ১৮৭১ থেকে ১৯১৪ অবধি সময়ের মধ্যে প্রায় ২৭২২ কেজি হিরে পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, এই গর্তটাই হল বিশ্ববিখ্যাত কিম্বার্লির হিরের খনি।

ভারতে এখনও পান্না বলে একটা জায়গায় হিরে পাওয়া যায় বটে, তবে সে শুধু ভূগোল বইয়ের জন্যে। গোলকোন্ডা সহ এদেশের সবক'টা হিরের খনিই এখন নিঃস্ব"।

"এত হিরে তোলা হয় ওখান থেকে?", মধুরিমার চোখ প্রায় কপালে উঠেছে দেখি, "তাও হিরের এত দাম কেন?"

চায়ের তলানিটা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমি বলি, "হিরের বাজারটা আসলে একেবারে প্রথম থেকেই খুব কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করেছে উৎপাদক সংস্থাগুলো। আফ্রিকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারে বিশাল ভূমিকা নিয়েছিলেন যে সিসিল রোডস, তাঁর উদ্যোগেই প্রথমে বেশির ভাগ ছোটো মাইনিং কোম্পানি একসাথে জুড়ে গিয়ে 'ডি বিয়ার্স' নামের কোম্পানি তৈরি হয়। তারপর ১৮৮৮ সালে তার সঙ্গে 'দ্য কিম্বার্লি' নামক একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানি মিশে গিয়ে তৈরি করে 'ডি বিয়ার্স কনসলিডেটেড মাইনস'। দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর বাজারে হিরের একমাত্র সরবরাহকারী ছিল এই সংস্থাই। লাগাতার মার্কেটিং ক্যাম্পেইন চালিয়ে, এবং কাটিং ও পলিশিং-এর ব্যাপারেও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এই কোম্পানি একইসঙ্গে হিরের জনপ্রিয়তা আর দাম, দুটোকেই আকাশছোঁয়া করে দেয়।

এনগেজমেন্ট রিং-এ হিরের ব্যবহারের ধারণাটা ডি বিয়ার্স-এর ১৯৩৮ সালে চালানো একটা মার্কেটিং ক্যাম্পেইনের অবদান মাত্র।

এখনও পৃথিবীতে প্রতি বছরে প্রায় ২৬ টন হিরে তোলা হয়, তবে এই কোম্পানি এখন নিজেদের উপস্থিতি ক্রমেই কমিয়ে আনছে নানা আইনি ঝামেলা এড়ানোর জন্য।

তবে হ্যাঁ, পৃথিবীর অধিকাংশ হিরের উৎপাদন এবং বাণিজ্য আমাদের হাতের বাইরে থাকলেও ৯২ শতাংশ হিরেই কিন্তু কাটা আর পালিশ করা হয় ভারতে, মূলত সুরাটে।"

"এই কাটা আর পালিশের ওপরেই কি হিরের দাম নির্ভর করে?" জানতে চায় তোষালি।

"মোট চারটে জিনিসের ওপর হিরের গুণমান নির্ভর করে", আমি বলি।

"প্রথমেই আসে ক্যারাট, মানে ২০০ মিলিগ্রামের এককে হিরের ভর কত, সেই বিচার। বাকি সব একই রকম থাকলে ক্যারাট বাড়লে হিরের দাম বাড়বে।

এরপর আসে ক্ল্যারিটি, যার বিচার করা হয় জেমোলজিক্যাল ইন্সটিট্যুট অফ আমেরিকা এবং আরো কিছু সংস্থার বানানো স্কেল অনুযায়ী। মোট যত হিরে পাওয়া যায়, তার মাত্র ২০ শতাংশের ক্ল্যারিটি এমন যাতে

তাকে জেমস্টোন, মানে মণিরত্ন হিসেবে ব্যবহার করা চলে। বাকিগুলো বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহারের জন্যে চলে যায়"।

"ক্ল্যারিটি মানে?" এবার জানতে চায় মধুরিমা।

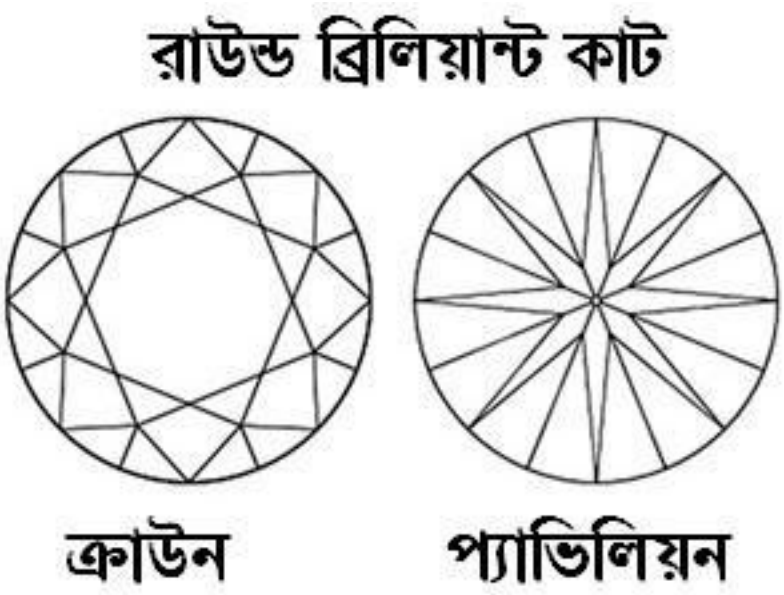
"মানে, আদর্শ অবস্থায় হিরের রং হওয়া উচিত একেবারে স্বচ্ছ এবং সাদা। কিন্তু প্রায় দশগুণ বড়ো করে হিরেকে দেখা হয় তার মধ্যে কোনো ফাটল বা অশুদ্ধি আছে কি না সেটা দেখার জন্য। তার ভিত্তিতেই হিরের ক্ল্যারিটি দেখা হয়"।

"অন্য দুটো কী?" জানতে চায় তোষালি।

"ক্যারাট এবং ক্ল্যারিটির পরেই আসে কালার, বা হিরের রং। একটু আগেই বললাম, আদর্শ হিরের রং বলে কিচ্ছু থাকার কথাই নয়। কালার গ্রেডিং স্কেলে একে বলা হয় 'ডি'। এরকম হিরে অবশ্য কমই আছে। বরং 'ই' গ্রেডের মূলত সাদা হিরে, যাতে কার্বনের ক্রিস্ট্যাল ল্যাটিসে যৎসামান্য নাইট্রোজেন ঢুকে গিয়ে সামান্য বাদামি বা হলুদ রঙের কলঙ্ক এনে দেয়, তারই চলন বেশি, কারণ গয়নায় বসানোর ফলে ওই কলঙ্ক ঢাকা পড়ে যায়। ক্রমে-ক্রমে 'জেড' গ্রেডের হিরে হয় একেবারে হলুদ বা বাদামি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, 'ডি' আর 'জেড' এই দুই-ই বিরলতম হিরে, তাই তাদের দাম সবচেয়ে বেশি।

হিরের রঙের ক্ষেত্রে অন্য উল্লেখযোগ্য বিষয় এটাই যে গাঢ় হলুদ, গোলাপি, লাল, নীল, সবুজঃ এসব রঙের হিরেও খুব দুর্লভ, আর সেজন্য এদের দামও মারাত্মক।

"লাস্ট, বাট নট দ্য লিস্ট, হল কাট। হিরের আকারের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ১৯১৯ সালে গণিতবিদ মার্সেল তোলকোওস্কি হিরের দ্যুতি সর্বোত্তম করার জন্যে তাতে থাকা পলিশড ফেস-এর সংখ্যা, তাদের কোণের মাপ, এবং ভরের কতটা হিরের ওপরের অংশ বা ক্রাউন-এ আর কতটা নিচের অংশ বা প্যাভিলিয়ন-এ থাকা উচিতঃ এসব বলে দিয়ে যান। এর ভিত্তিতেই হিরের কাটিং ও পলিশিং-এর দক্ষতার পরিমাপ করা হয়, যাকে বলা হয় কাট।



একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। তোলকোওস্কি-র আবিষ্কৃত গঠন 'রাউন্ড ব্রিলিয়ান্ট কাট' মেনে আধুনিক হিরেতে থাকে মোট ৫৭টা ফেসেট, তথা পলিশড ফেস। এরে মধ্যে ৩৩টা থাকে ক্রাউন-এ, ২৪টা থাকে প্যাভিলিয়ন-এ। ওপর আর নিচের মধ্যে থাকে একটা পাতলা গার্ডল। এই গার্ডল-এর সঙ্গে প্যাভিলিয়ন-এর মূল ফেসেটগুলো থাকতে হবে ৪০.৭৫ ডিগ্রি কোণে, এবং গার্ডল-এর সঙ্গে ক্রাউন-এর মূল ফেসেটগুলো থাকতে হবে ৩৪.৫ ডিগ্রি কোণে। এসব মানলে হিরের ডেপথ পার্সেপশন বাড়ে, সঙ্গে বাড়ে ক্রাউন-এ প্রতিসৃত হওয়া আলো প্যাভিলিয়ন থেকে প্রতিফলিত হওয়ার মাত্রা, অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য। আর তাতেই বোঝা যায় হিরের কাট।"

সংখ্যাগুলোর ধাক্কায় আমার শ্রোতাদের চোখগুলো আউট-অফ-ফোকাস হয়ে গেছে দেখে আমি ওঠার উপক্রম করছিলাম, কিন্তু মেয়ে ছাড়ল না। এবার সে তারস্বরে প্রশ্ন করল, "কিন্তু বাবা, সলোমনের হিরের খনি কোথায় ছিল?"

আমার হেদিয়ে পড়া অবস্থা দেখে বোধহয় বাকিদের কিঞ্চিৎ মায়াদয়া জাগল, তাই খুব তাড়াতাড়ি আরো এক কাপ চা, চানাচুর, মুড়িমাখাঃ এসব সুখাদ্য পাওয়া গেল। শক্তির সঞ্চার হওয়ায় আমি এবার যে প্রশ্ন দিয়ে এত কথার শুরু সেই জায়গাতেই ফিরে গেলাম।

"বাইবেলে রাজা সলোমনকে যেমন বুদ্ধিমান, তেমনই ধনী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই সময়ে সারা পৃথিবীতেই হিরে যেত ভারত থেকে। আমার নিজের ধারণা, যদি সলোমনের অন্য সম্পদের মধ্যে অনেক হিরে থেকে থাকে, তবে সেগুলো তিনি পেয়েছিলেন তাঁর রানি শেবার কাছ থেকে বিয়ের সময় উপহার হিসেবে, কারণ একাধিক সূত্র বলছে যে শেবা ভারতের, বা আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে মালাবার উপকূল তথা আধুনিক কেরালার রাজবংশের মেয়ে ছিলেন"।

"তাহলে ওই বইটা..." আমার বউ কথা শেষ না করলেও আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারি। এবার আর চা ঠান্ডা হতে না দিয়ে, ডান হাতের যাবতীয় কাজ মিটিয়ে, তারপর প্রায় ছটফট করতে থাকা শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আমি শুরু করি প্রায় ১৩০ বছর আগে লেখা, অথচ আজও সারা পৃথিবীকে মাতিয়ে রাখা এক গল্পের গল্প।

"মাত্র ১৯ বছর বয়সে অ্যাংলো-জুলু যুদ্ধ, এবং প্রথম বোয়র যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সুবাদে ডার্ক কন্টিনেন্ট হিসেবে পরিচিত আফ্রিকার গভীরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল রাইডার হ্যাগার্ডের। ঊনবিংশ শতকের একের পর এক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়ে ইতিহাসের ছবিটাই পালটে যাচ্ছিল, যাদের মধ্যে প্রধানতম ছিল মিশরের 'ভ্যালি অফ দ্য কিংস' এবং আসিরিয়ার সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। আফ্রিকার গভীরের তেমন কোনো আবিষ্কার তখনও সেভাবে লোকের নজরে না এলেও গ্রেট জিম্বাবোয়ে অঞ্চলে গহন অরণ্যের মধ্যে পরিত্যক্ত ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহর হ্যাগার্ড নিজেই দেখেছিলেন। তাই, অনাবিষ্কৃত এক সভ্যতার গল্প পাঠকের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনাটা তাঁর ছিলই।

"এরপর, স্রেফ ঘটনাচক্রে ১৮৮৫-তে হ্যাগার্ড তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে মোটে পাঁচ শিলিং-এর একটা বাজি ধরেন, যে তিনিও রবার্ট লুই স্টিভেনসন-এর সুপারহিট কাহিনি "ট্রেজার আইল্যান্ড"-এর মতো একটা লেখা পেশ করতে পারবেন। এক স্কটিশ এক্সপ্লোরার জেমস থমসন-এর লেখা থেকে তথ্য নিয়ে, এবং বিখ্যাত ব্রিটিশ হোয়াইট হান্টার ফ্রেডরিক কোর্টনি সেলাস-এর আদলে অ্যালান কোয়াটারমেন নামের অবিস্মরণীয় একটি রক্তমাংসের চরিত্র সৃষ্টি করে ওই বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে হ্যাগার্ড বইটা লিখে ফেলেন। কিন্তু তারপরেই তাঁকে এক বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেহেতু আফ্রিকার পটভূমিতে ইংরেজিতে লেখা ওটিই ছিল প্রথম অ্যাডভেঞ্চার নভেল, তাই একের পর এক প্রকাশক হ্যাগার্ডকে ফিরিয়ে দেন। শেষ অবধি, ১৮৮৫-র সেপ্টেম্বরে বইটা বেরোয়, এবং নজিরবিহীন-রকম বেস্টসেলার হয়।

শুধু অ্যাডভেঞ্চার নভেল লেখার জন্য নয়, এই উপন্যাসের মাধ্যমে হ্যাগার্ড অন্তত আরো দুটো বিষয়ে পথিকৃত হয়ে আছেন।

প্রথমত, সেই ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং রীতিমতো বর্ণবিদ্বেষ-শাসিত যুগেও হ্যাগার্ড তাঁর লেখায় কালো চামড়ার মানুষদের যে পরিমাণ সম্মান দিয়েছেন, এবং যেভাবে সাদা ও কালো মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধামিশ্রিত বন্ধুত্ব এবং আত্মত্যাগ দেখিয়েছেন, তা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, ফিকশন-এর ক্ষেত্রে "লস্ট রেস/ওয়ার্ল্ড" নামক একটা জঁর তৈরি হয়েছিল এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পরেই। এই ঘরানায় এরপর একে-একে প্রকাশিত হয় ১৮৮৮-তে রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর 'দ্য ম্যান হু উড বি কিং', ১৯১২-তে আর্থার কোনান ডয়েল-এর 'দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড', ১৯১৮-য় এডগার রাইস বারোজ-এর 'দ্য ল্যান্ড দ্যাট টাইম ফরগট', এবং ১৯৩৬-এ এইচ.পি. লাভক্র্যাফট-এর 'অ্যাট দ্য মাউন্টেইনস অফ ম্যাডনেস'।

কিন্তু, হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের সন্ধানে স্যার হেনরি, ক্যাপ্টেন গুড, অ্যালান কোয়াটারমেন-এর মরুভূমি আর পাহাড় পেরিয়ে এক অজ্ঞাত জায়গায় পৌঁছনো, সেখানে এক শয়তান রাজা ও তার বাহিনীর সঙ্গে

লড়াই করে ন্যায়সংগত রাজার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে অতুল সম্পদ ফেলে কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার এই কাহিনি স্রেফ গল্প। ঠিক যেমন, 'চাঁদের পাহাড়' স্রেফ গল্প"।

ঘরের ভেতরে আবহাওয়াটা যে থমথমে হয়ে উঠেছে, এটা আমি কথা শেষ করার পর ইলাস্টিকের মতো লম্বা হতে থাকা নৈঃশব্দ্য থেকে বুঝতে পারছিলাম। তাই, আর চা পাওয়া যাবে না একথা জেনেও, আমি নিজে থেকেই কথা শুরু করি।

"কোয়াটারমেন-এর বর্ণনা অনুযায়ী কুকুয়ানাল্যান্ড, মানে যেখানে আমাদের হিরোরা সাংঘাতিক বিপদ এবং অতুল সম্পদ, দুয়েরই সাক্ষাৎ পেয়েছিল, সেটা আজকের ডেমক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কংগো"-র একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। ঠিক ওখানে না হলেও, এবং রাজা সলোমনের খনির কথা উল্লেখ করেও ব্যাপারটাকে অনেক বেশি মজবুত তথ্য এবং ক্রূর বাস্তবের ওপর দাঁড় করিয়ে মাইকেল ক্রিকটন ১৯৮০ সালে লেখেন এক রুদ্ধশ্বাস টেকনো-থ্রিলারঃ 'কংগো'। কিন্তু এই উপন্যাসের মাধ্যমে ক্রিকটন, অনেক অ্যাডভেঞ্চার, অনেক তথ্যের পাশাপাশি আমাদের চোখের সামনে এমন এক জগতের ছবি তুলে ধরেন যা সলোমনের হিরের খনির চেয়েও অনেক-অনেক বেশি মূল্যবান।



"মোট জলবহনের দিক দিয়ে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে কংগো নদী। প্রায় ৩৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এর অববাহিকায় রয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেইন-ফরেস্ট, যার আয়তন প্রায় ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ হেক্টর। ডেমক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কংগো, রিপাবলিক অফ কংগো, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, ক্যামেরুন, গ্যাবন, এবং ইকুয়েটরিয়াল গিনিঃ এই ছ'টা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে এই নদীর অববাহিকা এবং এই চিরসবুজ অরণ্য।

এই জঙ্গলে আছে ১০০০-এরও বেশি রকমের উদ্ভিদ, এবং প্রায় ১০,০০০ প্রাণী প্রজাতি। তাছাড়া, প্রায় ৩৯০০ কোটি টন কার্বন নিজের গাছেদের মধ্যে ধরে রেখে এই জঙ্গল সারা পৃথিবীর ফুসফুস হিসেবে তো কাজ করছে।

কিন্তু এই ফুসফুস-ও কাঠ কাটার জন্যে, চোরাশিকারিদের আক্রমণে, ফসলের আওতায় আরো জমি আনার জন্যে, সর্বোপরি এই এলাকার বাসিন্দা প্রায় ৬ কোটি মানুষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে একটু-একটু করে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে ইতিমধ্যেই লুপ্তপ্রায় বলে ঘোষিত হয়েছে এই জঙ্গলের বেশ কিছু বাসিন্দা, যাদের বাদ দিয়ে আমরা জীবজগত-কে ভাবতেই পারিনা। এদের মধ্যে আছেঃ







১) গরিলা
২) হাতি
৩) ম্যানড্রিল বাঁদর
৪) বনোবো
৫) ওকাপি

রাজা সলোমনের সম্পদের কথা জেনে লোভ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ যতদিন না সলোমনের মতো বুদ্ধি আর ন্যায়বিচারের মাপকাঠিতে প্রকৃতি আর পরিবেশকে দেখবে, ততদিন বিশ্বাসঘাতক গাগুলের মতো করে আমরাই আমাদের বন্দি করে রেখে দেব সেই গুহার ভেতরে, যেখানে সম্পদ আছে অনেক, কিন্তু নেই জল, বাতাস, আর মুক্তি।

তাই, সলোমনের খনির চেয়েও বেশি সম্পদের আকর এই পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখলে সে আমাদের যা দেবে, তার দাম...”

“কোহিনুরের চেয়েও বেশি”, সমস্বরে বলে উঠল শনিচক্র!



(পর্ব-১)

কিশোর ঘোষাল

গত ৮ই নভেম্বর ২০১৬ রাত আটটা থেকে গোটা ভারতবর্ষে ১০০০ এবং ৫০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণার পর গোটা দেশে শোরগোল পড়ে গেছে। এই নোট বাতিল পদ্ধতি ঠিক না ভুল, আমাদের ভবিষ্যতে ভালো হবে, না খারাপ হবে! নাকি আমাদের যা অবস্থা ছিল তাইই থাকবে! এ সব বিষয় নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক, পক্ষে-বিপক্ষে জোরদার যুক্তি এবং প্রশংসা আর বিদ্রূপের বন্যা বয়ে যাচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে। সেই সব জটিল বিতর্কের মধ্যে একটুও না জড়িয়ে আমরা বরং এস দেখে নিই মানব সভ্যতায় এই নোট বা টাকা-পয়সা কবে থেকে শুরু হল। আর কিভাবে টাকা পয়সা ছাড়া আমাদের সভ্যতা এক কথায় অচল হয়ে উঠল দিন-কে-দিন। টাকা যখন ছিলই না, তখনই বা আমাদের জীবন যাত্রা কেমন ছিল?

১

কয়েকটি পরিবারের লোক একসঙ্গে দল বেঁধে, ছোট ছোট গোষ্ঠী তৈরি করে, আদিম মানুষেরা সভ্য জীবনের পথে যাত্রা শুরু করেছিল। শুরুতে খাদ্যের জন্যে জঙ্গলে শিকার আর ফল-মূল সংগ্রহ করা ছাড়া তাদের জীবন ধারণের অন্য কোন উপায়ই ছিল না। ধীরে ধীরে তারা কিছু কিছু বন্য প্রাণীদের পোষ মানাতে শিখে ফেলল। এই গৃহপালিত পশুদের মাংস এবং দুধ তারা যেমন খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করত, তেমনি ঘরের নানান কাজেও তাদের ব্যবহার করতে শিখে ফেলল। তারপর তারা আরও শিখে ফেলল আগুনের ব্যবহার, চাষবাস এবং ধাতুর ব্যবহার। সভ্যতার এই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সহজ সরল জীবন যাত্রার ক্রমশঃ ঢুকে পড়তে লাগল নানান জটিল পেশা, কেউ হয়ে উঠল দক্ষ কারিগর, পাথরের কিংবা মাটির নানান উপকরণ বানাতে পারে। কেউ হয়ে উঠল ধাতুবিদ, নানান অঞ্চলে আকর খুঁজে খুঁজে খনিজ তুলে আনে, তারপর সেই খনিজ গালিয়ে বের করে ফেলে লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপো। আবার আরেক ধরনের কারিগর সেই ধাতু থেকে বানিয়ে ফেলতে পারত বিভিন্ন প্রয়োজনের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, কিংবা রান্নার বাসন কোসন। আবার অনেকে সোনা, রূপো কিংবা ব্রোঞ্জ দিয়ে সুন্দর নকশার গয়না বানাতে শিখে ফেলল। অনেকে তুলো কিংবা অন্য কোন তন্তু দিয়ে কাপড় বানাতে শিখল, সে সব কাপড়ও হতো কত রকমের। সাদা, রঙিন, পাতলা, মোটা কিংবা শীতের জন্যে পশমের পোশাক, চাদর।

আমাদের মানব সভ্যতার শুরু হয়েছিল, চাষবাস এবং পশুপালনকে ঘিরে, গ্রামজীবন দিয়ে। প্রধানত নদীর ধারে ধারে গড়ে ওঠা এই গ্রামগুলির সব জায়গাতেই যে সব ধরনের উপকরণ পাওয়া যাবে, এমনতো হতে পারে না। যেমন, এক ধরনের জমিতে খুব ভালো খাদ্য শস্য, যেমন ধান, গম হয়, সে জমিতে তুলোর চাষ ভালো হয় না। আবার যে জমিতে ভালো তুলো হয়, সে জমিতে ধান-গম তেমন ভালো হয় না। একই ভাবে, নদীর ধারে যে সব জমিতে চাষবাস ভাল হয়, সে সব জমিতে লোহা-তামার মতো ধাতু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ধাতুর খনিগুলো অধিকাংশই রুক্ষ পাথুরে অঞ্চলে হয়, সেখানে ফসল ফলানো দুরূহ ব্যাপার।

সভ্যতার এই পর্যায়ে এসেই আমাদের বিনিময় অর্থাৎ বদল ব্যবস্থা জরুরি হয়ে উঠতে লাগল। ধরা যাক আমি ‘সবুজ’ গ্রামের লোক, আমাদের গ্রামে প্রচুর খাদ্য শস্য হয়, আমাদের গ্রামের সকলের সারা বছরের প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পরেও অনেক খাদ্য শস্য বাড়তি থেকে যাচ্ছে। অবিশ্যি আমাদের গ্রামে লোহা পাওয়া

যায় না। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি, আমরা যদি বেশ ভালো লোহার কোদাল, লাঙ্গলের ফাল, কাস্তে কিংবা খুরপি যোগাড় করতে পারি, আমাদের চাষের কাজে খুব সুবিধে হবে। আরো বুঝছি, বেশ কিছু ভালো গরু, বলদ কিংবা মোষ যদি আমরা যোগাড় করতে পারি, আমাদের চাষবাসের কাজটা অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে পারবে, আমরা অনেক ভালো ফসল হতে পারবে। 'সবুজ' গ্রামের লোক আমরা কী করব?

আবার ধরা যাক, তুমি 'রাঙা' গ্রামের লোক, তোমাদের গ্রামেও চাষবাস হয়, তবে সে তেমন কিছু নয়, গ্রামের সবার সারা বছরের খাবার পক্ষে যথেষ্ট ফসল হয় না। তবে তোমাদের গ্রামে অনেক লোহা পাওয়া যায়, আর তোমাদের ধাতুবিদ আছে, সে খুঁজে খুঁজে লোহার খনিজ বের করে, আর সেই খনিজ গালিয়ে লোহার গোলা বের করে। সেই লোহাকে গলিয়ে কিংবা গরম করে পিটিয়ে লোহার যন্ত্রপাতি বানাতে তোমরা 'রাঙা' গ্রামের লোকেরা খুবই দক্ষ। তোমরা বুঝতে পারছো, লোহা খেয়ে তো আর বেঁচে থাকা যায় না! তাদের খাবার জন্যে শস্য চাই, তাদের ভারি ভারি লোহা বইবার জন্যে শক্তিশালী বলদ বা মোষ থাকলে খুব সুবিধে হত। অতএব 'রাঙা' গ্রামের লোকেরাই বা তাহলে কি করবে?

আমাদের গ্রামের থেকে বেশ কয়েকদিন হাঁটা পথের দূরে, আরেকটি গ্রাম আছে, সেখানকার লোকজনেরা চাষবাস কিংবা অন্য কোন কাজে দক্ষ না হলেও, পশুপালন ব্যাপারটা তারা বেজায় ভালো বোঝে। তাদের গ্রামের মোষ আর বলদগুলো যেমন জোরদার, তেমনি খাটতে পারে। তাদের গাভিরাও দুধ দেয় প্রচুর। সেই গ্রামের লোকেরা দুধ, মাখন খেয়ে শেষ করতে পারে না, প্রচুর নষ্ট হয়। তাদের বলদ কিংবা মোষগুলোর সারাবছর কাজ থাকে না, কিন্তু তাদের পালন করতে খরচ হয় প্রচুর খড়, ঘাস বিচালি। তারা ভাবছে যদি কিছু বদলে নেওয়া যেত।

ঠিক এই ভাবনা থেকেই শুরু হয়ে ছিল বিনিময় প্রথা, যাকে ইংরিজিতে বলে Barter system । প্রাচীন গ্রীস, রোম এমনকি ভারতেও গরু বা বলদ, এক কথায় গবাদি পশুই ছিল বিনিময়ের প্রধান উপাদান। গাভির বয়েস ও তার দুধ দেওয়ার ক্ষমতার উপর তার দাম নির্ধারণ করা হত। আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্র ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একবছরের গাভি ও তার সদ্যজাত বাছুরের বিনিময়ে কতটা সোমরস পাওয়া যায় তার উল্লেখ আছে। গবাদি পশু ছাড়াও এক বস্তা শস্য কিংবা একখণ্ড মাংসের বড়ো টুকরোও তখন বিনিময়ের উপাদান হিসেবে সারা বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত হত। এমনকি কোন কোন জায়গায় নুনের বস্তার বিনিময়েও খাদ্য শস্য, মাংস বা অন্য উপকরণ পাওয়া যেত, কারণ যে কোন খাদ্যে নুন অত্যন্ত জরুরি এবং সমুদ্র থেকে অনেক দূরের দেশে নুন মোটেই সহজলভ্য ছিল না।

এই বিনিময় প্রথায় কাজ চলে যাচ্ছিল ঠিকই, তবে সমস্যাও হচ্ছিল বিস্তর। ধরা যাক একজন তন্তুবায় একটা ধুতি বা শাড়ি বানিয়েছেন, কিন্তু তার বিনিময়ে কতটা শস্যদানা কিংবা গাভি কিংবা মাংসের টুকরো তাঁর পাওনা হওয়া উচিৎ, কে ঠিক করবে? যে লোকটির অনেক গবাদি পশু আছে, সে হয়তো দুখানা ধুতি কিনতে চায়। দুখানা ধুতির সমমূল্যে একটি গাভিকে তো আর অর্ধেক বা আরো ছোট অংশে ভাগ করা যায় না! কিন্তু যার কাছে শস্যদানা আছে সে অর্ধেক বা সিকি বস্তা শস্য দিয়েই, সেই ধুতি কিনে ফেলতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে, বিনিময় প্রথা সবার ক্ষেত্রে, সব অঞ্চলে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছিল না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অচল হয়ে উঠছিল এই প্রথা।

২

মানুষের সভ্যতার যত উন্নতি হল, দেশের মধ্যে এমনকি দেশের বাইরেও ততই ব্যবসা বাণিজ্য বাড়তে লাগল। সত্যি বলতে যে দেশ বা রাজ্য বাণিজ্যে যত বেশি সফল, তার সম্পদ-সমৃদ্ধিও তত বেশি। আর বাণিজ্য যত বেড়ে উঠল, ভীষণ জটিল হয়ে উঠতে লাগল এই বিনিময় প্রথা। এমন কোন সাধারণ উপাদান যদি ব্যবহার করা যায়, যার দ্রব্যমূল্য সকলেই মেনে নেবে এবং সেই উপাদানের প্রেক্ষীতে সকল জিনিষের দামও যদি নির্ধারণ করে ফেলা যায়, তাহলে আর বিনিময়ের ঝামেলা হয় না। বলাবাহুল্য এই নিয়মে সকলেরই সুবিধে হল এবং দ্রব্য বিনিময় প্রথা বদলে গিয়ে, এসে গেল বেচা-কেনার অর্থ বিনিময় পদ্ধতি (Money transaction system)। নতুন এই ব্যবস্থায়, বিক্রেতা তার বিক্রি করে পাওয়া অর্থ দিয়ে, তার নিজের দরকার এবং মনোমতো জিনিষপত্র কিনতে আর কোন বাধা থাকল না। এসে গেল বিনিময়ের নতুন উপাদান, যার নাম অর্থ বা টাকা (Money)। ছোটাখাটো আঞ্চলিক লেনদেন ছাড়া, বিনিময় প্রথার চল বেশ কমে গেল।

প্রথম থেকেই অর্থ বিনিময়ে বিভিন্ন ধাতুর বহুল ব্যবহার শুরু হয়েছিল। শুরুতে সোনা, রূপো কিংবা তামার মতো বিশেষ বিশেষ ধাতু, গোলা হিসেবে কিংবা পুঁটলিতে গুঁড়ো হিসেবে ব্যবহার করা হত। তারপর ধীরে ধীরে ধাতুর ছোট ছোট পাত বা পাৎলা চাকতির ব্যবহার শুরু হল। দেশের রাজা কিংবা দেশের মুখ্য প্রশাসক বিশেষ কোন ছাপ বা ছবি দিয়ে যখন এই ধাতব চাকতিগুলো সকলের ব্যবহারের জন্যে বাজারে ছাড়তেন, তখন তাকে মুদ্রা (coin) বলা হয়। গ্রীসের প্রাচীনতম যে মুদ্রা পাওয়া গেছে তাতে পশুচিত্রের ছাপ দেখা যায়। মিশরের সোনা বা রূপোর মুদ্রাতেও গাভি এবং অন্যান্য পশুর ছাপ দেখা যায়।

মুদ্রার প্রধান বিশেষত্ব হল, মুদ্রায় ব্যবহার করা ধাতুর গুণ এবং ধাতুর ওজন। বিশুদ্ধ সোনা, রুপো কিংবা তামার নির্ধারিত (standard) দ্রব্যমূল্য সারা বিশ্বে, সকলেই মেনে নেয়। কিন্তু বিশুদ্ধ ধাতু ততটা শক্ত হয় না বলে, মুদ্রা বানানোর সময় বিশুদ্ধ ধাতুতে, অন্য ধাতুর কিছুটা খাদ বা অশুদ্ধি মেশাতে হয়। সোনা বা রূপোতে এই খাদের পরিমাণের উপর মুদ্রার মূল্য নির্ভর করে। সুতরাং কম সোনার সঙ্গে বেশি খাদ মিশিয়ে, একই রকম দেখতে মুদ্রা বাজারে ছাড়লে, সাধারণ লোকের পক্ষে সহজে বোঝা সম্ভব হত না। এর ওপর মুদ্রার ওজনে সামান্য কারচুপি করলেও চট করে ধরা সম্ভব হত না। দুর্জন প্রতারকদের এই দুর্নীতি ঠেকানোর জন্যে, রাজা কিংবা প্রশাসকরা বিশেষ ছবি, চিহ্ন, ছাপ বা সংকেত দিয়ে মুদ্রা ছাপতেন। সেই বিশেষ চিহ্নকে বলত মোহর, আবার বিশেষভাবে চিহ্নিত সোনার মুদ্রাকেও মোহর বলা হত।

অনুমান করা যায় খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই/তিন হাজার বছর আগে, সিন্ধু সভ্যতার আমলে, ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। সিন্ধু নদ, ঘাঘরা-হাকরা ও সরস্বতী নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা, সিন্ধু সভ্যতার এই শহরগুলি পাকিস্তান-আফগানিস্তানের সীমানা থেকে আমাদের দেশের গুজরাট, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। এখনো পর্যন্ত এই অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক ১০৫২টি শহরের হদিশ পাওয়া গেছে। পুরাতত্ত্ববিদরা গবেষণা করে দেখেছেন, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো নগরের কুশলী ধাতুবিদরা, দক্ষিণ ভারত থেকে প্রচুর সোনা এবং রাজস্থান থেকে তামা আমদানি করত। কিন্তু ধাতুমুদ্রার হদিস না পাওয়া গেলেও, শুধুমাত্র মহেঞ্জোদারো শহরে প্রায় ১২০০ সিলমোহর পাওয়া গেছে এবং অন্যান্য শহরেও বেশ কয়েকশ সিলমোহর উদ্ধার হয়েছে। এই সিলমোহরগুলি, নানান রকম ছবি খোদাই করা চারকোণা স্টিটাইট (Steatite) পাথরের টুকরো। স্টিটাইট পাথরের আরেক নাম সোপস্টোন, পাথরের মধ্যে সব থেকে নরম এই পরিবর্তিত (Metamorphic) শিলা ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium) সমৃদ্ধ খনিজ ট্যাল্ক(Talc)।

মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া কিছু সিলমোহর



লোথাল থেকে পাওয়া কিছু সিলমোহরঃ



এই সিলমোহরগুলির সঠিক ব্যবহার জানা না গেলেও পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, বাণিজ্যসংক্রান্ত বিনিময়ের কাজেই এগুলি ব্যবহার করা হত। এই সিলমোহরের অধিকাংশই বর্গাকার বা আয়তাকার হত। সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম একটি বন্দর শহর হল লোথাল, এখনকার গুজরাটের আমদাবাদ শহর থেকে মোটামুটি ৮৫ কিমি দূরে। এই বন্দর থেকে সুদূর ইজিপ্ট, সুমের, বাহারিনের সঙ্গে নিয়মিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এই বন্দর শহরে বেশ কিছু গোলাকার এবং ছোট বড়ো নানান আকারের স্টিটাইট সিলমোহর পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতার বিশাল ব্যাপ্তি, ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে এবং সুদূর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নিয়মিত বাণিজ্যিক সম্পর্কের নানান প্রমাণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, দ্রব্য বিনিময় করে এই বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন শহর থেকে উদ্ধার হওয়া এই সিলমোহরগুলিতে কিছু লিপি দেখতে পাওয়া যায়, যে লিপির পাঠ এখনো সম্ভব হয়নি। এই লিপিগুলি পড়ে ফেলতে পারলে, আমাদের ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য আমরা জানতে পারব। বড়ো হয়ে তোমরা যদি এই সব লিপির অর্থ বুঝে ফেলতে পারো, আমাদের মুদ্রার ইতিহাস এমন কী প্রাচীন ভারতের ইতিহাসও নতুন করে লিখতে হবে।

এরপর পরের সংখ্যায়

বন তুলসী

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়



যে সময়ের কোথা বলছি সেই সময় চান্দু বোরদে ভারতের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়দের একজন। আমি তখন স্কুলে নীচু ক্লাসে পড়ি। ওঁর পুরো নাম অবশ্য চন্দ্রকান্ত গুলাব রাও 'চান্দু' বোরদে। আমরা চান্দু বোরদে নামেই বেশি জানি।

শীতকালেই ক্রিকেট খেলা হত। মাঝে মাঝে পাঁচ দিনের টেস্ট খেলা। এখনকার মত একদিনের পঞ্চাশ ওভার বা কুড়ি ওভারের খেলার প্রচলন হয় নি। আজকের মত টি ভি-তে খেলা দেখার কথা তখন স্বপ্নাতীত। এদেশে টি ভি এসেছে অনেক অনেক পরে। খুব বেশি হলে রেডিওতে খেলার ধারাবিবরণী শোনাটাই ছিল অনেক। ইডেনে টেস্ট খেলা হলে বাংলায় ধারাবিবরণী শোনার আলাদা আকর্ষণ ছিল।

শীতকালের অনেকটা সময় মামার বাড়িতে কাটত। তখন ধান ওঠার সময়। আর আমরা ছোটোরা সেই সময় মাঠে ক্রিকেট খেলে কাটাতাম। খেলার সময় চান্দু বোরদের নকল করে খেলা বা বল ব্যাট দিয়ে মেরে মাঠের বাইরে পাঠাতে পারলে মনে মনে নিজেকে বোরদে ভাবতে বড়ই ভালো লাগত।

তবে সবসময় তো ব্যাট করার সুযোগ হত না, ফিল্ডিংও করতে হবে। সেই সময় বল ধরতে একটু আধটু লাফঝাঁপ দিতেই হত। আর তার ফলশ্রুতি হিসাবে হাঁটু কিম্বা হাতের কনুই ছড়ে রক্তপাত ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। গ্রামের মাঠে ডেটল স্যাভলন আর কোথায়। ছুটে মাঠের ধারে গিয়ে বনতুলসী গাছের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে দুই হাতের তালুর মধ্যে পাতাগুলি কচলে নিয়ে পাতার রস কাটা জায়গায় লাগিয়ে নিতাম। খেলার সময় কেটে যাওয়া জায়গাগুলি কোনদিন সেপটিক হয়নি। এমন কি পরদিন ব্যাথার কথাও ভুলে গিয়ে আবার মাঠে ছুটতাম।

আজ এতদিন পরে ভাবি এই আগাছা বন তুলসী পাতার রস যেন ম্যাজিকের মত কাজ করত। বন তুলসী গাছ শহরে প্রায় দেখা যায় না এমন কি গ্রামেও অনেক কমে এসেছে। বর্তমান প্রজন্ম এই গাছ প্রায় চেনে না বললেই চলে।

বন তুলসী গাছটি ছোটো অথচ সোজা আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। ছোট্ট গাছের সরু কাষ্ঠল কাণ্ডকে ঘিরে রয়েছে অনেক ডালপালা। এই গাছটি যতটা লম্বা প্রায় ততটাই চওড়া। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন এই গাছটি শুধু আমাদের এই উপমহাদেশ নয় দক্ষিণ আমেরিকাতেও দেখা যায়। রেল লাইন বা রাস্তার ধারে, নদী ও পুকুরের পাড়ে, পতিত জমিতে এই গাছ জন্মায়। গাছে নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত ফুল ফোটে। ইউফরবেসি পরিবার ভুক্ত এই গাছটির বিজ্ঞানসম্মত নাম *Croton bonplandianum*.

পাতা - বর্শার ফলার মত পাতাগুলি মোটামুটি দেড় থেকে দু ইঞ্চি লম্বা। গাঢ় সবুজ রঙের। পাতার ধার সামান্য ধারকাটা। পাতা এবং সবুজ ডালপালাগুলিতে সামান্য রোঁয়া রয়েছে। পাতাগুলি কচলালে রস বের হয়।

ফুল - ছোট্ট ছোট্ট সাদা ফুলগুলি দেখতে সুন্দর, লম্বা শীষের উপর অবস্থিত। ফুলগুলিতে পাঁচটি পাপড়ি রয়েছে।

ফল - ফলগুলি সবুজ, তিন কোণাকৃতি। ফল এবং পাতায় ছোটো ছোটো স্ফোটক বা আবের মত বৃদ্ধি দেখা যায়।

ভেষজ ব্যবহার -

১) কাটা ছেঁড়ায় পাতার রস লাগান হয়।

২) পাতার রস ত্বকের রোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়।

ভারতের বৈজ্ঞানিক



সংহিতা

আধুনিক কালে ভারতবর্ষের যে সব বৈজ্ঞানিক দেশের সীমা পেরিয়ে বিদেশেও সমূহ স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে পদার্থবিদ অশোক দাস অন্যতম। বৈজ্ঞানিক অশোক দাসের চর্চার ক্ষেত্র তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা। এই বিষয়ে তাঁর গবেষণা নানান মহাদেশে প্রসিদ্ধ।

উড়িষ্যার পুরী জেলায় তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯৫৩ সালের ২৩শে জানুয়ারি। তবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা তিনি করেছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে, পদার্থবিদ্যা নিয়ে এবং স্নাতক সাম্মানিক ও স্নাতোকোত্তর ডিগ্রিও তিনি পেয়েছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই যথাক্রমে ১৯৭২ ও ১৯৭৪ সালে।

পরবর্তী পর্যায়ে স্নাতোকোত্তর গবেষণা করার জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। সুপারসিমেট্রি ও সুপারগ্র্যাভিটি বিষয় দুটির ওপর গবেষণা করেছিলেন তিনি স্নাতোকোত্তর গবেষণা করার সময়ে, স্টোনিব্রুক নামে এক জায়গায় নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির যে ক্যাম্পাস ছিল সেইখানে। তাত্ত্বিক গবেষণার এই ক্ষেত্রগুলিতে মূলত বস্তুর কণা ধর্ম আর তার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হয়। সুপারসিমেট্রি আবার বোসন আর ফার্মিয়ন কণা দুটির ঘূর্ণন বিষয়ে আলোকপাত করে। এই কণা দুটি জোড়া হিসেবে বিবেচনা করলে এদের মধ্যে বোসন-এর ঘূর্ণন পূর্ণ সংখ্যায় গোণা যায় এবং অপর কণা ফার্মিয়নের ঘূর্ণন পূর্ণসংখ্যার অর্ধেক দাঁড়ায়। এছাড়াও কণাগুলির ভরের জন্য মৌলের প্রাথমিক কণা ইলেকট্রনের ভরের তারতম্য ঘটে। ১৯৭৭ সালে বৈজ্ঞানিক অশোক দাস ডক্টরেট ডিগ্রি পান ঘূর্ণনের ৩/২ ক্ষেত্র এবং সুপারগ্র্যাভিটি তত্ত্বের জন্য।

এরপরে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী গবেষকের কাজ করেন। যেমন নিউ ইয়র্কের সিটি কলেজে, মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে। রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. অশোক দাস যোগ দিয়েছিলেন ১৯৮২ সালে। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ১৯৯৩ সালে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। এখনও এই বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি অধ্যাপনা এবং গবেষণার সাথে যুক্ত। এছাড়াও তিনি ভারতবর্ষের সাহা ইন্‌স্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অতিরক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বৈজ্ঞানিক দাস নানান সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। যেমন ১৯৮৩-৮৯ সালের মধ্যে তিনি ছিলেন শক্তি দপ্তরের বিশিষ্ট অর্ধতন অনুসন্ধানকারী। ১৯৯১ সালে এডওয়ার্ড পেক কার্টিস পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৭ সালে প্রথমবার ফুলব্রাইট ফেলোশিপ পেয়েছিলেন। পরে একই সম্মান পান ২০০৬ সালেও। এর মধ্যে ২০০৪ সালে অর্জন করেন রকফেলার ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড। ২০০৬ সালেই উইলিয়াম এইচ রাইকার পুস্কারও

পেয়েছিলেন রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরকাড়া স্নাতোকোত্তর শিক্ষক হিসেবে। ফুলব্রাইট ফেলোশিপ তাঁকে পৌঁছে দেয় ব্রাজিলের সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জুন মাস অবধি ফাইনাইট টেম্পেরেচার ফিল্ড থিওরি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। এছাড়াও তাঁকে আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির সভ্য করা হয়েছে।

শতাধিক গবেষণা পত্রের রচয়িতা ড. অশোক দাস। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র এখন সমাকলন গণিতের দ্বারা প্রভাবিত। এই বিষয়ে গবেষণা পত্র ছাড়াও তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীদের পড়ার উপযোগী একাধিক বইও লিখেছেন।



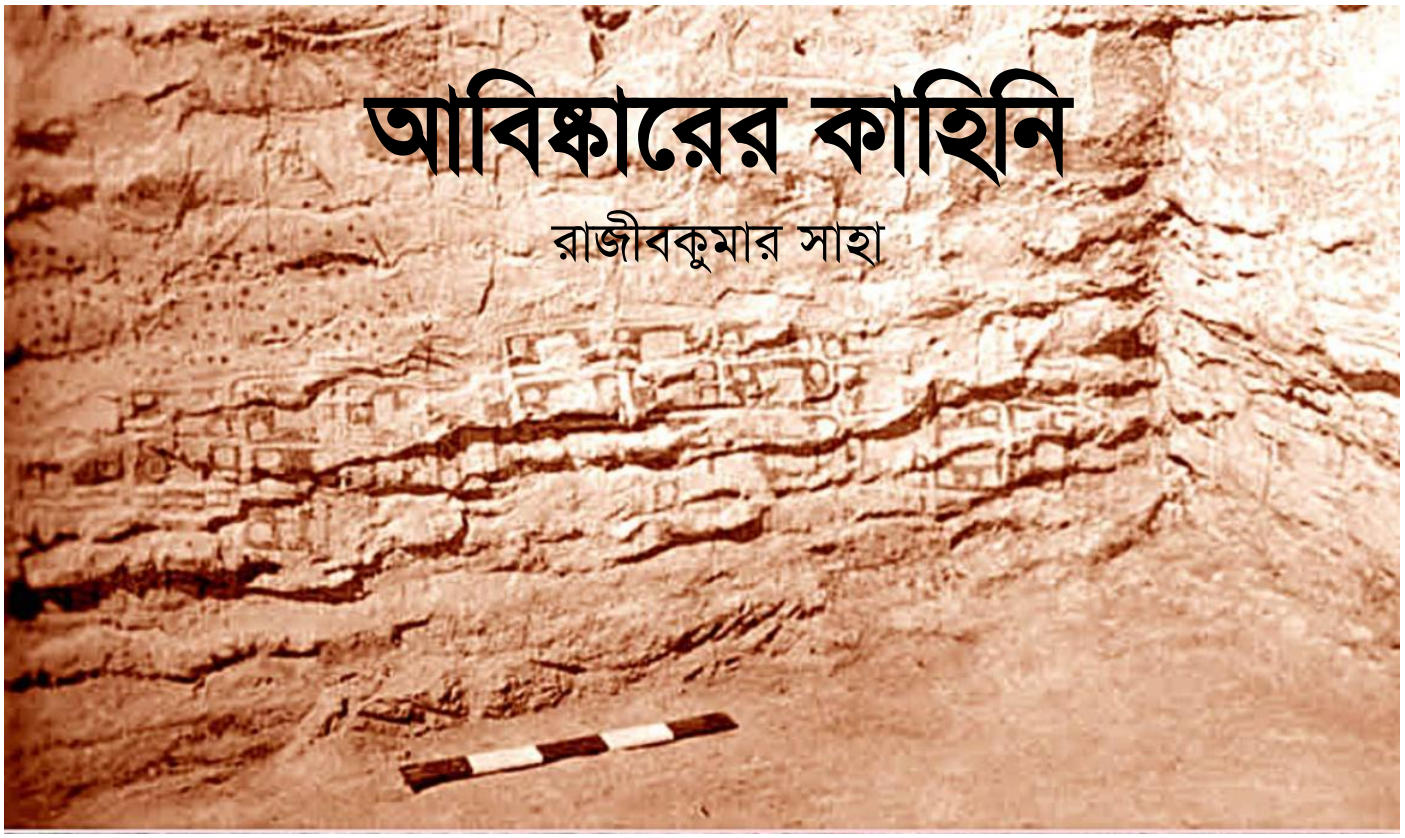
রুমালে দাউদাউ করে আগুন জ্বলল অথচ রুমাল রইল অক্ষত

দর্শক একজনের কাছ থেকে একটা সুতির রুমাল চেয়ে নিয়ে জাদুকর বলতে শুরু করলেন, "এই রুমালটা পেট্রলে চুবিয়ে নিয়ে আমিএতে আগুন ধরিয়ে দেব।"
বলতেই রুমালের মালিক আঁতকে উঠলেন। জাদুকর তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "চিন্তা করবেন না। এয়ার কিছু হলে আপনাকে একটা নতুন রুমাল দিয়ে দেব। এই কথা বলেই পাশে রাখা একটা তরলে রুমালটা ডুবিয়ে একটা চিমটে দিয়ে ধরে বের করে আনার পর এক শাগরেদ ওটাতে ফস করে দেশলাই ধরিয়ে আগুন দিয়ে দিল। দাউদাউ করে রুমালে আগুন জ্বলতে লাগল। প্রায় আধমিনিট মতন আগুন জ্বলার পর জাদুকর পাশে রাখা একটা জলভরা পাত্রে রুমালটা চুবিয়ে দিতেই আগুন নিভে গেল। রুমালের মালিকের মাথায় হাত, "এটা গেল!"
ওখানে থেকে উঠিয়ে এনে রুমালটা মালিকের হাতে জাদুকর দিতে দেখা গেল কিস্যু হয়নি। রুমালটা শুধু জলে ভেজা।
মালিকের মুখে স্বস্তির চিহ্ন। দর্শকরা হাততালিতে হলঘর গমগমিয়ে তুলল।

ওই তরল কি সত্যিই পেট্রল ছিল?

তরলটা আদৌ পেট্রল নয়। ওটা ছিল সমপরিমাণে ইথানল আর জলের মিশ্রণ। সঙ্গে এক চিমটে বোরাক্স (সোহাগা)। সুতির কাপড়ের রুমাল ওই তরলে চোবানোয় ওটা জলে ভালো করে ভিজে যায়। কিন্তু তার গায়ে তো একগাদা ইথানল লেগে আছে। ইথানল (অ্যালকোহল) উদ্বায়ী আর তার জ্বলনাংকও যথেষ্ট কম। আগুন লাগিয়ে দিতেই অ্যালকোহল পুড়তে শুরু করল। কিন্তু রুমাল জলে ভেজা থাকার ফলে তা দহনতাপে তাপিত হতে পারছে না, তাই পুড়ছেও না। এদিকে বোরাক্সও রুমালে একটা নিরাপত্তা আচ্ছাদন তৈরি করে রুমালকে আগুনের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে।

অনেকে জাদুটা কাগজের নোট দিয়েও দেখান। তোমরা একটা দশটাকার নোট নিয়ে খেলাটা একটু সাহস করে দেখাতে পার। কিন্তু সাবধান, ঠিকমত করতে না পেরে ওটা নষ্ট করলে কিন্তু আমায় কিছু বোলো না।



আবিষ্কারের কাহিনি

রাজীবকুমার সাহা

এই নীলগ্রহের জন্মলগ্ন থেকেই ঘটে চলেছে কতই না আজব কাণ্ডকীর্তি। বিশেষত মানুষ বা তার পূর্ব প্রজাতির সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন আবিষ্কার। আদিযুগ থেকে বিভিন্ন খোঁজ আর আবিষ্কারের যথাসম্ভব তথ্য ক্রমানুসারে নথিভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই বিভাগে।

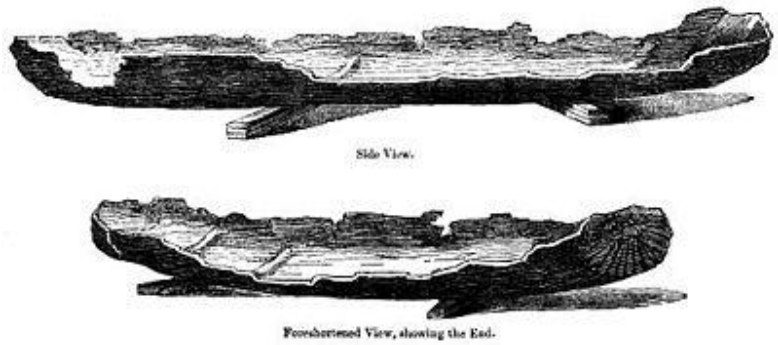
পর্ব - ৪

ধাতু আবিষ্কার (Metalworking) (খ্রিষ্টপূর্ব ৮৭০০)



ধাতু আবিষ্কারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আদিমানব ধারণাই করতে পারেনি যে এই যুগান্তকারী আবিষ্কার নিজেদের সভ্যতাকে কোন পথে চালিত করতে পারে। ইরাকের উত্তরাংশে তামা নির্মিত দুল খুঁজে পাওয়ার পর প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধারণা করেন যে প্রথম ধাতু হিসেবে তামার ব্যবহার মানুষ খ্রিষ্টপূর্ব ৮৭০০ থেকেই জানত। প্যালেস্তানিয় এবং অ্যানাটলিয় আদিবাসীরা কোনও গভীর গর্ত বা গুহা খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া খনিজ তামা পিটিয়ে অচিরেই বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র বা হাতিয়ার বানিয়ে ফেলল। কিন্তু সে তামা ছিল বেশ নরম। পরবর্তী সময়ে তারা আকরিক থেকে তামা আহরণ-বিদ্যা রপ্ত করে টিনের সাথে মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করে ফেলল। সে প্রায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ - ৪০০০-এর কথা। মানুষ তখন রীতিমতো সোনা ব্যবহার করতে শিখে গেছে। অবশ্য এর আগেই তারা ধাতুবিদ্যার উন্নতিকরণ করতে গিয়ে তামার সাথে আর্সেনিক মিশিয়ে হঠাৎ এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণ এবং চরিত্রের ধাতু আবিষ্কার করে ফেলল, যা আর্সেনিক্যাল ব্রোঞ্জ নামে পরিচিত। আর সম্ভবত এটাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানবসৃষ্ট সঙ্কর ধাতু।

গাছের গুঁড়ির শালতি (Dugout Canoe) (খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০০)



প্রয়োজন জিনিসটা মানুষের কখনও এক জায়গায় বা সীমিত সংখ্যক বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতেই একসময় গুহামানবদের দরকার পড়ল এমন এক বস্তুর যার সাহায্যে অনায়াসে জলের ওপর বিচরণ করা যায়। এতদিন শুধু সাঁতার আর জলে ভাসমান কাঠ জড়িয়ে ধরে সাঁতার কেটেই কাজ চালানো হচ্ছিল। সেই কাঠ অথবা মোটা গাছের গুঁড়িকে কাজে লাগিয়েই তারা তৈরি করে ফেলল শালতিজাতীয় একধরনের জলযান - যা দেখতে শুনতে প্রায় আধুনিক নৌকোর মতোই। ফাঁপা গাছের গুঁড়ির ভেতরটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বা ঠাসা গুঁড়ির পেটটা কুঁদে বানানো হল এই শালতি। বিবর্তনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে একসময় শালতির দুইদিকটা কোণাকৃতি করে দেওয়া হল যাতে জিনিসটা দ্রুত জল কাটতে পারে। ইউরোপের উত্তরাংশে এধরনের প্রাচীন শালতির বেশ কিছু প্রমাণ মিলেছে। প্রাচীন গ্রিসেও এই জলযানের ব্যবহার ছিল। গ্রিকরা একে 'মনো-অক্সিলন' বলে, যার ইংরেজি সমার্থক হচ্ছে 'সিঙ্গল ট্রি'।

বাটালি (Chisel) (খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০০)



আধুনিক বাটালি - কত রকম, কত ধরন আর কত ডিজাইনের হয়। তা ধারণাটা কবেকার? না, সেই ৭৫০০ খ্রিস্টপূর্বের আশেপাশে সময়কার। আদিমানব তখন হোমো ইরেক্টাস থেকে হোমো সেপিয়েন্সে উন্নিত হয়েছে। শক্ত হাড়গোড়ের বদলে ধাতুর যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শিখে গেছে। গ্রিক স্থপতি ম্যানোলিস কোরেস তো মনে করেন, আদি গ্রিকদের ব্যবহৃত ধাতুনির্মিত বাটালি বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি ধারালো আর শক্তপোক্ত ছিল। ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে অউরিগন্যাক গ্রামের নিকটে আবিষ্কৃত প্রায় ৩০০০০ খ্রিস্টপূর্বে নির্মিত হাড়ের বাটালি আর প্রস্তরযুগের শেষে ধাতুনির্মিত বাটালি অন্তত তাই প্রমাণ করে। তবে হাড়গোড়ের বাটালি যতই শক্তপোক্ত হোক না কেন তা ছিল ভঙ্গুর। ব্যবহারবিধি সম্পর্কে আদিম মানব ততটা সচেতনও ছিল না। পরবর্তী সময়ে ধাতুনির্মিত বাটালির আবিষ্কারের ফলে তাদের বিভিন্ন আয়াসসাধ্য কাজকর্ম যেমন, গাছ কাটা, কাঠ এবং পাথর কেটে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা অনেক সহজ হয়ে গেল। প্রাচীন মিশরীয় ছুতোর এবং রাজমিস্ত্রিরা পিরামিড তৈরিতে ব্রোঞ্জের বাটালি ব্যবহার করতেন। মজার কথা হচ্ছে, প্রথম তৈরির সময় বাটালির যে রূপদান করা হয়েছিল আজও তার চেহারার কোনোরূপ পরিবর্তন হয়নি। ইংরেজিতে 'chisel' কথাটি এসেছে পুরাতন ফরাসি শব্দ 'cisel' থেকে - উৎস হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ 'cisellum', যার অর্থ 'কিছু কাটার যন্ত্র'।

ইট (Dried Brick) (খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০০)

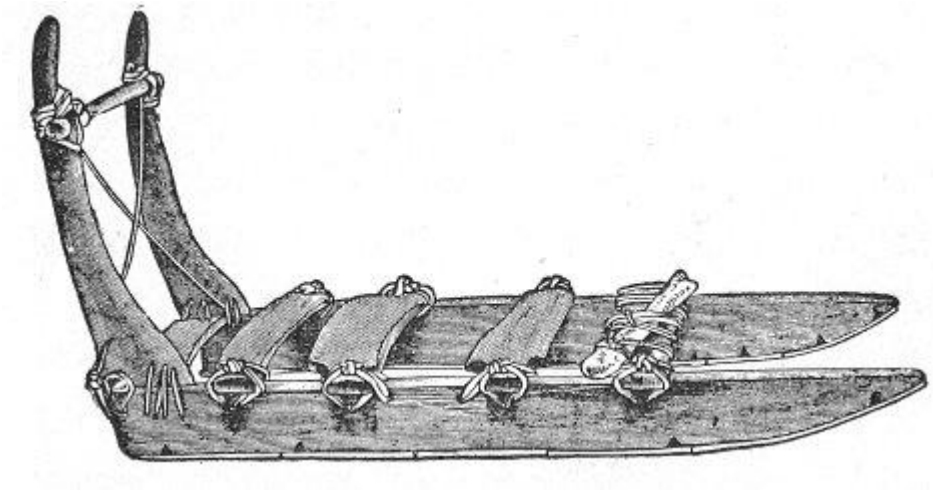
মানুষ আস্তে আস্তে দৈনন্দিন জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বিষয় প্রত্যেকটা প্রয়োজন নতুনভাবে ভাবতে শুরু করল। ফলে দিন দিন নতুন নতুন জিনিসের আবিষ্কার হতে লাগল। বর্তমানে মানবসমাজে বাসস্থান তৈরির ক্ষেত্রে এক অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে ইট। মানুষ প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০০-এই ইটের ব্যবহার শিখে গিয়েছিল। তখন তা ছিল কাঁচা মাটির, তবে শুকনো। একটা সুরক্ষিত বাসস্থানের প্রয়োজন আদিমজাতিকে বড়োই দুর্ভাবনায় ফেলে রেখেছিল দীর্ঘদিন। শেষে তারা নরম মাটিকে ঢেলা বানিয়ে খটখটে রোদে শুকিয়ে নিয়ে ঘর তৈরি করার কৌশল রপ্ত করে নিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন, এ



কাজে মাটি তারা নদীগর্ভ থেকে সংগ্রহ করত এবং তাদের ইটনির্মিত বাসস্থান রীতিমতো সুন্দর আকার আকৃতির ছিল আর সম্পূর্ণ মাটির তৈরি ছিল বলে অনেকাংশেই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ছিল। তুরস্কের উচ্চ টাইগ্রিস উপত্যকার ক্যায়োনু আর অ্যানাটোলিয়ার দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত দিয়ারবাকির নামক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০০-এর কাছাকাছি সময়কার কাঁচা ইটের সন্ধান পান। তবে সেগুলো ছিল একেকটা মাটির ঢেলা।

পরবর্তী সময়ে তুরস্কেরই ক্যাতালহয়ুক অঞ্চলের জর্ডন নদীর উপত্যকার জেরিকোতে আরও কিছুটা উন্নত ধরনের ইটের খোঁজ পাওয়া যায়। এগুলো কাদামাটির ঢেলা বানিয়ে রোদে শুকিয়ে হাতে তৈরি করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইটগুলো প্রত্যেকটা নিজেদের মধ্যে কাদার প্রলেপের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দেওয়াল আকারে আবিষ্কৃত হয়েছিল। আর আশ্চর্যজনকভাবে প্রত্যেকটা ইটের আকার ছিল একই অনুপাতের। যেমন, একেকটা ইট চার একক লম্বা, দুই একক প্রস্থ এবং এক একক উচ্চ ছিল। এ থেকে মনে করা হয়, মানুষ তখন রীতিমতো কাঠের বাক্সের নির্দিষ্ট ফর্মার সাহায্যে ইট তৈরি করত। সমগ্র মিশরীয় ও সিন্ধুসভ্যতায় ছোটবড়ো ঘরবাড়ি, খামার, শস্যাগার প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ ধরনের ইটের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। কাঠের ফর্মায় তৈরি ইটগুলো খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ – ৬৪০০-এর মধ্যে তৈরি বলে মত প্রকাশ করা হয়।

স্লেজ (Sledge) (খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০)



আজকালকার ‘স্নোমোবাইল’-এর অনেক অনেক আগেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা বরফ দিয়ে যাতায়াতের সুবিধার্থে এক পরিবেশ-বান্ধব যানের উদ্ভাবন করে ফেলে। পরবর্তীকালে তাই স্লেজগাড়ি নামে পরিচিত হয়। উত্তর ইউরোপের আর্কটিক অঞ্চলে কাঠনির্মিত স্লেজ আবিষ্কৃত হয় যা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০-এর সময়কার। অনুমান করা হয়, প্রাথমিক অবস্থায় এই স্লেজ মানুষ দ্বারা টানা হলেও পরে ধীরে ধীরে তা কুকুর এবং মেরুষাঁড় দিয়ে টানা শুরু হয়। এও ধারণা করা হয় যে মানুষ দ্বারা টানা স্লেজে চড়েই কিছু মানুষ প্রথমবারের মতো আর্কটিক এবং অ্যান্টার্কটিক অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিল। স্লেজ শুধু বরফের ওপরেই নয়, ভিজে বা কর্দমাক্ত পথ, এমনকি শক্ত পাথুরে রাস্তাতেও চলাফেরা করত। সামনে থেকে কেউ পাথুরে রাস্তায় তেলজাতীয় কোনও তরল ছড়িয়ে দিত যাতে যানটির নীচের অংশটি শক্ত মাটি বা পাথরের ঘর্ষণে বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

দুর্গ (Fort) (খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০)



মানব সমাজে আত্ম-প্রতিরক্ষার ধারণাটি হাজার হাজার বছরের পুরনো। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দুর্গ নির্মাণ থেকে শুরু করে আজকের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সবই এই ধারণারই ফসল। নিজের এবং পরিবার পরিজনদের সুরক্ষা দিতে মানুষ একসময় দুর্গ নির্মাণ করে ফেলে। প্রাচীন যুগে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রধানত তিন ধরনের দুর্গ তৈরি হত বলে মত প্রকাশ করেন। এক, মাটির প্রাচীরওলা দুর্গ; যেগুলো তৈরি হত দুর্গের চারপাশের পরিখা থেকে উত্তোলিত বালি মাটি দিয়ে। দুই, পাথরকুচি দ্বারা তৈরি অপেক্ষাকৃত দৃঢ় দুর্গ। তিন, ছোট বড়ো মাঝারি আকারের শক্ত পাথর দিয়ে রাজমিস্ত্রিদের দ্বারা তৈরি দৃঢ়তম দুর্গ। পুরনো ভেঙেচুরে যাওয়া দুর্গের জিনিসপত্র দিয়ে আবার নতুন দুর্গ তৈরি করে ফেলত তারা। তবে আধুনিক থেকে আধুনিকতর শৈলীযুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সবচেয়ে বেশি দুর্গের পরিচয় পাওয়া যায় ঐতিহাসিক যুগে।

মালবাহী যান (Travois) (খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০)



ট্রাভয় শব্দটি কানাডিয়ান ফ্রেঞ্চ; উৎপত্তি ফরাসি শব্দ ট্র্যাভেইল (Travail)। এটি ইংরেজি 'A' আকৃতির একটা কাঠের ফ্রেম যা প্রাথমিকভাবে কুকুরের পিঠে বেঁধে একস্থান থেকে অন্যস্থানে মালপত্র বহন করা হত। পরে অবশ্য অধিক মালপত্র বহনের প্রয়োজনে বন্য ঘোড়া, খচ্চর এগুলোকে পোষ মানিয়ে কুকুরের বদলে ব্যবহার করা হত। কারণ, গ্রীষ্মকালে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে কুকুরের গতি শ্লথ হয়ে পড়ত, আর কুকুরবাহী যানে কুড়ি থেকে ত্রিশ কেজি ওজনের বেশি ভার বহন করাও যেত না। ৭০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে সমতলভূমিতে বসবাসকারী নর্থ আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের মধ্যেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। ট্রাভয়ের কোণের দিকটা কুকুরের পিঠে বেঁধে দেওয়া হত আর দুদিকের দুটি লম্বা কাঠের টুকরো মাটি ছুঁয়ে থাকত। আড়াআড়িভাবে বাঁধা দুয়েকটি কাঠ বা গাছের ডালের ওপর ভার চাপিয়ে মালপত্র বহন করা হত। বিশেষত শিকার করা মৃত জীবজন্তু বা জ্বালানি কাঠ আহরণ করে এই বিশেষ যানে চাপিয়ে ঘরে ফিরত আদিমানবেরা। সঠিক অর্থে চাকা আবিষ্কারের পরে গাড়ি তৈরি হলেও আসলে গাড়িঘোড়ার ধারণা কিন্তু অনেক আগে ওই ট্রাভয় থেকেই জন্ম নিয়েছিল।

জুতো (Shoe) (খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০)



জুতো আবিষ্কারের স্বপক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদি বিষয়ে বেশ জটিলতা থাকলেও আমেরিকায় খুঁজে পাওয়া প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০-এর কাছাকাছি সময়ের জুতোকেই পৃথিবীর প্রথম জুতো হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালে অরেগন-এর ফোর্ট রক গুহায় প্রাচীনতম জুতোর সন্ধান মেলে। এগুলো সাধারণত গাছগাছড়ার শক্ত লতাপাতা, দড়িদড়া আর বন্য জীবজন্তুর চামড়া দিয়েই তৈরি করা হত বলে মনে করা হয়। একদল প্রত্নতাত্ত্বিক আদিমানবের পায়ের আঙুলের হাড় পরীক্ষা করে এও বলেন, যেহেতু হাড়ের ক্রমহ্রাসমান বৃদ্ধি এবং ক্রমবৃদ্ধিমান শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় সেহেতু প্রায় ৪০০০০ বছর পূর্বেও নিশ্চয়ই মানুষ জুতোর ব্যবহার জানত। সে জুতোর ডিজাইন ছিল আধুনিক জুতোর মতোই আর পা-কে সুরক্ষিত করে রাখে এমন সোলগুলো জুতোর সাথে দড়িদড়া দিয়ে বাঁধা থাকত।

বয়ন শিল্প (Woven Cloth) (খ্রিস্টপূর্ব ৬৫০০)

বন্য আদিমজাতি যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সভ্যতার শিখরের দিকে পা রাখতে শুরু করল। সে এখন আর কাঁচা



মাংস খায় না। নিয়ন্ত্রিত আগুন তাকে সে বর্বরতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। সে নিজস্ব প্রয়োজনে জুতো বানিয়েও পরতে শিখেছে। এখন জীবজন্তুর চামড়া গায়ে রাখতেও মন চায় না। সেই তাগিদেই একসময় সে কাপড় বুনতেও শিখে গেল। কাঠের ফ্রেমে লম্বালম্বিভাবে কিছু তন্তু বেঁধে আর কিছু আড়াআড়িভাবে ঢুকিয়ে কাপড় বুনত তারা।

মানুষ প্রথমবারের মতো জীবজন্তুর চামড়ার আঁশ দিয়ে তন্তু বানিয়ে কাপড় তৈরি করতে শিখল। কিন্তু তা তেমন টেকসই না হওয়ায় আস্তে আস্তে তাপ আর চাপের মাধ্যমে সেই তন্তু ব্যবহার করে সে সফলতার মুখ দেখল। ১৯৬২ সালে তুরস্কের ক্যাতালহয়ুক শহরে আদিমানবের কাপড় বোনার স্বপক্ষে প্রাচীনতম প্রমাণ মেলে। সে শহরে একটুকরো 'কার্বনাইজড ক্লথ'-এর সন্ধান মেলে যা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৬৫০০-এর সময়ের। কিন্তু সেটা ফ্ল্যাক্স (একটি বন্য ভূমধ্যসাগরীয় গাছ) না ভেড়ার পশমের তৈরি তা জানা যায়নি। তবে তার আগেই মিশরে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০-এর সময়কার একটুকরো লিনেন কাপড় খুঁজে পাওয়া যায়। মনে করা হয় যে তুরস্ক আর মিশরে খুঁজে পাওয়া কাপড়ের টুকরোগুলো একই জিনিস দিয়ে তৈরি। তবে বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করেও এই দ্বন্দ্বের নিশ্চিত অবসান করা সম্ভব হয়নি।

মানচিত্র (Map) (খ্রিস্টপূর্ব ৬৫০০)



প্রথম মানচিত্র তৈরি করার কৃতিত্ব কিন্তু ব্যাবিলনবাসীদের। পৃথিবীর আনাচে কানাচে দ্রুত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কেরও তখন দ্রুত বিকাশ হচ্ছে। অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে মানুষ বুঝতে পারল যে কোনও স্থানে দ্বিতীয়বার বা বারবার যেতে গেলে ওই জায়গার বিশিষ্ট স্থান বা দ্রষ্টব্যগুলোর অবস্থান যতটুকু সম্ভব সঠিকভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। ভাবনাচিন্তার ফসল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল মানচিত্র। ১৯৬১ সালে তুরস্কের ক্যাতালহয়ুক শহরে একটা দেওয়ালে আঁকা মানচিত্র আবিষ্কৃত হয় যাতে কিছু বাড়িঘর আর একটা আগ্নেয়গিরির চুড়ো নজরে আসে। মানচিত্রটির বয়স নির্ধারিত হয় প্রায় ৮৫০০ বছর। প্রসঙ্গত, পৃথিবীতে বহুদিন এই মানচিত্র নামক বস্তুটার সঠিক কোনও নীতি নির্দেশিকা ছিল না। শেষে ১৮৯১ সালে ‘ইন্টারন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল কংগ্রেস’ পৃথিবীর স্কেল ম্যাপের সবিস্তার বিবরণী প্রকাশ করে।

এরপর আগামী সংখ্যায়

দুর্লভ ইলিশ

অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়



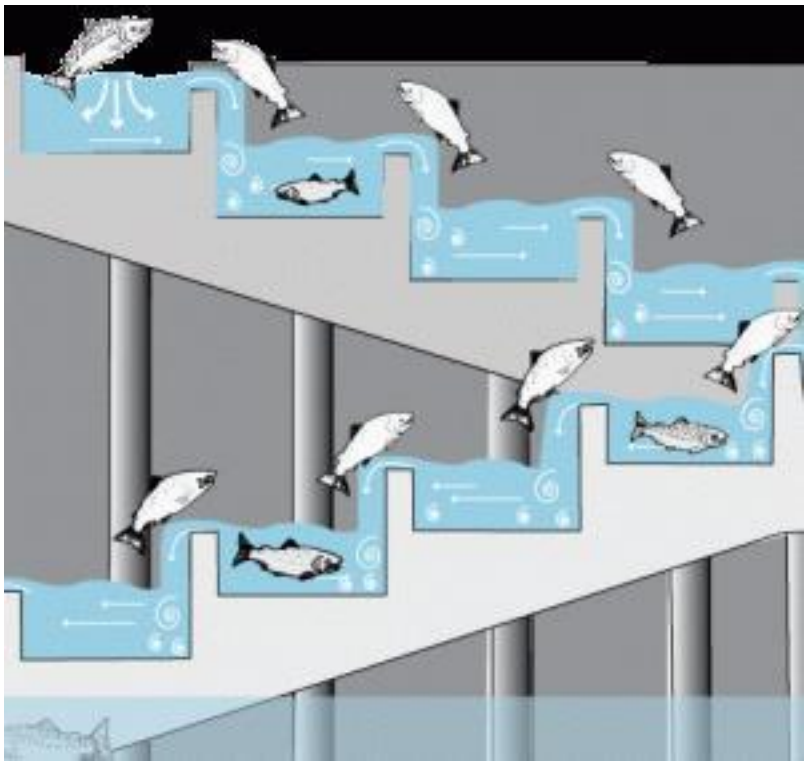
ইলিশ মাছ খেতে তোমাদের নিশ্চই খুব ভাল লাগে? বাঙালিদের অন্যতম প্রিয় মাছ ইলিশ। কিন্তু আজকাল বাজারে সে মাছের দাম দেখে হাত দেবে কার সাধ্য। চিরকাল এমনটি ছিল না। বাংলায় বর্ষার ভরা নদীতে ইলিশের প্রাচুর্য ছিল। ইলিশ খেতে খেতে তাতে অরুচি হয়ে যেত। সাধারণ গরীব মানুষ পান্তা ভাত আর ইলিশ ভাজা দিয়ে ভর পেট খেয়ে কাজে বেরিয়ে পরত। আজ মানুষ সংখ্যায় বেড়ে গেলেও ইলিশের সংখ্যা বিপদজনক ভাবে কমে আসছে।

ইলিশ মাছের বায়োলজিকাল নাম, Tenualosa Ilisha. তেলেগু ভাষায় এর নাম 'পোলাসা', তামিলরা আবার বলে 'উল্লাম'। এই মাছ খাবার জন্য বাঙালিরা পাগল, আর অন্য প্রদেশের লোকেও একে পছন্দ করে। মাছের বিশেষজ্ঞরা ইলিশকে 'shad' জাতীয় বলে বিবৃত করে থাকেন। তার মানে এরা সামুদ্রিক মাছ এবং এরা সাধারণত সমুদ্রে থাকলেও, ডিম পাড়ার জন্য মিষ্টি জলের সন্ধান করে। কাঁটা থাকলে বাঙালিদের বয়ে গেল। এই জাতীয় মাছে আবার প্রচুর কাঁটাও থাকে। কিন্তু কাঁটা বাছতে বাঙালি, অহমীয়া বা ওড়িয়াদের কোন জুড়ি নেই। রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্ট্যালিন নাকি ইলিশ বেজায় পছন্দ করতেন। ইলিশ মাছ খাওয়ার প্রচলন আছে ভারতের বাইরেও, যেমন ইরাক, ইরান, মায়ানমার, পাকিস্তান ইত্যাদি। ভাবছ বাংলাদেশেও তো আছে। আছে বই কী? বাংলাদেশের মানুষেরা সবাই বাঙালি যে। তাই তাদের কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ না করলেও চলে। যেহেতু বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, পদ্মা নদীর মিষ্টি জলে তাই সেখানেকার ইলিশ খুবই সুস্বাদু হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে বাজারে বাজারে বাংলাদেশের ইলিশের চাহিদা অনেক।

আমাদের সবার প্রিয় এই ইলিশের আকাল কেন পড়ল, আর আমরা কতখানি দায়ী এজন্য, সেই নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব। মাছের চরিত্র দেখে মৎস বিজ্ঞানীরা মাছকে দু ভাগে ভাগ করেছেন, পরিযায়ী ও অপরিযায়ী। ইলিশ মাছ পরিযায়ী মাছ। অর্থাৎ, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাড়ি দেয়। সমুদ্রের নোনা জলে এরা ডিম পাড়ে না বলে, সমুদ্র থেকে উজান বেয়ে নদীর মিষ্টি জলের তল্লাসে পাড়ি দেয়। উল্টো স্রোতে গা ভাসিয়ে এরা সাঁতার কেটে হাজার মাইল চলে যেতে পারে। ইলিশের এই নদী পথে জলস্রোতের বিপরীত গমন হতে থাকে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত। ইলিশ মাছ জলের ২০০ বা ৩০০ মিটার নিচে সাঁতার কাটে। জলের উপর ভাগে আসে না। তাই নদীর উৎস মুখে যখন জলের গভীরতা কমে আসে, তখন তারা কোন

উপযুক্ত স্থান দেখে ডিম পাড়ে আর ফিরতি পথ ধরে সমুদ্রের দিকে। এই সময়ে নদীর মিষ্টি জলের প্রভাবে ইলিশের স্বাদ খুব ভাল হয়। নদীতে এসেই ইলিশ গায়ে গতরে বৃদ্ধি পায়। ঠিক তখনি তারা মাছ ধরাদের জালে ধরা পড়ে। ডিম দেওয়ার আগেও ধরা পড়তে পারে। ডিম ফুটে বাচ্চা ইলিশ জন্মেই স্বাভাবিক নিয়মে নদী থকে সাগরের দিকে সাঁতার কাটতে থাকে। এটা সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে হয়। বাচ্চা ইলিশদের এই অবরোহণ হতে থাকে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমরা লোভী মানুষের দল, নদীতে জাল ফেলে, সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝেই নব্য যুবা ইলিশের দলকে ধরে শহরের বাজারে চড়া দামে বিক্রি করে দিই। ঠাকুমা বা দিদিমারা বলতেন, দুর্গা পুজো থেকে সরস্বতী পুজো অবধি ইলিশ খেতে নেই। এটা কুসংস্কার মোটেই নয়। এ সময়ে ইলিশের দল ডিম পাড়তে সাগর থেকে নদীতে পাড়ি দেয় বংশ বৃদ্ধির তাগিতে। তাই তাদের এ সময়ে ধরলে তাদের জীবন চক্র সম্পূর্ণ হয় না, মাছের ওজোন কম হয়, আকারেও ছোট হয়। ইলিশের আর একটা দ্বিতীয় দল সাগর থেকে নদীর উজান পথে চলতে থাকে জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত। বর্ষাকালে তারা আবার সাগরে ফিরে আসে। প্রথম দলটির সাথে এদের এখানেই পার্থক্য।

আমরা সভ্য মানুষেরা সেচের ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ তৈরি করবার জন্য নদীতে বাঁধ দিই। সেই বাঁধে বাধা পায় মাছের মুক্ত চলাফেরা। ফ্রান্সিস হ্যামিল্টন নামে এক ব্রিটিশ সাহেবকে ইংরেজ সরকার ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের সমীক্ষা ও পরিমাপের কাজে নিযুক্ত করে। পেশায় একজন চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও, হ্যামিল্টন সাহেবের প্রভূত উৎসাহ ছিল জীবন বিজ্ঞানে। তাই তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই কাজ সম্পন্ন করেন। তার সমীক্ষার ফল স্বরুপ ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মৎস সম্পদের উপর গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বাঁধ নির্মাণ এবং মাছ ধরবার ফাঁদগুলোকে দায়ী করেন মাছের স্বাভাবিক চলাফেরায় প্রতিবন্ধক হবার জন্য। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে তারের জাল আর বাঁধে ধাক্কা খেয়ে দলে দলে ইলিশ মাথায় আঘাত পেয়ে মারা যায় এবং এই কারণে মাছের ফলনও কমে যায়।



সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদেরা বাঁধ বানাবার সময় ‘ফিশ ল্যাডার’ বানাচ্ছেন, যাতে মাছেদের স্বাভাবিক চলাফেরা প্রতিহত না হয়। ফিশ ল্যাডার হচ্ছে একধরনের বৈকল্পিক পথ, জলের মুল ধারার থেকে পৃথক। এটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যে বাধাহীন ভাবে মাছ স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতার কাটতে পারে। ফারাক্কা বাঁধ বানাবার আগে নাকি ইলিশ মাছ পাটনা ছাড়িয়ে এলাহাবাদ পর্যন্ত পাওয়া যেত। আজ সেই ইলিশ গঙ্গায় পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠেছে। তাই সাগর ও গঙ্গার সঙ্গম স্থল ডায়মন্ড হারাবারের ইলিশেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। আশা করা যায় ফিস ল্যাডারের সাহায্যে ইলিশ মাছের সংখ্যা বাড়ানো যাবে। সেই সাথে অসময়ে ইলিশ মাছ জালে ধরাও বন্ধ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

হাতির চেয়ে বড়ো স্থলচর প্রাণী নেই কেন

সুজিতকুমার নাহা



হাতির চেয়ে বড়ো ডাঙার জন্তু অমিল কেন তার জবাব দিতে বসে প্রথমেই মনে পড়ল গ্যালিলিওর কথা। গ্যালিলিও বলেছিলেন, "একটি ছোটো কুকুর পিঠে একই আকৃতির দুই বা তিনটি কুকুর বইতে পারে। সন্দেহ জাগে, একটি ঘোড়া নিজের সাইজের মাত্র একটি ঘোড়াকেও বহন করতে পারে কিনা।"

ভার বইবার ব্যাপারে কুকুরের তুলনায় ঘোড়াকে হেয় করার পেছনে গ্যালিলিওর সঙ্গত কারণ ছিল। আসলে, প্রাণীদের আকার বৃদ্ধির সাথে মাথা চাড়া দিতে থাকে কাঠামোগত দুর্বলতার সমস্যা। এজন্য অবশ্যই দায়ী স্কেলন।

নিশ্চয়ই ভাবছ, 'স্কেলন' আবার কী বস্তু --- খায় না মাখে ! জবাব পেতে অভিধান কিংবা পরিভাষাকোষ হাঁটকে লাভ নেই, শব্দটা কোথাও খুঁজে পাবে না। সাসপেন্সে না রেখে রহস্য বরং ফাঁস করেই দিই। নেহাত দায়ে পড়ে শব্দটা এক্ষুনি তৈরি করলাম **scaling**-এর পরিভাষা হিসেবে। ইংরেজি **scale (noun)**-কে বাংলায়ও 'স্কেল' এবং **scale (verb)** কে 'স্কেলিত' বলা চলতে পারে। খটোমটো লাগছে? কী আর করা যাবে, বাংলায় কখনও চর্চা হয়নি এমন একটি বিষয়ে আলোচনা করতে হলে লেখক ও পড়ুয়া দু'জনকে কিঞ্চিৎ ঝক্কি তো পোহাতেই হবে !

যাই হোক, গ্যালিলিওর বক্তব্যের তাৎপর্য স্পষ্ট হবে পরের আলোচনা থেকে।

লম্বায় **a** ও চওড়ায় **b** হলে একটি আয়তাকার বারান্দার ক্ষেত্র (এরিয়া) হবে **ab** । লম্বা চওড়া দুটোই **k** গুণ করে বাড়ালে ক্ষেত্র বেড়ে হবে $\mathbf{k^2ab}$ । কাজেই বলতে পারি, ক্ষেত্র স্কেলিত হয় দৈর্ঘ্যের বর্গ বা দ্বিতীয় ঘাতে (**area scales as square of length**)। অনুরূপে বলা যায়, আয়তন স্কেলিত হয় দৈর্ঘ্যের ঘন-তে বা তৃতীয় ঘাতে (**volume scales as cube of length**)।

প্রথমেই দু'টি কথা বলা দরকার। (এক) আকারের সাথে যেহেতু প্রাণীদেহের ঘনত্ব তেমন কিছু পাল্টায় না, তাই আয়তনের পরিবর্তে 'ওজন স্কেলিত হয় দৈর্ঘ্যের ঘনকে' লিখলেও ভুল হবে না। (দুই) হাড়ের সহন ক্ষমতা বা হাড়ের জোর (বোন স্ট্রেংথ) হাড়ের ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় বলতে পারি 'হাড়ের জোর স্কেলিত হয় দৈর্ঘ্যের বর্গে।'

মাপ (ডাইমেনশন) বাড়ার সাথে প্রাণীর ওজন এবং হাড়ের জোর দুই-ই বাড়ে। কিন্তু ওজন বাড়ার সাথে হাড়ের জোর সমান তালে তো বাড়েই না, বরং পিছিয়ে পড়তে থাকে অতি দ্রুত। কী বলতে চাইছি তা স্পষ্ট হবে উদাহরণ দিলে। মাপ দ্বিগুণ হলে ওজন **2x2x2** বা আটগুণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু হাড়ের জোর বাড়ে মাত্র **2x2** বা চারগুণ। আবার মাপ তিনগুণ হলে ওজন যেখানে 27 গুণ বাড়ে সেখানে হাড়ের জোর বাড়ে মোটে 9 গুণ।

আলোচনা থেকে বোঝা গেল ছোটো প্রাণীর চেয়ে বড় প্রাণীর হাড় তুলনামূলকভাবে কমজোরী। স্পষ্ট হল কুকুর ও ঘোড়ার বহন ক্ষমতা নিয়ে গ্যালিলিওর মন্তব্যের কারণ।

বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপজনিত তাপের উৎপাদন ও বর্জনও বিশালদেহীদের পক্ষে সমস্যার। তাপের উৎপাদন প্রতিটি কোষে (অর্থাৎ আয়তনে) আর তাপের বর্জন ত্বকে (তল বা সারফেসে)। অর্থাৎ, উৎপাদন স্কেলিত হয় দৈর্ঘ্যের ঘন-তে কিন্তু বর্জন স্কেলিত হয় দৈর্ঘ্যের বর্গে।এই স্কেলন তারতম্য তাপের উৎপাদন ও বর্জনের সামঞ্জস্য রক্ষায় বাধার সৃষ্টি করে।

বিপুল ওজন বইনোপযোগী হাড়ের অপ্রাপ্যতা এবং বিপাকীয় তাপ যথাযথভাবে বর্জনে অক্ষমতা --- এই জোড়া সমস্যাই স্থলচর প্রাণীদের আকারের উর্দ্ধসীমা বেঁধে দিয়েছে। তাই হাতির চেয়ে বৃহদাকার স্থলচর প্রাণী অমিল।

দু-মুখো দর্পণ

সুমন পাল

একটি পরিচিত দৃশ্য দিয়ে শুরু করা যাক এবং যেটা আমাদের জন্য ইতিবাচক। এটা পুলিশের পদ্ধতিগত একটি অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট। একটি উজ্জ্বল ঘর যেখানে একজন অপরাধীর অপরাধের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আর তার একটি সংলগ্ন অন্ধকার ঘরে, পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা কফি বা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞাসাবাদের কার্যধারা পর্যবেক্ষণ করছেন। এই দুটি ঘরের মধ্যের সাধারন দেওয়ালে যে আয়নাটি থাকে, যার পিছনে পুলিশের কর্মকর্তা নিজে মেঘনাদ হয়ে সন্দেহভাজনের জিজ্ঞাসাবাদ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন, সেটি কিভাবে সম্ভব হয় সেটাই আলোচ্য (চিত্র 1)।



জিজ্ঞাসাবাদ ঘর। পিছনের আয়নার প্রকৃতি হল দুমুখো। আয়নার পিছনে অফিসাররা এই জিজ্ঞাসাবাদ দেখতে পারেন।

আরেকটি ঘটনা লক্ষ করা যাক যেটা বেশির ভাগ সময়ই নেতিবাচক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন একটা প্রচলন হয়েছে যে, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যে আধুনিক পোশাক-আশাক বাজারে এসেছে তা অত্যাধুনিক মল-এ বিক্রি হচ্ছে। সেখানে অনেক আইটেম থেকে পছন্দ করাটা সত্যি খুব সহজ। শুধু তাই নয়। এই জাতীয় শপিং মলগুলিতে থাকছে ট্রায়াল রুম। সেখানে পোশাকগুলি পরিধান করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফিটিংস সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কেনার ব্যাপারে। আর এখানেই একটু গোলমালের খবর শোনা যায় মাঝেমাঝেই। সাম্প্রতিক অতীতে, মহিলাদের পোশাক পরিবর্তনের ট্রায়াল রুমে কিছু অসাধু লোক ব্যবহার করছে এক বিশেষ জাতীয় আয়না (দুমুখো আয়না) (চিত্র 2)। এছাড়াও টয়লেট, বাথরুম, হোটেল রুম, বিশ্রাম কক্ষ ইত্যাদিতে অসৎ উদ্দেশ্যে গোপনে ব্যবহার করা হচ্ছে এই বিশেষ জাতীয় আয়না (চিত্র 3)। কিন্তু আমাদের মধ্যে কজন নিশ্চিত করে জানি যে আপাতদৃষ্টিতে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা সাধারণ আয়না বাস্তবে একটি 'সাধারণ' আয়না নাকি আসলে একটি 'দুমুখো' আয়না? এটা ঠিক যে শুধু একনজর দেখেই দুটোর মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। কিন্তু এটা ভীষণই জরুরি। সুতরাং, কীভাবে আমরা নিশ্চিত হব এবিষয়ে? সেটাও বিবেচ্য।

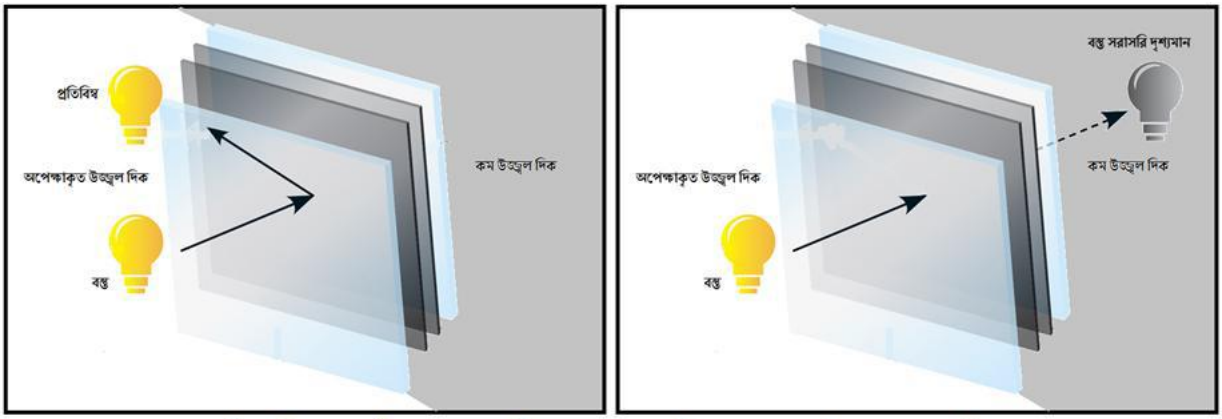


যে আয়নাটি আংশিক ভাবে প্রতিফলনে সক্ষম এবং আংশিক ভাবে স্বচ্ছ সেটিই আসলে একটি দুমুখো আয়না। যখন এই আয়নার একপাশ উজ্জ্বল ভাবে আলোকিত রাখা হয় এবং অন্যদিকটি অন্ধকার থাকে, তখন অন্ধকার দিক

থেকে আলোকিত দিক দেখা যায় কিন্তু বিপরীত দিক থেকে কিছু দেখা যায়না। কিভাবে করা হয় এটি? আয়নার কাচকে একটি পাতলা এবং প্রায় স্বচ্ছ ধাতু - সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম-দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। এই প্রতিফলক তলের প্রলেপ এতটাই পাতলা করা হয় যে এটিকে একটি অর্ধ-ধাতব (half-silvered) পৃষ্ঠ বলা হয়ে থাকে। এর নাম এরকম half-silvered বলা হয় এই জন্য যে প্রতিফলক তলের অণুর আচ্ছাদন এতটাই পাতলা যে শুধুমাত্র প্রায় অর্ধেক অণু প্রয়োজন আয়নাটিকে একটি অস্বচ্ছ আয়নায় পরিণত করতে। অর্ধ-ধাতবপৃষ্ঠ, এর ওপর যে আলো আপতিত হয়, তার প্রায় অর্ধেক তার পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত করে প্রথম মাধ্যমেই ফিরিয়ে দেয় এবং বাকি অর্ধেক উল্টোদিকে প্রতিসৃত করে দেয়।



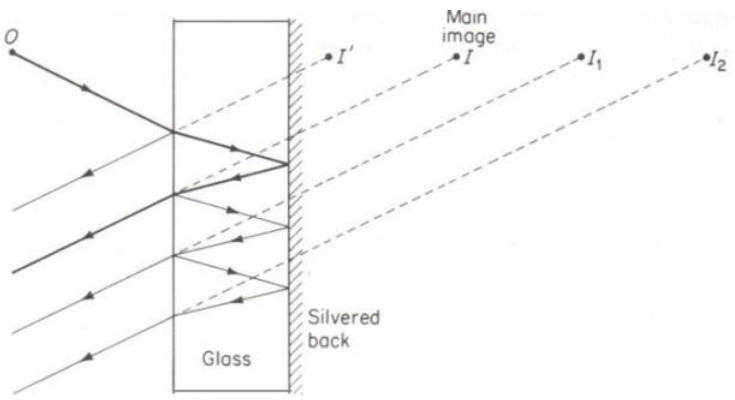
সাধারণ একটি আয়নার সাথে এর তফাত তাহলে কোথায়? কাচের ওপর রূপা, টিন বা নিকেল ধাতুর প্রলেপ দিয়ে সাধারণ আয়না তৈরি করা হয়। আর ধাতুর বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা যাতে জারণ না হয়ে যায় তাই তামার একটি স্তর যোগ করা হয় বা রং-এর একটি স্তর প্রয়োগ করা হয়। এতে দুটো দিক বজায় থাকে - এক, প্রতিফলক প্রলেপ রক্ষা পায়, এবং দুই, এটা নিশ্চিত করা যায় যে সব আলো প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবে-যার অর্থ হল এটি একটি নিয়মিত আয়নার মতো আচরণ করবে। তাহলে এটা বলা যায় যে, দ্বিমুখী আয়নার কলাকৌশল লুকিয়ে রয়েছে এর উৎপাদন এবং যথোপযুক্ত আলোকসম্পাতের ওপর।



চিত্র 5 : একটি দুমুখো দর্পণে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরনের প্রক্রিয়া

একটি উজ্জ্বলতর ঘরে এটা একটি আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক আয়না হিসেবে কাজ করে যখন বিপরীত দিকে অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল ঘর থাকে (চিত্র 5)। যারা উজ্জ্বলতর ঘরে থাকবে তারা তাদের নিজস্ব প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে - অর্থাৎ এটা সাধারন আয়নার মতো আচরণ করবে; আর যারা অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল ঘরে থাকবে তারা আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখতে পাবে - অর্থাৎ এটা একটা সাধারণ স্বচ্ছ জানালার মতো আচরণ করবে।

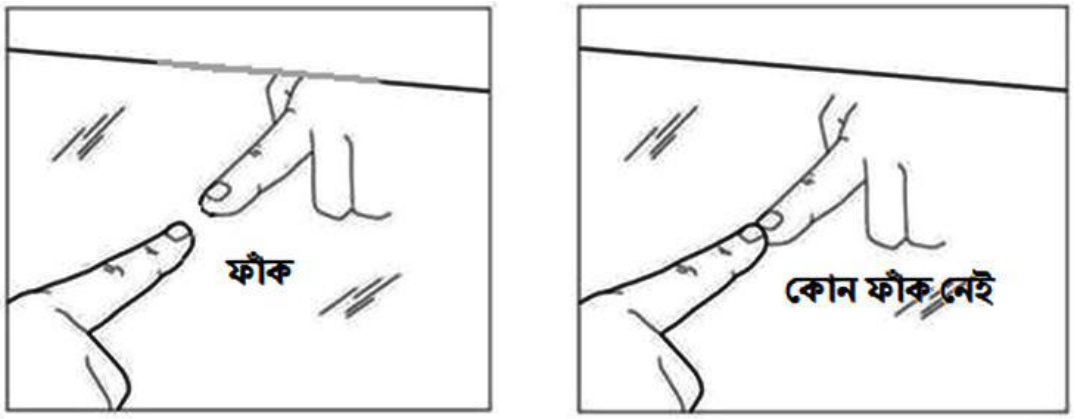
এখন প্রশ্ন হল, কীভাবে চেনা যাবে এই দুমুখো দর্পণকে? সাধারন আয়নায় সাধারনত 1 mm থেকে 5 mm পর্যন্ত বেধ হয়, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেশি হতে পারে। এই রকম পুরু একটি কাচের স্ল্যাবের পিছনে ধাতব প্রলেপ (সাধারণত রূপা, টিন বা নিকেল ধাতু) থাকায় এই আয়নায় বহু প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হতে পারে। কাচের সামনের



চিত্র 6 : একটি পুরু দর্পণে বহু প্রতিবিম্ব তৈরির প্রক্রিয়া।

তল থেকে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে একটি প্রতিবিম্ব গঠন করবে (I′) (চিত্র 6); আলোর অপর অংশ কাচ মাধ্যমে প্রতিসৃত হয়ে ধাতব প্রলেপ অংশ থেকে প্রতিফলিত হবে এবং পুনরায় বায়ু মাধ্যমে প্রতিসৃত হয়ে দ্বিতীয় প্রতিবিম্ব গঠন করবে (I)। এই দ্বিতীয় প্রতিবিম্বটিই উজ্জ্বলতম এবং এটিই আমরা দেখে থাকি। প্রথম প্রতিবিম্বটি তৈরি হয় খুব কম পরিমান আলোকরশ্মির প্রতিফলনে আর তৃতীয় (I_1) বা চতুর্থ (I_2) প্রতিবিম্বের উজ্জ্বলতাও কমে যায় কারন আয়নার প্রথমতল থেকে কাচ মাধ্যমে আলোর খুব সামান্য অংশই প্রতিফলিত হয়। ফলে এভাবে তৈরি হওয়া প্রতিবিম্বগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচরে সাধারনত আসে না। এখন, কোন একটি বস্তু (বা কিছু না পেলে নিজের হাতের আঙ্গুল) যদি তির্যকভাবে আয়নায় স্পর্শ করানো যায়, তাহলে উৎপন্ন প্রতিবিম্ব ও বস্তুর মধ্যে একটি ফাঁক পরিলক্ষিত হয় (চিত্র 7)।

অপরদিকে, দুমুখো আয়নার বেধ তুলনামূলক ভাবে কম এবং গঠনে আগেই বলা হয়েছে যে ধাতব প্রলেপ হল h a l f -s i l v e r e d ;ফলে তুলনামূলক ভাবে আলোর একটি বড় অংশ আয়নার মধ্যে দিয়ে প্রতিসৃত তথা নির্গত হয়ে যায়; আর উৎপন্ন প্রতিবিম্ব ও বস্তুর মধ্যে কোন ফাঁক পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাৎ, সহজ এই যান্ত্রিক উপায়েই আমরা বুঝে ফেলতে পারি যে আয়নাটি সাধারন নাকি দুমুখো।



চিত্র 7 : একটি সাধারন ও একটি দুমুখো দর্পণে দর্পণে উৎপন্ন প্রতিবিম্ব (ফাঁকযুক্ত ও ফাঁকবিহীন)।

দুমুখো আয়নাকে পাবলিক এলাকায় এবং জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে, পরীক্ষামূলক গবেষণায়, নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করা যেতেই পারে। এর ছোট সংস্করণ মাঝে মাঝে সিকিউরিটি ক্যামেরার ক্ষেত্রে-যেখানে ক্যামেরা একটি লুকোনো জায়গায় রাখা প্রয়োজন, টেলিপ্রম্পটার-এর ক্ষেত্রে - যেখানে একজন উপস্থাপক একটি চলচ্চিত্র বা টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে সরাসরি অভিক্ষিপ্ত লেখা থেকে পাঠ করবেন, ব্যবহার করা হয়।

পরিশেষে, মানব মনের জটিল কুটিল খেলার অংশে আমরা প্রবেশ না করে ধরেই নিলাম যে কিছু অসাধু লোক সমাজে চিরকালই থাকবে (যদিও আদর্শগত দিক থেকে না থাকাই বাঞ্ছনীয়), সচেতন হতে হবে আমাদেরই নিজ স্বার্থে ও নিজ নিজ দায়িত্বে যাতে এর কু-ব্যবহারে আমরা বিপদগ্রস্ত না হয়ে পড়ি।

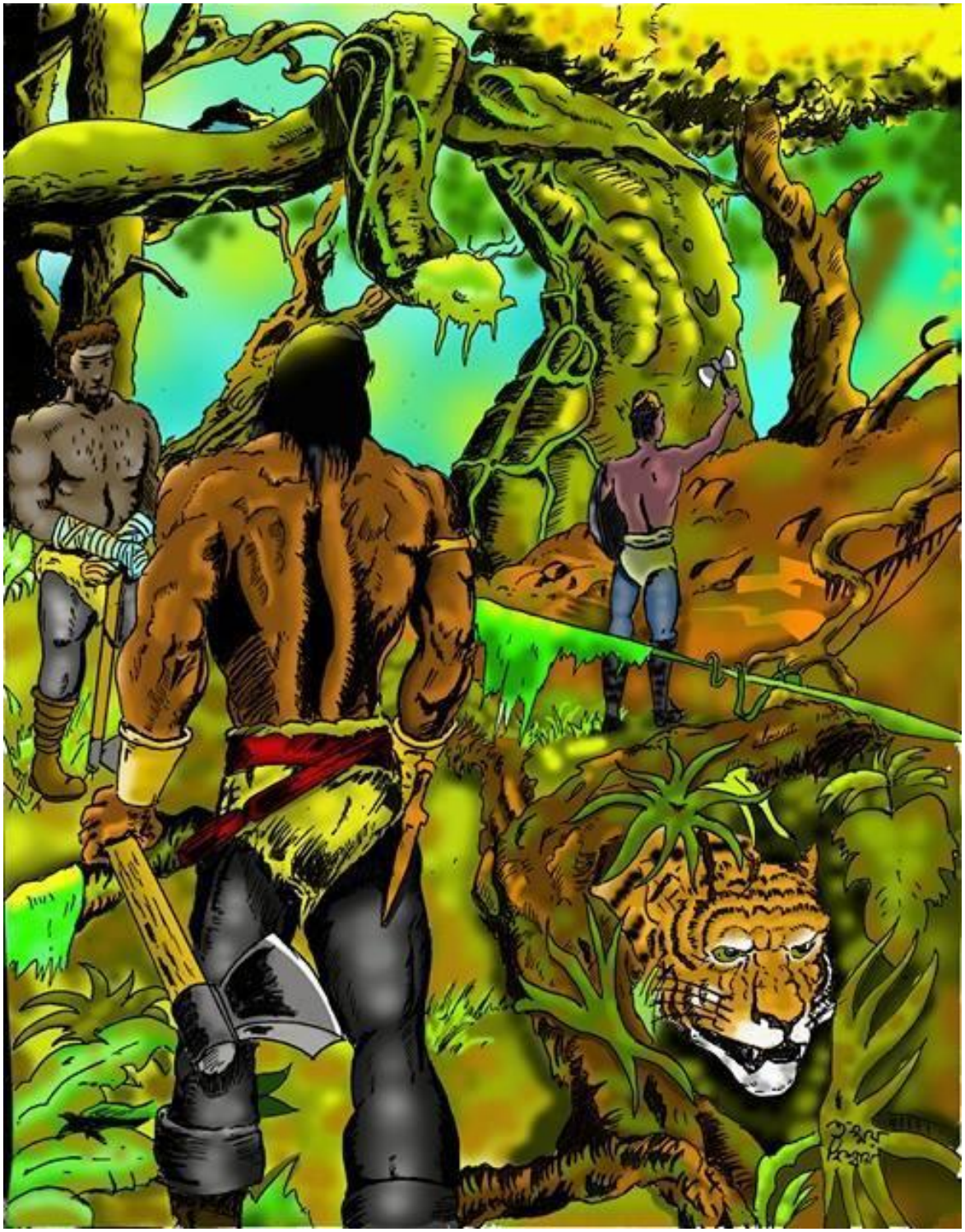
তথ্যসূত্র

১। https://en.wikipedia.org/wiki/One-way_mirror
২। http://science.howstuffworks.com/question421.htm
৩। http://mentalfloss.com/article/12969/how-do-two-way-mirrors-work

E-mail: paul_suman30@yahoo.co.in

আইওই বৃক্ষের কিংবদন্তী

রাখি পুরকায়স্থ



শিলং শহর থেকে প্রায় আট-দশ মাইল পশ্চিমে রয়েছে একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। মেঘালয়ের খাসি জনজাতিদের লোককথাগুলিতে বিখ্যাত সেই পাহাড়টির নাম বার বার ফিরে আসে। পাহাড়টি "আইওই বৃক্ষের পর্বত" নামেই লোকমুখে পরিচিত। কালের প্রবাহে তার একসময়ের দুনিয়াজোড়া খ্যাতি এখন প্রায় হারিয়ে গেছে, তবু আজও জায়গাটার নৈসর্গিক রূপ-প্রাচুর্য সকলের মন কেড়ে নেয়। পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ

ভাসানো নীল আকাশের চাঁদোয়ার নীচে সেই টিয়া-সবুজ রঙ পাহাড়ের ঢালে সাজানো রয়েছে সমৃদ্ধ গ্রাম ও জুম চাষের ক্ষেত।

পাহাড়টির পাদদেশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা পথে বয়ে চলেছে উমিয়াম নদী। খাসি ভাষায় উমিয়াম নদীর অর্থ বিলাপকারী বা কাঁদুনে নদী। লোকে বলে, পাহাড় ও তার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর জায়গা। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল সুফলা চাষের জমি। কাছের ঘন বন-জঙ্গল থেকে আসত প্রচুর মূল্যবান কাঠ। এছাড়াও, অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য জায়গাটা ছিল বিখ্যাত।

শোনা যায়, সেই সবুজ বনের ভেতরকার ফাঁকা জায়গায় ঘুরে বেড়াত পরী-হুরির দল। সুগন্ধ ছড়ানো রঙিন ফুলের মাঝে বাসা বাঁধত বিচিত্র বর্ণের পাখিরা। প্রাচীনকালের সেই মানুষগুলির কাছে এমনটিই ছিল 'আইওই বৃক্ষের পর্বত'।

সেই পাহাড়ের মাথায় গজিয়ে উঠেছিল এক অবিশ্বাস্য আয়তনের গাছ-আইওই গাছ-যা কিনা জঙ্গলের অন্যান্য বিশাল গাছগুলির মাথা ছাড়িয়ে সুদূর নীল আকাশকে ছুঁয়েছিল অনায়াস দক্ষতায়। প্রকৃতপক্ষে গাছটি ছিল এক অনন্য প্রজাতির উদ্ভিদ, যার প্রকৃতি মানুষের কাছে অজানা। চারপাশে বহুদূর ছড়িয়ে থাকা গাছটির মোটা-মোটা ডালপালা ছিল ঘন পাতায় ঢাকা। সেই ঘনপাতার বেড়াজাল ভেদ করে সূর্যরশ্মি এসে মাটিকে ছুঁতে পারত না।

বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে থাকা আইওই গাছের করাল ছায়ার নিচে শস্যশ্যামলা এই জায়গাটা একসময় হয়ে উঠেছিল ঊষর, অনুর্বর ও নিষ্ফলা।

এদিকে গাছটির খ্যাতি ক্রমশ নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বিভিন্ন দেশ থেকে হরেক জাতের মানুষ এসে গাছটি দেখবার জন্য ভিড় জমাল। তবে, গাছটির ডাল ভাঙবার বা বাকলে সামান্যতম আঁচর কাটবার সাহসও কিন্তু কেউ দেখাত না। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত, গাছটিতে বসবাস করে কোন এক অজানা শক্তিশালী দেবতা, যাকে রুষ্ট করলে অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ ধ্বংসের কবলে পড়তেই হবে।

যুগের পর যুগ আইওই গাছটি ক্রমাগত বাড়তে লাগল, আর ততই বাড়োতে লাগল তার অমঙ্গলকারী ছায়া। সেই গাছের নীচে ছায়াঢাকা অনুর্বর-নিষ্ফলা জমির পরিমাণও তাই বেড়ে উঠল ক্রমাগত। মানুষ আর সেই পাহাড়ের ঢালে বসবাস করতে পারছিল না। চারপাশের বহু মাইল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে চাষবাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এককালের সমৃদ্ধ পরিবারের মানুষগুলি পলাতক আসামির মত সেই সদা-অনুসরণকারী অমঙ্গলের ছায়া থেকে পালিয়ে দিগ্বিদিকে বিদেশ বিভুঁইয়ে ঘরছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যে পাহাড়ি বনপথ ও মনোরম বন ভরে থাকতো উল্লসিত কণ্ঠস্বর ও শিশুদের সরল হাসির শব্দে, তা ক্রমশ পরিণত হল ড্রাগনের গোপন আস্তানায় কিংবা হিংস্র বন্য প্রাণীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে। সেখানে সাধারণ মানুষেরা ঘোরাঘুরি করতে ভয় পেত।

ক্রমশ এই গাছের প্রভাবে গোটা বিশ্ব এক ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হল। অবশেষে, আসন্ন সর্বনাশ থেকে বিশ্বকে বাঁচাবার তাগিদে সকল মানবজাতির এক দরবার আহ্বান করা হল, যাতে পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটা উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। দীর্ঘ, গুরুগম্ভীর আলোচনার পর স্থির হল, একদল সাহসী ও সুদক্ষ কাঠুরেকে পাহাড়টিতে পাঠানো হবে। তারা পাহাড় চূড়ায় পৌঁছে আইওই গাছটিকে কেটে ফেলবে। এতে সূর্যালোক আবার ফিরে আসবে পৃথিবীর মাটিতে।

তারপর সেই কাঠুরের দল যাত্রাপথের সব বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে, তারপর গাছে অধিষ্ঠিত অজ্ঞাত দেবতার ক্রোধানলে ভস্ম হবার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, গভীর অরণ্য ভেদ করে পাহাড় বেয়ে চূড়ার দিকে উঠতে উঠতে শেষমেশ আইওই গাছটির গোড়ায় পৌঁছোতে সক্ষম হল। একটুও সময় নষ্ট না করে, প্রবল পরিশ্রম ও দক্ষতার সাথে ধারালো কুঠার দিয়ে তারা গাছটি কাটবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

গাছটির বাকল ছিল ভীষণ কঠিন। দেখা গেল, রাতের অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত তীব্র প্রচেষ্টা চালিয়েও কেবলমাত্র বাকলের সামান্য নীচ পর্যন্ত কাটতে তারা সক্ষম হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে, তারা পরস্পরকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে গাছটির আশেপাশে তখনও পর্যন্ত সেই অজানা দেবতার ক্রোধের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়নি, আর সে-কারণেই হয়তো তাদের ওপর দুর্ভাগ্যের কালো ছায়াও নেমে আসেনি। মনকে এসব কথা বুঝিয়ে তারা সকলে বিশ্রাম নিতে গেল।

পরদিন সকালে খুব তাড়াতাড়ি তারা কাজের জায়গায় হাজির হল। কিন্তু ফিরে এসে তারা যা দেখল তাতে তারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। দেখা গেল, আগের দিন প্রচন্ড পরিশ্রম করে গাছের যতটুকু তারা কাটতে পেরেছিল তার চিহ্ন একেবারে উধাও হয়েছে। আশ্চর্যভাবে গাছটির কান্ড আগে যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটিই হয়ে গেছে- যথেষ্ট কঠিন ও তাতে একটি আঁচড়েরও দাগ নেই!

কাঠুরেরা বড়ো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। তারা ফের গাছটির ধারে-কাছে ঘেঁষতে ভয় পেতে লাগল। তারা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গেল, এলাকাটি ভূতগ্রস্ত। কিন্তু দলের মধ্যে কয়েকজন কাঠুরে ছিল সঙ্কল্পে অবিচল। ভীত সন্ত্রস্ত সাথীদের তারা স্মরণ করিয়ে দিল, মানবজাতি এক ভয়ানক বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাকিরা তাদের হারানো সাহস ফিরে পেল। সকল কাঠুরে আবার একজোট হয়ে গাছটি কাটবার জন্য জোর কদমে কাজে লেগে পড়ল। সারাদিন তারা কঠোর পরিশ্রম করলো, কিন্তু পরদিন সকালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো! দেখা গেল, গাছটি আবারও কী এক আশ্চর্য জাদুবলে তার সব ক্ষত সারিয়ে ফেলেছে।

কাঠুরেরা কিন্তু গাছের ওপর হামলা চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, দিনের বেলা তারা যতই ধৈর্য সহকারে গাছটিকে কাটতো, রাতের বেলায় কী এক আজব উপায়ে গাছটি আবার আরোগ্য লাভ করতো। দিন-দিন কাঠুরের দল হতবুদ্ধি ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগলো। সেইসাথে, এমন অদ্ভুত একটি অঞ্চলে বসবাসের কষ্টগুলিও যেন ক্রমশ তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠছিল। শেষ পর্যন্ত তারা সেই ভৌতিক এলাকা থেকে পালিয়ে তাদের জ্ঞাতি-ভাইদের কাছে নিরাপদ স্থানে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। নিত্যদিন এমন অতিপ্রাকৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে থাকবার চাইতে ছায়াঢাকা বিশ্বের অনিবার্য পরিণতি সহ্য করাও যেন তাদের কাছে বেশি ভালো মনে হচ্ছিল।

কাঠুরেরা যখন এইসব কথাবার্তায় ব্যস্ত, ঠিক তখন একটি ধূসর রঙের ছোট্ট খাসিয়া টুনটুনি পাখি, কা ফ্রেইৎ, কিচিরমিচির করতে করতে তাদের পাশে এসে বসল। ধারে বসেই পাখিটি কাঠুরেদের সাথে কথা বলতে শুরু করল। সকলকে অবাক করে দিয়ে পাখিটি কাঠুরেদের বলল, সে তাদের সাহায্য করতে এসেছে। কাঠুরেদের সাহস বজায় রাখতে আহ্বান জানাল সে।

কা ফ্রেইতের এমনধারা কথা শুনে কাঠুরেরা নিস্তেজ অবস্থাতেও না হেসে থাকতে পারলো না। বনের সবচেয়ে ছোটো পাখিটা নাকি গাছ কাটতে সাহায্য করবে বিশ্বের সেরা বাছাই কাঠুরেদের!

কাঠুরেদের পরিহাস করতে দেখে টুনটুনি তাদের আরও কাছে এসে আগের চাইতেও উচ্চস্বরে কিচিরমিচির করতে লাগলো। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সে কাঠুরেদের বলল, “এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে আপনারা মহান ও জ্ঞানী ব্যক্তি, আর সে কারণেই তো এমন একটি মহৎ কর্ম সম্পাদনের জন্য আপনাদের মনোনীত করা হয়েছে। তবে মনে রাখবেন, আপনারা কিন্তু সেই গুরুদায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ, আমি যখন আপনাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চাইলাম,আপনারা আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টায় মেতে উঠলেন। এ কথা সত্যি, আমি পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো, কিন্তু জঙ্গলের গোপন রহস্য জানার ব্যাপারে তা কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আইওই গাছটি সফলভাবে কাটতে হলে আপনাদেরও কিন্তু জঙ্গলের সেই গোপন রহস্যটি জেনে নিতে হবে।”

টুনটুনি পাখির মুখ থেকে এমন কথা শুনে কাঠুরেরা খুব অবাক হয়ে গেল। তারপর সবাই মিলে কা ফ্রেইৎকে অনুরোধ করল জঙ্গলের সেই গোপন রহস্যটি তাদের জানাবার জন্য।

শেষমেশ কাঠুরেদের ওপর খুশি হয়ে কা ফ্রেইৎ তাদের অবাক করে দিয়ে জানাল, গাছটির এমন রাতারাতি আরোগ্যলাভের পেছনে কোন অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার হাত নেই - যেমনটা কাঠুরেরা অনুমান করেছিল! আসলে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনার পেছনে রয়েছে একটি বড় বাঘ- উ খ্ল্যা - যে কিনা প্রতি রাতে চুপচাপ এসে গাছের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানগুলি চেটে দেয় আর এর ফলে সকাল হবার আগেই গাছটি আবার আগের মত অবস্থায় ফিরে যায়। প্রকান্ড গাছটির অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়াময়তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শিকারের খোঁজে রোজ চুপিসারে ঘুরে বেড়ায় বাঘটি। তাই বাঘটি বেশ বুঝেছে, গাছটি কাটা পড়লে তার অশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। সে-কারণেই আইওই গাছটি কাটার সে ঘোর বিরোধী।

জঙ্গলের সেই গোপন রহস্য জানতে পারে কাঠুরের দল খুব উল্লসিত হয়ে উঠলো। উৎসাহিত হয়ে প্রবল উদ্দমে তারা গাছটির ওপর নতুন করে আক্রমণ হানতে শুরু করলো। ক্রমে রাতের অন্ধকার নেমে এল।

এবার কিন্তু কাঠুরেরা অন্যদিনের মত তাদের কুঠারগুলি নিজেদের সাথে নিয়ে বিশ্রাম করতে গেল না। এর পরিবর্তে তারা অদ্ভূত একটি কান্ড করলো- তারা কুঠারের ধারালো প্রান্তটি বহির্মুখি করে গাছটির কান্ডে আটকে দিল।

সে রাতে বাঘটি আবার চুপিচুপি এল গাছের পাশে। এদিকে টুনটুনি পাখি যে কাঠুরেদের কাছে গোপন কথাটি ফাঁস করে দিয়েছে, তা কিন্তু বাঘটি একেবারেই জানে না। সে নিশ্চিন্ত মনে গাছের ক্ষত স্থান চাটতে লাগলো, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে কুঠারের ধারালো ফলকে তার জিভ কেটে গেল। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত জিভ নিয়ে আতঙ্কিত অবস্থায় বাঘটি আর্তনাদ করতে করতে দূরে পালিয়ে গেল। কাঠুরেদের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে বাঘটি কিন্তু আর সেখানে কখনও ফিরে আসেনি। এতে কাঠুরের দল নির্বিঘ্নে কাজ করবার সুযোগ পেল এবং সময়ের সাথে সফলভাবে আইওই গাছটি কেটে ফেলতে সক্ষম হল।

এভাবেই কা ফ্রেইৎ, ক্ষুদ্রতম এক পাখি, বিশ্বের মাটিতে পুনরায় সূর্যালোক ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে মানবজাতিকে সাহায্য করেছিল।

গল্পের উৎসঃ *'The Legend of Iei Tree' from "Folk-Tales of the Khasis" by Mrs. K.U.Rafy*



ভয়ানক এক রাতের গল্প

অমিত দেবনাথ

“রবিনসন, কত্তা তোমায় ডাকছেন।”

“জ্বালিয়ে খেলে,” আমি ভাবলাম। বিরক্তিকর এই লোকটা, মিঃ ডিকসন, ভুট্টার ব্যবসায়ী, বেইলি অ্যান্ড কোম্পানির ওডেসা এজেন্ট। “কি ব্যাপারে হে? নিকোলেইফ পলায়নের ব্যাপারে নতুন কোনও আইডিয়া, নাকি অন্য কিছু?”

“জানি না,” গ্রেগরি বলল, “সাহেব বেশ ভাল মুডে আছেন মনে হল, ব্যাবসার ব্যাপারেই বোধহয়। ওঁকে বসিয়ে রেখ না।” সুতরাং দুরু দুরু বক্ষে আমাকে ঢুকতে হল সিংহের গুহায় – থুড়ি, কর্তার ঘরে।

আগুনের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মিঃ ডিকসন দারুন কেতা নিয়ে, আমাকে দেখে তাঁর সামনের একটা চেয়ারে বসতে বললেন। “মিঃ রবিনসন, আপনার বুদ্ধি আর বিচক্ষণতার ওপর আমার পুরো ভরসা আছে। বয়স কম হলেও ভেতরটা আপনার খাঁটি।”

আমি সামনে ঝুঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি কৃতার্থ।

“অনর্গল রাশিয়ান বলতে পারেন নিশ্চয়ই,” তিনি বললেন।

উত্তরে আমি আরেকবার সামনে ঝুঁকলাম।

“আপনাকে একটা কাজ দেব,” তিনি বললেন, “আর এই কাজের ওপর আপনার প্রোমোশন নির্ভর করছে। এ কাজের জন্য অন্য কারোর ওপর নির্ভর করা যায় না, আর আমি এখন এখানে এমনভাবে ফেঁসে আছি, বুঝতেই পারছেন, নাহলে...”

“নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি করব,” আমি বললাম।

“চমৎকার! তাহলে কাজের কথায় আসা যাক। সলটেফ-এর দিকের রেললাইনটা সবে চালু হয়েছে, আমি ওডেসা ফার্মের কাজকর্ম ওই জেলায় নিয়ে যেতে চাইছি। আমার বিশ্বাস, এর জন্য খুব বেশি খরচ আমাদের হবে না। আপনি ট্রেনে করে সলটেফে চলে যান, গিয়ে মিঃ দিমিদফ নামে একজনের সঙ্গে কথা বলবেন, লোকটার অনেক জমিজমা আছে ওখানে। ওঁর সঙ্গে যতটা সম্ভব ঠিকঠাক কথাবার্তা চালাবেন, আমি আর মিঃ দিমিদফ দুজনেই চাইছি কাজটা যথাসম্ভব গোপন রাখতে, যতদিন না ওডেসাতে নতুন ফসল ওঠে।

আমি আমাদের ফার্মের খাতিরে কাজটা চাই, আর মিঃ দিমিদফ চাইছেন কুসংস্কার ভেঙে তাঁর কৃষির ফসল রপ্তানি করতে। আপনি আজ রাতেই রওনা হয়ে যান, ওখানে আপনার জন্য লোক থাকবে। আপনার খরচখরচার জন্য টাকা পেয়ে যাবেন। তাহলে সুপ্রভাত, মিঃ রবিনসন, আশা করি আমি আপনাকে যে সুযোগ দিয়েছি, তাতে আপনি সফল হয়ে ফিরবেন, কারণ এর ওপর আপনার অনেক কিছু নির্ভর করছে।"

বুক ফুলিয়ে ঘরে ঢুকে আমি বললাম, "গ্রেগরি, আমি একটা গোপন কাজে যাচ্ছি। হাজার হাজার পাউন্ডের কাজ, বুঝলে। তোমার ছোট পোর্টম্যান্টোটা দাও, আমারটাও লাগবে, আর ইভানকে বল প্যাক করে দিতে। এক জায়গায় যাচ্ছি, সেখানে একজন রাশিয়ান কোটিপতি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আর শোন হে, সিমকিনসের লোকজনদের কাউকে একটি কথাও বলবে না, পুরো কাজ কেঁচে যেতে পারে, মনে থাকে যেন। সাবধান।"

আমি শুরুতে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম কাজটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে, কাজেই আমি সারাটা দিন অফিসে ঘাপটি মেরে রইলাম, আমার হালচাল দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তা, আর সন্ধ্যের সময় আমি যখন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন অলক্ষ্য প্রহরী নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন, যে আমি স্ট্রং বক্সের সব জিনিসপত্র গ্রেগরির ছোট চামড়ার হাতব্যাগটায় ভরে দিলাম। সে আবার ইংরেজি লেবেল সেঁটে দিয়েছিল এর মধ্যে, যেটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। আমার একটাই আশা, যে এই "লন্ডন" বা "বারমিংহাম" লেখা লেবেলগুলো হয়তো কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না, অন্ততপক্ষে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী শস্য ব্যবসায়ী নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে না যে আমি কে বা আমার উদ্দেশ্য কি।

যথাযথ রুবল দিয়ে টিকিট কেটে আমি রাশিয়ান ট্রেনের মোটামুটি ভাল একটা কামরার এক কোণায় উঠে বসে ভাবতে লাগলাম আমার অত্যাশ্চর্য ভাগ্যের কথা। ডিকসনের এখন বয়স হয়ে গেছে, যদি আমি কাজটায় সফল হই,তবে...আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল একটা ছবি, যেন আমি কোম্পানির পার্টনার হয়েই গেছি। গাড়ির চাকার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ পালটে গেল "বেইলি, রবিনসন অ্যান্ড কোং", "বেইলি, রবিনসন অ্যান্ড কোং"-এর একঘেয়ে আওয়াজে, গানের সুরের মত সেই আওয়াজ কখন যেন মিলিয়ে গেল, যখন আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম। তখন যদি আমি জানতাম যাত্রা শেষে আমার জন্য কী অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে, তাহলে বোধহয় আরামের ঘুম আমার ছুটে যেত।

আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল কেউ যেন আমায় তীক্ষ্ণভাবে নজর করছে। আমার ভুল হয়নি। আমার উল্টোদিকের সিটের লম্বা, গাঢ় রঙা কালো চোখের একটা লোক খর চোখে আমায় মাপছে, এমনভাবে, যেন আমার ভেতরটা পর্যন্ত পড়ে নিচ্ছে। তারপর দেখলাম সে আমার ট্রাংকটা দেখছে।

"সর্বনাশ!" আমি ভাবলাম, "সিমকিনসের এজেন্ট মনে হচ্ছে! ওই গাধা গ্রেগরিটার ওই লেবেলগুলো লাগানোতেই কান্ডটা হল মনে হচ্ছে।"

আমি চোখ বন্ধ করলাম, কিন্তু আবার খুলতেই সোজা লোকটার চোখে চোখ পড়ে গেল।

"ইংল্যান্ড থেকে, তাই না?" বিশ্রি দাঁত বার করে হেসে লোকটা রাশিয়ান ভাষায় বলল।

"হ্যাঁ," আমি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে করতে বললাম, যদিও বিরক্তি লাগছিল আমার ব্যর্থতায়।

"বেড়াতে নিশ্চয়ই?" আবার প্রশ্ন।

"হ্যাঁ," ব্যস্ত হয়ে বললাম, "বেড়াতেই যাচ্ছি, অন্য কিছু না।"

"নিশ্চয়ই," লোকটার গলায় একটা রুক্ষ সুর লক্ষ করলাম, "ইংরেজরা বেড়াতেই যায়, অন্য কিছু না। ঠিক।"

লোকটার আচরণ রহস্যজনক বললে কম বলা হয়। হয় ব্যাটা পাগল, না হলে আমার মত একইরকম কোনও ফার্মের এজেন্ট, আর ও বোঝাতে চাইছে যে আমার ব্যাপারটা ও বুঝে ফেলেছে। দুটোর কোনওটাই সুখকর নয়। যাই হোক, আমি খানিকটা হালকা বোধ করলাম, যখন ট্রেনটা একটা নড়বড়ে শেডের নিচে এসে দাঁড়াল, এটাই এখন দ্রুত বেড়ে ওঠা শহর সলটেফের স্টেশনের কাজ করছে, যে শহরে আমাকে বলা হয়েছে ব্যবসা শুরু করে তার বানিজ্যকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত করাতে। আমি প্ল্যাটফর্মে নামার সময় প্রায় ভেবেই নিয়েছিলাম বাইরে একখানা বিজয়-তোরণ দেখতে পাব।

মিঃ ডিকসন বলেছিলেন আমার জন্য লোক থাকবে, আমি কিন্তু স্টেশনের গুটিকতক লোকের মধ্যে কোনও মিঃ দিমিদফকে দেখতে পেলাম না। হঠাৎই আমার পাশ দিয়ে একটা নোংরা, দাড়িগোঁফ না কামানো লোক হনহন করে চলে গেল, প্রথমে আমার দিকে, পরে আমার যত দুর্দশার মূল, সেই ট্রাংকের দিকে তাকাতে তাকাতে। লোকটা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল, কিন্তু একটু পরেই আবার ফিরে এল আমার পাশে, চলতে চলতেই ফিসফিস করে বলল : "একটু দূরত্ব রেখে আমার পেছন পেছন আসুন।" কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রচণ্ড গতিতে হেঁটে স্টেশন থেকে রাস্তায় নেমে এলাম। রহস্য আরও ঘনীভূত হল, যখন আমার ব্যাগ নিয়ে লোকটার পেছনে হেঁটে বাঁক ঘুরেই দেখলাম রাস্তার এক কোণায় একখানা ড্রস্কি - মানে ঘোড়ার গাড়ি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নোংরা মতন লোকটা দরজা খুলে ধরতে আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

"মিঃ দিমি..." আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই লোকটা চাপা গলায় বলে উঠল, "শ্ শ্ শ্! নাম নেবেন না, দেওয়ালেরও কান আছে। রাত্রে সব কিছু জানতে পারবেন।" বলেই সে বন্ধ করে দিল দরজা, তারপর লাগাম ধরে ছুটিয়ে দিল গাড়ি দারুণ জোরে, এত জোরে, যে আমি শুধু দেখতে পেলাম বাইরে আমার ট্রেনে দেখা সেই কালো চোখের লোকটা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, যতক্ষণ না আমরা চোখের আড়াল হয়ে গেলাম।

যেতে যেতে আমি পুরো ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করছিলাম। শুনেছিলাম রাশিয়ায় অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা অত্যাচারী হয়, কিন্তু এখন দেখছি উলটো ব্যাপার।এই মিঃ দিমিদফ লোকটা নির্ঘাত খুন-খারাপির আশঙ্কা করছে, যদি সে ফসল রপ্তানি করে, আর তার ফলে এখানে ফসলের দাম বেড়ে যায়। নিজের সম্পত্তি বিক্রি করবে, তাতেও এত ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কি অবস্থা! এদের অবস্থা তো আইরিশ জমিদারদের থেকেও খারাপ দেখছি! জঘন্য ব্যাপার! আর এঁর অবস্থাও তো খুব অভিজাত বলে মনে হচ্ছে না।নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতেই আমি বাইরের সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা আর আলুথালু, ময়লা পোশাকের লোকজন দেখছিলাম, ভাবছিলাম, গ্রেগরি বা আর কেউ সঙ্গে থাকলে ভাল হত, হঠাৎই খেয়াল করলাম লোকটা রাশ টেনে ধরল, তার মানে আমরা এসে গেছি।

ঠিক তাই। গাড়ি থেমে গেছে, আর সামনের ফোকর দিয়ে গাড়িওয়ালার ঝাঁকড়াচুলো মাথাটা দেখা যাচ্ছে।

"আমরা এসে গেছি, মাননীয় মহাশয়," আমাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করতে করতে বলল সে।

"মিঃ দিমি..." আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই আবার বাধা দিল সে, ফিসফিস করে বলল, " বাকি সব কিছু বলতে পারেন, কিন্তু নাম বলবেন না। এদেশে মুখ খোলা বারণ। সাবধান, হে মহান মানুষ।" বলে সে আমাকে একটা পাথর বাঁধানো পথ দিয়ে নিয়ে এল, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হল খানিকটা, সামনে একটা ঘর, তার দরজা খুলে বলল, "এখানে বসুন একটু সময়, আপনার জন্য একটু আহারের ব্যবস্থা হচ্ছে ।" তারপর বিদায় নিল সে, আমাকে একা সেই ঘরে রেখে।

"মিঃ দিমিদফের বাড়িঘর যেমনই হোক না কেন," আমি ভাবলাম, "তাঁর কাজের লোকগুলো কিন্তু খাসা!"

"মাননীয় মহাশয়", "হে মহান মানুষ"! আমি মন্তব্যগুলো ভাবতে ভাবতে ভাবতে লাগলাম, আমার মত একটা পাতি কেরানীকেই যদি এমন সম্বোধন করে, তাহলে ডিকসন বুড়ো এখানে এলে না জানি ওরা কি বলত! এখন একটু পাইপ তো খাওয়া যেতেই পারে, যদিও এরকম একটা বদ্ধ ঘরে ধুমপান করা ঠিক না। আর আশ্চর্য, এত ছোট ঘর ওরা বানিয়েছেই বা কেন? একেবারে একটা খুপরির মত লাগছে।

খুপরিই বটে! লোহার দরজা, যেটা সাংঘাতিক শক্ত। জানলা আছে, তবে তাতে ঘন করে গরাদ দেওয়া। মেঝেটা কাঠের, হাঁটাচলা করলেই ফাঁপা আওয়াজ হচ্ছে সেখানে, যেন এখুনি তলাটা ধ্বসে যাবে। দেওয়াল আর মেঝের সর্বত্র কফি বা ওইধরণের কিছুর গাঢ় দাগে ভরা। মোট কথা, এরকম একটা জায়গায় কারোর পক্ষেই প্রফুল্ল থাকা সম্ভব নয়।

মনে মনে এইসব ভাবা তখনও শেষ করিনি, বাইরের করিডরে কারোর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম, পরক্ষনেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো আমার চেনা গাড়ির সেই লোক, বহুবার মাথা ঝুঁকিয়ে মার্জনা চাইলো আমাকে একা এরকম একটা "বাতিল করার ঘরে" রেখে যাওয়ার জন্য। তারপর সে আমাকে নিচের

একটা বড়ো আর চমৎকার সাজানো গোছানো ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল রয়েছে, যাতে মাত্র দুজন বসতে পারে, আর ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়েছিল একজন মানুষ, যার বয়স আমার চেয়ে খুব সামান্যই বেশি। আমি ঢুকতেই সে ঘুরে আমার দিকে এগিয়ে এল আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য, তার প্রতি পদক্ষেপেই বোঝা যাচ্ছিল সে আমাকে দারুণ সম্মান করছে।

"এত কম বয়সেই এত নামকরা!" বলে উঠল সে, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "দয়া করে চেয়ারে বসুন, আপনিই আজকের প্রধান। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই, অনেক লম্বা জার্নি করতে হল তো। আমরা মুখোমুখি ডিনার সারবো, বাকিরা আসবে পরে।"

"আপনি নিশ্চয়ই মিঃ দিমিদফ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না স্যার," তীক্ষ্ণ ধূসর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল সে, "আমার নাম পেত্রোকিন, আপনি বোধহয় অন্য কারোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন। কিন্তু স্যার, কাউন্সিল মিটিঙের আগে আর কোনও কথা নয়। আমাদের শেফের রান্না পরখ করে দেখুন, আমি নিশ্চিত যে আপনার দারুণ লাগবে।"

কে যে এই মিঃ পেত্রোকিন, অন্য লোকেরাই বা কে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। দিমিদফের গোমস্তা-টোমস্তাই হবে বোধহয়, আমি ভাবলাম, যদিও এই লোকটার সঙ্গে নামের কোনও মিলই নেই দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, এ যখন চাইছে না এই মুহূর্তে কোনও ব্যবসায়িক কথাবার্তা হোক, তখন আমারই বা কথা বলার দরকার কি? আমরা কথাবার্তা শুরু করলাম ইংল্যান্ডের সামাজিক জীবন নিয়ে, এবং দেখা গেল এ বিষয়ে লোকটার ভাল দখল আছে, সে যা যা বলছিল এ বিষয়ে, সবই নিখুঁত। মালথাসের জনসংখ্যা নীতি নিয়ে তার মন্তব্যগুলো চমৎকার, যদিও আমার কাছে খানিকটা গোঁড়া মনে হল।

"ব্যাপার কি জানেন," পানভোজনের শেষে আমরা সিগার ধরানোর পর বলল সে, " আমরা তো আপনাকে চিনি না, তবে জোর কপাল যে আলেকজান্ডার আপনার ব্যাগের ইংরেজি লেবেলগুলো খেয়াল করেছিল। আপনাকে দেখতেই বা কেমন, সে ব্যাপারেও আমাদের কাছে কোনও তথ্য ছিল না, তবে আমরা ভেবেছিলাম, যিনি আসবেন, তিনি বেশ বয়স্ক হবেন। হাজার হোক, এরকম একটা কাজের পক্ষে আপনার বয়সটা সত্যিই কম।"

"ওপরওয়ালা আমার ওপর ভরসা রেখেছেন," আমি উত্তর দিলাম, "আর আমরা আমাদের কারবারের জায়গায় শিখেছি যে তরুণ আর চালাকচতুররা অনুপযুক্ত নয়।"

"সে তো ঠিকই," প্রত্যুত্তর করল আমার নতুন বন্ধু, "তবে অবাক হচ্ছি এটা শুনে যে আপনি আমাদের এই মহৎ সংগঠনকে কারবার বললেন। কিছু মানুষ যখন একসাথে মিলে জগতকে নতুন একটা কিছু দিতে চাইছে, আর যেটা সবার চেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়, সেখানে এই কাজকে কারবার বলাটা খুবই বেদনাদায়ক। আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ব বরং অনেক সুন্দর কথা।"

"জয় ভগবান!" আমি ভাবলাম, "বস শুনলে খুব খুশি হবেন। এই লোকটা যেই হোক না কেন, নির্ঘাত ব্যবসার মধ্যে আছে।"

"চলুন স্যার," বললেন মিঃ পেত্রোকিন, "আটটা বাজে, কাউন্সিলের লোকেরা সব বসে আছে। ওপরে যাওয়া যাক, আমি সবার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। আমি নিশ্চিত করে বলছি যে আপনার পরিচয় একদম গোপন থাকবে, আর আপনার জন্যে সবাই অধীরভাবে অপেক্ষা করছে।"

আমি লোকটার পেছন পেছন যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম যতটা সম্ভব লাভজনক শর্তে কাজটা করে ফেলতে হবে। ব্যাপারটা নিয়ে ওরাও তো আমার মতই উতলা হয়েছে দেখা যাচ্ছে, আর সম্ভবত কোনও বিরুদ্ধ পক্ষও নেই, সুতরাং সবচেয়ে ভাল কাজ হচ্ছে চুপচাপ অপেক্ষা করা আর দেখা যে ওরা কি প্রস্তাব দেয়।

মনে মনে ভাবা শেষও করিনি, দেখলাম আমরা পৌঁছে গেছি প্যাসেজের শেষ প্রান্তে। আমার সঙ্গের লোকটা একটা বড়সড় দরজা ঠেলে খুলে ফেলল, আর দেখলাম আমরা প্রবেশ করেছি একটা বেশ বড় আর দারুন ঝকঝকে সাজানো গোছানো ঘরে, এই ঘরটা আমরা যে ঘরে খাওয়া দাওয়া করেছিলাম, তার চেয়েও বড়। ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল, সবুজ পশমি কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া, কিছু কাগজ ছড়ানো রয়েছে সেখানে, আর তার চারপাশে বসে আছে জনা চোদ্দ-পনেরো লোক, গভীর মনোযোগ দিয়ে কি সব যেন



আলোচনা করছিল তারা। পুরো দৃশ্যটা আমার কাছে মনে হল একটা জুয়ার আসরের মত, এরকম একটা আসরে আমি কয়েকদিন আগে গেছিলাম।

আমাদের ঢুকতে দেখেই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে আমাদের স্বাগত জানাল। আমি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে ওরা আমার সঙ্গী নয়, বরং আমাকে দেখেই ওরকম স্বাগত জানাল, আর দেখলাম প্রত্যেকটি চোখ আমার দিকে সসম্ভ্রমে চেয়ে আছে, সেই চোখের চাহনিতে অবাক বিস্ময় আর প্রায় ক্রীতদাসসুলভ মনোভাবের মিশেল। টেবিলের মাঝখানে বসেছিল একটা লোক, নীল-কালো চুল আর গোঁফ এবং অসম্ভব পাংশু মুখের জন্য অদ্ভুত লাগছিল তাকে, হাত তুলে তার পাশের চেয়ারে বসতে বলল আমাকে। আমি বসলাম।

"আমার নিশ্চয়ই আর বলার প্রয়োজন নেই যে," বললেন মিঃ পেত্রোকিন, "ইংরেজ এজেন্ট গুস্তেভ বারজার আমাদের মাঝখানে এসে আমাদের ধন্য করেছেন। অ্যালেক্সিস, দেখতেই পাচ্ছ যে উনি বয়সে একেবারে তরুণ," আমার পাশের পাংশু মুখের লোকটার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, "তবুও গোটা ইউরোপ ওঁকে শ্রদ্ধা করে।"

"নাঃ, ব্যাপারটা হালকা করা দরকার," আমি ভাবলাম, গলা ছেড়ে বললাম, "মশাইরা, আমি একজন ইংরেজই বটে, তবে বারজার নয়, রবিনসন, মিঃ রবিনসন।"

একটা হাসির গররা উঠল টেবিল জুড়ে।

"বটেই তো! সাবাস, সাবাস," বলে উঠল অ্যালেক্সিস নামের সেই লোকটা, "আপনার বিচক্ষণতার প্রশংসা করতেই হয়, মাননীয় মহাশয়। সাবধানতা অবশ্যই ভাল। আপনার ডাকনামটা বাঁচিয়ে রাখুন। যাই হোক, আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আজকের এই শুভ সন্ধ্যায় হয়ত আমাদের কিছু অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে

হবে, কিন্তু আমাদের সংগঠনের তো কিছু নিয়ম আছে, সেগুলো মানতেই হবে, তাতে আমাদের যত খারাপই লাগুক না কেন, এবং আজ রাত্রে একটা বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।"

"এরা কী সব বলছে, অ্যাঁ?" আমি ভাবলাম। "এদের কাজের লোককে ছাড়িয়ে দিলে আমার কি? এই দিমিদফ লোকটা, বা এ যেই হোক না কেন, এর বোধহয় নিজস্ব পাগলাগারদ আছে।"

"মুখ থেকে কাপড়টা বের করে নাও!" শব্দগুলো ভেসে এল চাবুকের মত। চেয়ারে বসে আমি কেঁপে উঠলাম। কথাগুলো বলেছে পেত্রোকিন। এই প্রথম আমি খেয়াল করলাম, টেবিলের অন্যদিকে একটা গাঁট্টাগোট্টা লোক বসে আছে, তার হাতদুটো চেয়ারের সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধা, আর মুখে গোঁজা আছে একটা রুমাল। এক ভয়াবহ সন্দেহে আমার বুক ধড়াস করে উঠল। এ আমি কোথায় এসেছি? মিঃ দিমিদফের ডেরায় কি? এই লোকগুলো কারা? এদের এই সব কথাবার্তার মানে কি?

"মুখের কাপড়টা বের করে নাও!" আরেকবার বলল পেত্রোকিন, আর লোকটার মুখ থেকে রুমাল খুলে নেওয়া হল।

"পল ইভানোভিচ," বলল সে, "তোমার কিছু বলার আছে?"

"জানে মারবেন না, স্যার," মিনতি করছিল লোকটা, "জানে মারবেন না, ওটা ছাড়া বাকি যা ইচ্ছে হয় করুন। যেখানে নির্বাসন দেওয়ার দিন, আমার মুখ বরাবরের মত বন্ধ থাকবে। সংগঠন যা বলবে করব, কিন্তু দয়া করে জানে মারবেন না। দয়া করুন স্যার।"

আমার পিঠ ঠেকে গেল চেয়ারে, খাবি খাচ্ছিলাম আমি।

"নিয়ে যাও একে!" বলল পেত্রোকিন, আর ঘোড়ার গাড়ির সেই লোকটা , আরও দুজন মিলে ধাক্কা মারতে মারতে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল সেই লোকটাকে। বাইরের প্যাসেজে শুনতে পেলাম পায়ের আওয়াজ, তারপর একটা দরজা খোলা আর বন্ধ করার শব্দ। তারপর একটা আওয়াজ ভেসে এল, যেন একটা ধ্বস্তাধস্তি চলছে, যার সমাপ্তি ঘটল একটা দমাস করে ভারি কিছু দিয়ে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কোনও কিছু মাটিতে পড়ে যাওয়ার আওয়াজে।

"যারা বিশ্বাসঘাতক, তাদের এটাই শাস্তি," বিষণ্ণভাবে বলল অ্যালেক্সিস। বাকি সবাই বলে উঠল, "ঠিক!"

"একমাত্র মৃত্যুই পারে আদেশ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে," বলল আরেকটা লোক, " কিন্তু মিঃ বারজা- থুড়ি, মিঃ রবিনসন একেবারে পাংশু হয়ে গেছেন। ইংল্যান্ড থেকে এতদূর আসার পরই এ দৃশ্য দেখাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।"

"যদি কোনওক্রমে একবার এখান থেকে বেরোতে পারি, তবে নতুন জীবন পাবো।" ভাবলাম আমি। এখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে বিরাট কোনও ভুলের জন্য আমি একদল ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদীদের ডেরায় এসে পড়েছি, ওরা ভুল করে ওদের দলের অন্য কাউকে আমার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে। আর আমি যা দেখে ফেললাম, তারপর আমার বাঁচার একমাত্র রাস্তা হল অভিনয় চালিয়ে যাওয়া, যতক্ষণ কোনও সুযোগ না আসে। সুতরাং আমি একটু ঝাড়াপাড়া দিয়ে উঠে হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করলাম।

"শরীরটা একটু খারাপ লাগছিল ঠিকই," আমি উত্তর দিলাম, "তবে এখন অনেক ভাল লাগছে। আমায় মার্জনা করবেন।"

"না না, এ তো হতেই পারে," আমার ডানপাশের দাড়িওয়ালা একজন বলল, "মাননীয় মহাশয়, এখন বলুন, ইংল্যান্ডের খবর কি?"

"খুব ভাল," আমি বললাম।

"মাননীয় কমিশনার মহোদয় কি সলটেফ ব্রাঞ্চের জন্য কোনও বার্তা পাঠিয়েছেন?"

"লিখিত কিছু দেননি," আমি বললাম।

"কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, তিনি বলেছেন এ ব্যাপারটা তাঁর মাথায় আছে ," আমি উত্তর দিলাম।

"দারুণ! দারুণ! এই তো চাই!" উল্লাসে ফেটে পড়ল গোটা টেবিল।

এই শোচনীয় পরিস্থিতির কথা ভেবে আমার ক্রমেই অস্থির আর অসুস্থ লাগছিল। যে কোনও মুহূর্তে প্রশ্নের উত্তরে আমি ধরা পড়ে যাব। সামলে নেওয়ার জন্য পাশের টেবিলে রাখা একটা ব্র্যান্ডির বোতল তুলে নিলাম আমি, গলায় ঢাললাম খানিকটা তার থেকে। কড়া পানীয়টায় কাজ হল, চাঙ্গা হয়ে উঠলাম খানিকটা, বসে পড়লাম আমার চেয়ারে। তখন আমার মজাই লাগছিল, ভাবলাম এই খেলাটা চালিয়ে যাব, কারণ তখনও পর্যন্ত রসবোধটা আমার মধ্যে রয়েছে পুরো মাত্রায়।

"আপনি বারমিংহামে গেছিলেন?" দাড়িওয়ালা লোকটা জিজ্ঞেস করল।

"অনেকবার," আমি বললাম।

"তাহলে তো নিশ্চয়ই আপনি গোপন কারখানা আর অস্ত্রাগারও দেখেছেন?"

"দুটোই দেখেছি একাধিকবার।"

"পুলিশ এখনো কিছু সন্দেহ করেনি তো?"

"কিচ্ছু না।"

"আচ্ছা, এত বড় একখানা ব্যাপার কি করে সম্পূর্ণ গোপন রয়েছে, বলতে পারবেন?"

এ প্রশ্নের উত্তরেই হয়ত লাট খেয়ে পড়তাম, কিন্তু আমার স্বভাবসুলভ চাপল্য আর ব্র্যান্ডির ধাক্কায় আমি তখন চনমনে।

"এটা তো বলা যাবে না," আমি বললাম, " চিফ কমিশনারের নির্দেশ আছে।"

"ঠিক বলেছেন, একদম ঠিক," বলল আমার আসল বন্ধু পেত্রোকিন। "আপনাকে তো আগে মস্কোর সেন্ট্রাল অফিসে সব রিপোর্ট দিতে হবে, তারপর এইসব খুঁটিনাটি।"

"বিলক্ষণ," হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

"আমরা শুনেছি," বলল অ্যালেক্সিস, "যে আপনাকে লিভাডিয়া পরিদর্শনে পাঠানো হয়েছিল। এর কোনও বিবরণ দিতে পারবেন?"

"যা জিজ্ঞেস করবেন, চেষ্টা করব," আমার সাহস বাড়ছিল।

"এ ব্যাপারে বারমিংহাম থেকে কি কোনও আদেশ জারি হয়েছে?"

"আমার ইংল্যান্ড ছাড়ার আগে পর্যন্ত কিছু বেরোয়নি।"

"ভাল, ভাল, এখনও অনেক সময় আছে," দেড়েল লোকটা বলল, "অনেক মাস। আচ্ছা, তলাটা কাঠের হবে, না লোহার?"

"কাঠের," দুমদাম করে বলে যাচ্ছিলাম আমি।

"ভাল," আরেকটা গলা শোনা গেল, "আচ্ছা, এর তলাটা কতখানি চওড়া হবে?"

"সঠিক বলা যাবে না," আমি বললাম, "তবে মোটামুটি আশি গজ ধরে রাখুন।"

"কতজন এতে চড়তে পারবে?" জিজ্ঞেস করল একজন রক্তশূন্য চেহারার লোক টেবিলের পাশ থেকে। এ লোকটাকে এ রকম একটা খুনির আখড়ায় থাকার বদলে কোনও পাবলিক স্কুলে মানাত বেশি।

"তা, শ"তিনেক তো বটেই," আমি বললাম।

"ভাসমান কফিন একটা!" বলল সেই লোকটা। গলা শুনে মনে হল যেন সে এক্ষুনি কাউকে কবর দিতে যাচ্ছে।

"এর স্টোর-রুমগুলো কি ওপরে থাকবে, না স্টেট-কেবিনের নিচে?" জিজ্ঞেস করল পেত্রোকিন।

"নিচে," অবলীলায় বলে গেলাম আমি, যদিও ওরা যে কি নিয়ে বলছিল, সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

"মাননীয় মহাশয়, এবারে বলুন," বলল অ্যালেক্সিস, "র‍্যাভিনস্কির ইস্তাহার নিয়ে জার্মান সমাজতান্ত্রিক বয়ের কি উত্তর দিয়েছেন?"

এর উত্তরে আমি যে কি বলব ভেবে পেলাম না। আমার উপস্থিত বুদ্ধি আমাকে এবারেও বাঁচিয়ে দেবে কি না, তার পরীক্ষা হওয়ার আগেই এমন একটা ব্যাপার ঘটল, যা অভাবিত, বস্তুতপক্ষে আরও খারাপ। নিচে একটা দরজা দড়াম করে খোলার আওয়াজ হল, শুনতে পেলাম সিঁড়ি দিয়ে কেউ দ্রুত উঠে আসছে। তারপর বাইরে একটা জোরালো টোকা, সঙ্গে পরপর আরও দুটো মৃদু টোকা।

"সংগঠনের সঙ্কেত!" বলে উঠল পেত্রোকিন, "কিন্তু আমরা তো সবাই এখানে উপস্থিত! তাহলে কে?"

একটা ধাক্কার চোটে খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল একটা লোক, সারা গা ভর্তি ধুলো , মনে হল বহুদূর থেকে আসছে, কিন্তু তার রুক্ষ মুখে কর্তৃত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। টেবিলের প্রত্যেকটি লোককে কড়া চোখে নজর করতে লাগল সে। চমকে উঠল ঘরের সবাই। মনেই হল এ লোকটাকে কেউ চেনে না।

"এভাবে অনধিকার প্রবেশের মানে কি মশাই?" জিজ্ঞেস করল দাড়িওয়ালা লোকটা।

"অনধিকার প্রবেশ!" বলে উঠল আগন্তুক। "আমি জানতে চাই এর মানে কি! আমাকে বলা হয়েছিল এখানে আমার সহকর্মীরা থাকবে, আর তারা আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের কাছে অপরিচিত বটে, কিন্তু আশাকরি আমার নামটা আপনাদের কাছে কিছু সম্মান পাবে। আমার নাম গুস্তেভ বারজার, ইংল্যান্ডের এজেন্ট, আর আমার কাছে চিফ কমিশনারের চিঠিটাও রয়েছে, যে চিঠিটা তিনি তাঁর সলটেফের ভাইদের জন্য লিখেছেন।"

ওদের নিজেদের তৈরি বোমাও যদি ঘরের মধ্যে ফাটতো, তাহলেও বোধহয় ওরা এত অবাক হত না। ঘরের প্রত্যেকটি চোখ তখন পর্যায়ক্রমে আমার এবং নতুন আসা এজেন্টের দিকে নিবদ্ধ।

"যদি আপনিই গুস্তেভ বারজার হন," বলল পেত্রোকিন, "তাহলে ইনি কে?"

"আমিই যে গুস্তেভ বারজার, এই কাগজপত্রগুলোই তার প্রমাণ দেবে," বলে আগন্তুক একটা প্যাকেট ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর। "এই লোকটা কে আমি জানি না, তবে এ যদি কোনও বদ উদ্দেশ্যে এখানে ঢোকে, তবে এখানকার সব কিছু জেনে ফেলার পর এখান থেকে জ্যান্ত বেরোবে না। বলুন তো মশাই," সে বলল আমাকে, "আপনি কে আর কি উদ্দেশ্যে এখানে ঢুকেছেন?"

আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারলাম। পেছনের পকেটে রয়েছে আমার রিভলভার, কিন্তু সেটা দিয়ে এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে আমি কি করব? আমি হাতড়াচ্ছিলাম সেটা, একই সঙ্গে মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করছিলাম ঘরের সবকটা ঠান্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকের দিকে তাকিয়ে।

"ভদ্রমহোদয়গণ," আমি বললাম, "এতক্ষণ এখানে যা হল, তাতে আমার কোনও হাত নেই। আমি কোনওভাবেই পুলিশের চর নই, যেটা আপনারা ভাবছেন, এবং একই সঙ্গে এটাও বলছি যে আমি আপনাদের এই মহান সংগঠনের সদস্যও নই। আমি একজন সামান্য শস্য-ব্যবসায়ী, নেহাতই পাকেচক্রে এখানে এসে পড়েছি।"

আমি একটুক্ষণের জন্য থামলাম। বাইরে কোনও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কি? মনে হল যেন অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ আস্তে আস্তে এদিকেই আসছে? না, পুরোটাই বোধহয় আমার মনের ভুল, কারণ আওয়াজটা মিলিয়ে গেল। কিন্তু আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

"একটা কথা বলতে পারি," আমি বললাম, "আজকে এখানে আমি যা শুনেছি, তার পুরোটাই গোপন থাকবে। আমি একজন ভদ্রলোক, আমি এ ব্যাপারে কথা দিচ্ছি আপনাদের।"

ওদের দেখে মনে হল ওরা কোনও মতলব ভাঁজছে। আমার পেছনেই দরজা, আর আমি শপথ করে বলতে পারি, আমি কারোর বড়বড় নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছিলাম। এরা কি সেই তিনজন, যারা একটু আগেই বাইরে গিয়ে তাদের সেই নৃশংস কাজটা করেছে, আর এখন শকুনের মত গন্ধ শুঁকে আরেকটা শিকার খুঁজছে?

আমি টেবিলের চারদিকে আবার তাকালাম। মুখগুলো এখনও আগের মতই কঠোর। কারোর মুখে করুণার চিহ্নমাত্র নেই। আমি পকেটে রিভলভারটা চেপে ধরলাম। নৈঃশব্দ ভাঙল পেত্রোকিনের কর্কশ কণ্ঠস্বরে।

"কথা যখন খুশি দেওয়া যায়, যখন খুশি ভাঙাও যায়, কাজেই ওর কোনও দাম নেই," বলল সে। "এখন একটাই রাস্তা। হয় আমাদের জীবন থাকবে, নাহলে ওর জীবন। আমাদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ, তিনি বিধান দিন।"

"ঠিক বলেছেন," বলল ইংরেজ এজেন্ট, "একটা রাস্তাই খোলা আছে। বহিষ্কার।"

এর মানে কি বুঝতে পেরে আমি লাফিয়ে উঠলাম।

"না!" দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, "আপনারা একজন স্বাধীন ইংরেজকে এভাবে ভেড়ার মত জবাই করতে পারেন না!"

একটা লোক তেড়ে এল আমার দিকে। আমি বন্দুক টেনে বার করতে না করতে দেখতে পেলাম ঝিকিয়ে ওঠা ছুরির ফলা আর গুস্তেভ বারজারের ভয়ংকর মুখ। তারপর আমি ট্রিগার টেনে দিলাম, আমার কানে বেজে উঠল গুস্তেভের কর্কশ চিৎকার, আর আমি মেঝেতে পড়ে গেলাম পেছন থেকে একটা দারুণ আঘাত পেয়ে। অর্ধচেতনভাবে, ভারী ওজনের ধাক্কায় মাটিতে পিষে যেতে যেতে আমি শুনতে পেলাম আমার ওপরে চিৎকার আর মারামারির আওয়াজ, তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম আমি দরজার সামনে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শুয়ে আছি, যে দরজাটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। আমার সামনে সেই লোকগুলো, যারা খানিকক্ষণ আগেই আমার গর্দান নেবে বলে তৈরি হয়ে গেছিল। তাদের প্রত্যেককে দুজন দুজন করে বেঁধে ফেলা হয়েছে, আর পাহারা দিচ্ছে রাশিয়ান সৈন্যরা। আমার পাশে পড়ে আছে সেই ইংরেজ এজেন্টের মৃতদেহ, যার গোটা মুখই উড়ে গেছে বিস্ফোরণে। অ্যালেক্সিস আর পেত্রোকিন আমার মতই পড়ে আছে মেঝেতে, প্রচুর রক্ত পড়ছে দুজনেরই সারা গা থেকে।

"কী ভাই, জোর বাঁচা বেঁচে গেছেন," কানের পাশে একটা উৎফুল্ল গলা শুনলাম।

তাকিয়ে দেখি ট্রেনের সেই কালো চোখের লোকটা।

"উঠে পড়ুন," বলল সে, "আপনি অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন শুধু, হাড়গোড় কিছু ভাঙেনি। আমিও প্রথমে এখানে ঢুকে আপনাকে সন্ত্রাসবাদী বলে ভুল করেছিলাম। যাই হোক, আপনিই প্রথম কেউ, যে এই গুহা থেকে জ্যান্ত বেরোতে পারল। আমার সঙ্গে নিচে চলুন, আমি জানতে পেরেছি আপনি কে, আর আপনি কোথায় যেতে চান। আমি আপনাকে মিঃ দিমিদফের কাছে নিয়ে যাব। না, না, ওখানে যাবেন না," বলে উঠল সে, আমি প্রথম যেই ঘরে উঠেছিলাম, সে ঘরের দিকে পা বাড়াতে যেতেই। "ওখানে পা-ই দেবেন না, এক দিনে আপনি অনেক খারাপ দৃশ্য দেখেছেন। নিচে আসুন, এক গ্লাস পান করে একটু চাঙ্গা হয়ে নিন।"

হোটেলে যেতে যেতে সে আমাকে সবটাই বুঝিয়ে দিয়েছিল। সলটেফের পুলিশ বাহিনী, সে যার প্রধান, আগেই সতর্কবার্তা পেয়েছিল এবং বেশ কিছুদিন ধরেই এই সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজ চালাচ্ছিল। আমার এরকম একটা জায়গায় আসা, সব কিছুর মধ্যেই একটা গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা, আর গ্রেগরির দেওয়া সেই সব্বনেশে পোর্টম্যান্টোর ওপর ইংরেজি লেবেল বাকি কাজটা করে দিয়েছিল।

আর বিশেষ কিছু বলার নেই। আমার সেই বন্ধুদের সবাই হয় সাইবেরিয়ায় চালান হয়েছিল, নাহয় তাদের কোতল করা হয়েছিল। আমার কাজে খুশি হয়েছিল আমার ওপরওয়ালারা। আমার প্রোমোশন হয়েছিল তারপরেই। আমার জীবনধারা পালটে গেছিল সেই ভয়ঙ্কর রাতের পর থেকেই, যে রাতের কথা ভাবলে আমি আজও কেঁপে উঠি।

[স্যার আর্থার কোনান ডয়েল রচিত "আ নাইট অ্যামঙ দ্য নিহিলিস্টস" অবলম্বনে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় "লন্ডন সোসাইটি" ম্যাগাজিনে ১৮৮১ সালে।]

ভেলরিওকা

অনুবাদঃ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য



এক ছিল বুড়ো আর তার ছিল এক বুড়ি। তাদের দুই মা বাপ মরা নাতিনাতনী। ভারী সুন্দর তারা। বুড়োবুড়ি তাদের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসত।

একদিন বুড়ো গেছে তাদের নিয়ে মটরশুঁটির ক্ষেতে। গিয়ে দেখে ফনফনিয়ে বেড়ে অঠা গাছের মাথায় বেজায় ভালো মটরশুঁটির ঝাঁক। দেখে বুড়োর খুশি ধরে না। হেসে হেসে বলে, "দ্যাখ, দ্যাখ, এমন ফসল আর দুনিয়ার কোন ক্ষেতে ফলবে না। ঐ দিয়ে আমরা কিসেল রাঁধব আর মটরশুঁটির পিঠে বানাব।"

পরদিন সকালে দাদু তার বড়োনাতনীকে ক্ষেতে পাঠাল। বলে, "গিয়ে ক্ষেত থেকে চড়ুই তাড়া দিদিভাই।"

শুনে বড়োনাতনী ক্ষেতের ধারে গিয়ে বসে একটা শুকনো ডাল হাতে নিয়ে নাড়ায় আর বলে, "এই চড়ুই, যাঃ! ভাগ! আমার দাদুর মটরশুঁটি খেয়ে পেট ভরে ফেললি যে!"

যেই না বলা, অমনি বনের মধ্যে বেজায় শব্দ উঠল, আর তারপর সেখান থেকে বের হয়ে এল ভেলরিওকা। পাহাড়ের মত চেহারা তার।চোখ মোটে একখানা, নাকখানা বাঁকানো, মাথায় উলোঝুলো চুল, আধ হাত লম্বা ঝোলা গোঁফ, কাঠের জুতো পরা একটা পায়ে লেংচে লেংচে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটে আর দাঁত কড়মড় করে হাসে। নাতনীর কাছে এসে সে তার হাত ধরে টনতে টানতে নিয়ে চলে গেল বনের ভেতর।

ওদিকে দাদু তার নাতনীর পথ চেয়ে বসে থাকে তো বসেই থাকে, আর সে আসে না। তখন সে তার ছোটো নাতিটকে পাঠাল দিদিকে খুঁজতে। সে-ও আর ফেরে না। অবশেষে বুড়ো বুড়িকে বলল, "এত দেরি তো ওরা কখনো করে না! বোধ হয় কোথাও খেলা জুড়েছে। গিয়ে একটু দেখে এস না!"

শুনে বুড়ি উঠে উনুনে রান্না হতে থাকা পিঠেগুলোকে খুন্তি দিয়ে উল্টেপাটে দিয়ে গেল নাতিনাতনীর খোঁজে।

তাকে ক্ষেতের দিকে আসতে দেখে ভেলরিওকা চিৎকার করে বলে, "এখানে কী চাই বুড়ি? মটরশুঁটি তুলতে এলি নাকি? তাই যদি হয় আমি কিন্তু তাহলে তোকে এইখানে সারাজীবন মটরক্ষেতে দাঁড় করিয়ে রেখে দেব।" এই বলে সে তাকে ক্রাচ দিয়ে এমন মারল যে বুড়ি তাতে আধমরা হয়ে পড়ে রইল ক্ষেতের ভেতর।

ওদিকে, বুড়ি আর তার নাতিনাতনি কেউ ফেরে না দেখে বুড়ো শেষে ভারী রেগে গজগজ করতে করতে ক্ষেতের দিকে চলল তাদের খোঁজে। গিয়ে দেখে বুড়ি পড়ে আছে আধমরা হয়ে, আর তার নাতিনাতনীদের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। বুড়ো চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বুড়িকে তুলে নিয়ে বাড়ি গেল।

মুখেচোখে জল দিতে জ্ঞান এল বুড়ির। তখন সে বুড়োকে বলল কে তাকে অমন করে মেরেছে, আর তাদের নাতিনাতনীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। শুনে বুড়ো তো রেগে আগুন। বলে, "আজ বদমাশ ভেলরিওকার একদিন কি আমার একদিন। এই বলে সে লোহার একটা ক্রাচ নিয়ে রাগে গরগর করতে করতে চলল ভেলরিওকার সন্ধানে।

বুড়ো তো তারপর যায় যায় যায়–যেতে যেতে শেষে সে এসে হাজির হল বনের ভেতর এক ছোট্ট ঝিলের ধারে। তার জলে সাঁতার কাটছিল এক হাঁস। বুড়োকে দেখে সে বলল, "কোয়াক কোয়াক কোয়াক– একশ বছর বাঁচবে তুমি দাদু। তোমার জন্যে হাপিত্যেশ করে এইখানে বসে বসে তোমার কথাই ভাবছিলাম আমি এতক্ষণ।"

"আহা বেঁচে থাক তুই।কেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলি রে?" জবাব দিল বুড়ো।

"আমি তো জানতাম তুমি নাতিনাতনীর খোঁজে ভেলরিওকার তালাশে বের হবে।"

"কিন্তু তুই সে বদমাশটার কথা জানলি কেমন করে?"

"কোয়াক কোয়াক–কারণ আছে। আমার লেজ কেটে দিয়েছে ও। আমি বলে একটা ছোট্ট হাঁস, আর সে আমায় কি না--"

"ওর বাড়ি কোথায় জানিস? দেখিয়ে দিবি আমায়?"

"চল দেখিয়ে দি," বলে জল থেকে উঠে হাঁস চলল হেলেদুলে বুড়োর পাশে পাশে।

যেতে যেতে তারা দেখে পথের পাশে পড়ে আছে একটুকরো দড়ি। বুড়োকে দেখে দড়ি বলে "ও টেকো দাদুভাই, ভালো আছ? থাকো কোথা? যাচ্ছ কোথা?"

"আমি থাকি বনের বাইরে ও–ই ওখানে। যাচ্ছি ভেলরিওকাকে খুঁজতে। সে আমার বুড়িকে বেজায় মেরেছে আর আমার সুন্দর নাতিনাতনীদুটোকে চুরি করে নিয়ে গেছে।"

"হুম। তা আমায় সঙ্গে নেবে নাকি?"

"নিয়েই যাই," ভাবল বুড়ো, "ওকে দিয়ে বদমাশটাকে ফাঁসি দেব'খন।" এই ভেবে বুড়ো ঘাড় নড়তে দড়ি চলল সাপের মত এঁকেবেঁকে তার পেছনপেছন।

খানিক দূরে গিয়ে এবার তাদের দেখা একটা জলে চলা গম ভানবার কলের সাথে। বুড়োকে দেখে কল বলে "ও টেকো দাদুভাই, ভালো আছ? থাকো কোথা? যাচ্ছ কোথা?"

"আমি থাকি বনের বাইরে ও–ই ওখানে। যাচ্ছি ভেলরিওকাকে খুঁজতে। সে আমার বুড়িকে বেজায় মেরেছে আর আমার সুন্দর নাতিনাতনীদুটোকে চুরি করে নিয়ে গেছে।"

"হুম। তা আমায় সঙ্গে নেবে নাকি?"

"নিয়েই যাই," ভাবল বুড়ো, "কখন কী কাজে লেগে যায় কে জানে!" এই ভেবে বুড়ো ঘাড় নড়তে কল চলল তার হাতলে ভর করে তার পেছনপেছন।

আবার তারা যায় যায়। পথে দেখা একটা ওক-এর বীজের সাথে। বুড়োকে দেখে বীজ বলে "ও নাকলম্বা দাদুভাই, ভালো আছ? থাকো কোথা? যাচ্ছ কোথা?"

"আমি থাকি বনের বাইরে ও–ই ওখানে। যাচ্ছি ভেলরিওকাকে খুঁজতে। সে আমার বুড়িকে বেজায় মেরেছে আর আমার সুন্দর নাতিনাতনীদুটোকে চুরি করে নিয়ে গেছে।"

"হুম। আমিও দুষ্টুটাকে চিনি। তা আমায় সঙ্গে নেবে নাকি? তোক্মার কাজে আসব দেখো।"

"চল তবে। আমাদের পেছন পেছন গড়িয়ে গড়িয়ে আয়।"

অমনি ওকের বীজ দুটো পা বের করে লাফাতে লাফাতে তাদের সঙ্গে চলল।

তারপর তারা এসে পৌঁছুল এক ভয়ানক বনের মধ্যে। সে বনের মধ্যে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর। ভারী একলা সেটা। ঘরে উনুনে আগুন নেই। একপাশে রয়েছে শুধু একটা স্যুপ বানাবার হাঁড়ি। ওকের বীজ অমনি লাফ মেলে সেই হাঁড়ির ভেতর ঢুকল গিয়ে দড়ি গিয়ে হাঁড়ির গলায় জড়াল। কল গিয়ে বেঞ্চির ওপরে উঠল, হাঁস গিয়ে বসল উনুনের মাথায় আর বুড়ো ঘরের এক কোণে গিয়ে লুকোল।

খানিক বাদেই হঠাৎ জঙ্গলে দুমদাম শব্দ উঠল। বন থেকে এক পায়ে কাঠের জুতো পরে ক্রাচে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে আর হাসতে হাসতে বের হয়ে এল ভেরলিওকা। ঘরে ঢুকেই সে একবোঝা কাঠ মেঝেতে ফেলল এনে। তারপর উনোন ধরাতে বসল। ওমনি হাঁড়ির ভেতর থেকে ওকের বীজ গান ধরেছে–

"হি হি হি
আমরা সবাই ভেরলিওকাকে
মারতে এসেছি"

শুনেই ভেরলিওকা রেগে আগুন হয়ে হাঁড়িটার হাতল ধরেছে চেপে, আর ওমনি হাতল ভেঙে হাঁড়ি মাটিতে পড়ে চূরচূর। তার ভেতর থেকে ওকের বীজ লাফিয়ে উঠে ভেরলিওকার একমাত্র চোখে গুঁতো মেরে তাকে দিয়েছে অন্ধ করে। তখন তার ওপর লাফিয়ে পড়ল দড়ি। যতই হাত পা ছোঁড়ে সে ততই দড়ি তাকে আচ্ছা করে পেঁচিয়ে বাঁধে। তাইতে যেই না সে তার একখানা পা ছুঁড়েছে, তাইতে ধাক্কা খেয়ে বেঞ্চি থেকে কল এসে দমাস করে পড়েছে তার বুকের ওপর।

বুড়ো তখন বেরিয়ে এসে তার লোহার ক্রাচ দিয়ে ভেরলিওকাকে কী মার, কী মার!তাই দেখে উনুনের মাথা তেকে হাঁস চিৎকার জুড়েছে "কোয়াক কোয়াক কোয়াক, খাক খাক বেজায় মার খাক–"

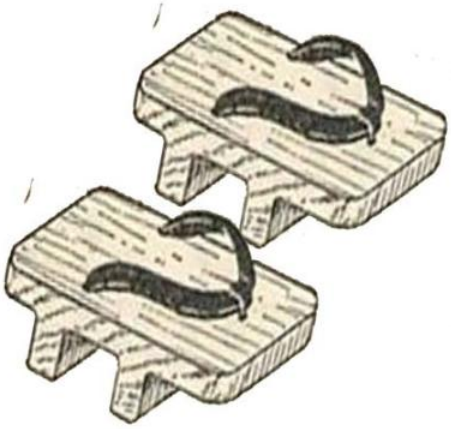
মারতে মারতে মারতে শেষে একেবারে মেরেই ফেলল বুড়ো। তারপর তার ঘরটা ভেঙে মাটির নীচের গুপ্তঘরে গিয়ে নাতিনাতনীকে উদ্ধার করল, আর সেইসঙ্গে সেই গুপ্তঘরের সব সোনাদানা নিয়ে এসে বিরাট বড়োলোক হয়ে সুখেশান্তিতে ঘর করল অনেক দিন।

আমার কথাটি ফুরোল।

জাপানী লোককথা

জাদু চটি





সোনালী ঘোষাল

কেন্টারোর মায়ের খুব অসুখ। তাই হতভাগা খুব উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। তারা যে বড্ড গরিব। মায়ের জন্য ওষুধপথ্য কেনার সামর্থ্য তাদের নেই।

আমায় আবার কাকার কাছে হাত পাততে যেতে হবে। মনে হয় আবার তিনি আমায় সাহায্য করবেন। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কেন্টারো কাকার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল। কাকাকে সব কথা খুলে বলতে কাকা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, "কী! আবার টাকা চাইতে এসেছিস্?"

"দয়া কর, কাকা। এবারের মত কিছু টাকা দাও, না হলে ওষুধের অভাবে মা মরেই যাবে।"

কিন্তু তার অনুরোধ, উপরোধে কাকার মন গলল না। সে তাকে ঘরের বাইরে বের করে দিল। বেচারা কেন্টারো রাস্তার ধারে একটা গাছের নীচে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল। না ঘুমানো পর্যন্ত সে কেঁদেই চলল।

হঠাৎ মনে হল কেউ যেন তাকে ঠেলা দিয়ে বলছে, "ছোট্ট ছেলে তুমি এখানে কী করছ?"

চোখ খুলে কেন্টারো তার সামনে এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার মায়ের খুব অসুখ। আমরা এত গরিব যে মায়ের সেবাযত্ন করার বা ওষুধ কেনার টাকা নেই। যদি আমি এক্ষুনি এক্ষুনি তার জন্য ওষুধ কিনতে না পারি, তাহলে মা নিশ্চিতভাবেই মারা যাবে।"

বৃদ্ধ বলল, "কেঁদো না বাছা। আমি তোমায় সাহায্য করব। এই কাঠের চটিজোড়া নাও। যখনই তুমি এটা পায়ে গলিয়ে লাফ দেবে তখনই এর মধ্যে থেকে একটা সোনার মুদ্রা বেরিয়ে আসবে। কিন্তু মনে রেখ, কখনই একসঙ্গে একটার বেশি মুদ্রা বার করবে না। কেন না তুমি যতবার লাফ দেবে ততবারই তুমি সামান্য ছোট হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর তুমি আবার আগের আকার ফিরে পাবে। কিন্তু একসঙ্গে বেশি মুদ্রা বার করলে তুমি একটা মশার মত হয়ে যাবে। কথাটা কিন্তু স্মরণে রেখ।"

বলতে বলতেই বৃদ্ধ লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা মৃদু ঝাঁকুনি খেয়ে কেন্টারো জেগে উঠল। "আচ্ছা আমি কী স্বপ্ন দেখছিলাম? কিন্তু তা তো মনে হচ্ছে না। ঐ তো কাঠের চটি এখানেই পড়ে রয়েছে। যাই, তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফিরি- তারপর এটাকে পরীক্ষা করে দেখি।"

বাড়ির উঠোনে পা দেওয়া মাত্রই সে সেই কাঠের চটিতে পা গলালো তারপর সজোরে লাফ দিল। খট্ করে একটা শব্দ হল। কেন্টারো মাটিতে পড়ে গেল। আরে, কী আশ্চর্য! সত্যিসত্যিই তো একটা স্বর্ণমুদ্রা বেরিয়ে এসেছে। আঃ, কী আনন্দ! আমি এখন খুব খুশি। এই স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমি এখন মায়ের জন্য চাল, ওষুধ, যা ইচ্ছে তাই কিনতে পারি। আমার মা আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। আবার আমাদের জন্য রান্না করবে, আমায় আদর করবে। কী মজাটাই না হবে!

এদিকে হয়েছে কী কেন্টারোর এই জাদু জুতোর কথা কীভাবে যেন সমস্ত গ্রামবাসী জেনে ফেলেছে। তারা প্রত্যেকেই কেন্টারোর সৌভাগ্যে খুব আনন্দ পেল, কিন্তু তার কাকা এটা মেনে নিতে পারল না। যেভাবেই হোক জাদুচটি তাকে হস্তগত করতেই হবে। সে মনে মনে ফন্দি আঁটতে শুরু করল।

একদিন গুটিগুটি পায়ে সে কেন্টারোর বাড়ি এসে হাজির। নরম স্নেহ মাখা কণ্ঠে বলল, "সুপ্রভাত ভাগ্নে, সুপ্রভাত।"

কেন্টারো তাকে সুস্বাগতম্ বলে ঘরে নিয়ে এল। কেন্টারো আর তার মা কাকাকে উপাদেয় খাবার খেতে দিল। খেতে খেতে কাকা বলল, "আহা! কী অপূর্ব স্বাদ! শুনলাম তুমি নাকি একটা জাদু চটি পেয়েছ , যেটা তোমায় স্বর্ণমুদ্রা দেয়?"

"হ্যাঁ, কাকু। এই যে, এই চটিটা আমি পেয়েছি।"

"তুমি কি এটা আমায় বিক্রি করবে? তোমার যত টাকা প্রয়োজন পাবে। হেঁ হেঁ এতদিন ধার বাবদ যেসব টাকাপয়সা নিয়েছ সেগুলোর কথাও আমরা ভুলে যাব। এখন কী করতে চাও বল?"

কাকু, এই চটি আমায় একজন দয়ালু বৃদ্ধ দিয়েছেন। আমি প্রাণ থাকতে এটা তোমায় বিক্রি করতে পারব না।"

"তাহলে অন্তত একদিনের জন্য আমায় এটা ধার দাও।"

" না- না–কাকু আমি তো পারব না।"

অমনি কাকা তাকে এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে চটিজোড়া কেড়ে নিল। যাবার আগে বলে, "কেবল আজকের জন্যই এটা নিয়ে যাচ্ছি ভাগ্নে, কালই ফেরত দিয়ে যাব।"

"যেও না কাকু, দাঁড়াও! দাঁড়াও!"

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই কেন্টারোর কাকু বাড়ি পৌঁছে গেল। বাড়ির ভেতরের উঠানে ঘাসের উপর একটা মাদুর বিছিয়ে দিল চটিটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল, "এটা সত্যি সত্যি কাজে লাগবে তো? তারপর যেই সে চটিটা পায়ে গলিয়ে লাফ দিল, অবাক হয়ে দেখল সত্যি একটা সোনার মুদ্রা বেরিয়ে এসেছে।

"নিজের চোখে দেখেও এটা বিশ্বাস করতে পারছি না," বলে সে আবার লাফ দিল, "কী সুন্দর, চক্‌চকে, মনোরম সব স্বর্ণমুদ্রা!"

আনন্দের আতিশয্যে কেন্টারোর কাকু লাফিয়েই চলল। তার মাদুরের উপর থরে থরে সোনার মুদ্রা জড়ো হল।

"হোঃ, হোঃ, হোঃ! আমি এখন জাপানের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। বড্ড ক্লান্তিবোধ করছি। কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিই, তারপর আবার অনেক- অনেক- অনেক বেশি লাফাব," এই বলে সে নীচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ভারী অবাক হয়ে গেল।

"কী হল? স্বর্ণমুদ্রাগুলোকে তো মাদুরের চেয়েও বড় বলে মনে হচ্ছে! আরে! এখন তো দেখছি মুদ্রার স্তূপটাকে একটা সোনার পর্বতের মত দেখাচ্ছে! এ তো ফুজিয়ামার চেয়ে অনেক উঁচু!"

ভীত চকিত হয়ে সে চারধারে তাকাল, "এ কী? গাছগুলো সব আকাশকে ছুঁয়ে ফেলেছে। হা, ভগবান! এসব কী কান্ড কারখানা ঘটছে? আমি আমার বাগানের শেষ সীমানা দেখতে পাচ্ছিনা। বাড়িগুলো তো সব বিশাল আকার ধারণ করেছে।"

ঠিক তখনই কেন্টারো সেখানে উপস্থিত হল। সারাবড়ি তন্নতন্ন করে সে কাকুকে খুঁজল। না পেয়ে অবশেষে ভেতরের বাগানে গিয়ে সে অবাক হয়ে বলে, "এ তো দেখছি স্বর্ণমুদ্রার পাহাড়! কিন্তু কাকু গেল কোথায়? সে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "কাকু, কাকু তুমি কোথায়?"

হঠাৎ কেন্টারোর মনে একটা ভাবনার উদয় হল, "আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা বার করে ফেলে কাকু এখন মশার মত ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে? তাই হয়তো আমি তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।

"আচ্ছা! চটিটার উপর এটা কী? এটাকে তো ছোট্ট গুবরে পোকা বলে বোধ হচ্ছে..... হায়! হায়! কাকু..... এ তোমার কী অবস্থা হয়েছে? না- না, ওঃ কী ভয়ঙ্কর!" এই বলে আতংকে চিৎকার করে উঠল কেন্টারো।

"আমাকে বাঁচাও! আমায় রক্ষা কর! অনুগ্রহ করে আমার জন্য কিছু একটা কর।"

কিন্তু কাকুর ক্ষীণ আর্তস্বর কেন্টারোর কান পৌছল না।

"বেচারী কাকু! আমি তাকে কোন সাহায্যই করতে পারলাম না। লোভ করে তার এ কী দুর্ভাগ্যহল! হায় হায়!"

স্তূপীকৃত সোনার মুদ্রাগুলোকে একটা থলেতে পুরে কেন্টারো বাড়ি ফিরে এল। সে আর তার মা এর পরেও আরও বহুদিন সুখে কাটিয়েছিল।

অচেনা ঈশান

(পর্ব ২ - মহিলা দিবস)



মালিনী ভট্টাচার্য্য

গৌহাটি শহর থেকে প্রায় ২০ কিমি দূরে আসাম-মেঘালয় ছুঁয়ে 'বর্নিহাট' বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে দিগারু নদীর ধারে ছবির মতন ছোট্টো শ্যামলী গ্রাম 'আপরিকুলা'। সেখানে পা রেখে আলাপ হল "মালোই তেরন" নামে এক মহিলার সাথে। তিনি জানালেন যে এক সময় গ্রামের 'উপদেষ্টা' হয়ে সবার মুশকিল আসান করাই ছিল তার কাজ। ওই কাজ করতে করতে প্রায় ১৫ বছর আগে গ্রামের মেয়ে বউদের নিয়ে কিছু করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নকে সাকার করতে প্রথমেই তিনি সকলের জন্য ব্যাংকে খাতা খোলান (যা আজ আমরা 'জনধন যোজনা' নামে জানি) ও ছোটখাটো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করান, যেমন বয়ন, মুর্গী চাষ, ইত্যাদি। কিন্তু স্বল্পপুঁজিতে বেশি দূর এগোতে সাহস পাননি - তাই অবশেষে সকলের চেনা গণ্ডিতেই ফিরে গেছেন, যা হল "চাষ-বাস"।

এই প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল সবচেয়ে বর্ষিয়ান মহিলা কল্পনা তেরনের (লাহন) সাথে... তিনি জানালেন যে ২০০১ সালে তাঁরা একত্রিত হন ও কয়েকজনকে নিয়ে একটি ছোটো দল তৈরি করেন, যার নাম "আতুর"।

২০০২ সাল থেকে তাঁরা সমবেত ভাবে চাষ শুরু করেন 'হলুদ ও পানের'। পরে সদস্য বাড়লে নতুন উৎসাহে নেমে পড়েন 'ধান' চাষ করতে। এখন তারা মনের আনন্দে গ্রামের জমিতে বিভিন্ন ধরনের ধানচাষ করেন, যেমন আইজং, আমপাখি, জোহা, ইত্যাদি। আজ ৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী সম্মিলিত ভাবে কৃষিকাজ করছে ও নিজেরা রোজগার করে ব্যাংকে টাকাও জমা করছে। ঘর-কন্না, স্বামী-সংসার সামলে দিনের অনেকটা সময় তাঁরা কাটান মাঠে মাঠে ফসল ফলিয়ে। কী যে ভাল লাগল ওদের দেখে। তাই ওদের সাথে মাঠে দাঁড়িয়ে "আমরা চাষ করি আনন্দে..." গানটি গেয়ে ওদের মানে বুঝিয়ে দিলাম।

ওঁদের উন্নতমানের ফলন দেখে জানতে চাইলাম 'সার' এর কথা। ওঁরা জানালেন যে সরকারের তরফ থেকে সার সরবরাহের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তা কখনোই তাদের হাতে এসে পৌঁছোয় না। তাতে কিন্তু তাঁরা থেমে থাকেননি - নিজেরাই জৈবিক সার তৈরি করে ফসল ফলাচ্ছেন - বাজারে বিক্রি করছেন - তার লভ্যাংশ ব্যাংকে জমাও করছেন। কী সার ব্যবহার করেন জানতে চাইলে সরল একগাল হেসে কল্পনা জানালেন যে বৃষ্টির সময় পাহাড় থেকে ধস নামলে সেই পাহাড়-ভাঙা মাটিই হল সবচেয়ে ভাল সার।

এদিকে গল্প করতে করতে সন্ধ্যা নেমে এল দেখে আমিও গুটিগুটি পায়ে গাড়ির দিকে এগোলাম। মনে এঁকে নিলাম এক ছবি - হলদে-সবুজ পাকা ধানের খেতে কমলা, লাল, নীল হলুদের ওড়নায় মাথা ঢেকে, কল্পনা, নীরুলা, জুনালীরা ধান কাটছে। গাড়ি চালু হতেই ড্রাইভারকে বললাম - রেডিও নয়, আমি গাইব "সকল গর্ব দূর করি দিব, (কল্পনা) তোমার গর্ব ছাড়িব না"।

এই প্রসঙ্গে “সীমান্ত বাজার” বা “Border Hat” এর কথা একটু জানাই, যা এ অঞ্চলে খুবই সফল। আপাতত চারটি সীমান্ত বাজার রমরমিয়ে চলছে, যেখানে কল্পনারাও তাদের এই কৃষিজাত পণ্য বিক্রি করেন। বাজারগুলি ২টি মেঘালয়-বাংলাদেশ সীমান্তে (কালাইচর ও বালাত) এবং ২টি ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে (কমলাসাগর ও শ্রীনগর)।

আর এক সাহসী মা-মেয়ের জীবন সংগ্রামের কাহিনী শুনিয়ে এই লেখা শেষ করব। বড়দিনের ছুটিতে কড়কড়ে ঠান্ডায় চলেছিলাম গৌহাটি থেকে মিজোরামের Mt. Hmuifang এর উদ্দেশ্যে। ২০ ঘন্টা সফর করে ক্লান্ত-শ্রান্ত আমরা থামলাম “রাতচোরা” বলে একটি জায়গায়। নামের সাথে মিল রেখে যা রাতের বেলায় চুরি ডাকাতির জন্য বিখ্যাত। দেখলাম সারি সারি অনেক দোকান। কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শে পা রাখলাম ছোট্ট এক দোকানে গরম চা খেয়ে চাঙ্গা হব বলে। ভিতরে ঢুকতেই অবাক হলাম - ওই রাতে ওই জায়গায় এক যুবতী মা ও তার কিশোরী মেয়ে সেই দোকান চালাচ্ছে দেখে। গরম চা হাতে নিয়ে ওদের সাথে এগিয়ে গিয়ে আলাপ করে জানতে পারলাম যে তারা ওই গ্রামেরই ও মহিলা স্বামী-পরিত্যক্তা। ওই দোকানই তার রুজি-রুটি। কত সৎ সাহস ও মনের জোর থাকলে ওইরকম বিপরীত পরিস্থিতিকেও অনুকুল করে নেওয়া যায়!

বল তো, নারী দিবসে ওদের সেলাম না জানিয়ে থাকা যায়?

আঙ্কল স্যাম (২)

সংহিতা



আবার স্বকীয়তা রেখেও ইউনাইটেড স্টেটস্-এর দারুন আলাদা আমিস জনগোষ্ঠী। এঁরা জার্মান। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইউরোপ থেকে এসেছিলেন আমেরিকায় কিন্তু শিল্পসমৃদ্ধ যান্ত্রিক আমেরিকার জীবনযাপণ এঁরা গ্রহণ করেন নি। ছোটো ছোটো শহর বা কসবায় এঁদের বাস। তবে পেন্সিলভ্যানিয়ার ল্যাঙ্কাস্টার কাউন্টি আর ওহায়োর হোমস্ কাউন্টিতে এঁদের বাস কাউন্টি জুড়ে। সেখানে তাঁরা বিশাল বিশাল খামারে চাষ করেন, পশুপালন করেন, হাতে করে আসবাব বানান।

হোমস কাউন্টিতে আমিসদের একটা ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার আছে। সেখানে তাঁরা খুব যত্ন করে জানান যে ‘‘আমিস ওয়ে অফ লাইফ’’ মানে ঠিক কী। আমাদের দেখে সেখানকার গাইড জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘‘তোমরা তো ভারত থেকে আসছ?’’ আমরা ‘‘হ্যাঁ’’ বলতেই বলেছিলেন, ‘‘তোমাদের সাথে আমাদের অনেক মিল। আমরাও আমাদের বাড়ির বৃদ্ধ মানুষদের সাথে একসাথে বাস করি। একেক বাড়িতে বয়স্ক বাবা-মা, তাঁদের ছেলে-পুত্রবধূ আর নাতি-নাতনির সাথে বাস করেন।’’ কিন্তু পরে একটা তথ্যচিত্রতে দেখলাম যে এক যুবক ও যুবতী একে অপরকে বিয়ে করবে বলে মনস্থ করলে সমাজের বয়জ্যেষ্ঠদের সমষ্টির কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতির সঙ্গে নববিবাহিতদের দেওয়া হয় খামার করার জায়গা। তারপর বিয়ে হয়ে গেলে নবদম্পতির বার্নহাউস বা শস্যগোলা বানিয়ে দেন গোষ্ঠীর সমস্ত পুরুষ মিলে। এক বেলায় সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে কাজটা সারতে হয় তো, তাই অনেক লোক মিলে হাত লাগান বোধ হয়। আর অতজন কাজ করবেন মানে তাঁদের সকালের জলখাবার , দুপুরের খাবার এবং সন্ধের খাবারের আয়োজন রাখতে হয়। আয়োজনের দায়ভার বহন করেন নব দম্পতি, আর খাবার রান্নার আর পরিবেশনে লাগেন গোষ্ঠীর মহিলারা। মানে পুরুষেরা যখন নবদম্পতির বার্ন তৈরির কাজে ব্যস্ত, তখন তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করেন তাঁদের মা, স্ত্রী, কন্যারা।

এসব কাজ গ্রীষ্মকালেই হয়। কারণ গ্রীষ্মের দিনে আলো ফোটে পাঁচটার আগে। আর সূর্য ডোবে প্রায় রাত নটার সময়ে। সন্ধে সাতটা থেকে এক অতি দীর্ঘ গোধূলি থাকে। ফলে দিনের আলো ব্যবহার করে বাইরের যাবতীয় কাজ সেরে ফেলতে চান ইউনাইটেড স্টেটসের সক্কলে, আমিসরা তো বটেই, নির-আমিসরাও। মানে যাঁরা আমিসদের মতো মূলতঃ কৃষি ও বনজ কাঠের কাজের মতো কাজ করেন না, তাঁরাও দিনের কাজ উপার্জনের কাজ শুরু করে দেন সকাল সাতটার মধ্যে। সে কাজটা রাস্তা সারাইয়ের মতো, নর্দমা তৈরি করার মতো বাইরের কাজ না হলেও, আপিসে বসে খাতাতে, কম্পিউটটারে হিসেব কষার কাজ হলেও। তার মানে বাইরের কাজে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয় ভোররাত থেকে।

আবার দিনের বেলা বাইরের কাজ মিটিয়ে ফেলতে চাওয়ার মধ্যে আমিসদের একটা বিশেষ কারণ আছে। সেটা হলো এঁরা ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করেন না। মোমবাতি বা কেরোসিন ল্যাম্প ব্যবহার করেন। সেলফোন তো দূর, টেলিফোনও ব্যবহার করেন না। ফলে হোমস কাউন্টির গভীরে ইলেকট্রিক কিংবা টেলিফোনের খুঁটি নেই কোনো। চাষ করেন ঘোড়ায় টানা লাঙল দিয়ে। কাপড় কেচে দড়িতে ঝুলিয়ে শোকান। নালা, নদী, ঝোরা পেরোনোর সেতুগুলো কাঠের। যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করেন ঘোড়ার গাড়ি, সেগুলোকে ডাকা হয় বাগি বলে। তবে বার্নের সামনে পার্ক করে রাখা অটোমোবাইল দেখেছি। দেখেছি রিস্টওয়াচ পরা আমিস মহিলাও।



আমিস নারী-পুরুষের জামা-প্যান্ট তৈরি করা হয় নীল রঙের কাপড় থেকে। সারা কাউন্টির সব্বাই নীল জামা পরেন কাউন্টিতে। বয়স্ক পুরুষেরা লম্বা দাড়ি রাখেন। টুপি পরেন কালো। পরেন কালো প্যান্ট আর কোট। আর সাদা শার্ট। প্যান্ট নীল হোক বা কালো তাতে সাসপেন্ডর থাকে। বয়স্ক মেয়েরা খোঁপা করে মাথার চুল বেধে রাখেন, মাথা ঢেকে রাখেন কাপড়ে, কাপড়টা দড়ি দিয়ে বাধা থাকে থুতনির নিচে। মাথার কাপড়ের এই ব্যবস্থাকে বলে বেবুস্কা। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত আমিস ছেলেমেয়েরা চার্চের ইস্কুলে যায়। সেখানে তাঁরা খ্রিষ্ট ধর্ম এবং আমিস কায়দা কানুন সম্পর্কে শিক্ষা পায়। তারপর ষোলো বছর বয়স অবধি চলে খামারের কাজের আর হাতের হাজের শিক্ষানবিশী বাড়ির বয়স্কদের কাছে। ষোলো বছর বয়স হলে আমিস ছেলেমেয়েদের এক বছরের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় আমিস সমাজের বাইরের পৃথিবী দেখার জন্য, জানার জন্য, বোঝার জন্য। খুব কম সংখ্যক আমিস ছেলেমেয়েরা ফিরতে নারাজ থাকে আমিস জীবনে। অধিকাংশই ফিরে আসে নিজের পরিবারের কাছে। তারপর তাদের আমিস চার্চে দীক্ষিত করা হয়।

আমিস সমাজে খ্রিষ্টধর্ম বেশ আদ্যিকালের মত মেনে চলে। আমিসরা যুদ্ধ করেন না। নেন না রাজানুগ্রহ। তাঁরা শুধু বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত পরিশ্রম করে, বাকি সময় ঈশ্বরচিন্তায়, পড়শীর কল্যাণে কাটানোর মত মানেন আর পালন করেন। প্রায় চারশো বছর আগে স্যুইস প্রশাসকদের বিষনজরে পড়ে আমিসরা ক্রমশ দুর্গম থেকে দুর্গমতর এলাকায় সরে যেতে থাকেন, উত্তরে জার্মানীতে আর পশ্চিমে ফ্রান্সে। তারপর ক্রমে তাঁরা পৌঁছে যান অ্যামস্টারডামের আশেপাশে, হল্যান্ডে প্রায় দেড়শ বছর ধরে। বলাবাহুল্য আরও পশ্চিমে যাওয়ার প্রয়োজনে তাঁরা আটলান্টিক পেরিয়ে হাজির হয়েছিলেন আমেরিকা মহাদেশে। এখন থেকে আড়াইশো বছর আগে ইউরোপ জুড়ে নানান ধর্মীয় গোষ্ঠীর হত্যাকাণ্ড শুরু হতেই আমিসরা ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি জমান, তাঁদের ধর্মানুশাসনের কারণেই। তাঁরা কখনও অস্ত্র ধরেন না। ফলে যুদ্ধে কিংবা বাছাই করা ধর্মীয় গোষ্ঠীর হত্যাকাণ্ড চললে, প্রাণ বাঁচাতে তাঁদের দেশত্যাগী হওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। তাঁদের ভাষা আজও জার্মান। ঘরোয়া আমিস জীবন আর আমিস মানুষের ধর্মানুবর্তীতা খুব সহজ সরল ও মনোগ্রাহী করা দেখানো হয়েছে হ্যারিসন ফোর্ড অভিনীত ১৯৮৫ সালের

উইটনেস ছবিতে। যদিও এটা বড়োদের ছবি, কিন্তু এই ছবির মুখ্য চরিত্রে আছে একজন শিশু। তাই বাবা-মায়ের সাথে বসে এই ছবিটা দেখে আমিস জীবন কেমন তা জানার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারের গাইড খুব সুন্দর বুঝিয়েছিলেন, ''পেন্সিলভ্যানিয়াতে যে আমিসরা প্রথম এসে পৌঁছেছিলেন তাঁদের জার্মান উচ্চারণের জন্য তাদের পেন্সিল্ভ্যানিয়া ডাচ বলে ডাকা হত। তার থেকে অনেকে মনে করেন যে আমিস নামটা বোধ হয় অ্যামস্টারডাম থেকে এসেছে। কিন্তু তা নয়। আমিস চার্চের আদি ধর্মপ্রচারক জেকব আম্মানের নাম থেকে এসেছে আমিস গোষ্ঠির নাম।'' আমিসদের প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে মেনোনাইটস্‌দের কথা। মেনোনাইটস্‌দের ধর্মভাবনা আমিসদের মতো হলেও তাদের জীবনযাপণ খানিক আলাদা। যদিও ভৌগোলিকভাবে এই দুই গোষ্ঠী প্রায় একত্রে বাস করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ইউনাইটেড স্টেটস সরকার ঘরে ঘরে চিঠি পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে যেতেন নবীন পুরুষদের যোদ্ধা হওয়ার জন্য, মাতৃভূমির সেবা করার জন্য, তখনও আমিসরা কেউ রাজি হন নি যুদ্ধে যোগ দিতে। কেবলমাত্র একজন মেনোনাইট যুবক সমগ্র গোষ্ঠীর হয়ে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচারক হয়ে। তার মানে কী আমিসরা দেশদ্রোহী? দেশের আইন মানেন না? এই বিতর্কে আমিসরা বলেন, ''আমার ধর্ম আমাকে শান্তির পথ নিতে নির্দেশ দিয়েছে। যুদ্ধ করলে আমি ধর্মচ্যুত হব। রাষ্ট্র থেকে আমি কোনো দান গ্রহণ করি না। যেমন বৃদ্ধ হলে কিংবা অন্য সময়ে খেটে খাওয়ার মতো গায়ের জোর না থাকলে সরকারী কোনো সাহায্য আমি গ্রহণ করি না। আমার পরিবার, পরিজন, প্রতিবেশীদের আনুকুল্যেই আমার চলে যায়। তাহলে আমি সরকারী নির্দেশে অধর্ম করব কেন?'' আবার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারের গাইড বলেছিলেন, ''তবে যদি পুলিশ এসে আমাদের কাউকে ধরে তাতে তো আমরা বাধা দিই না। কোর্টের সাবপিনাতে সাড়া দিয়ে বিচারকের দরবারেও হাজির হই। রাষ্ট্রের আইনের সাথে সহায়তা করি সবসময়। তবে আমরা যেহেতু কোনো নেশা করি না, কোথাও কারুর সাথে মারপিট করি না আমাদের দরজাতে কখনও পুলিশ হাজির হয় না। আসে না আদালতের সমনও।''

হোমস কাউন্টির মিল্‌সবার্গ এলাকাকে লিটল স্যুইজারল্যান্ড বলা হয়। জায়গাটা ছবির মতো সুন্দর দেখতে। আমি দেখেছি গ্রীষ্মে। পাহাড়ের সবুজ ঢেউয়ের মধ্যে সাদা কাঠের বাড়ি আর তার রঙীন ছাদ। ঝিল আর তার ওপরের কাঠের রঙীন পুল। শীতে বরফের মধ্যে জায়গাটাকে স্যুইজারল্যান্ডের মতোই লাগে নাকি। আসলে এখন এখানে যাঁরা বাস করেন তাঁদের পূর্বপুরুষের আদিবাস তো স্যুইজারল্যান্ডেই। তাই আদিভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা মনে পড়লে আমেরিকার আমিস গোষ্ঠীর আদি অভিবাসীরাও আবেগাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। তাঁদের আদিপুরুষ আদিভূমি থেকে বাস উঠিয়ে প্রাণের তাগিদে বেছে নিয়েছিলেন ইউরোপের দূর্গম থেকে দুর্গমতর এলাকা। তারপর প্রাণের তাগিদে আমেরিকা পৌঁছে তাঁরা নিজেদের বাসভূমিকেই সাজিয়ে তুলেছেন আদিভূমির মতো, পূর্বপুরুষের থেকে বংশানুক্রমে লালন করে রাখা আদিভূমির স্মৃতিকে উজিয়ে রেখে মিল্‌সবার্গকেই করে তুলেছেন স্যুইজারল্যান্ড।

আমিস এলাকা ছাড়াও ইউনাইটেড স্টেটস্‌-এর অন্যান্য শহর আর গ্রামও খুব ঝকঝকে পরিষ্কার। তার কারণ বোধ হয় পশ্চিমের দেশগুলির ময়লা জড়ো করা আর তা ফেলে দেওয়ার জন্য সচেতনতা। দেশগুলোর সচেতনতা মানে সেই দেশের মানুষগুলোর সচেতনতা। সেই সচেতনতা দিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন একটা ব্যবস্থা যা তাঁদের ঘর, উঠোন, পাড়া, মহল্লা, বাজার, শহর, গ্রাম সব পরিপাটি পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। ব্যবস্থা মানে কী? মানে কিছু নিয়ম, যা সব বাসিন্দাকেই মানতে হবে, না মানলে প্রথমে জরিমানা পরে শাস্তি পেতে হবে। যেমন সিঙ্গাপুরে চ্যুইং গাম খাওয়া নিষেধ। এটা যদিও পুবের দেশ, তবুও। যেমন লন্ডনের দেওয়ালে স্প্রে পেইন্ট দিয়ে গ্রাফিত্তি করা নিষেধ। কিন্তু ব্যবস্থা মানে কয়েকটা কাজ যা করলে জীবন নোংরা হয় তা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করাই শুধু নয়, কিছু কাজ যা করলে জীবন পরিচ্ছন্ন হয় তা করতে নাগরিকদের বাধ্য করা।

ক্রমশ

মৃত্যুঞ্জয়ী হিরোশিমা

উমা ভট্টাচার্য



কিছুদিন আগে বেড়াতে গিয়েছিলাম জাপানে।প্রথম দিনই দেখতে গিয়েছিলাম হিরোশিমাকে।চোখে ভাসছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে পারমাণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমার নানা চিত্র।ভাবছিলাম কেমন হবে আজকের সেই হিরোশিমা? কেমন আছে সেখানকার মানুষজন?

গিয়ে দেখলাম এক আনন্দময় সবুজ,শ্যামল হিরোশিমাকে।দেখলাম এক মৃত্যুঞ্জয়ী হিরোশিমাকে।এবারের বিশ্বের জানালা পর্বে শোনাব সেই প্রাণবন্ত নতুন হিরোশিমা আর পুরনো হিরোশিমার কথা।আজকের হিরোশিমা ১৯৪৬ সালের পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা হিরোশিমা।

বিশ্বযুদ্ধকালীন জাপানের সাম্রাজ্যবাদী রাজাকে শিক্ষা দিতে একটা গোটা বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের ওপর ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট 'লিটল বয়' নামক পারমাণবিক বোমাটি নিক্ষেপ করেছিল আমেরিকা।হিরোশিমার ডাউনটাউন, ব্যাবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল, হিরোশিমার প্রাণকেন্দ্র নাকাজিমা অঞ্চলের ওপর নেমে এসেছিল এই আঘাত। হিরোশিমার মূল নদী, প্রাণদায়িনী 'ওটা' নদী নাকাজিমা জেলার উত্তরে এসে দুইভাগে ভাগ হয়ে পূর্ব আর পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দেখে মনে হবে যেন দুদিকে দুটি হাত প্রসারিত করে আদরে ঘিরে রেখেছে নাকাজিমা জেলাকে।পূর্ব দিকের নদীটির নাম 'মোতাইয়াসু' আর পশ্চিম দিকের নদীটির নাম 'হন'-দুজনে বয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে।স্থানটি ছিল খুবই শান্ত, সুন্দর,বর্ধিষ্ণু,উন্নত আর গুরুত্বপূর্ণ।

১৮৭১ সালে হান বংশের রাজত্বকাল শেষ হয়ে জাপানে মেইজি রাজতন্ত্রের শাসনকাল শুরু হয়েছিল। চালু ছিল ১৮৭১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত। এই সময়ের শুরুতেই হিরোশিমা নগরটি 'হিরোশিমা প্রিফেক্চার'-এর রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। মেইজি রাজারা এসেই সমস্ত প্রাদেশিক রাজাদের অধিকার শেষ করে দিলেন,প্রদেশগুলোকে ভেঙে দিয়ে সমগ্র জাপানকে ভাগ করলেন কতকগুলো প্রিফেক্চারে।তারই একটি হল হিরোশিমা প্রিফেক্চার। ১৮৭১ সালেই হিরোশিমাতে গড়ে উঠেছিল আধুনিক সেনাবাহিনী। দুর্গও তৈরি হয়েছিল। ১৮৯৫ সালের মাত্র চারদিনের চিন-জাপান যুদ্ধের সময় হিরোশিমা হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি একটি সুগঠিত সামরিক শহর।



মোতাইয়াসু আর হন,দুটি নদী দিয়ে ঘেরা ত্রিভুজাকৃতি ভূখন্ড হিরোশিমাতে অর্থাৎ পূর্বতন নাকাজিমা জেলায় নদী দুটির ধার ধরে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য বাজার,দোকান,ব্যাঙ্ক,স্কুল,কলেজ,হাসপাতাল,উপাসনালয়, সিনেমা হল আর অসংখ্য মানুষের শান্তির নীড়। এখানকার সাতটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের শেষ ৬টি এই সময়েই স্থাপিত হয়েছিল।একটি ছিল আগের আমলের। শিল্প স্থাপিত হয়েছিল প্রচুর। পণ্য পরিবহনের সুবিধার জন্য ১৮৮০ সালে উজিনা বন্দর স্থাপনে হিরোশিমার মাথায় আরেকটি পালক লাগে, হিরোশিমা হয়ে ওঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী।নদী দিয়ে ভেসে চলত পণ্যবোঝাই নৌকা।নদীপথেই আসত এলাকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান।আমদানি-রপ্তানি,যাতায়াত চলত নদীপথে।

সবদিক থেকে এত গুরুত্বপূর্ণ, উন্নত, জনবহুল শহরকেই প্রথম পারমাণবিক বোমার লক্ষ করা হয়েছিল।সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্রের আঘাতে জাপানের সামরিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চেয়েছিল আমেরিকা।চূড়ান্তভাবে সফলও হয়েছিল।৪৪০০ কেজি ওজনের ৩মিটার লম্বা আর ৭১০ মিলিমিটার ব্যাসের সেই 'ছোট্ট ছেলে' বা 'লিট্‌ল বয়' মারণাস্ত্রটি এক লহমায় ধ্বংস করেছিল বিশাল এলাকার শহরটিকে, লাখো মানুষ সঙ্গেসঙ্গেই মারা গিয়েছিল, কিছু মানুষ হাসপাতালে মারা গিয়েছিল।

হাসপাতালে দীর্ঘদিন যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করে যারা টিকে গিয়েছিল সেই 'হিবাকুশা'(সারভাইবার)দের আত্মীয়স্বজন ছিল না। খাদ্য,বস্ত্র, আশ্রয় কিছুই ছিল না। শিশু,যুবক,বৃদ্ধ নির্বিশেষে সব হিবাকুশাদের ঠাঁই হয়েছিল রাস্তায়।

মোতাইয়াসু নদীর পূর্বদিকে ১৯১৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল হিরোশিমা শহরের বাণিজ্যদ্রব্যের প্রদর্শন গৃহ। নাম ছিল 'হিরোশিমা প্রিফেকচারাল প্রোডাক্টস্ এক্সিবিশান হল'-যা এ্যাটম বোমের তান্ডবে পুরোপুরি ধ্বংস হয়নি। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি মাথায় গম্বুজ আকারের লোহার তৈরি শক্ত খাঁচাটি নিয়ে, সারা অঙ্গে বর্বরতার ক্ষতচিহ্ন ধারণ করে আজও কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে।নাম তার গেন্-বাকু-ডোম বা এ্যাটমিক বোম্ ডোম।বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল হেরিটেজ বিল্ডিং-এর মর্যাদা পেয়েছে তা।

নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম হিরোশিমার ধ্বংসলীলার মূর্তিমান সাক্ষীকে-যেটি অচিরেই হয়ে উঠেছিল হিরোশিমার ল্যান্ডমার্ক।বোমাক্রান্ত হিরোশিমার ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত বিকলাঙ্গ হয়ে যাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে সে ধিক্কার জানাচ্ছে সভ্য বর্বরদের। যেন বলছে,পৃথিবী যেন আর কখনোই পারমাণবিক বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন না হয়।পৃথিবী হোক শান্তির আলয়।

সেদিন সারা নাকাজিমা জেলাটিই নিমেষে পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে,আজ সে ঘুমিয়ে আছে মাটির নীচে। একসময়ের সেই প্রাণবন্ত জেলার শূন্যস্থানের ওপরেই ১৯৫৪ সালে জাপান গড়ে তুলেছে বিশ্বশান্তির প্রতীক 'হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল পার্ক' বা 'হিরোশিমা জাতীয় শান্তি-স্মৃতি উদ্যান'। জাপানি ভাষায় নাম হল 'হিরোশিমা হেইওয়া কিনেন কোয়েন'। মোটামুটি ১,২২,১০০ বর্গমিটার জায়গা জুড়ে এই পার্ক। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্টের সেই বিস্ফোরণের পর অগ্নিদগ্ধ যন্ত্রণাকাতর হাজার হাজার মানুষ দেহ শীতল করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মোতাইয়াসু নদীর জলে।হাজার হাজার মৃত

মানুষের দেহে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল নদীর বুক। শীতল জলের নদীটি মানুষের রক্তে পরিণত হয়েছিল রক্তনদীতে। সেসব মানুষদের আত্মার শান্তির জন্য আর হৃদয়হীন যুদ্ধবাজ মানুষদের নীরব তিরস্কার জানাতে নদীর তীর ধরেই গড়ে তোলা হয়েছে এই শান্তির উদ্যান। এই উদ্যানেই আছে 'পিস ক্লক টাওয়ার'- যেখানে প্রতিদিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে-বিস্ফোরণের সময়টিতে টাওয়ারের ঘড়িটিতে এক প্রতীকি এ্যালার্ম বেজে ওঠে। সংকেতধ্বনিটি যেন পৃথিবীকে জানাতে চায় আর যুদ্ধ নয়, শান্তি নেমে আসুক পৃথিবীর প্রতি দেশে,প্রতি কোণে।১৫৯০ সালে নির্মিত যে হিরোশিমা ক্যাসেল ঘিরে গড়ে উঠেছিল উন্নত হিরোশিমা সেটিও বোমায় বিধ্বস্ত হয়েছিল। সেটিও ১৯৫৮ সালে পুনর্নির্মিত হল, ফিরে গেল আগের রূপে, নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রেখে।

সবুজ গাছে গাছে ছাওয়া পিস পার্কের ঠিক মাঝখানেই নির্মিত হয়েছে 'সিনোট্যাফ'- অনেকটা জাপানি কফিনের মত দেখতে,সাদা রঙের আর্চ।হিরোশিমায় বোমার আঘাতে মৃত হাজার হাজার মানুষের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ দিতে,১৯৫২ সালের ৬ই আগস্ট তৈরি হয়েছিল এই সিনোট্যাফ। এর নিচে জাপানি ভাষায় লেখা আছে একটি প্রতিজ্ঞা,আর মৃতদের আত্মার শান্তি কামনার বাণী।যার মর্মার্থ,"তোমরা এখানে শান্তিতে ঘুমোও,আর আমরা কেউ দ্বিতীয়বার এই ভুল করব না।"

এই সিনোট্যাফের কাছেই আছে একটি বিশাল আকারের 'শান্তিপ্রদীপ।' পরমাণু বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রণাকাতর সকল মানুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সাল থেকে এখানে জ্বালানো রয়েছে এই 'অনির্বাণ শান্তিপ্রদীপ।' এই প্রদীপের অবিরত জ্বলে যাওয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক নিঃশব্দ প্রতিবাদ।



পার্কের পশ্চিমের অংশে আছে 'পিস বেল্ টাওয়ার'।এই টাওয়ারের মাথার ওপরের ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠা ডোম আকৃতির ছাদটি আসলে ইউনিভার্স-এর প্রতীকী রূপ।ছাদ থেকে ঝুলছে ১.২০০কিলোগ্রাম ওজনের একটি বেল-শান্তির ঘন্টা।এটির গায়ে আঁকা আছে জাতীয় সীমারেখাহীন বিশ্বের মানচিত্র-যেন প্রতিফলিত করছে 'এক বিশ্বের'ধারণাকে। যেখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না,শত্রুতা থাকবে না,যুদ্ধ থাকবে না,পরমাণু বোমা থাকবে না।ঘণ্টাটির গায়ে,যেখানে আঘাত করে মানুষ ঘণ্টাটি বাজাবে সেই জায়গাটিতে আঁকা আছে পারমাণবিক হাতিয়ারের প্রতীক চিহ্ন।যেন পরমাণু অস্ত্রের প্রতীকের ওপর আঘাত হেনে পৃথিবী থেকে পারমাণবিক অস্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করবে সাধারণ মানুষ।ঘন্টাটির গায়ে গ্রিক, জাপানি ও সংস্কৃত ভাষায় একটি বাণী লেখা আছে যার অর্থ-'নিজেকে জানো'।

বেল টাওয়ারের মাথার ডোমের গায়ে আছে দাঁড়ানো একটি বালিকার মূর্তি, হাত দুটি তার ওপরের আকাশের দিকে তোলা।যেন কিশোরী সাদাকো সাসাকি দাঁড়িয়ে আছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার হাত পেতে। বম্বিং-এর সময় দু'বছরের ছিল মেয়েটি, তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় বারো বছর বয়সে।মারা যার লিউকেমিয়ায়।পিস বেলের কাছাকাছি একটি মিউজিয়ামের বাক্সে রাখা আছে তার হাতে বানানো ৬৪২টি কাগজের সারস। জাপানের উপকথায় আছে কেউ যদি ইচ্ছাপূরণের বাসনা নিয়ে ১০০০ কাগজের সারস বানাতে পারে তবে তার ইচ্ছাপূরণ হয়।সুস্থ হয়ে বাড়ি যাবার বাসনা নিয়ে সে হাসপাতালের বিছানায় বসে বসে ৬৪২ টি রঙিন কাগজের বক বানানোর পর মারা যায়। সাসাকির স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর সহপাঠীরা বানায় 'পেপার ক্রেন ক্লাব'। পিস পার্কে আজও ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন কিছু কাগজের সারস বানিয়ে উৎসর্গ করে

সাসাকি ও তার মত যেসব শিশুরা মারা গেছে তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। এরই কাছাকাছি আছে ‘চিলড্রেন্স পিস মনুমেন্ট’,সেখানে আছে একটি সারস আর একটি কিশোরীর স্ট্যাচু।

এখনও প্রতি বছর ওই তারিখে,সন্ধ্যাবেলায় মোতোইয়াসু নদীতে কাগজের লণ্ঠন ভাসিয়ে দেন মৃত আত্মাদের শান্তি কামনা করে।মনে হয় যেন আলোকিত আত্মারা ভেসে চলেছে শান্তির দেশের উদ্দেশ্যে।

পার্কের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত হিরোশিমা ন্যাশনাল পিস মেমোরিয়াল হল।দ্বিতল এই বাড়িটির



সবটাই অবস্থিত মাটির নিচে,বাইরে আছে শুধু একটি ঘড়ির(প্রতীকী)মিনার,ঘড়ির কাঁটাটি থেমে গেছে ঠিক ৮টা বেজে ১৫মিনিটে।এই মিনারের চারদিক ঘিরে বানানো হয়েছে জলের ফোয়ারা। বোমার আঘাতে যে সব মানুষ মৃত্যুর আগে পানীয় জলের জন্য আর্ত চিৎকার করে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন তাঁদের তৃষ্ণার্ত আত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই ফোয়ারার জল।এই হলের একতলায় আছে সেমিনার হল,একজিবিশন হল,পরমাণু বিস্ফোরণ সংক্রান্ত তথ্যে পূর্ণ লাইব্রেরি।দ্বিতীয় তলে আছে ‘ভিক্টিম্স্ ইনফরমেশন হল’ আর ‘হল অফ রিমেমবারেন্স’।এখানে বোমার আঘাতে তৎক্ষণাৎ মৃত ১৪০,০০০মানুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১৪০,০০০ টাইল্স্ দিয়ে চিত্রায়িত হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হিরোশিমার ছবি।দেওয়ালে চিত্রের নিচের দিকে লেখা আছে মৃতদের নাম।হিরোশিমার নির্মম ট্র্যাজেডির মূর্ত প্রতীক এই দেওয়ালচিত্র।

পিস পার্কের একেবারে দক্ষিণে, শেষপ্রান্তে আছে ১৯৫৫ সালে গড়ে তোলা পিস্ মেমোরিয়াল মিউজিয়াম।এটি পুরনো বিল্ডিং,সাজানো মূলত মডেল, ফটো আর বোমার আঘাতে পুড়ে যাওয়া জিনিসপত্রের অংশ,আর সেই মৃত্যুদূত লিটল বয়ের খোলটি দিয়ে।এছাড়া ও আরও অনেক কিছু।ছবি আছে সেই কালো বিষের ধোঁয়ার।যে কালো ধোঁয়া খানিক উঁচুতে উঠে বাটন মাশরুমের আকার ধারণ করেছিল,আর নেমে এসে বিধ্বংসী এক চাদর বিছিয়ে দিয়েছিল হিরোশিমার ওপর।গিলে ফেলেছিল একটা জীবন্ত শহরকে আর ছিবড়েগুলো ছড়িয়ে রেখে গিয়েছিল শ্মশানের ছাই আর পোড়া কাঠকয়লার মত ধ্বংসস্তূপরূপে।

আরও অনেক না জানা কথাই জানালেন আমাদের গাইড কাজুমি সান। আমাদের দেশে যেমন নামের শেষে জি বা দাদা দিদি লাগিয়ে সম্বোধন করা হয়,জাপানে তেমনি কাউকে সম্বোধন করতে হলে নামের শেষে সা বা সান ব্যবহার করতে হয়।

জাপানের হিরোশিমা নীরব প্রতিবাদ করতে যেসব আয়োজন করেছে তা এক কথায় বিস্ময়কর।এত মানুষের মৃত্যুর জন্য হা-হুতাশ করে বসে না থেকে জাপান আর হিরোশিমাকে আবার গড়ে তুলেছে জাপানিরা। প্রচন্ড পরিশ্রম, একাগ্রতা আর ডিসিপ্লিনে তারা গড়ে তুলেছে গুঁড়িয়ে যাওয়া দেশকে,অর্থনীতিকে। বাঁচিয়ে তুলেছে তাদের শিল্প, কৃষ্টি আর সংস্কৃতিকে। হিরোশিমার ধ্বংসের ইতিহাসের সাক্ষী হতে গিয়ে মনে হচ্ছিল আইনস্টাইন বোধ হয় আত্মদহনে ভুগেছিলেন তাঁর সেই

যুগান্তকারী ফর্মূলা আবিষ্কারের জন্য। মনে হচ্ছিল যে ফর্মূলার ওপর ভিত্তি করে আমেরিকার মানহাটান প্রজেক্টের গবেষণার ফল-পারমাণবিক বোমা সৃষ্টি হয়েছিল আইনস্টাইনের সেই যুগান্তকারী নিরীহ ফর্মূলা $E=MC^2$ এই ধ্বংসলীলার পরে যেন হয়ে দাঁড়িয়েছিল মৃত্যুর সহজ ফর্মূলা।

বীভৎস সেই হত্যালীলার সমস্ত অবশেষ প্রমাণ হিসাবে সংগ্রহ করে রেখেছে জাপান।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হত্যানায়কদের বীভৎসতম কুকাজের সব তথ্যই জাপান সযত্নে রক্ষা করেছে 'ওয়ার মিউজিয়ামে'।পর্যটকদের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের কাছে নীরবে পৌঁছে দিচ্ছে বিশ্বে শান্তি রক্ষার

আজকের হিরোশিমাতে আছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি রেলস্টেশন,দীর্ঘ প্রশস্ত রাজপথ, আধুনিক যানজট নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি,অসংখ্য বহুতল বিল্ডিং,মাটির নীচে বেসমেন্টে স্থাপিত শপিং মল।আরও কত কী। ১৯৪৯ সালে আইন পাশ করে হিরোশিমাকে 'শান্তি-শহর'হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেন জাপানের সম্রাট হিরোহিতো।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশার শেষ হল, রাজতন্ত্রের জাপানের যুদ্ধবাজ নীতি পরিত্যক্ত হল হিরোশিমা ও নাগাসাকির নামে দুটি নগর আর মানুষের ধ্বংসের বিনিময়ে। জাপান সরকারের যুদ্ধোত্তর নীতি গড়ে তুলল নতুন হিরোশিমা।শান্তিময় হিরোশিমা।প্রত্যয়ী হিরোশিমা।

হিরোশিমার প্রাচীন ইতিহাস বেশি দিনের নয়।প্রায় চারশো বছর আগেকার কথা। 'সেতোইনল্যান্ড' সাগরের বুকে 'ওটা' নদীর মোহনার গড়ে ওঠা হন্সু দ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে ছিল একটি প্রশস্ত স্থান-জাপানি ভাষায় নাম ছিল 'গো-কামুরা'।কেউ থাকত না সেখানে।সমুদ্রের তীরে প্রশস্ত অঞ্চল জুড়ে এলোমেলোভাবে বয়ে যেত সাত সাতটি নদী-যা ছিল গো-কামুরার,পরবর্তীকালের হিরোশিমার গর্ব।আজও বয়ে চলেছে সেই সপ্তনদী।

পার্শ্ববর্তী আকিপ্রদেশে বাস করতেন সেই প্রদেশের রাজা মোরি তেরুমোতো। জাপানের বিখ্যাত মোরি বংশের উত্তরসূরী ছিলেন এই দায়মিও অর্থাৎ প্রাদেশিক রাজা।তাঁর নজর পড়লো সেই অঞ্চলটির দিকে।রাজা বুঝলেন তিনদিকে পর্বতবেষ্টিত নদীবহুল প্রশস্ত জায়গাটি শাসনকার্য পরিচালনার পক্ষে যেমন উপযোগী হবে তেমনই ব্যাবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও হবে সুবিধাজনক।

জায়গাটিকে নির্বাচন করার পরই তড়িঘড়ি করে একটি বিরাট সুরক্ষিত ক্যাসেল নির্মাণ শুরু করলেন। চার বছরের মধ্যে সেই জনশূন্য জায়গায় নির্মিত হল তাঁর বিরাট ক্যাসেল,অসমাপ্ত অবস্থাতেই ১৫৯৩ সালে রাজা চলে এলেন সেই ক্যাসেলে-জায়গাটির নতুন নাম দিলেন 'হিরোশিমা'। অবহেলায় পড়ে থাকা প্রান্তর গো-কামুরা ধীরে ধীরে পরিণত হল দুর্গনগরী হিরোশিমায়।হিরো মানে প্রশস্ত আর শিমা মানে ব-দ্বীপ। প্রশস্ত সেই ব-দ্বীপ হিরোশিমার ইতিহাসে শুরু হল সেনগোকু যুগ,যা চলেছিল ১৫৮৯ সাল থেকে ১৮৭১ সালে একচ্ছত্র মেইজি রাজতন্ত্রের শাসন শুরু হওয়া পর্যন্ত।

হিরোশিমার নদীগুলির ফাঁকে ফাঁকে ছিল ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। রাজা তেরুমোতো প্রথমেই নদীগুলির ওপর সেতু তৈরি করে দ্বীপগুলিকে জুড়ে দিলেন পরস্পরের সঙ্গে।প্রশস্ত রাজপথ তৈরি করলেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম করলেন। জনবসতি বাড়তে লাগল, ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়তে লাগল।সাত বছরের মধ্যেই হিরোশিমা এক বর্ধিষ্ণু জনবহুল,প্রাণোচ্ছল নগরে পরিণত হল।এবার এই অঞ্চলের দিকে হাত বাড়ালেন তোকুগাওয়া রাজবংশ। সেকিগাহারা নামক স্থানের যুদ্ধে হিরোশিমার দখল নিলেন তাঁরা।এই তোকুগাওয়া রাজারা তাঁদের নিজস্ব সেনাবলে জাপানের সার্বভৌম সম্রাটের ক্ষমতাকে অস্বীকার করে ধীরে ধীরে জাপানে বলবৎ করেছিলেন তোকুগাওয়া শগুনেট বা তোকুগাওয়া শাসন। প্রায় দুশো আটষট্টি বছর ধরে জাপানে তাদের শাসন বলবৎ ছিল।এক রাজার থেকে অন্য রাজার অধীনে এলেও অবস্থানের গুরুত্বের জন্য হিরোশিমার উন্নয়ন বা বিকাশ ছিল অব্যাহত। দীর্ঘকাল ধরে সাধারণ মানুষ আর যোদ্ধা বীর সামুরাইদের পাশাপাশি অবস্থানে হিরোশিমাতে গড়ে উঠেছিল এক উন্নত মিশ্র সংস্কৃতি।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবার জাপানে ফিরে এল মেইজি রাজবংশের শাসন।রাজা তেরুমোতোর এক বংশধর প্রাদেশিক রাজাদের সহায়তায় তকুগাওয়া শগুনেটের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করলেন।এই ইম্পেরিয়াল বা রাজতন্ত্রের যুগেই জাপান পেল নেশন-এর রূপ,শুরু হল জাপানের তথা হিরোশিমা্র আধুনিকীকরণ।সে কাহিনী শুরুতেই বলেছি। তাঁর পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে হিরোশিমা সাক্ষী হল পারমাণবিক আক্রমণের। কিন্তু হিরোশিমা স্বল্পকালের মধ্যেই সব ক্ষতি সামলে নিয়ে শুরু করল আধুনিকীকরণের কাজ। অচিরেই আবার শুরু হল হিরোশিমার পুনরুজ্জীবন-মৃত্যুঞ্জয়ী হল বিধ্বস্ত হিরোশিমা।আজ সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে বোঝাই যায় না যে মাত্র একাত্তর বছর আগে এক মহাপ্রলয়ের ধাক্কায় ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল হিরোশিমা। কিন্তু নিখোঁজ হয়ে যায়নি জাপানের মানচিত্র থেকে। বরঞ্চ দ্বিগুণ দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে জাপানের বুকে।

এক নজরে কিছু তথ্য----

- জাপানের হন্সু দ্বীপের চো-উগোকু অঞ্চলে 'ওটা' নদীর মোহনায় অবস্থিত হিরোশিমা প্রিফেক্চার।মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলি হিরোশিমাকে সাতটি ছোট ছোট দ্বীপে বিভক্ত করেছে,যেগুলি ব্রীজ দিয়ে সংযুক্ত।
- মোট এলাকা ৯০৬.৫৩ বর্গ কিলোমিটার।৮টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হিরোশিমা প্রিফেক্চার।

- ২০১৬সালের পয়লা আগস্টের জনগণনা অনুসারে জনসংখ্যা প্রায় ১,১৯৬,২৭৪ জন ।প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৩৪১৮ জনের বাস।
- ঐ অঞ্চলের বৃহত্তম নগর আর রাজধানী শহর।
- আর্দ্র উপ-নিরক্ষীয় জল বায়ুর অঞ্চল।শীতল থেকে মৃদুশীতল শীতকাল।আর্দ্র,উষ্ণ গ্রীষ্মকাল।সবচেয়ে গরম পড়ে আগস্ট মাসে,দিনগুলি রৌদ্রকরোজ্জল। জুন-জুলাই মাসে বেশী বৃষ্টিপাত হয়।
- হিরোশিমার মাথাপিছু জাতীয় আয় খুবই বেশি।
- শিক্ষার হার খুব বেশী।শিল্পের শহরও আজকের হিরোশিমা।পৃথিবীখ্যাত মাজুদা বা মাজ্‌দা মোটর কারের জন্মস্থান এখানকার 'মাজ্‌দা মোটর কোম্পানি'।আগে এই কোম্পানির নাম ছিল 'তোকুগাওয়া কোম্পানি লিমিটেড'।আছে যন্ত্র আবিষ্কারের গবেষণাগার ও যন্ত্রাংশ নির্মাণের কারখানা।আর আছে উন্নত স্টিল ইন্ডাস্ট্রি।
- শিল্পের মত শিল্পীরও অভাব নেই এখানে।আছে 'সিমফোনি অরকেষ্ট্রা', 'মিউজিয়াম অফ আর্ট','হিরোশিমা প্রিফেক্‌চারাল আর্ট মিউজিয়াম'।

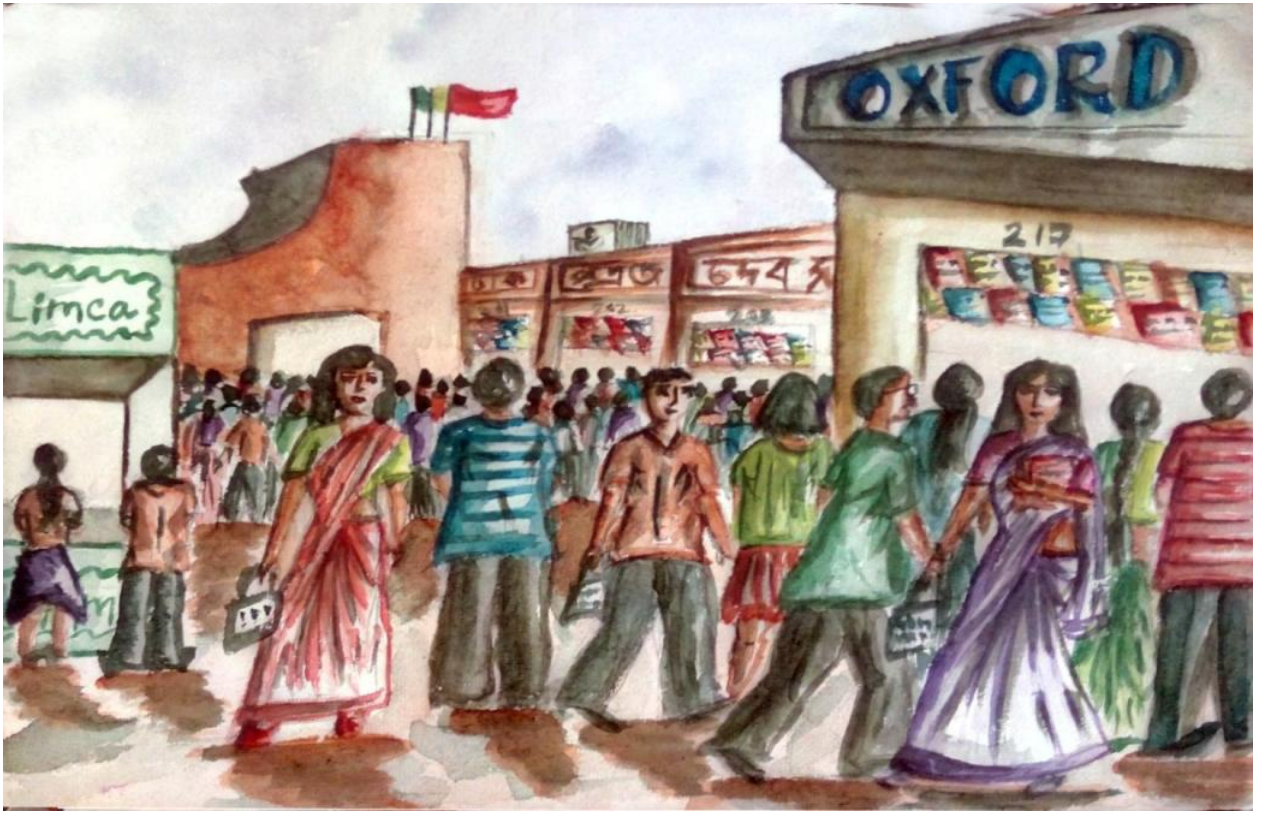


- আমোদ অনুষ্ঠানেরও কমতি নেই।ফ্লাওয়ার ফেস্‌টিভ্যাল,ইণ্টারন্যাশনাল এ্যানিমেশান ফেস্‌টিভ্যাল', 'হিরোশিমা ডে উদ্‌যাপন',হিরোশিমা ল্যাণ্টার্ণ ফেস্টিভ্যাল, এ সব চলে সারা বছরের নানা সময় জুড়ে।
- খেলাধূলাতেও পিছিয়ে নেই হিরোশিমা।সারা জাপানের সঙ্গে এখানেরও প্রিয় খেলা বেসবল।বাস্‌কেট বল,ফুটবল,গল্‌ফও প্রিয় খেলা। আছে হিরোশিমা মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়াম।
- এই শহরের ঐতিহ্যের আর একটি নিদর্শন হল এখানকার ট্রাম।এই ট্রাম ব্যবস্থাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।নিজের চেষ্টায় আর বিদেশী সহায়তায় সেইসব ধ্বংসপ্রাপ্ত বেশ কয়েকটি ট্রামকে মেরামত করে কিছুদিনের মধ্যেই চালু করেছিল,যেগুলির মধ্যে চারটি এখনও চলছে,জানালেন আমাদের গাইড,দেখলামও দুটি ট্রাম।
- হিরোশিমা বিখ্যাত সেখানকার বিখ্যাত খাবার 'ওকোনোমি ইয়াকি'-একধরণের প্যানকেক্‌।নানা রকমের সব্‌জি,মাংস আর সামুদ্রিক মাছের মিশ্রণে তৈরি করা হয় এই প্যানকেক।পরতে পরতে থাকে বাধাকপি, কল বেড়োনো বিনস্‌,পর্কের পাতলা টুকরো।টপিং দেওয়া হয় নুড্‌ল আর সস্‌ দিয়ে।আর এক ধরনের প্রিয় খাদ্য 'ইয়াকি খাকি' – সেটি হল বিশেষ পদ্ধতিতে সেদ্ধ করা ঝিনুক,যা খোলার মধ্যে রেখেই পরিবেশন করা হয়।এছাড়া স্টিকি রাইস আর বেক্‌ড ফিস-সুসিও এখানকার প্রিয় খাবার।
- চিকিৎসা ব্যবস্থাও খুব উন্নত।এখানে আছে ছটি হাসপাতাল।

সব মিলিয়ে আজকের হিরোশিমা এক শান্তির নিলয় ।

রঙিন ছবিগুলি তুলেছেনঃ লেখক

এবারে লিখিব খেলিব বিভাগে প্রথমেই রইল আমাদের পূবালী ঠাকুরের রংপেনসিলে বইমেলার ছবি–

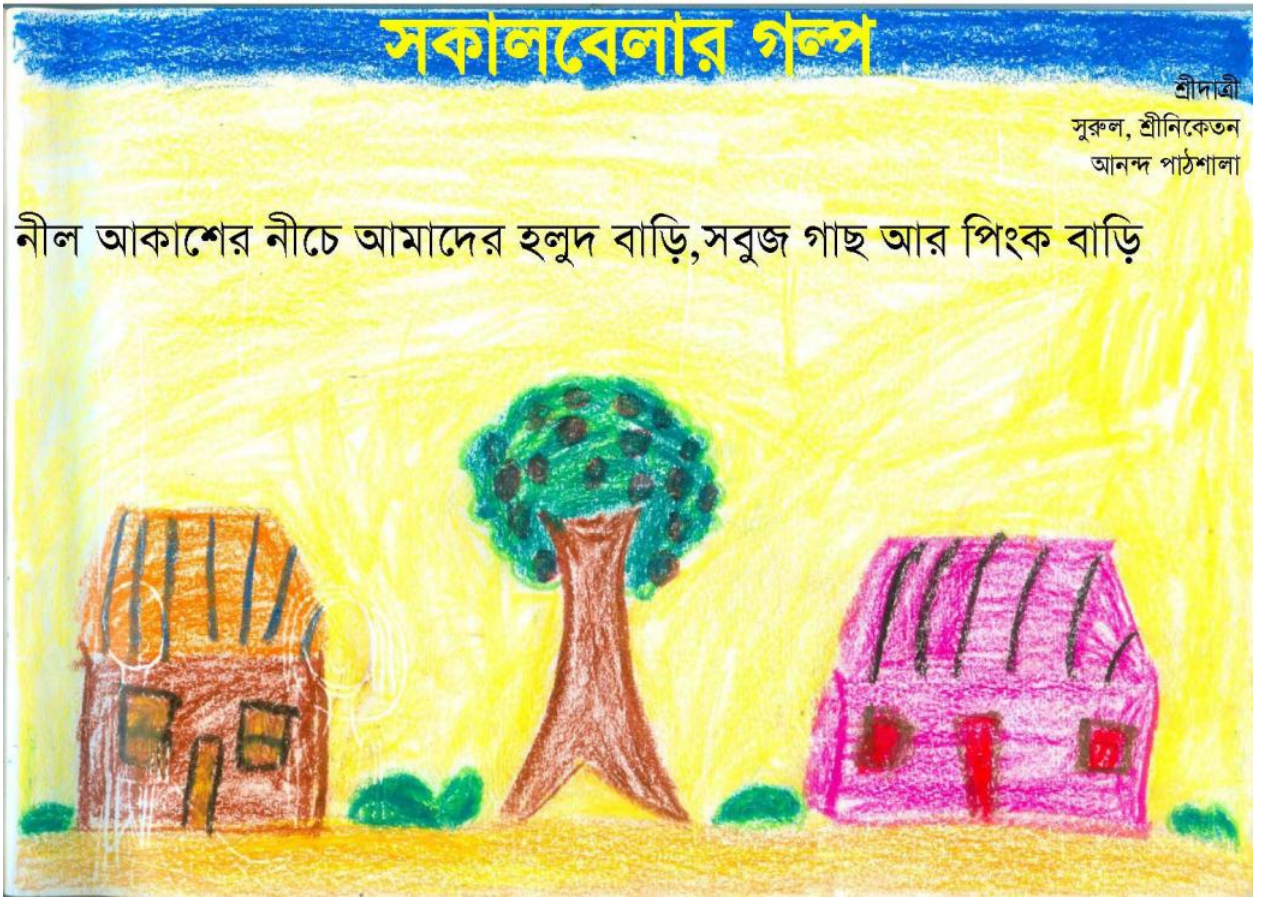


পুবালী ঠাকুর

অষ্টম শ্রেণী

কলকাতা

বোলপুর শান্তিনিকেতনের সুরুলের বন্ধু পাঁচ বছুরে শ্রীদাত্রীর দু জোড়া চোখ। তার একজোড়া এমনি এমনি চোখ, আর অন্য জোড়া হল গিয়ে তার মনের চোখ। সেই দু পথেই সে সুন্দর পৃথিবীটাকে দেখে আর তার যত রংচং সব ঢেলে দেয় কাগজের বুকে। এই যে শ্রীদাত্রীর অ্যালবামঃ



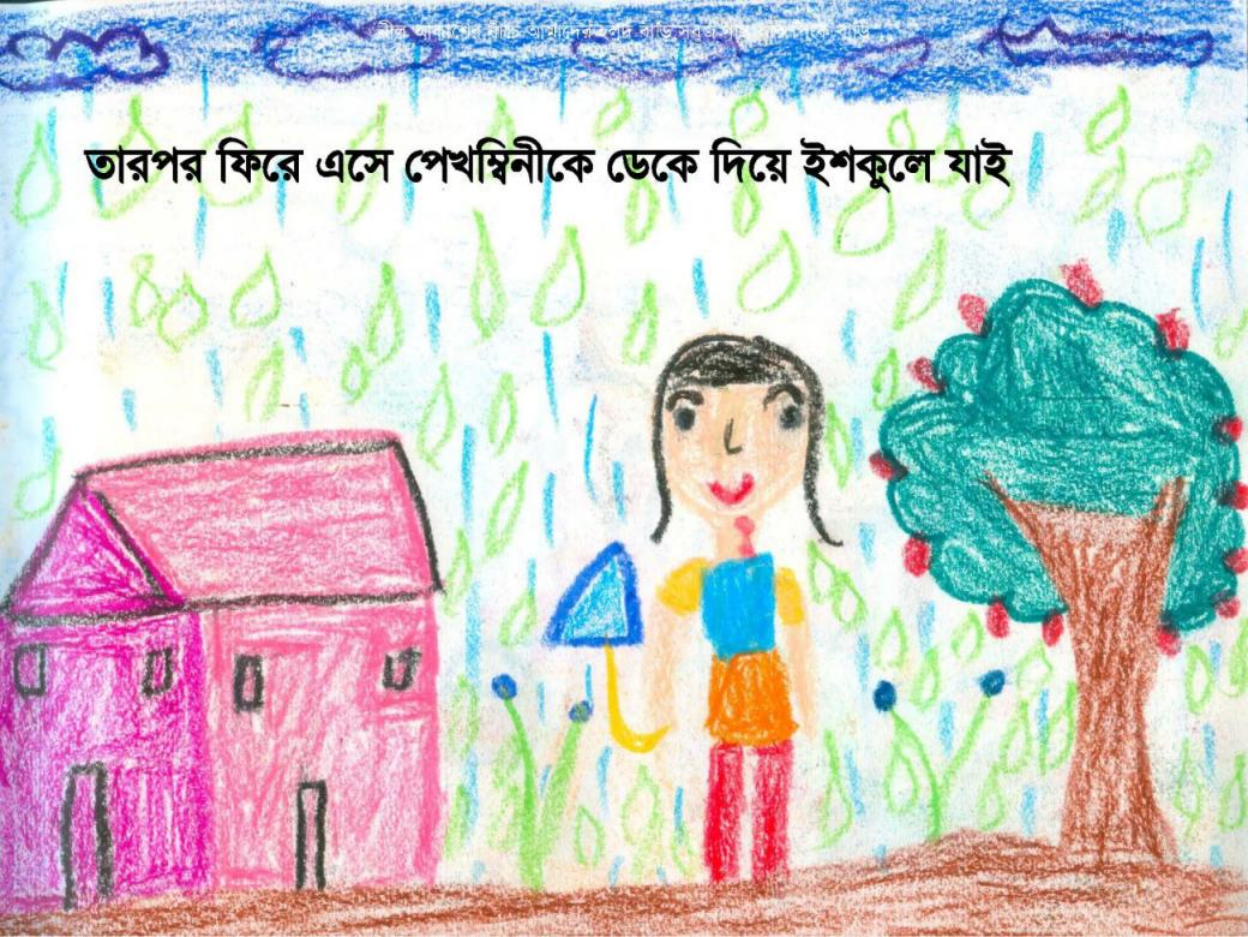

তার এক বাড়িতে থাকি আমি বিনি আর বুই

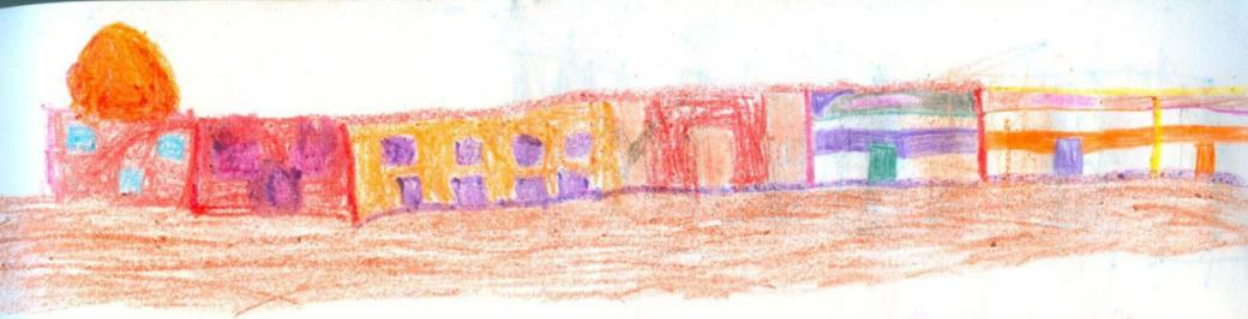
আর পিংক বাড়িতে থাকে পেখম্বিনী




সূর্য উঠলে ঘুম থেকে উঠে ফুল তুলতে যাই

তারপর ফিরে এসে পেখম্বিনীকে ডেকে দিয়ে ইশকুলে যাই





যাবার পথে রেলগাড়ি বলে, চল আমার সঙ্গে অনেক দূরে। সার্কাসের তাঁবু বলে, সন্ধেবেলা আসিস।



আমি হেসে বলি, নিশ্চয় যাব।আগে ইশকুলের ছুটি হোক! তারপর হাঁটিতে হাঁটতে চলে যাই সেই যেখানে সবুজ, বেগুনি আর কমলা গাছেদের ভিড়ে আমাদের নানারঙের স্কুল



প্রথম ধাঁধাঃ

“আজ্ঞে না সার, টাকাটা আমি টেবিল থেকে নিইনি। গীতাঞ্জলীর মধ্যে ভরে রেখেছিলাম। ১৫ আর ১৬ পাতার মাঝখানে, তাও পরিষ্কার মনে আছে। সেখান থেকে বের করেছি।”

শুনেই বুঝে গেলাম লোকটা সত্যি না মিথ্যে কোনটা বলছে। কীভাবে বুঝলাম বল তো?

দ্বিতীয় ধাঁধাঃ

সিনেমাটিনেমা লেজার দিয়ে কীসের গায়ে রেকর্ড করে?

জবাবে ছোকরা লিখেছিল ৫০০৫৫০০ অথবা ১০০৫০০। ঠিক লিখেছিল কি? কেন?

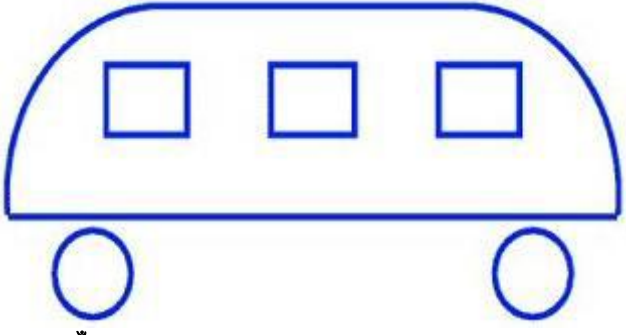
তৃতীয় ধাঁধাঃ

সঙ্গের ভিডিওটাতে সাদা জার্সির খেলোয়াররা ঠিক কতবার বল পাস করেছে বল দেখি?

https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo

চতুর্থ ধাঁধাঃ

বাসটা ডানদিকে যাচ্ছে না বাঁদিকে যাচ্ছে?



পঞ্চম ধাঁধাঃ

সে অফিসের ১০০ জন কর্মীর মধ্যে ৯০ জন বাংলা জানে, ৮০ জন হিন্দি জানে আর ৭৫ জন ইংরিজি জানে। তাহলে এ অফিসে সবচাইতে কম করে কতজন তিনটে ভাষাই জানে?

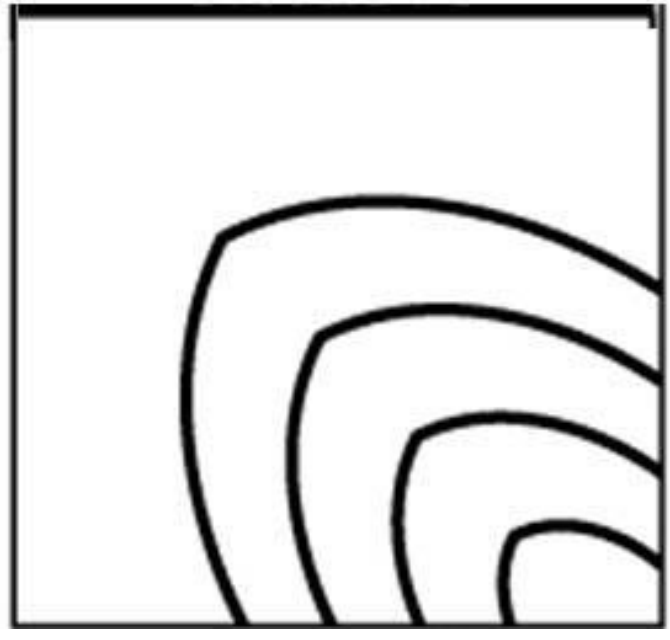
ড্রুডল

এরা কীসের ছবি?

১



২



অবিশ্বাস্যঃ

প্রাণীজগতের কিছু অবিশ্বাস্য ছবি দিয়ে এবারের পাতা সাজানো হলঃ








Rakesh Rocky.com

কীসের ফোটো?



মগজ ধোলাই

– রণিত পাল

১) এই ঘটনাটি প্রথম বার ঘটে ১৯২৫ সালে। তারপর থেকে প্রায় ৩৫০ বার ঘটেছে ইতিমধ্যে। কোন বহু প্রতীক্ষিত ঘটনার কথা বলছি যা ঘিরে আজও বাঙালী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে থাকে?



২) এক সময় কার্যত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বসা এই মানুষটির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস। বর্তমানে তার জীবন অবলম্বনে নির্মিত নাটক, "এক মঞ্চ, এক জীবন" -এ তাঁর চরিত্রায়ন করছেন বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার। কোন বিখ্যাত বাঙালীর কথা বলছি?

৩) তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থটি তিনি সর্বপ্রথম তাঁর পিতৃবন্ধুদের দেখান। স্বরচিত বললে পাছে যদি তারা না পড়েন সেই আশঙ্কায় তিনি বলেন এটি অন্য একজনের লেখা এবং তিনি এটি বাড়ির পুরনো কাগজপত্রের ভীড়ে খুঁজে পেয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি এই নামটি তাঁর ছদ্মনাম হিসেবেও ব্যবহার করেন। কার কথা বলছি এবং গ্রন্থটির নাম কী?

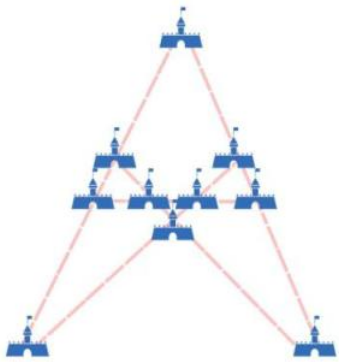
৪) এখনও পর্যন্ত ছজন বাঙালী এই কৃতিত্বটি অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে দুজন মহিলা। শেষ জন এটি অর্জন করেছেন এই বছরের দোরগোড়ায়। কোন একটি বিষয়ে এই কৃতিত্বটি অত্যন্ত সম্মানিত। কীসের কথা বলছি? এই তালিকায় সর্বশেষ নামটি কার?

৫) এই অসামান্য সুন্দরী মহিলা, যিনি একাধারে একজন সহজাত প্রতিভাধর চিত্রকরও বটে, ১৮৫৬ সালে ভারতে আসেন তার স্বামীর চাকরীতে পদোন্নতির সৌজন্যে। ১৮৬১ সালে ইনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বারাকপুরে এখনও এনার সমাধিস্থল দেখতে পাওয়া যায়। ইনি খাদ্যরসিক বাঙালীদের কাছে কীভাবে আজও অমর হয়ে আছেন?

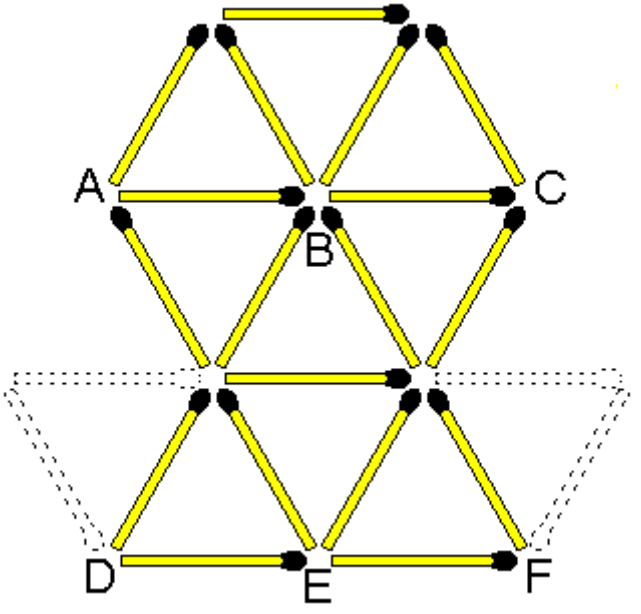
গত সংখ্যার উত্তর

১। পঞ্চাশ পয়সা ২। আগে সে কোটিপতি ছিল এসে ৩। ৬জন ৪।এক নং ছক্কা হাঁকাল ও ঠ্যাঙে টান লেগে রিটায়ার্ড হার্ট হল। পরের জন এক রান নিতে গিয়ে রান আউট হল। এবার দ্বিতীয়জন ছক্কা হাঁকাল। ৫। ১৯৯-৯৯+৯৯-৯৯

৬।



৭.



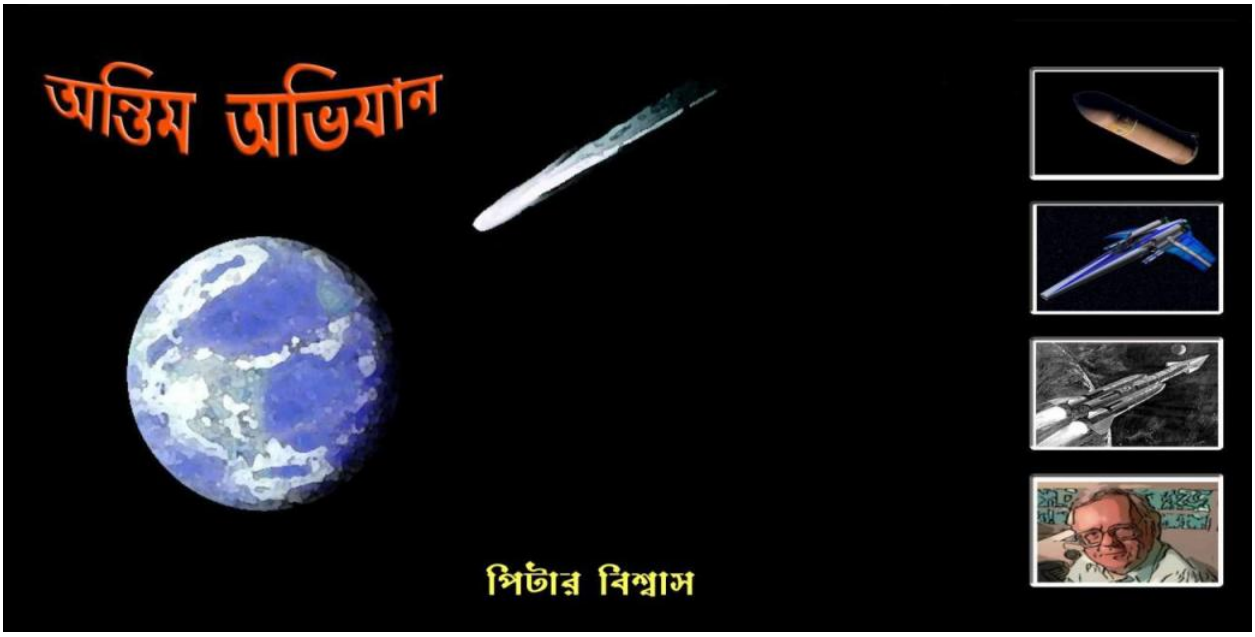
ড্রুডলঃ ঠোঁটকাটা

কীসের ফটোঃ

প্রথম পাতাল রেল। লণ্ডনে।

<u>মগজ ধোলাই</u>

১) সিধু জ্যাঠা ২) মাউন্ট K 2 ৩) রবিনহুড ৪) ব্যোমকেশ বক্সী ৫) লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু



যদি কা পোনের সন্দেহ মিথ্যে হয়–তাহলে গত এক বছরের সব চেষ্টা বিফল হবে তার। হয়ত এ প্রতিষ্ঠান থেকে সরে যেতে হবে তাকে অক্ষমতার বোঝা মাথায় নিয়ে। আর যদি সত্যি হয়? তাহলে যে এই সমস্ত গবেষণা, এই গোটা প্রতিষ্ঠানটার অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে উঠবে? হাতে থাকবে মাত্রই একটা বছর। না না। সে নিজেকে ব্যর্থ দেখতে চায় এবারে।-

“এই যে বার্থ ডে বয় এসে গেছে। হ্যাপি বার্থ ডে ক্রিস।” চারপাশ থেকে নানা ভাষায় নানারঙের মুখগুলো এগিয়ে এসে চমকটা ভেঙে দিল ক্রিস্টোফারের। কমিউনিটি হলের মাঝখানে একটা টেবিলে একটা ছোটো কেক রাখা। দেয়ালে হলোগ্রাফিক ছবিতে ক্রিস্টোফারের মুখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল প্রতিষ্ঠানের ব্যানার–“যশপাল পরিবারের সদস্য ক্রিস্টোফারের জন্মদিনে আমাদের শুভেচ্ছা–”

****

হঠাৎ কমিউনিকেটরের মৃদু কাঁপুনি তাকে সতর্ক করে তুলল। ঘরজোড়া রামধনুর রঙ ছড়াচ্ছে প্রজেকটরগুলো। চঞ্চল , উদ্দাম একটা গানের সুরে পা মিলিয়েছে সবাই। কেউ তাকে এ মুহূর্তে খেয়াল করছে না।

হইহইয়ের মধ্যেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে একটা কোণায় গিয়ে হাতের কমিউনিকেটরটা বের করে আনল সে। বুদ্ধর কেন্দ্রিয় প্রসেসরের সঙ্গে জুড়ে রাখা যন্ত্র সংকেত দিয়েছে, তার দিয়ে আসা গণনার কাজ শেষ করেছে বুদ্ধ। সেখানে ছোট্টো পর্দার গায়ে লাল ও নীল রঙের দুটো রেখা। লাল রেখাটা সরাসরি এসে বিঁধে রয়েছে পৃথিবীর বিষুব অঞ্চলের বুকে। তার কিছুদূর দিয়ে মহাকাশে হারিয়ে গিয়েছে এতদিন ধরে দেখানো সুইফট টাটলের গতিপথ বলে দেখানো নীল রঙের রেখাটা।

এদিকওদিক একবার তাকিয়ে দেখল সে। কেউ খেয়াল করছে না তাকে। তারপর কমিউনিকেটোরে একটা সংখ্যা টাইপ অরে মৃদু গলায় ডাকল , “টাইকো?”

তার যন্ত্র থেকে রেখাদুটোর ছবিটা তখন ভেসে গিয়েছে বহুদূরের কোন আকাশে উড়তে থাকা একটা চোরাচালানকারি যানের কমপিউটারে। কয়েক মুহূর্ত বাদে সেখানে ছবিটা মুছে গিয়ে টাইকোর মুখটা ভেসে উঠল, “এবার তুমি নিশ্চিত তো ক্রিস?”

ফ্যাকাশে মুখে মাথা নাড়াল ক্রিস্টোফার। টাইকোর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। আস্তে আস্তে তার মুখটা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে তখন কা পোনের মুখ ভেসে উঠছে। স্থির চোখে ক্রিস্টোফারের দিকে তাকিয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। তারপর যখন কথা বলল, তখন তার গলায় উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও ছিল না, "আমরা আগে থেকেই এটা জানতাম ক্রিস। শুধু তোমার প্রমাণটা খুঁজে বের করা দরকার ছিল, যাতে সবাই বিশ্বাস করে।"

"কিন্তু–কী লাভ? মাত্র এক বছর সময় বাকি আছে আর। এর মধ্যে–"

"চেষ্টা কর। আপ্রাণ চেষ্টা কর এবার। আমি জানি এইবার পৃথিবীর সেরা মস্তিষ্কেরা এ নিয়ে চেষ্টা করবেন। হয়ত তাতে ফল হবে। যদি না হয় তাহলে একটা আরো পথ থাকবে ক্রিস। একটা অস্ত্র আছে। একেবারেই অপরীক্ষিত। তাই তার ওপর ভরসা রাখবার সাহস আমার নেই। আমি তোমার এবং দুনিয়াজোড়া বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভার ওপর ভরসা রাখব তাই। তাতে ব্যর্থ হলে শেষ চেষ্টা হিসেবে--" আপনমনে কথাগুলো বলতেবলতেই হঠাৎ নিজেকে সামলে নিলেন কা পোন, "তোমার কমিউনিকেটরের ফায়ার ওয়াল সরিয়ে নাও। একটা স্নিফার প্রোগ্রাম ইসস্টল করে দেব এতে। ঠিক কোন প্রোগ্রামটা নজরদার উপগ্রহদের পাঠানো তথ্যে বদল এনে বুদ্ধর বিশ্লেষকের কাছে সুইফট টাটলের গতিমুখের বিষয়ে ভুল খবর দিচ্ছিল সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে তোমায়। একমাত্র তাহলেই এ রহস্যের সঠিক ব্যাখ্যা তুমি তুলে দিতে পারবে প্রতিরক্ষাবিভাগের হাতে।"

উৎসবরত মানুষজনের নজর এড়িয়ে ততক্ষণে কমিউনিটি হলের বাইরে বের হয়ে এসেছে ক্রিস্টোফার। বড়ো বড়ো পায়ে স্কাইওয়াকের এসকালেটরে উঠে দাঁড়াতেদাঁড়াতেই তার আঙুল খুলে দিয়েছে তার কমিউনিকেটরের দরজা। সেখান দিয়ে ইথার বেয়ে ভেসে এসে একটা ছোট্টো কিন্তু শক্তিশালী প্রোগ্রাম ফের ভেসে যাচ্ছিল বুদ্ধের প্রসেসিং কোরের ভেতরে। একটা বৈদ্যুতিন জীবাণু সংক্রমণের মতই সে তখন ছড়িয়ে পড়ছে অমিত শক্তিধর পার্থিব সেন্ট্রাল প্রসেসর 'বুদ্ধ'র মস্তিষ্কে, তার সমস্ত প্রোগ্রামের সাবরুটিনের ভেতরে। খুঁজে চলেছে কোন লুকিয়ে থাকা নিয়মভাঙা ম্যালওয়ারের সংকেত–

****

এখন এখানে রাত। কাচের ডোমের বাইরে অন্ধকার আকাশে মৃদু সঞ্চরমাণ ফোবসের আলোর বিন্দুটা আস্তে আস্তে মাথার ওপরে উঠে আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতেথাকতেই হঠাৎ প্যানেল থেকে জেগে ওঠা তীক্ষ্ণ শব্দটা চমক ভাঙিয়ে দিল নজরদার মানুষটার। মুখ ঘুরিয়ে পর্দার দিকে একনজর তাকিয়ে সে বুঝে নিতে চাইল ব্যাপারটা। আর তারপরেই বিপদজ্ঞাপক বোতামটার গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে সে ডাকল, "ডঃ গ্রোভার।"
প্রায় মিনিটখানেক পর পল গ্রোভারের আধাঘুমন্ত মুখটা বেসে উঠল কমিউনিকেটরের পর্দায়, "কী হয়েছে জালাল?"

"বুঝতে পারছি না। বুদ্ধের সঙ্গে আমাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে হঠাৎ। কী করে–"

"আমরা আসছি। কোন কিছুতে হাত ছোঁয়াবে না। আশা করব তোমার কোন ভুলে–"

ফ্যাকাশে মুখে মাথা নাড়াল জালাল নামের বিজ্ঞানিটি। সর্বাধিনায়িকা লালপিওতের এই টাট্‌ল্ ব্লাস্টার প্রজেক্টে কাজ করবার সম্মান যেমন আছে তেমনই আছে সামান্যতম ত্রুটিতবিচ্যুতিতে কঠোর শাস্তির ভয়।

দু ঘন্টা বাদে, নিয়ন্ত্রণকক্ষের প্রধান প্যানেলের সামনে থেকে যখন মাথা তুললেন পল গ্রোভার, তখন চোখদুটো জ্বলছে তাঁর। পাশে সদ্য এসে বসা লালপিওতে উদ্বিগ্নমুখে তার দিকে দেখছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন পল, "একটা স্নিফার প্রোগ্রাম। বুদ্ধের ভেতরে ইনস্টল করা হয়েছে এখন থেকে তিন ঘন্টা আগে। আমাদের ম্যালওয়ার চিহ্নিত হয়েছে অ্যাডমিরাল। আমাদের এতদিনের সমস্ত চেষ্টা–" বলতেবলতেই হঠাৎ লালপিওতের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিস্মিত হলেন তিনি। সেখানে প্রত্যাশিত রাগের বদলে একটা অদ্ভুত হাসি ছড়িয়ে পড়েছে।



“একটু আগেই ব্যাপারটা ঘটল তাহলে পল। আমার নিজের পরিকল্পনা ছিল আর এক মাস বাদে আমরা নিজেরাই নিঃশব্দে, সবার চোখের আড়ালে ম্যালওয়ারটাকে সরিয়ে নেব।”

“তার মানে?”

“তুমি বৈজ্ঞানিক, গ্রোভার। অসামান্য প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক। কিন্তু রাজনীতির তুমি কিছু বোঝ না। যেটা বোঝ সেই বিষয়ের একটা প্রশ্ন করি তোমায়। আজ যদি তুমি হঠাৎ জানতে পারতে, ওই ধূমকেতুটা এই মঙ্গলের সঙ্গে ধাক্কা খাবে ঠিক এক বছর বাদে তাহলে এক বছরের মধ্যে, আমাদের সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগিয়েও তুমি তাকে রোখবার মত অস্ত্র বানাতে পারতে কি?”

মাথা নাড়লেন গ্রোভার, “সেটা সম্ভব নয়। এ ধরণের গবেষণায় অনেক বেশি সময় লাগে। অন্তত চার পাঁচ বছরের প্রজেক্ট হতে হবে সমস্ত, তত্ত্ব, রূপরেখা ও বাস্তবায়ন শেষ করতে।”

“ঠিক। তাহলে এখন পার্থিব সরকার খবরটা পাবার পর কী হবে বুঝতে পারছ? আতঙ্ক ছড়াবে গ্রোভার। নিশ্চিত ধ্বংসের আতঙ্ক। কুড়ি বিলিয়ন মানুষ। কোথায় পালাবে? আনন্দ কর গ্রোভার। এতদিনে–এক স্বৈরাচারি গ্রহ বুঝবে, মৃত্যুর অসহায় আতঙ্ক কাকে বলে।”

“কিন্তু অ্যাডমিরাল, আপনার পরিকল্পনার থেকে একটাই তফাৎ হয়ে গেছে এখানে। এরা নিজে থেকে, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমাদের ম্যালওয়ারটাকে খুঁজে পেয়েছে। ওরা প্রতিশোধ নেবে অ্যাডমিরাল। আমরা আর নিরাপদ নই।”

তাঁর কথাটা শেষ হবার আগেই পর্দায় একটা মুখ ভেসে উঠল হঠাৎ। লালপিণ্ডতের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কপালে হাত ঠেকালেন সামরিক পোশাক পরা মানুষটি, “আপনাদের পরিবহন তৈরি আছে অ্যাডমিরাল। আশ্রয়ঘাঁটিতে খবর পাঠানো হয়েছে।”

“ধন্যবাদ হোমাজ। ওভার অ্যান্ড আউট,” বলতেবলতেই গ্রোভারের কাঁধ ছুঁয়ে কাচের ডোমের বাইরের দিকে ইশারা করলেন একবার লালপিণ্ডতে। সেখানে তখন ফ্লাডলাইটের আলোয় দুটো বিশাল মালপরিবহনযান এসে দাঁড়িয়েছে।

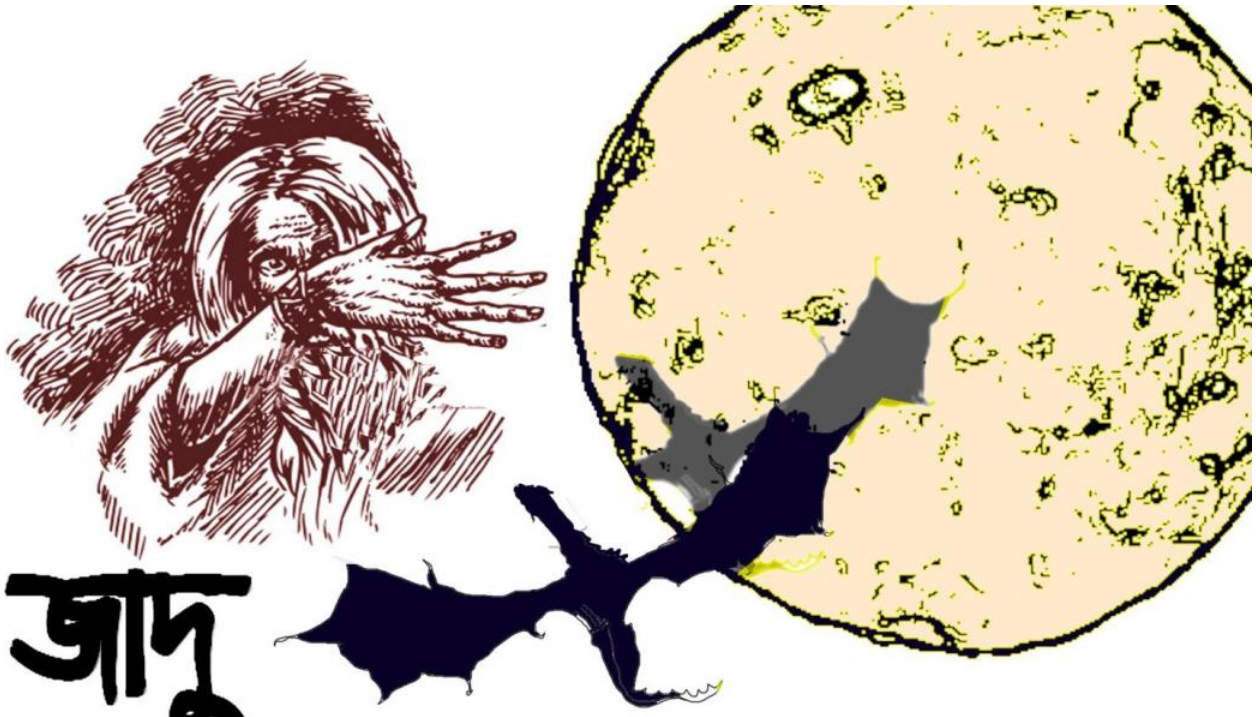
“এ আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে আমি বহুদিন আগেই তৈরি হয়েছি পল। মঙ্গলের ওপর পার্থিব সামরিক হানা হলেও আমার প্রশাসণকে ছুঁতে পারবে না তারা। কিছু সাধারণ মানুষই মরবে কেবল। আক্রমণের অনেক আগেই গ্রহপৃষ্ঠ থেকে সরে যাবার জন্য আমি তৈরি। এখন সময়টা এগিয়ে এসেছে শুধু।”

“আমাকে এই প্রস্তুতির খবর আগে জানানো হয়নি কেন?” পল গ্রোভারের মুখে একইসাথে অনেকগুলো অনুভূতি খেলা করে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে মুখের হাসিটি একরিকম রেখে লালপিণ্ডতে বললেন, “আমাকে প্রশ্ন করবার সাহস আমি একবারের বেশি ক্ষমা করি না পল। তোমাকে আমি হারাতে চাই না। তোমার জন্য একটা কাজ আছে আমার। সুইফট টাটল্এর উড়ানপথ সংক্রান্ত অন্তর্ঘাতে আমাদের ভূমিকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পার্থিব সরকারের নজরে আসা এখন মাত্রই কয়েকটা দিনের ব্যাপার। এই সময়টুকুর মধ্যে, কে এ কাজটা করতে সক্ষম হয়েছে তার হদিশ আমার চাই।”

“কিন্তু এত তাড়াতাড়ি -কীকরে–”

“যে প্রোগ্রামটা আমাদের ম্যালওয়ার খুঁজে বের করল তা আকাশ থেকে আসেনি। কোন পথে তা এল, সেটা খুঁজে বের করবার চেষ্টা কর পল। যদি তা বাইরে থেকে কেউ পাঠিয়ে থাকে তবে তা সরাসরি বুদ্ধের নিরাপত্তাকে ভেঙে ঢুকবে না। ওখানে কাজ করেন এমন কারো যন্ত্র বেয়ে তা আসবে। তার চিহ্ন থাকবে কোথাও না কোথাও। খোঁজো পল, খোঁজ। সে মানুষটাকে আমার চাই। আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে সে। আমি তো তাকে ছেড়ে দেব না–”

ক্রমশ



নবম অধ্যায়

রাতুল তার রুমে গেল। অনেক খোঁজাখোঁজি করেও বিনয়কে পাওয়া গেল না। হেডমাস্টার স্যার সব ছাত্রদের নির্দেশ দিলেন নিজেদের রুমে চলে যেতে। সাধারণত হোস্টেল এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকে না। স্টাফেরা এগারোটার মধ্যে সব রুমের বাতি বন্ধ করে দিয়ে যান। কিন্তু আজ দেরি হল বিনয়ের হারিয়ে যাওয়ার কারণে।

রাতুল তার খাটে বসে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল। সে একটু আগে যা দেখে এল তা কি সত্যি? বিশ্বাসই হচ্ছে না। হাতে বিনয় বা জাদু রাজ্যের সম্রাট নিকোলাই পুত্র হারিরির দেয়া ছোট জাদুর বই। রাতুল কাঁপা কাঁপা হাতে বইটা খুলল। তাতে শুধু সাদা পাতা। কিছুই লেখা নেই।

পাশের খাটে শুয়ে আকাশ বই পড়ছিল। সে বেশিরভাগ সময়ই বই পড়ে। পাঠ্যপুস্তক না হলে গল্পের বই। সুতরাং, অনেক বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে। এছাড়া এ চকলেটের বীজের ব্যাপারে কিংবা কবি শান্ত শফিকুরের কবিতাগুলোর নষ্ট না করতে বলে সে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং, রাতুল এখন তাকে আর বোকা মনে করে না।

আকাশ বই থেকে মুখ তোলে চশমাটা ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথায় ছিলে?"

রাতুল বলল, "এই তো...বারান্দায় ছিলাম।"

আকাশ আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমার হাতে ওটা কি বই?"

রাতুল উঠে গিয়ে বইটা ড্রয়ারে রাখতে রাখতে বলল, "ওটা কিছু না।"

তারপর কথা অন্যদিকে নেয়ার জন্য জিজ্ঞেস করল, "তুই এই ঝামেলার মধ্যে বই পড়ছিস নাকি?"

আকাশ উৎসাহ পেয়ে উঠে বসে বলল, "হ্যাঁ। এই একটু আগে পড়তে বসেছি। ভূতের বই। সাত রকমের ভূতের কথা আছে এখানে। সবচেয়ে ভয়ংকর হল গরিলা ভূত। অন্য ভূতের হাত থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু গরিলা ভূতে ধরলে আর রক্ষা নেই।"

রাতুল জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, 'গরিলা ভূতটা আবার কী?" কিন্তু সেই সময়ে দরজায় টোকা দিয়ে হেডমাস্টার বললেন, "কী খবর তোমাদের?"

রাতুল তার টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে ড্রয়ার খুলে বইটা রাখতে গিয়েছিল। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আকাশ খাট থেকে নেমে দাঁড়াল। হেডমাস্টার স্যার হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে ছোট একটা লাঠি এবং গায়ে সাদা পাঞ্জাবী। তিনি কালো পাজামা পড়েছিলেন। এবং তার হাতের লাঠিটিও কালো।

হেডমাস্টার স্যার ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে রাতুলের খাটে এসে বসলেন। তারপর বললেন, "তোমরা বসো। কোন সমস্যা হচ্ছে না তো?"

রাতুল বলল, "জি না, স্যার।"

হেডমাস্টার স্যার আকাশের দিকে তাকালেন।

আকাশও বলল, "জি না স্যার।"

রাতুলের ইচ্ছে হচ্ছিল হারিরি যেসব কথা বলে গেছে সে সম্পর্কে স্যারকে কিছু জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু তার ভয় হচ্ছিল। তাই কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না।

স্যার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "রাতুল, তোমার সাথে কি যে ছেলেটা হারিয়ে গেছে তার দেখা হয়েছিল?"

রাতুল উত্তর দিল, "জি স্যার।"

"আজ হয়েছে?"

"জি।"

"কতক্ষণ আগে?"

"এই একটু আগে স্যার।"

"কোথায়?"

"বারান্দার কোণে সে অন্ধকারে বসেছিল।"

"তোমাকে কিছু বলেছে?"

"বলেছে সে নাকি জাদু রাজ্যের সম্রাট নিকোলাই এর ছেলে।"

"কিছু দিয়ে গেছে?"

"একটা জাদুর বই।"

"কোথায় সেটা?"

রাতুল তার ড্রয়ার থেকে বইটা বের করে স্যারের হাতে দিল। স্যার কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে বইটা দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যে জাদুকর এসেছিলেন তিনি তোমাকে কিছু দিয়ে গেছেন?"

রাতুল বলল, "একটি জাদুর চকলেট। তিনি বলেছেন এই চকলেটের বীজ থেকে জাদুর চকলেটের গাছ হবে।"

স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "বীজটা কোথায়?"

রাতুল তার ড্রয়ার থেকে কাগজে মোড়া বীজটা বের করে স্যারের হাতে দিল। স্যার বীজটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। এর গন্ধ শুঁকলেন। এরপর তিনি জাদুর বইয়েরও গন্ধ শুঁকলেন।

তারপর বললেন, "সব কিছু ঠিক আছে।"

প্রচন্ড কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল রাতুল বীজটি নিয়ে। তাই সে প্রশ্ন করে বসল, "স্যার, এটা থেকে কি সত্যি সত্যি গাছ হবে?"

স্যার রাতুলের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বললেন, "তা আমি বলতে পারব না। এটা সাধারণ কোন বস্তু নয়। আমাদের পৃথিবী যেমন এক জগত তেমনি অন্য এক জগত আছে। সে জগতে সব কিছু অন্যরকম। সে জগতে প্রবেশ করতে হলে বিশেষ বস্তুর দরকার হয়। এ বীজ সেরকমই এক বিশেষ বস্তু। মাঝে মাঝে পৃথিবীর কোন কোন মানুষ এ'রকম বস্তু পেয়ে যায়। আর সেই বিস্ময়কর জগতে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। আমিও পেয়েছিলাম খুব ছোটবেলায়।"

স্যার তার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে খুব ছোট গোলাকৃতির একটি রাবারের বল বের করে বললেন, "আমার ক্ষেত্রে সে বস্তুটি ছিল এই রাবারের বল। এটাই আমাকে দেয়া হয়েছিল। তোমাকে দেয়া হয়েছে অন্যরকম কিছু। এটা দিয়ে কী করতে হবে তা নিশ্চয়ই জাদুকর তোমাকে বলে গেছেন?"

রাতুল বলল, "হ্যাঁ, তিনি বলেছেন চাঁদের আলোতে এটা মাটিতে রোপন করতে।"

স্যার বললেন, "তাহলে তো হয়েই গেল। মাটিতে রোপন করলেই হয়ত তুমি এর বিশেষত্ব দেখতে পাবে।"

তারপর তিনি জাদুর বইটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই বইটা হল জাদু রাজ্যের কিছু তথ্যের বই। এই বইটি জাদু রাজ্যের বাইরে কাজ করে না। তাই এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

রাতুলের তখন মনে হল হারিরির কথা। সে নিশ্চয়ই বিপদে আছে। রাতুল জিজ্ঞেস করল, "স্যার, ছেলেটা কি এখনো লুকিয়ে আছে?"

স্যার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "একটু আগে তাকে হোস্টেলের ছাদ থেকে কোবিলাইয়ের লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে। কোবিলাই হল কালো জাদুকর। অন্যায়ভাবে সে জাদু রাজ্যের সম্রাট হতে চায়। সে সম্রাট হলে পৃথিবীতেও অন্যায় প্রভাব খাটাবে। তাই মানুষ এবং জাদু রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাকে ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু সে বড় শক্তিশালী।"

রাতুলের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল এই কথা শুনে। বার বার তার চোখে ভাসছিল বিনয় তথা হারিরির মুখ। সে মুখ বিমর্ষ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কিন্তু নিরাশ নয়। স্যারও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর রাতুলের দিকে তার হাতের কালো লাঠিটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "যখন বীজ রোপন করতে যাও তখন এই লাঠি হাতে রাখবে। এটি সাধারণ কোন লাঠি নয়। জাদু রাজ্যে এ তার ক্ষমতা দেখাবে। আর কখনো বিশ্বাস হারাবে না। মনে রাখবে তুমি যদি বিশ্বাস করো পারবে, তাহলেই তোমার পক্ষে পারা সম্ভব। বিশ্বাস না থাকলে তুমি আগেই হেরে বসে থাকবে।"

রাতুল লাঠিটি হাতে নিল। স্যার খাট থেকে উঠে দরজা খুলে আবার রাতুলের দিকে ফিরে বললেন, "দুশ্চিন্তা করো না।" তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন।

রাতুল কিছুক্ষণ লাঠিটির দিকে চেয়ে বসে রইল। স্যার বিছানায় বীজ এবং বইটি রেখে গেছেন। রাতুল সে দুটি হাতে নিল। পাশের খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আকাশ রাতুল এবং হেডমাস্টার স্যারের কথা শুনছিল। সে কথাবার্তার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারেনি। কিন্তু এটা বুঝতে পেরেছে খুব বিশেষ কিছু ঘটতে চলেছে।

সে রাতুলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "স্যার কী বলে গেলেন? আর এসব কি জাদুরাজ্যের জিনিস?"

রাতুল আকাশের মুখের দিকে তাকাল। তার মনে এখন নানা চিন্তা। এই জাদুর বীজ রোপন করলে আসলে কী হবে? জাদুরাজ্য দেখতে কেমন? সেখানে কী হচ্ছে? সত্যি সত্যি কি এমন কিছু হচ্ছে? নাকী সব কোন স্বপ্ন বা কল্পনা?

আকাশ আরো কয়েকবার জিজ্ঞেস করল। কিন্তু রাতুল প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বলল, "আমি পিছনের শালবনে যাব।"

আকাশ অবাক কণ্ঠে বলল, "এখন?"

রাতুল বলল, "হ্যাঁ। এখন।"

আকাশ বলল, "কিন্তু গেটে তো দারোয়ান। বাইরে যেতে দেবে না।"

রাতুল বলল, "ছাদে গিয়ে জানালার কার্নিশ দিয়ে নামব।"

আকাশ ভয় পেয়ে বলল, "পড়ে যাবে না? এভাবে নামা বিপদজনক।"

রাতুল বলল, "আমি এর আগে অনেকবার নেমেছি।"

কথাটা সত্যি। জানালার কার্নিশ দিয়ে এবং পাইপ বেয়ে রাতুল অনেকবার নিচে নেমেছে। হোস্টেলের আরো অনেকে নেমেছে। এটা একরকম খেলার মত হয়ে গিয়েছিল একসময়। এই বিল্ডিংটায় পাইপ এবং জানালার কার্নিশ এমনভাবে দেয়া আছে যে নামাটা খুব কঠিন কিছু না। যখন ছাত্ররা খেলা হিসেবে এভাবে নামতে শুরু করল তখন একদিন এক স্যারের নজরে পড়ে যায়। তারপর কড়াভাবে নিষেধ করা হয়। এভাবে আর কাউকে নামতে দেখলে হোস্টেল ও স্কুল থেকে বের করে দেয়া হবে।

কিন্তু আজ নামতে হবে। রাতুলের আত্মবিশ্বাস আছে সে ঝামেলা ছাড়াই নামতে পারবে। যদিও রাতে সে কোনদিন নামেনি। আজ রাত হলেও পরিষ্কার মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণ চাঁদের আলোর কারণে চারদিক রূপালি আলোতে আলোকিত।

আকাশ বলল, "কিন্তু আমি তো নামতে পারব না। আমার ভয় লাগবে।"

রাতুল বলল, "তোকে নিচ্ছে কে? তুই ঘরে বসে বই পড়।"

আকাশ বলল, "না। আমাকে তোমার সাথে নাও। প্লিজ।"

রাতুল বলল, "সে হবে না। এটা অনেক রিস্ক। তাছাড়া তোর গিয়ে কাজ নেই।"

কিন্তু আকাশ নাছোড়বান্দা। সে যাবেই। রাতুল শেষপর্যায়ে তার অনুরোধে বিরক্ত হয়ে তাকে সাথে নিতে রাজি হল। তাতে বিপদের ঝুঁকি অবশ্য বাড়ল কিছুটা। কারণ মোটাসোটা আকাশকে নিয়ে কার্নিশ আর পাইপের সাহায্যে নিচে নামা সহজ কথা না।

রাতুল ব্যাগে জাদুর বই, বীজ ভরল। আকাশের একটা চামড়ার ছোট ব্যাগ ছিল। এতে স্ক্রু ড্রাইভার থেকে শুরু করে হাবিজাবি অনেক জিনিসে ভর্তি। এটাকে আকাশ বলে বৈজ্ঞানিক বক্স। তার সেই বৈজ্ঞানিক বক্সটাও ব্যাগে ভরা হল। অতঃপর তারা দুজন খুব সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে পৌঁছল।

ছাদে গিয়ে উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে চারপাশটা দেখে নিল রাতুল। এরকম চাঁদের আলো একরকম ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করে। মনে হয় কিছু দূরে যেন ছায়া ছায়া কী একটা দাঁড়িয়ে। মানুষের মত খানিকটা, খানিকটা ভূতের মত। রাতুল তাড়াতাড়ি একপাশে গিয়ে রেলিং ধরে নিচে তাকাল। উপর থেকে এভাবে নিচে তাকালে ভয় ভয় করে। কিন্তু রাতুল আজ লক্ষ্যস্থির করে এসেছে। শুধু শুধু ভয় পেলে চলবে না। সে স্যারের দেয়া কালো ছোট লাঠিটাকে পিঠে বেঁধে নিল। এরপর রেলিং টপকে জানালার কার্নিশে চলে গেল। তারপর ফিসফিস করে আকাশকে বলল, "এভাবে নামবি। একটা কার্নিশে নামার পর পাইপ বেয়ে একটু নেমে আরেকটাতে লাফিয়ে পড়বি।"

আকাশ বলল, "কিন্তু যদি পা কার্নিশে না পড়ে?"

রাতুল বলল, "পা কার্নিশে না পড়লে সোজা গিয়ে পড়বি নিচে। তাই খুব সাবধানে পা ফেলবি। আর আস্তে কথা বল। জানালার পাশেই কিন্তু রুম।"

রাতুল পাইপ বেয়ে নেমে আরেকটা কার্নিশে লাফিয়ে পড়ল।

আকাশ তখন কাঁপা কাঁপা পায়ে প্রথম কার্নিশে নেমেছে। এই প্রথমবারের মত তার ইচ্ছে হচ্ছে ফিরে চলে যেতে। কিন্তু রাতুলের সাথে যেতেও ইচ্ছে করছে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং ভয়ে সে কার্নিশে দাঁড়িয়ে শীতের সকালে পুকুরের ঠান্ডা জল থেকে উঠে আসা মানুষের মত কাঁপতে লাগল। নিচে চোখ যেতেই যেন আত্মা খাঁচা ছেড়ে বের হয়ে উড়ে যাওয়ার জন্য হুটোপুটি শুরু করে দেয়।

রাতুল দুটি কার্নিশ অতিক্রম করার পর পিছনে চেয়ে দেখল আকাশ এখনো প্রথম কার্নিশেই দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রাতুল এত দূর চলে এসেছে যে এখান থেকে কিছু বলতে গেলে জানালার পাশের রুমের ছাত্ররা শুনে ফেলতে পারে। রাতুল ফিসফিস করে আকাশকে ডাক দিয়ে হাত দিয়ে নামতে ইশারা করল। কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে মনে হল না সে নামতে পারবে।

আকাশের অবস্থা দেখে রাতুলের রাগে ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের চুল ছিঁড়ে ফেলতে। রেগে গেলে তার চোখমুখ অন্যরকম হয়ে যায়। সে রাগে প্রায় গজগজ করতে করতে আবার উপরে উঠতে শুরু করল। একটি কার্নিশ ওঠার পর আকাশের খেয়াল হল উত্তেজিত রাতুল উঠে আসছে। রাতুল উঠে এলে নিশ্চিত তাকে রুমে ফেরত পাঠাবে। কিল থাপ্পড়ও কিছু পড়তে পারে। মূলত সে ভয়েই সে দেয়াল থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে পাইপ ধরে নামার চেষ্টা করল। এটা খুব কঠিন কিছু ছিল না, তাই পেরে গেল। পরের কার্নিশে পা ফেলে সে নিচে তাকাল। আকাশ নামছে দেখে রাতুল ওঠা বন্ধ করে দেখছে। আকাশ ভালোভাবে কার্নিশে পা ফেলতে পারল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাতুল। সেও নামা শুরু করল। নামতে আর কোন ঝামেলা হচ্ছিল না। আকাশও মোটামোটি বুঝতে পেরেছিল কীভাবে নামতে হয়। সুতরাং তারা নেমে যেত আধঘন্টার মধ্যেই। কিন্তু মাঝপথে এসে রাতুল থমকে দাঁড়াল।

রাতুল তখন উপর থেকে তিন নাম্বার জানালার কার্নিশে। আর মাত্র একটা কার্নিশ বাকি আছে। তারপর পাইপ বেয়ে নামলেই নিচে পৌছানো যাবে। কিন্তু নিচে শোনা গেল মানুষের হাটার শব্দ। টর্চ লাইট দিয়ে দারোয়ান হোস্টেলের চারপাশটা দেখে নিচ্ছে।

রাতুলের বুক ঢিবঢিব করতে লাগল। সে মূর্তির মত দেয়ালের সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশও নিচে নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। এরকম কাটল দশ মিনিটের মত। দারোয়ান চারিদিকে কয়েকবার টর্চ মেরে চলে গেল। ভাগ্য ভালো সে উপরে তাকায়নি। রাতুল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু তবুও পুরোপুরি নির্ভার হতে পারল না সে। কারণ বলা যায় না, দারোয়ান যদি নিচে কোন কাজে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে নামা মাত্র তাদের দেখে ফেলবে। তাই সাবধানে কোন শব্দ না করে রাতুল নামল। আকাশও নেমে এল সন্তর্পনে।

তারা দুজন নেমে চারিদিকে তাকিয়ে খুব দ্রুতবেগে স্কুলের সীমানা দেয়ালের কাছে গেল। এখানে একটি ছোট গর্ত আছে। যে গর্ত দিয়ে যাওয়া যায় অন্যপাশে। সেখানে একটি রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার ওপর পাশেই শালবন।

রাতুল এবং আকাশ দেয়ালের গর্ত দিয়ে বাইরে বের হয়ে রাস্তা ক্রস করে শালবনে প্রবেশ করল। পূর্ণচাঁদের আলো শালবনে অপূর্ব সৌন্দর্য বিস্তার করেছে। এই সৌন্দর্য না দেখলে বোঝা যাবে না। রাতুল শালবনের কিছুটা গভীরে গেল। তার কাঁধের ব্যাগ থেকে বের করল সেই জাদুর চকলেটের বীজ। এটা রোপন করতে হবে। কিন্তু দেখা গেল মাটি খোঁড়ার মত কিছু নেই। আর মাটি এত শক্ত যে হাত দিয়েও খোঁড়া সম্ভব না। এই সমস্যারও সমাধান করল আকাশ। সে ব্যাগে তার বৈজ্ঞানিক বক্স নিয়ে এসেছিল। বৈজ্ঞানিক বক্সে অদ্ভুত সব জিনিসের মধ্যে একটি ছিল স্টিলের চাকু। এই চাকু দিয়েই মাটি খুঁড়ে গর্ত করল রাতুল। তারপর সেই গর্তে চকলেটের বীজটাকে রেখে দিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিল। কিছুক্ষণ তারা দুজন সে জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কিছুই হল না।

রাতুল বলল, "চল। এবার হোস্টেলে ফিরতে হবে। কাল এসে দেখব গাছ হল কি না।"

আকাশ জিজ্ঞেস করল, "পানি দিতে হবে না? গাছের তো পানির দরকার হয়।"

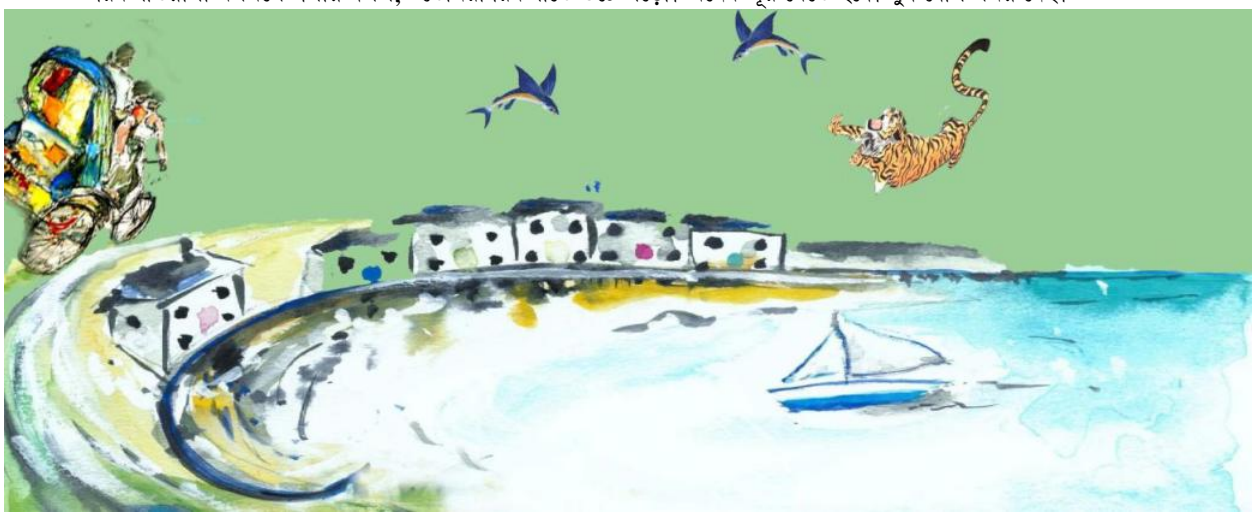
রাতুল বলল, "এখন পানি পাবো কোথায়। আপাতত এরকমই থাক। কাল পানি দেব এসে।"

রাতুল পিঠে বাঁধা লাঠিটা হাতে নিল এবং ফিরে যেতে শুরু করেছিল। আকাশও যাচ্ছিল তার পিছু পিছু। তারা মাত্র কয়েক পা গেছে এমন সময় পিছন থেকে এল খচখচ শব্দ। তারা দুজন প্রায় একসাথে ঘুরে ফিরে তাকাল। যা দেখল তাতে তাদের চক্ষুস্থির! কালো কুচকুচে একটি গাছ গঁজিয়ে মাথা সমান উঁচু হয়ে গেছে।

দুজন সামনে এগিয়ে গেল গাছের নিচে। রাতুলের হাতে হেডস্যারের দেয়া লাঠি দিয়ে রাতুল একটি খোঁচা দিল চকলেট বৃক্ষে। নরম নরম ঠেকল গাছের গা। তারপর তারা কিছু বুঝে উঠার আগে হঠাৎ এক তীব্র আলোর ঝলকানি শুরু হল। উজ্জ্বল একরাশ আলো গাছের আশপাশ এবং তাদের ঘিরে ঘুরতে লাগল চক্রাকারে। এই ঘূর্ননের গতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। একসময় আলোর তীব্রতা এত বেশি হল যে তারা দুজন চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হল।

রিকশার টুং টাং শব্দ শুনতে পেল তারা। আলোর তীব্রতা একটু কমলে রাতুল চোখ খোলে দেখল একটা আলো ঝলমল রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। এর চালকের আসনে একজন অদ্ভুত রিকশাওয়ালা। মাথায় কালো হ্যাট, মুখে অদ্ভুত মুখোশ। পড়নে কালো আলখেল্লা।

রিকশাওয়ালা খসখসে গলায় বলল, "তোমরা রিকশাতে উঠে পড়ো। অনেক দূর যেতে হবে। খুব বেশি সময় নেই।"



রাতুল এবং আকাশ দুজনই দেখল তাদের চারপাশে চক্রাকারে ঘুরছে তীব্র আলো। সুতরাং রিকশায় ওঠা ছাড়া উপায় নেই। তারা দুজন ভয়ে ভয়ে রিকশাতে চড়ে বসল।

রিকশাওয়ালা আবার বলল, "সিটবেল্ট বেঁধে নাও। খুব জোরে ছুটতে হবে।"

রাতুল সিটবেল্ট বেঁধে নিল। আকাশ বাঁধতে পারছিল না ভয়ে বা অন্য কোন কারণে। রাতুল তাকে বাঁধতে সাহায্য করল। সিটবেল্ট বাঁধা শেষ হলে রিকশাওয়ালা টুং টাং করে বেল বাজাল। তারপর ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল রিকশা বাতাসে ভর করে। রিকশার গতি বৃদ্ধি পেতে লাগল। একসময় এতই বৃদ্ধি পেল যে আলোর ঝলকানি ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। রাতুল এবং আকাশ দুজনই আবার চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হল।

চোখ খোলার পর তারা দেখল অন্য দৃশ্য। আশপাশের পরিবেশ বদলে গেছে। রিকশা এবং রিকশাওয়ালা নেই। তারা চলে এসেছে এক সবুজ পৃথিবীতে। সেখানে আকাশের রঙ সবুজ। কয়েকটি রঙ বেরঙের ডানাওয়ালা মাছ উড়ছে বাতাসে প্রজাপতির মত। কয়েকটা সবুজ ও হলুদ খরগোশ লাফিয়ে পড়ছে পাশের স্বচ্ছ জলের ডোবায়। রাতুলদের সামনে দিয়েই উড়ে গেল একটা আস্ত বাঘ।

রাতুল বুঝতে পারল এ দেশ জাদুর দেশ। এই সেই জাদু রাজ্য। আকাশ তখন বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে। এমন জগত যা কল্পনাকেও হার মানায়! রাতুল ও আকাশ চারপাশটা দেখছিল তার একেকটা জিনিস দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা শুনতে পেল কাঁপা কাঁপা গলায় কে যেন বলছে, "কে বাছা তোমরা? এখানে কী করছ?"

প্রথমে রাতুল এবং আকাশ কেউই ধরতে পারল না শব্দটা আসছে কোথা থেকে। তারপর রাতুলের চোখ পড়ল তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক পাশে একটি ঝাঁকড়া গাছের দিকে। সে গাছ লাল নীল নানা ফলে ভর্তি। ফলগুলো এতই পাকা যে মনে হচ্ছে রঙ ফেটে বেরোচ্ছে। সে ফল এবং সবুজ পাতার ফাঁকে গাছের একটি ডালে সাদা কাপড় পড়া এক থুত্থুড়ে বুড়ি বসে আছে। সে-ই প্রশ্ন করছে রাতুলদের।

রাতুল বুড়িকে দেখতে পেয়ে বলল, "আমরা জানি না এখানে কীভাবে এলাম। আপনি কে?"

বুড়ি বলল, "হে হে হে। আমি কে? এটা কোন কথা হল বাছা? আমি এই গাছের মালিক। তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত। নাও আমার গাছের ফল খাও। এর রসে তোমাদের প্রাণ জুড়াবে।"

বুড়ি একটা ডাল ধরে হালকা ঝাঁকি দিল। তাতে দুটো টসটসে ফল শূন্যে ভাসতে ভাসতে রাতুল এবং আকাশের মুখের সামনে এসে স্থির হয়ে রইল। রাতুলের কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল। তাই সে ফল হাতে নিলেও মুখে দিল না। কিন্তু আকাশ লোভ সামলাতে পারল না। রাতুল কিছু বলার আগেই সে খপ করে ফলটা ধরে গপ করে এক কামড় বসিয়ে দিল। তারপর প্রায় মিনিট খানেকের মধ্যে পুরোটা সাবার করে দিয়ে হাতের রস চাটতে লাগল।

রাতুলের তখন মনে পড়ল জাদুর বইয়ের কথা। সে ব্যাগ থেকে বইটা বের করল। বইয়ের রঙ তখন বদলে গেছে। সবুজ মোহনীয় এক রঙের আবহ তৈরি হয়েছে বইয়ের মলাটে।

রাতুল প্রথম পাতা খুলল। তাতে স্বয়ংক্রিয় স্ক্রিণের মত লেখা উঠল,

জাদু সম্রাট নিকোলাই পুত্র হারিরির পক্ষ থেকে জাদু রাজ্যে তোমাদের স্বাগতম। এই লেখা যদি তোমরা দেখতে পাও তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি তোমরা জাদু রাজ্যে চলে এসেছ।জাদু রাজ্য ভয়ংকর সব সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। সামান্য ভুলেই এখানে প্রাণনাশ হতে পারে। তাই সাবধান। এখানের প্রথম নিয়মটা মানুষদের এক প্রচলিত নিয়মের মতোই- 'অপরিচিত কেউ কিছু দিলে খাবে না।' এখানে ডাইনিরা গাছে গাছে থাকে। নতুন কেউ এলে তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে বিষফল খাইয়ে দেয়।

এটা পড়েই রাতুল আৎঁকে উঠল। তার মানে আকাশ বিষফল খেয়েছে। রাতুল তার হাতের ফলটি ছুঁড়ে ফেলে দিল। গাছ থেকে বুড়ি বলতে লাগল, "ফেলে দিলি কেন বাছা? আরেকটা ফল দেব? আরেক রঙের খাবি? এই রঙ কি তোর পছন্দ না?"

রাতুলের সেসব শোনার মত অবস্থা নেই আর। আকাশ বিষফল খেয়েছে সুতরাং তার জীবন এখন সংকটাপন্ন। আকাশকে বাঁচাতে হবে। রাতুল জাদুর বইয়ের বিষফল অংশে আঙুল রাখতেই বিষফল বিষয়ক আরো কিছু তথ্য সামনে এল। রাতুল খুঁজে বের করল কেউ বিষফল খেয়ে ফেললে তাকে কীভাবে বাঁচানো যায় সে অংশ। তাতে লেখা আছেঃ

কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ডাইনি বুড়ির প্ররোচনায় বিষফল খেয়ে ফেললে যত শীঘ্র সম্ভব তাকে পীযূষ স্রোতস্বিনীর জল পান করাতে হবে। তবে সাবধান পীযূষ নদে ভয়ানক মেছো কুমিরের বসবাস।

রাতুল বই বন্ধ করে বোকার মত গাছের বুড়িকে জিজ্ঞেস করে বসল, "পীযূষ নদ কোথায়?"

ডাইনি বুড়ি তখন বুঝতে পারল তার ছলচাতুরি এরা বুঝে গেছে। এবার সে নিজ রূপে ফিরে এল। অগ্নিমূর্তি ধারণ করল বুড়ি। তার চোখ দুটি লাল হয়ে জ্বলজ্বল করছিল। সে চিৎকার বলতে লাগল, "দূর হয়ে যা! দূর হয়ে যা মানুষের দল! হা হা হা!"

রাতুল আকাশকে নিয়ে গাছের কাছ থেকে সরে এল। তবুও বুড়ির চিৎকার থামল না। রাতুল ভেবে পাচ্ছিল না এখন কী করবে বা কার কাছে জিজ্ঞেস করবে। জাদুর বইয়ে হয়ত তথ্য আছে কিংবা জিজ্ঞেস করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেটা কীভাবে রাতুল বুঝতে পারছিল না।

ঠিক তখন তাদের পেছন থেকে ভালো মানুষের মত একটা কণ্ঠ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এই ডাইনি বুড়ি এত চেঁচাচ্ছে কেন আজ? আমার ঘুমটা ভেঙে দিল বজ্জাত বুড়ি।"

রাতুল তাকিয়ে দেখল হাই তুলতে তুলতে কথাটা বলেছে একটি বিরাটাকার সিংহ। সিংহটার শরীর দেখলে মনে ভয়ে ধরে যায়। সকালের জলখাবার হিসেবে কয়েকজন মানুষকে পুরো গিলে খেতে পারবে এমন শরীর। কিন্তু তার মুখটা অনেক নিরীহ। মায়া মায়া ভাব তার চোখ মুখে। রাতুল তাই ভয় না পেয়ে বলল, "আমার বন্ধুকে বুড়ি বিষফল খাইয়ে দিয়েছে। আমি পীযূষ নদে যেতে চাই। তুমি কি আমাকে বলতে পারবে এটি কোন দিকে?"

সিংহ হাই তুলতে তুলতে বলল, "তুমি চাইলে আমি তোমাদের সেখানে পৌঁছে দিতে পারি। তবে সেখানে আমি থাকতে পারবো না। মেছো কুমির খুব ভয়ানক। একবার আমার লেজ কামড়ে ধরেছিল।"

রাতুল বলল, "আমাদের পৌঁছে দিলে খুব উপকার হয়।"

আকাশ ততক্ষণে অনেক নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। বিষফলের ক্রিয়ায় সে চারদিক ঘোলাটে দেখতে শুরু করেছে।

সিংহ বলল, "তোমার বন্ধুকে নিয়ে আমার পিঠে চড়ে বসো।"

বলেই সিংহ তার পিঠের সাথে লাগানো ডানা দুটি ঝাপটাল কয়েকবার। রাতুল সিংহের ডানা দেখে চমকে গেল আবার। ডানার রঙ এবং চামড়ার রঙ একই হওয়ায় আগে তার চোখে পড়েনি।

ক্রমশ

করাতদেঁতো

কৌশিক ভট্টাচার্য

সবচেয়ে কে মানুষখেকো আমরা কি তা জানি?
সিংহ-বাঘে কোথায় লাগে, সবাই এটা মানি
করাতদেঁতো কপাৎখেকো কুমির-ই সেই প্রাণী!
সমস্তদিন খায় সে শুধু যখন যেটা মেলে
দাঁতগুলো তার করাত যেন! চিবিয়ে ছিঁড়ে ফেলে
মুরগি, পাঁঠা , হাঁস বা গোরু -- কপাৎ কোরে
গেলে।

শনিবারের দুপুরটি তার অন্য সবার চেয়ে।
পেট ভরাতে নয় সে রাজি ফালতু কিছু খেয়ে
ঐ দিনে তার স্পেশাল মেনু : বাচ্চা ছেলেমেয়ে!

ঐদিনে তার মাংসটা চাই তুলতুলে আর কাঁচ্চা
অল্পতে তার পেট ভরে না, চাই ছ' ছটা বাচ্চা
ছেলের মেয়ের মিললে জোড়া সবচেয়ে তা আচ্ছা।



ছোট্ট ছেলে পাকড়ে ধরে মাখিয়ে লেবুর রসে
ঝাল বাড়াতে তাই সে শুধু সরষে দিয়ে ঘষে
টক-ঝালেতে দুয়েই যাতে আচ্ছা করে বসে।

বাচ্চা মেয়ের ঝামেলা এই লম্বা যত চুলে
সস মাখালে না জড়িয়ে দেয় সেগুলো খুলে
বাচ্চা মেয়ে তাই শুধু নেয় চিনির রসে গুলে।

রসে-সসে সব মিলিয়ে জড়িয়ে হলে আঠা
তারপরে সে করবে শুরু, ভাবলে ভয়ে কাঁটা
মিষ্টি ঝালে টক মিশিয়ে এক এক করে সাঁটা।





ভাবছ কেন এমন খাওয়া? কী এসবের মানে?
আমি তো আর খাইনি নিজে, করাতদেঁতোই জানে!
খাচ্ছে কেন আমায় বলে যায় নি কানে কানে!

একটা কথা, রাত্তিরে সে খিদেয় থাকে রেগে
বাচ্চা যদি না ঘুমিয়ে কেবল নড়ে, জেগে
অমনি এসে ধরবে তাকে এক নিমেষে বেগে!

আজকে তবে এইটুকুই, এইবারেতে ঘুম,
নড়ছ কেন? চোখ যে খোলা! দেখব নাকি . . হুম!
বাইরে যেন আওয়াজ হোলো দুম দুমা দুম দুম!

ন্যাংলাপানা হ্যাংলা হাসি, ঝাঁ চকচকে গা-টি
করাতদেঁতো দাঁড়িয়ে ঐ , সব করেছে মাটি!
বাড়ির মধ্যে ঢুকবে নাকি, কোথায় গেল লাঠি?

করাতদেঁতো কাছেই আছে, চলছে শিকার খোঁজা।
জানলে তুমি জেগেই আছো, আসবে চলে সোজা।

এইবারে নট নড়নচরন, চোখ যেন হয় বোঁজা!

এই তো দেখো, লক্ষ্মী হয়ে চোখ বুঁজে যেই শুলে
করাতদেঁতো অমনি সোজা তোমায় গেল ভুলে।
দেখছি তো নেই এই এখানে, জানলাখানা খুলে!

জোর বেঁচেছ কিন্তু তুমি, এসেই যদি যেতো?
রাত হয়েছে, জাগছো বসে, দেখতে যদি পেতো,
কপাৎ করে তোমায় ধরে চিবিয়ে গিলে খেতো!

তাই তো বলি, ঘুমিয়ে পড়, এমনি আবার হলে
একটুও নয় নড়াচড়া, দিচ্ছি তোমায় বলে
চুপটি করে চোখটি বোঁজো, আপনি যাবে চলে।

***(Roald Dahl** এর **The Crocodile** অবলম্বনে। মূল লেখাতে কুমীরের নাম **Crocky-Wock the Crocodile** । উপরের লেখার শেষ কয়েকটি প্যারাগ্রাফ মূল লেখার থেকে একটু আলাদা।)*



আবু হোসেন

হালুমবা ছিল বীরমার্জার গুণ্ডামি তার কাজ যে
বজরানিবাসী; এমন গুণ্ডা দুটি তো পাবে না রাজ্যে
গ্রেভসেন্ড হতে অক্সফোর্ড তক ঘোরাফেরা নিঃশঙ্ক
বেড়ালজগতে নাম ছিল তার টেমসের মহাতঙ্ক

ডাকুসর্দার, একদিনও তার কাটে না লড়াই ভিন্ন
গায়ে কতশত যুদ্ধের ক্ষত থাবায় কাদার চিহ্ন
একখানা কান উধাও, কারণ সহজেই যায় বোঝা
এক সবেধন কুটিল নয়ন দৃষ্টিটি নয় সোজা

রদারহিথের লোকজন তার শাসণের তাপে জর্জর
হ্যামারস্মিথ আর পুটনির লোক তার নামে কাঁপে থরথর
মুরগির ঘরে তালা দেয় তারা হাঁসগুলো রাখে সামলে
কে জানে কখন ফাঁক পেলে বুঝি হালুমবা পড়ে হামলে

আহারে বেচারা ক্যানারি সে ভয়ে ঝাপটায় ডানা খাঁচাতে
আদুরে কুকুর, হালুমবা এলে কে পারে তারেও বাঁচাতে
জাহাজের খোলে ধেড়ে ইঁদুরেরা ভাগে পেলে তার গন্ধ
কোনো মার্জার কাছে এলে তার কপাল বেজায় মন্দ

তবে এরা সব ছোটোখাটো, তার আসল মূর্তি অন্য
তোলা থাকে সেটা ভিনদেশি যত বেড়ালগুলোর জন্য



শ্যামদেশি এক মার্জার নাকি হরেছিল তার কর্ণ
তাই শ্যামদেশি মার্জার তার ভয়ে হয় গতবর্ণ

গ্রীষ্মরজনী, চাঁদভাসা রাত, শান্ত আকাশ তলে
রুপোলী আলোয় বজরাটি বাঁধা মোলাসে জেটির জলে
ময়ূরপংখী নৌকাটি যেন, দোলে জোয়ারের ঝোঁকে
হালুমবা তাই দেখে আনমনে, একটি ভাবুক চোখে

ডাকু সখা তার গ্রামবুচামুক নেইতো সেদিন বাড়ি
হ্যাম্পটন বেল রেস্তোরাঁতে সে ভেজাতে গিয়েছে দাড়ি
সেনাপতি বীর পতিতব্রুটাস সেও তো ছিল না ঘরে
পাড়ে সিংহের স্ট্যাচুর পেছনে আরামে শিকার ধরে

মাস্তুলে চেপে চাঁদের আলোয় হালুমবা দেখে চেয়ে
অস্থিভামিনী, বান্ধবী তার, হেঁটে যায় জেটি বেয়ে
সেনাদল তার ঘুমে অচেতন পিপেতে, বাংকে, ঘরে
তখনই হাজির শ্যাম মার্জার শামপান ডিঙা চড়ে

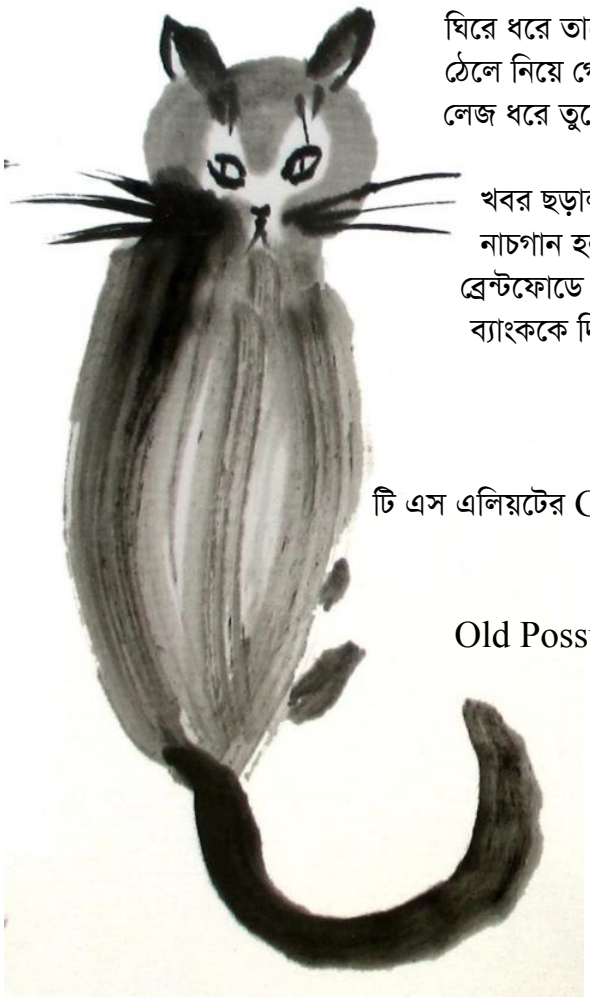
হালুমবা কিছু টেরটি পেল না কখন যে ধীরে ধীরে
নীল চোখে ভরা শাম্পানগুলো এল বজরাকে ঘিরে
ভালোবাসা ভরা গলাটিতে তার ওঠে ম্যাঁও ম্যাঁও গান
অস্থিভামিনী সঙ্গে ধরেছে মিষ্টি মিঞাঁও তান

বাঁকা নখ আর ছুরিহেন দাঁতে শ্যামদেশি সেনাদল
শব্দ না তুলে এল দুলে দুলে উঠল না কোলাহল

হালুমবা ঘিরে নিল পোজিশান, বেজায় জটিল পাক
মিঞাঁওওও(অ্যাটাক) ডেকে সেনাপতি গিলবার্ট দিল হাঁক

ওমনি সেনারা শাম্পান ছেড়ে মহালাফ মেরে উড়ে
চিনাবারুদের মত ছুটে এল গোটা বজরাটি জুড়ে
পিপেতে বাংকে ঘরে শুরু হল মার্জার অভিযান
উধাও হলেন অস্থিভামিনী বাঁচিয়ে আপন প্রাণ

হালুমবা ঘিরে যত সেনাদল তোলে যুদ্ধের সুর
ম্যাঁআও ম্যাঁআও রণসঙ্গীত ভেসে যায় বহুদূর
হাজারো রণের বীর সৈনিক আঁধার দেখল চোখে
ঘিরে ধরে তাকে নীল চোখ আর হাজারো থাবায় নখে
ঠেলে নিয়ে গেল ডেকের কিনারে শ্যামদেশী সেনাদল
লেজ ধরে তুলে ছুঁড়ে দিল ফেলে যেখানে অতল জল



খবর ছড়াল দাবানলহেন বাজে ঢাকঢোল শিঙে
নাচগান হল হেনলেতে আর উৎসব ওয়াপিং-এ
ব্রেন্টফোডে হল মার্জার ফেস্ট, গোটা ইঁদুরের রোল
ব্যাংককে দিল একদিন ছুটি, নাচাগান শোরগোল

টি এস এলিয়টের GROWLTIGER’S LAST STAND
অবলম্বনে।
মূল গ্রন্থ
Old Possum’s Book of Practical Cats

র‍্যাপিডেক্স সমাস শিক্ষা

অমিতাভ প্রামাণিক

কয়েক মিনিট আমায় দিয়ে দে, লাগবে না তোর ক'মাস –
ঘাড় ধরে আমি শিখিয়ে নেবই বাংলা গ্রামার, সমাস!

যে সমাসে ব্যাসবাক্যে দেখবি আঁশটে আঁশটে গন্ধ,
মারামারি করে, ঠিক বুঝে নিবি ঐটারই নাম দ্বন্দ্ব!

যে সমাসখানা বন্ধুর মতো, এই আড়ি, এই কী ভাব!
কঞ্জুস ব্যাটা অন্য কিছু না, ওটাই অব্যয়ীভাব।

যে সমাসে বাড়ে অম্বল, বুকজ্বালা, সেই জানে যার হয়
অকম্মার সে ঢেঁকি সমাসের নামটা কর্মধারয়।

আর যে সমাস ব্যাটাছেলে, যার হাত ভরা টাকা, ঘুষের –
পড়োনা কখনও খপ্পরে তার, বিটলে তৎপুরুষের।

অনেক সমাস একসাথে মিলে গুঁড়ো করে নেওয়া মিহি –
চরিত্রহীন সেই সমাসের নামটা বহুব্রীহি।

যে দুটো সমাস শিখতে ভির্মি খেয়েছিল মুনি ভৃগু
সেই দুটো মিলে এক হয়ে গিয়ে যা হল, সেটাই দ্বিগু।

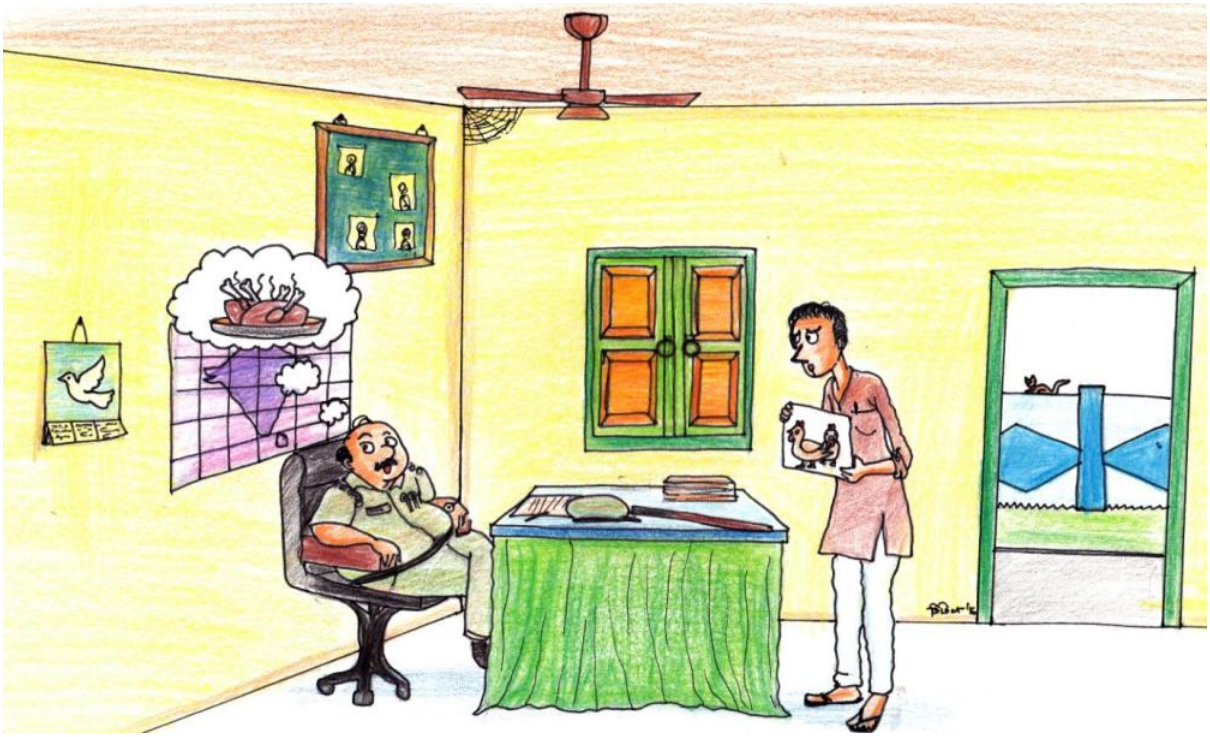
অলুক-ফলুক আর যা যা আছে, বুঝিয়ে দেবে তা সুধীর
এবার বলতো, দরকার আছে ব্যাকরণ কৌমুদীর?



ছবিঃ শ্রীময়ী

মুরগি চুরি

সঞ্জয় মিত্র



বলে দিয়ে অবনীদা ডিম ভাত বানাতে
ছেঁচে পান চেঁচে খান, পরে যান থানাতে
থানাদার প্যালা ঘোষ চ্যালা তার প্যাঁড়া খায়
দারোগার গা রোগা কি, বাড়ি বাগডোগরায় ?
রেগে কাঁই প্যালারাম, বলে এ কি কোশ্চেন
সহবত শেখোনিকো, কী হিসেব কষছেন ।
রাগারাগি ছেড়ে বলে অবনী মুখুজ্যে
কেঁচে গেল বেঁচে থাকা সাধু চোখ বুজছে
কাল রাতে চুরি গেছে গোটা দুই মুরগি
এন্তার ডিম পাড়ে সকাল দুপুরকি
বেঁটে খাতা আনো দেখি, ও সি বলে প্যালারে
ডাইরিটা ঠিকঠাক লিখি এই বেলা রে।
‘বুঝে বল ঠিক রাত কটা হবে তখনই’
‘বড়ি খেয়ে ঘুমোই তো, ঘড়ি ঠিক দেখিনি’
চেঁচামেচি দেখে পাড়া ভেঙে পড়ে আবেগে
ভূতো যুগি বেতো রুগি পারে সে কি না রেগে
ক্রমে আসে জমে ভিড় পাড়া বেপাড়া থেকে
মোটা চাঁদু রোগা দাদু হাত ধরে নাতিকে
দারোগার দাবড়ানি, শোন ভুলে গেছি তো
মুরগিটা পেটে আছে শুনে যা কোঁকোর কোঁ।

ছবিঃ তিতিল

জাগ্‌লিং থট

দেবীস্মিতা দেব

কাজ যদি হয় উৎপটাং
ফেল সেরে তা
পটাং পট্
করিস যদি ছটফটাং
কর তবে তা
ছটাং ছট্
হোস্ যদি তুই চিৎপটাং
উঠেই পড়িস
চটাং চট্
ভাঙিস যদি মটমটাং
শব্দ হবেই
মটাং মট্
আওয়াজ পেলে খটখটাং
যাস চলে তুই
খটাং খট
জলে ভর্তি ঘটঘটাং
খালি হলেই
ঘটাং ঘট।
কাজ যদি সব ঝটপটাং
সারতে পারিস
ঝটাং ঝট
খুলেই যাবে জটজটাং
যতই আছে
জটাং জট।



ছবিঃ শ্রীময়ী

মনের কথা

প্রিন্স মাহমুদ হাসান





পড়ার টেবিল হিজিবিজি
লাগে না আর ভালো।
ভালো লাগে বাঁশবাগানে
জোনাকিদের আলো।

ভালো লাগে মাঠের ফড়িং
ভালো লাগে নদী।
কেমন হবে নদীর জলের
মাছ হয়ে যাই যদি?

কেমন হবে পাঠশালাটা
যদি গো হয় মাঠে;
ইচ্ছে হলেই খেলব আমি
ইচ্ছে হলেই পাঠে।

মায়ের শাসন চাই না আমি
চাই না শাসন বাবার
চাই না খেতে গ্লাস ভরা দুধ
ডিমও সাথে আবার।

মনের কথা বলেই দিলাম
আসল কথা বাকি
আমি হলাম ভালো ছেলে
দিই না পড়া ফাঁকি।

শৈশবের দিনগুলি

রওশন মতিন



আমার মনের রঙ –ছবি যে
প্রজাপতির রঙিন পাখা,
ভর দুপুরে ওড়াউড়ি
ফুলের গায়ের পরাগ মাখা ।

দিনগুলো যে কাজলা বিলের
স্বচ্ছ জলের ঢেউ ,
মায়ের স্নেহে হাত বাড়িয়ে
ডাকছে নাকি কেউ !

ওই সুদূরের আকাশটা যে
স্বপ্ন –ছবি নীল,
ভোরের আলো ছড়িয়ে দিয়ে
খুলছে মনের খিল !

বাঁধনহারা হার না মানা
আলোয় মাখামাখি,
বাঁধন ছেড়া দস্যি আমি
মুক্ত ডানার পাখি।



ভালো লাগে

দেবাশিস বসু

ভালো লাগে রোদ্দুর
জোছনার আলো
মিঠে হাওয়া ফুরফুর
লাগে খুব ভালো ।

ভালো লাগে পিঠেপুলি
মা-র মিঠে কোলটা
আর ভালো কোলে দুলি
শুধু খাওয়া দোলটা।



লেজকাহিনী

পার্থ চট্টো

কাল বিকেলে বসেছিলাম--
নাহ্,--ছিলাম দাঁড়িয়ে;
কারণ,
একটু হলেই দিচ্ছিলাম যে
লেজটা মাড়িয়ে.....
মাড়িয়ে দিইনি বলেই,
কারই লেজ বা,
খোঁজও পাইনি;
কে রাখলে তুলে কোলেই----



কিম্বা কারুর কোল ছিল কিনা!
মুড়ে বসেছিল দুই পা!
লেজের আড়ালে সে'সব খবর,
কাগজে না ছাপলই বা!
নাহ্------
তবু মনে হয় বসেছিলাম;
দাঁড়িয়েই বসেছিলাম!
বসেই... দাঁড়িয়ে... লেজটা মাড়িয়ে.....
না তো---!

কীভাবে পেরিয়ে গেলাম!!!



১। ইংলিশ চ্যানেলের ছবি দেখেছ?
না ম্যাম। আমাদের কেবল অপারেটর শুধু হিন্দি চ্যানেল দেখায়।

২। গাড়ি বিষয়ক
শিল্পসম্মত গাড়ি–কলাকার
এক হেডলাইটওয়ালা গাড়িঃ কানাকার
দুই হেডলাইট ভাঙা গাড়িঃ অন্ধকার
তীব্র গতিশীল গাড়ি-গোলাকার
গাড়ির দামঃ দরকার
সরিয়ে পার্ক করুনঃ সরকার
মৌমাছিদের গাড়িঃ বিকার
গাড়িদের খেলার মাঠঃ কারপার্ক
গাড়িদের ফুলকাঃ কারগিল

-একটি মরুবাসী প্রাণীর নাম বল
-উট।
-গুড। আরো পাঁচটি মরুবাসী প্রাণীর নাম বল।
-আরেকটি উট, আরেকটি উট, আরেকটি উট, আরেকটি উট এবং আরেকটি উট

৩। -অঙ্কের দিকে জাস্ট সামান্য একটু মনোযোগ দিও ঋত্বিক।
-তাই তো দিচ্ছি ম্যাম।

৪। -পরিষ্কার করে বল। অন্যকে যে নিজের কথা বোঝাতে পারে না সে একটা গাধা।
-কী বললেন ঠিক বুঝলাম না স্যার।



।৩১।

বাড়ি ফিরে গিয়ে আজিমার যা দশা দেখেছিলাম সে কথা বলে আরেক বার নিজেকে দুঃখ দিতে চাইনা আমি। থাক সে কথা।

ফিরে আসবার কয়েকদিন বাদে বাবা একদিন আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ভয় পাওয়া গলায় বলল, চারপাশে শোনা যাচ্ছে, আমাদের ওপরে লোকজনের সন্দেহ হয়েছে। এ গ্রাম আর আমাদের জন্য নিরাপদ নয়। গুজবটা কতটা সত্যি সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও এ ব্যাপারে কোন ঝুঁকি না নেওয়াই উচিত। ঠিক করলাম আমি আর বাবা কয়েকজন লোককে নিয়ে বের হব কাছাকাছি যেসব এলাকায় তখনো ইংরেজ শাসণ ঢোকেনি তেমন কোন জায়গায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। সিন্ধিয়ার রাজত্বে যেমন আমাদের বেরাদরি লুটের টাকার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ হিস্যা রাজাকে খাজনা হিসেবে ধরে দিয়ে গ্রামে থাকে, নতুন কোন রাজত্বে গিয়ে তেমন কোন ব্যবস্থা করবার ইচ্ছে ছিল আমাদের।

সেই মত বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে কাছাকাছির মধ্যে বুন্দেলখন্ডের বিভিন্ন রাজাদের রাজত্বে ঘুরে ঘুরে খোঁজখবর শুরু করলাম। পুরনো গ্রাম ছেড়ে বেশি দূরে যাবার ইচ্ছে ছিল না আমাদের।

খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে ঝালোনের রাজার সঙ্গে দেখা করা গেল। আমাদের গণেশ জেমাদার তখন তাঁর আশ্রয়ে থাকে। তাকে নিরাপদে থাকবার সুযোগ দেবার বদলে তার লুটের টাকার একটা মোটা হিস্যা রাজা পান। তারই সুপারিশ রাজা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছিলেন।

রাজার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হল আমাদের। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন আমাদের আশ্রয় দিয়ে না তাঁর আবার কোন বিপদআপদ হয়। আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো আর উপদেষ্টাদের মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে বশ করে ফেলতে অবশেষে রাজার আপত্তি থামল। বছরে তিনশো টাকার খাজনা আর খুব দামি কিছু গয়নাগাঁটি লুট করলে তার হিস্যা, এই শর্তে রফা হল। ঠিক হল বাবা এলাকায় নিজের পরিচয় লুকোবার জন্য ঝালোনের রাজধানীর কাছাকাছি তিনটে গ্রামের জমিদারি নিয়ে সেখানে চাষবাসের কাজ করবে।

কথাবার্তা শেষ হলে রোকরিয়াদের থেকে পাওয়া জিনিসপত্র থেকে একটা মুক্তোর মালা, আমার তলোয়ারটা আর আরো কিছু জিনিসপত্র মিলে সবশুদ্ধু পাঁচ হাজার টাকার নজরানা দিয়ে আমরা ফিরলাম। বাবা, কয়েকজন লোককে নিয়ে রয়ে গেল সেখানে সব বিলিব্যবস্থা করবার জন্য আর আমি বাকি দলটা নিয়ে গ্রামের দিকে ফিরলাম আমাদের বাড়ির লোকজনদের নিয়ে আসবার জন্য।

নিজের ছোটবেলার গ্রাম ছেড়ে নতুন জায়গায় যেতে কারই বা ভালো লাগে। এইখানে আমাদের সবার ছোটবেলা কেটেছে, এইখানেই আমরা বড় হয়েছি। গ্রামের লোকজনও ভদ্র ব্যবহারের জন্য আমাদের ভালোবাসত খুব। তবু সব ছেড়ে আমাদের নতুন জায়গায় যেতেই হল। কিন্তু খারাপ লাগলেও বাবার এই দুরদর্শিতায় আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষা হয়েছিল সেবার। কারণ তার শোনা গুজবটা মিথ্যে ছিল না। ইংরেজরা কী করে যে আমাদের খবর পেয়েছিল জানি না, কিন্তু আমরা চলে আসবার কয়েকমাস পর আমাদের মূরনির গোটা পরগণাটা ইংরেজরা আক্রমণ করে। গ্রামের পর গ্রাম একটা একটা করে ধরে সেখানকার ঠগিদের নিকেশ করে দিয়েছিল তারা। বহু

নামকরা ঠগি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়, বহু ঠগি পালিয়ে গিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শুধু আমাদের মত কিছু অল্প যারা আগেভাগে অন্য ডেরা খুঁজে নিয়েছিল তারা বেঁচে যায়।

এরপর আমি নিজেও একটু সাবধান হলাম। যতদিন জমা টাকা হাতে আছে ততদিন বিনা কারণে নতুন কোন ঝুঁকি নেবার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। দ্বিতীয় অভিযান সেরে ফেরবার সঙ্গেসঙ্গেই আমায় 'সুবেদার' উপাধিটা দেয়া হয়ে গিয়েছিল। ঠগিদের মধ্যে সেটাই সর্বোচ্চ উপাধি। ফলে টাকাপয়সা আর সম্মান দুটোই তখন আমার হাতে এসে গেছে। তিনটে গ্রামের জমিদারীর থেকেও রোজগার মন্দ হত না আমাদের। জমিদারী চালাবার কাজে বাবাকে সাহায্য করে, হেসেখেলেই দিন কাটছিল আমাদের। ঠগিগিরি তখন কিছুদিনের জন্য একেবারে বন্ধ আমাদের দলের।

শুধু একজনের এমন শান্ত জীবন মোটেই পছন্দ হছিল না। সে হল গণেশ জেমাদার। মাঝেই মাঝেই সে জেদ ধরত তার সঙ্গে নতুন অভিযানে বের হতে হবে। আমি তাতে মত দিতাম না। শান্তিতে থাকতে ভালোই লাগছিল আমার। এই গণেশ জেমাদারকে দেখলে আমার ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হত। তার সামনে এলেই আমার মনে হত এর সঙ্গে আমার আগে কখনো দেখা হয়েছে। ভীষণ যন্ত্রণার একটা ভুলে যাওয়া স্মৃতি বারবার আমার মাথার ভেতরে ধাক্কা দিয়ে জেগে উঠতে চাইত। লোকটার চেহারা বেশ শক্তিশালী। মুখটা ভয়ংকর। দেখলে বুকের ভেতরটা শিরশির করে ওঠে। তবে তার কথা এখন থাক। যথাসময়ে গণেশের কথা ফের বলা যাবে।

বছরতিনেক এইভাবে সুখেশান্তিতে কাটল আমাদের। তিনটে গ্রামের জমিদারি ততদিনে বেড়ে সাতটা হয়েছে। গত অভিযানের সময় আজিমার একটা মেয়ে হয়েছিলো। সে এখন ভারী সুন্দরী হয়ে বড় হয়ে উঠছে। আর কোন ছেলেপিলে হয়নি আমাদের। চতুর্থ বছরে এসে আমাদের দুঃখের দিন শুরু হল। রাজা কী কারণে হঠাৎ সন্দেহ করলেন আমরা তাঁকে ঠকাচ্ছি। কাজেই ভয় দেখাতে শুরু করলেন যে আমাদের তিনি ধরিয়ে দেবেন। সেইসঙ্গে আবার সে বছর দারুণ খরা হয়ে ফসলটসল কিছু হল না। রাজা কিন্তু তাতে না দমে আমাদের কাছ থেকে সাতটা গ্রামের পুরো খাজনাই আদায় করে নিলেন। ফলে জমা টাকাপয়সা যা ছিল সব ফুরিয়ে এল একেবারে। বাধ্য হয়েই আমি তখন নতুন অভিযানের কথা ভাবতে বসলাম।

দল গড়তে গিয়ে নতুন মুশকিল শুরু হল। আমাদের দলটা তখন ভেঙেচুরে ছড়িয়ে গেছে দূর দূরান্তরে। তাদের খুঁজেপেতে আনতে সময় আর টাকা দুটোই নষ্ট হবে অনেক। ঠিক এই সময় জনরব উঠল, নামকরা পিন্ডারি নেতা চিতু নাকি বিরাট একটা দল জুটিয়ে দশেরার পর থেকে ইংরেজ রাজত্বে ঢুকে লুটপাট করবার ছক করছে। কথাটা শুনে ইস্তক আমার খুব আগ্রহ হচ্ছিল। পেশায় না হলেও মানসিকতায় আমি আসলে একজন সৈনিক। সামনাসামনি লড়াই করায় আমার খুব আগ্রহ আছে। ভাবলাম, কয়েকটা বাছাই লোক আর ভালো ঘোড়া নিয়ে যদি চিতুর দলের কোন একটা শাখায় ভিড়ে যেতে পারি তাহলে ঠগি অভিযান করলে যা পাব তার চেয়ে লাভ বেশি বই কম হবে না। বিশেষ করে সে'বছর পিন্ডারিদের দল পথে বের হবে; ধরতে পারলে তারা কাউকেই ছেড়ে কথা কয় না। ঠগি থেকে মহারাজা কারো নিস্তার নেই তার হাতে পড়লে। তাছাড়া ঠগিদের সঙ্গে তাদের বিশেষ একটু শত্রুতাও আছে।

পীর খান আর মোতিরাম তখনও আমাদের কাছাকাছি আছে। তাদের ডেকে পরিকল্পনাটা বলতে তারা এককথায় রাজি। তখনো তাদের কাছে টাকাপয়সা কিছু বেঁচে আছে। ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই তারা ঘোড়াটোড়া, বর্মচর্ম কিনে নিয়ে এসে হাজির হল। সঙ্গে আরো পাঁচজন বাছাই করা লোকও জুটিয়ে এনেছে। তবে মুশকিল হল, সে লোকগুলোর ঘোড়া নেই। পায়ে হেঁটে পিন্ডারিদের দলে গেলে কোন লাভ হবে না। শেষে উপায় না দেখে আমি গিয়ে রাজাকে ধরে পড়লাম। রাজা আমায় বিশেষ স্নেহ করতেন। ফলে অল্প কসরতেই রাজি হয়ে গেলেন তিনি। ঠিক হল রাজার আস্তাবল থেকে পাঁচটা ঘোড়া ধার পাব আমরা। অভিযান থেকে ফিরে আসবার পর ঘোড়ার বাজারদরের দ্বিগুণ হারে ধার শোধ দিতে হবে তাঁকে। সাজগোজসহ প্রত্যেকটা ঘোড়ার দাম ধরা হল তিনশ টাকা করে।

ঘোড়া জোটাবার কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেল আমাদের। গ্রাম ছাড়বার আগে, ঠগি অভিযানে যাবার আগে যেসব পুজোপাঠ হয় ঠিক সেইরকমভাবেই পুজোপাঠ সেরে দৈবি সংকেত নেয়া হল। দেখা গেল সব সংকেত শুভ। খুশি মনে রওনা হয়ে গেলাম আমরা।

কয়েকদিনের মধ্যেই চিতু পিন্ডারির শহর নেমাওয়ারে পৌঁছে দেখি গোটা জায়গাটা সারা হিন্দুস্তান থেকে আসা হরেক চেহারা আর পোশাক-আশাকের সেপাইতে থিকথিক করছে। বড়োসরো লুটপাটের সুযোগ মেলবার আশায় রোজই আরো লোক এসে পৌঁছোচ্ছে দলে দলে।

পৌঁছোবার পর প্রথমেই আলাপ হল চিতুর এক বিশ্বস্ত সর্দার, গফুর খানের সঙ্গে। লোকটার হিংস্র মুখেচোখে পিন্ডারি শব্দটা যেন বড় বড় করে লেখা। যোদ্ধা হিসেবে তার খুব সুনাম। চিতুর দলে ঢোকবার আগে দোস্ত মহমদ আর কুরীম খানের দলেও কাজ করেছে নাকি সুনামের সঙ্গে। সে-ই আমায় সঙ্গে করে চিতুর দরবারে নিয়ে গেল। আমার সেরা পোশাকটা পরে গিয়েছিলাম আমি। চিতুর সামনে নিচু হয়ে তলোয়ারের বাঁটটা এগিয়ে দিয়ে সম্মান জানিয়ে বললাম, আমি ঝালোনের একজন সৈয়দ। তার দলে যোগ দিতে এসেছি।

চিতুও দেখলাম আমাকে বেশ সম্মান দেখাল। আমার চেহারাটা তার বেশ মনে ধরেছে বোঝা যাচ্ছিল। বলে, "ঝালোন? তার মানে তুমি তো অনেক দূর থেকে এসেছ হে? ভালো, ভালো। আমার দলে স্বাগত। যে কোন বীরপুরুষের জন্যই সবসময় আমার দলের দরজা খোলা। আমার কাছে কাজ করবার নিয়ম টিয়ম জেনেই এসেছ নিশ্চয়! আমি মাইনেপত্র কিছু দিই না। লুটপাট যা করবে তার মধ্যে আমার প্রাপ্য একটা অংশ আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বাকি সব তোমার থাকবে। আমার প্রাপ্য কতটা সেটা তুমি লোকজনের কাছেই জেনে নিও। আশা করি আমায় ঠকাবে না। মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি জোচ্চোর নও।"

"নিয়মকানুন আমি সব জেনেই এসেছি," আমি জবাব দিলাম, "তবে একটা অনুরোধ আছে। আমার সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু এসেছে যারা আপনার দলে যোগ দিতে চায়। হুজুর যদি অনুমতি দেন তো তাদের আমি পেশ করতে পারি।"

"নিশ্চয় দেখব, তবে এখন নয়। সন্ধের সময় মাঠে এস। সেখানেই আমি তোমার তোমাদের সবার সঙ্গে আলাপ করব আর তোমাদের ঘোড়াটোড়াগুলোও দেখে নেব একবার। সে'সব দেখবার পর বাহিনীতে তুমি কী পদ পাবে সেটা ঠিক করব।"

এই চিতু সর্দারের মত মানুষ আমি বেশি দেখিনি। যেমন গায়ে শক্তি, তেমন তার সাহস আর দম। তাকে দেখে দলের লোকেরা সবসময় আরো বেশি কাজ করবার উৎসাহ পেতো সবসময়। অনেকবার এমন হয়েছে যে সারাদিনের পথচলায় ক্লান্তিতে আমরা যখন ঘোড়ার পিঠ থেকে টলে পড়বার দশায়, চিতু তখন , যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গীতে তার ঘোড়াটাকে দৌড় করানো শুরু করেছে। লোকটার যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মরাটা উচিত ছিল, কিন্তু ভাগ্যের সঙ্গে কারো কোন জোর তো খাটে না। বড় করুণভাবে মৃত্যু হয়েছিল তার। তবে সে গল্প এখন নয়।

চিতুর দরবার থেকে বের হয়ে গফুর খান আমায় বলল, "শহরের বাইরে যে বড় মাঠটা আছে,বিকেলবেলা তোমার লোকজনকে নিয়ে সেইখানে হাজিরা দেবে। খেয়াল রেখো ঘোড়াগুলো যে ভাল অবস্থায় থাকে। তোমার লোকজনের পোশাক আশাক যেন ঠিকঠাক হয়। আমি চেষ্টা করবো তোমাকে আমার রিসালায় ঢুকিয়ে নিতে। জান তো, আমার রিসালা হচ্ছে লুটপাটে সবার সেরা। চাইকি আমার রিসালার শ দুশো লোকের সর্দার বানিয়ে দেবারও চেষ্টা করে দেখতে পারি। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি নেতা হবার জন্যই জন্মেছ।"

"আমিও মনেপ্রাণে তাই চাই," আমি জবাব দিলাম, "আপনি যদি আমায় একটু দেখেন তাহলে আমার সে স্বপ্নটা পূরণ হতে পারে। আমি আগে কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে যাইনি বটে, কিন্তু আপনার কাছে থাকলে শিখে নিতে সমস্যা হবে না।"

সেখান থেকে ফিরে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি দলের সবাইকে ঠিকঠাকভাবে তৈরি করে নিয়ে মাঠের দিকে রওনা হলাম। ঘোড়া আর মানুষ সবাই তখন খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে বেশ তাজা হয়ে উঠেছে। পরিদর্শনের জন্য আমি নিজে সবজি খানের বর্মচর্ম আর তলোয়ার দিয়ে সাজলাম। মাঠে পৌঁছে দেখি সেখানে তখন শ'খানেক ঘোড়সওয়ার এসে জমা হয়ে গিয়েছে।

সূর্য অস্ত যাবার বেশ খানিক আগেই চিতু শহর থেকে বের হয়ে পরিদর্শনের মাঠে চলে এল। তাকে ঘিরে ছিলো তার বিশ্বস্ত সর্দারের দল। সবার আগে আগে আসছিলো আপাদমস্তক বর্মে মোড়া গফুর খান।তাকে দেখলেই আন্দাজ করা যায় কতবড় বীর সে। তার দিকে দেখিয়ে আমি পীর খানকে বললাম, "ওই দেখ। ওর কাছেই আমরা কাজ করব।" বলতে বলতেই আমি আমার অধৈর্য হয়ে ওঠা ঘোড়াটাকে পা দিয়ে টোকা মেরে দৌড় করিয়ে এগিয়ে গেলাম চিতুর দিকে। তার কাছে পৌঁছে হাতের তলোয়ারটাকে একেবারে নিচু করে জিনের ওপর থেকে কোমরের কাছে মাথা নুইয়ে বললাম, "আপনার আদেশ মুতাবিক বান্দা হাজির হুজৌর। এখন হুকুম করুন।"

ঘোড়াটাকে ভালো করে দেখি নিয়ে চিতু হাসিহাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাঃ বাঃ। তুমায় দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভালো কাজ দেবে তুমি। সঙ্গের লোকজনও তো বেশ ভালোই। এমন বেশ কিছু লোক পেলে আমার বড় সুবিধে হত হে।" বলতে বলতে পাশ ফিরে বলে, "কী হে গফুর খান। একে তোমার দলেই নেবে তাহলে? শ'কয়েক লোক হবে নাকি মীর সাহেবের হাতে দেবার জন্য?"

"নিশ্চয় হবে হুজুর," গফুর খান হাঁক দিয়ে বলে উঠল, "দেখে তো মনে হচ্ছে সাক্ষাত রুস্তম! আমি প্রথমবার দেখেই বলেছিলাম-- "

"তাহলে যাও, ওকে তোমার হাতেই দিলাম। খেয়ালটেয়াল রেখো একটু--"

গফুর খুশি খুশি মুখে আমার দিকে ফিরে বলল, "এসো হে মীর সাহেব, এখানে কারো থেকে একটা লম্বা খেলার বল্লম নাও দেখি। চলো, তুমি কেমন বাহাদুর তার একটু পরীক্ষা নিয়ে নিই।"

বললাম, "আমি তলোয়ারবাজি জানি। মাটিতে দাঁড়িয়ে তলোয়ার হাতে আমি দুনিয়ার যেকোন মানুষের মহড়া নিতে পারি। তবে ঘোড়ায় চড়ে বল্লমের খেলা আমার জানা নেই। কিন্তু তাতে আমি ভয় পাই না। আসুন--"

আমি একজনের কাছ থেকে একটা বল্লম জোগাড় করে নিলাম। জিনিসটা একটা লম্বা বাঁশের ডান্ডা। তার মাথায় তুলোর একটা বল গোঁজা আর সরু সরু কাপড়ের ফিতে লাগানো।

মাঠে এসে আমাদের দুটো ঘোড়াই একে অন্যকে ঘিরে ক্রমাগত পাক খেতে লাগল। ঘোড়ার পিঠ থেকে আমরা বল্লম নিয়ে পরস্পরকে খোঁচা মারবার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম,কিন্তু কেউই কাউকে ছুঁতে পারছিলাম না। আমাদের ঘিরে বাকি ঘোড়সওয়াররা বেশ কৌতুহল নিয়ে হিন্দুস্তানের সেরা যোদ্ধার সঙ্গে একেবারে অপরিচিত একজন নতুন যোদ্ধার কশরত দেখছিলো। একেকবার একজন যখন অন্যজনের আক্রমণের হাত থেকে বেঁচে জটিল একটা ভঙ্গী করে ঘোড়া নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যায় অমনি চারপাশে সাবাশ সাবাশ শব্দ ওঠে। এমনিভাবে বেশ খানিকক্ষণ চলবার পর একবার হঠাৎ ঘোড়া পিছিয়ে নিতে সামান্য দেরি হওয়ায় গফুর খানের বল্লম আমার হাতটাকে ছুঁয়ে দিতেই সে ছোটা থামিয়ে বলল, "আমি জিতে গেছি।"

বললাম, "আর এক হাত হবে নাকি?"

সে বলল, "সাবধান হে ছোকরা। আবার মুখোমুখি হলে আমি কিন্তু অত সহজে ছেড়ে দেব না তোমায়। পাঁজরাতে দু একটা খোঁচা খেলে নতুন যোদ্ধাদের বেশ ভালো শিক্ষা হয় জানো তো?"

উত্তরে আমি কিছু না বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে আক্রমণের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গফুর খান এইবার দেখি সর্বশক্তি নিয়ে আমার ওপর আক্রমণ শানাচ্ছে। তবে তার ঘোড়াটা আমার ঘোড়ার চেইয়ে একটু মোটা হওয়ায় তার আক্রমণগুলো আমি এড়িয়ে যেতে পারছিলাম। খানিকক্ষণ এইভাবে আমার ওপর আক্রমণ চালাবার পরে যেই দেখলাম তার ঘোড়াটা একটু ক্লান্ত হয়েছে অমনি আমি পালটা আক্রমণে গেলাম। কয়েকবার তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ শানিয়ে খেয়াল করলাম গফুর খান রেগে উঠছে। একটা নতুন ছেলের হাতে এমন হেনস্থা হতে তার মোটেই ভালো লাগছে না। খুব শিগিগিরই সে তিতিবিরক্ত হয়ে সবকিছু ভুলে আমার দিকে তেড়ে এল সোজা। আমি হঠাৎ আমার ঘোড়াটার মুখ একপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে গফুর খানের ঘোড়াটার পেটবরাবর তাক করে বল্লমটা চালিয়ে দিতে সেটা গিয়ে সটান তার বুকে লাগল। ধাক্কাটা বেশ জোরেই লেগেছিল তার। চারদিকে তখন সাবাশির ঝড় উঠেছে। হতভম্ব অবস্থাটা কাটিয়ে উঠে গফুর খানও সেই চিৎকারে যোগ দিল। বলে, "মীর সাহেব আপনি আমায় ঠকিয়েছিলেন। এ খেলায় আপনি তো ওস্তাদের ওস্তাদ। অথচ বলছিলেন এ খেলা আপনার জানা নেই!"



আমি বললাম, "আমি কোরাণ ছুঁয়ে বলতে পারি আমি আগে কখনো বল্লম হাতে নিয়ে দেখিনি। হঠাৎ করেই ব্যাপারটা ঘটে গেছে। আপনার বেশি লাগেনি তো?"

"না হে, আমার তেমন কিছু লাগেটাগেনি। তবে তলোয়ারেও যদি তোমার এমন হাত হয় তাহলে এখানে এমন কোন লোক তো দেখি না যে তোমার সামনে দাঁড়াতে পারবে।"

আমি বললাম, "অহংকার করছিনা, তবে চিতু হুজুর যদি ইচ্ছা করেন তাহলে কাল সকালে আমি কিছু মহড়া নিয়ে দেখাতে পারি।"

চিতু খুশি হয়ে বলে, "বেশ বেশ।" অন্যরাও দেখি এ ব্যাপারে বেজায় উৎসাহ দেখাচ্ছে। ঠিক হল পরদিন চিতুর বাড়িতে তলোয়ারের খেলার পরীক্ষা হবে আমার।

তৃতীয় পর্ব

।৩২।

পরদিন বিকেলে একটা ছোট মাঠে ফের আমাদের জমায়েত হল। চিতু পিন্ডারিদের প্রথা মেনে মাঠের একপাশে একটা কার্পেট বিছিয়ে তার সর্দারদের নিয়ে সেখানে বসেছে। চোখেমুখে তার বেশ কৌতুহলের ছাপ। আমি আসতে আমাকে ডেকে নিয়ে পাশে বসাল। সামনে মাঠের ওপর দুজন শক্তপোক্ত চেহারার রাজপুত তখন ঢাল আর কাঠের তলোয়ার নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে লড়ছে। কেউ কাউকে ছুঁতে পারছে না অবশ্য।

"কী হে এদের দিয়ে চলবে?" চিতু আমায় প্রশ্ন করল।

আমি বললাম,"এদের মধ্যে যাকে আপনি বলবেন হুজুর--"

"সাবধান। চেহারাগুলো দেখেছ তো? দেখো, আবার গোহারা হেরে বোসো না।"

উত্তরে আমি বললাম, "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো হুজুর।"

পীর খান একটা কাঠের তলোয়ার আর বেতের ঢাল জোগার করেই রেখেছিলো। সেগুলো হাতে নিয়ে আমি ময়দানে নেমে পড়লাম। তার আগেই গায়ের জামাটা খুলে রেখে একটা রুমাল দিয়ে কোমরে কষে বেঁধে নিয়েছি। মাঠের মধ্যে দুই রাজপুতের একজন বসে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। আমায় আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। চারপাশে লোকজন দেখি ফিসফাস করছে খুব। লোকটার মুশকো চেহারার পাশে আমার হালকা-পলকা চেহারাটা দেখে

তাদের তখন ধারণা হয়েছে এর সঙ্গে এঁটে ওঠা আমার কর্ম নয়। এ খেলায় গায়ের জোরের চেয়েও দক্ষতার দাম যে অনেক বেশি সে কথা এরা ততটা জানে না বলে মনে হচ্ছিল আমার।

মাঠের মাঝখানে এসে পৌঁছে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বললাম, "নিয়মটা কী হবে? প্রথম যে অন্যকে ভালোরকম একটা ঘা দিতে পারবে সে জিতবে, তাইতো?"

সে বলল, "রাজি। তবে আমি বেশ জোরে মারবো কিন্তু। সাবধান!"

"ভালো কথা," আমি জবাব দিলাম, "এবার তৈরি হও।"

সে একপাশে সরে গিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আমায় ভালো করে দেখে নিল, তারপর তলোয়ার নাচিয়ে নাচিয়ে আমায় ঘিরে পাক খেতে খেতে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি কিন্তু জায়গা ছেড়ে একচুল নড়লাম না। তলোয়ারটা উঁচুও করলাম না। লোকটা ভেবেছিলো আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে শুরু করবো বুঝি। আমার দাঁড়িয়ে থাকাদেখে সে একটু ঘাবড়ে গেল প্রথমে। তারপর হাতের তলোয়ার মাথার ওপর উঁচিয়ে দুই লাফে কাছে এসে আমার মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ার চালিয়ে দিল।

আমি পুরোপুরি তৈরি ছিলাম এই আক্রমণটার জন্য। এমন আক্রমণ বেশির ভাগ সময়েই ঘটে থাকে। ঢালটা উঁচিয়ে আমি তার আঘাত ঠেকালাম, তারপর ঢাল দিয়েই তার তলোয়ারটাকে আটকে ধরে রেখে আমার কাঠের তলোয়ার দিয়ে তাকে এমন মার মারলাম যে সে অনেকদিন তা মনে রাখবে। চারদিকে তখন হাততালির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এইবার অন্য রাজপুতটা এগিয়ে এসে আমাকে সেলাম করে বলে, "ভীম সিংকে তো বেকায়দায় পেয়ে হারিয়ে দিলেন। এবার আমার সঙ্গে এক হাত হয়ে যাক, কী বলেন?"

এই লোকটা দেখা গেল আমার লড়বার কায়দাটা চেনে।তার সঙ্গে তলোয়ারবাজি করতে করতে আমার মনে হচ্ছিল যেন সেই ছোটবেলায় ফিরে গেছি আবার, আবার আমার অস্ত্রবিদ্যার গুরুর সঙ্গে লড়ছি। কিন্তু গুরুকে আমি পরের দিকে বারংবার হারিয়েছি, কাজেই এই লোকটাকেও আমার ভয় ছিল না। খানিক লড়বার পরেও কেউ যখন কাউকে ছুঁতে পারলাম না, তখন দুজনেই লড়াই ছেড়ে একটু বিশ্রাম নিতে বসলাম। তখন চিতু উঠে দাঁড়িয়ে বলে "যথেষ্ট হয়েছে। দুজনেই ভালো লড়েছ। কেউ কাউকে হারাতে পারো নি। আজ এই পর্যন্তই থাক।"

"না খোদাবন্দ," আমি বললাম, "আমাদের মধ্যে একজনকে আজ জিততেই হবে। আমার এই বন্ধুটিও তাই চায়।"

রাজপুতটি হাসতে হাসতে বলে, "নবাবসাহেবের হাত বটে একখানা। আপনার গুরু কে বলুন তো! আমার সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিতে পারে এমন কাউকে এই প্রথম দেখলাম।"

"ঠিক আছে," চিতু হাত উলটে বলল, "তবে দেখো, এর থেকে আবার দুশমনি না তৈরি হয়ে যায় দুজনের মধ্যে।"

আবার অনেকক্ষণ লড়াই চলল আমাদের, কিন্তু কেউ কাউকে আর ছুঁতে পারি না। দু একবার দুজনেরই পা পিছলেছে। দুজনেই তা সামলে নিয়েছি। লোকটার দম আমার চেয়ে বেশি। কাজেই একটা সময় খেয়াল করলাম আমি যতটা ক্লান্ত হয়েছি সে ততটা হয়নি। আমি তখন লড়াইয়ের কৌশল বদলালাম। আক্রমণ বন্ধ করে দিয়ে আমি আত্মরক্ষা করতে লাগলাম শুধু, আর তারই মধ্যে সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। লোকটা ভাবল এইবারে আমায় বাগে পেয়েছে। ঝড়ের বেগে আঘাতের পর আঘাত করতে করতে কখন যে তার একটা পাশ অরক্ষিত রেখে দিয়েছে তার খেয়াল নেই। মুহূর্তের মধ্যে আমার কাঠের তলোয়ার গিয়ে গুঁতো মারল তার খোলা পাঁজরের গায়ে। এত জোরে মেরেছিলাম যে সবাই সে শব্দটা শুনতে পেয়েছিল সেদিন। লোকটার দম বন্ধ হয়ে গেছিল এক মুহূর্তের জন্য। তলোয়ারটা সত্যিকারের হলে ওই এক ঘায়ে তার শরীরটা নিঃসন্দেহে দুটুকরো হয়ে যেত সেদিন।

"দারুণ দারুণ," বলে সাবাশি দিয়ে উঠল চিতু। তারপর রাজপুতের দিক তাকিয়ে বলে, "রামদিন সিং, তুমি আজ হেরে গেছ কিন্তু এই হারে কোন লজ্জা নেই।"

রাজপুতটি শুনে একগাল হাসল। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা সবাই জানো তলোয়ারবাজিতে আমার ক্ষমতা কতটা। সেই আমাকে এ আজ হারিয়ে দিয়েছে। অতএব সাবধান। মীরসাহেবের সঙ্গে পারতে কেউ লাগতে এসো না কখনো।"

আমি চিতুর দিকে ঘুরে বললাম, “আমার একটা প্রার্থনা আছে খোদাবন্দ। যদি অভয় দেন তো বলি।”

“বলো, কী চাই।”

“এই দুজন রাজপুতকে আমায় দিন। আপনার দয়ায় আমি একটা সৈন্যদলের সর্দার হতে চলেছি। সেই দলের মধ্যে এঁর হাতে পঞ্চাশ জন আর ভীম সিং-এর হাতে পঁচিশজন সেনার দায়িত্ব আমি দিতে চাই।”

“ভালো কথা। তাই হোক তবে,” বলতে বলতে গফুরের দিকে ঘুরে চিতু বলল, “দেখো গফুর খান, এরা যা চাইছে সব যেন ঠিকঠিক পায়। বিপদের সময় এরাই আমাদের ভরসা হবে।”

ক্রমশ

দীন মহম্মদ

ভারত ভ্রমণ



ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে
ঘুরে বেড়ানো এক দেশীয় কর্মচারীর ভ্রমণআলেখ্য



পর্ব-২

অনুবাদ: শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

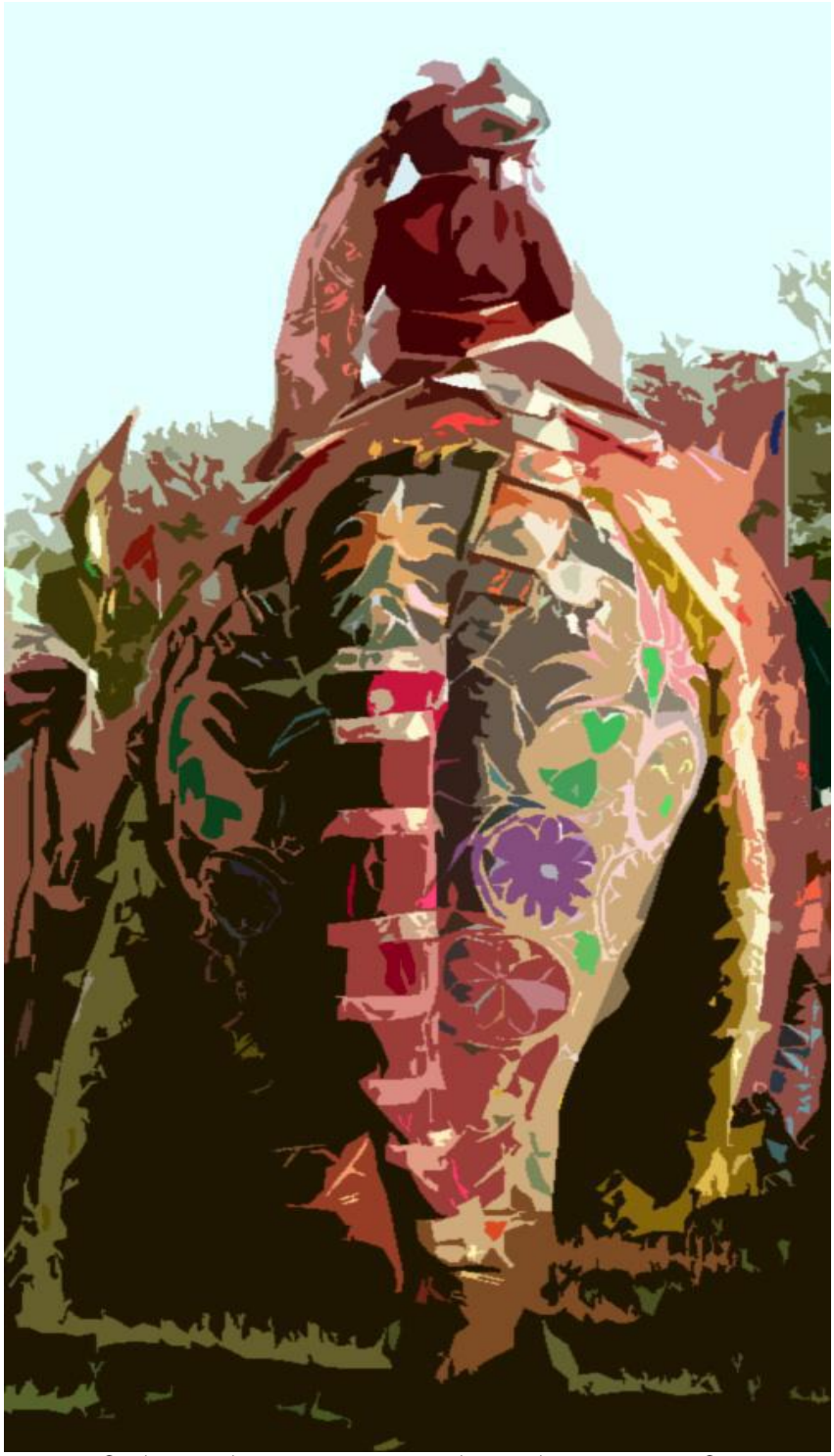
পত্র ২৯

প্রাচ্য বা অন্য যেকোন জায়গায় হাতির মতো বিশাল আর একটাও নেই। আশ্চর্য হবেন আর সাথে সাথে বেশ মজাও পাবেন এই বিরাট চারপেয়েটির কথা পড়লে। এটা সম্ভবত অবিসংবাদিতভাবে দুনিয়ার সবচেয়ে বিশাল । মোটামুটি বারো থেকে পনেরো ফুট উচ্চতার, সাতফুট মতো চওড়া; গায়ের চামড়া এতই পুরু যে তলোয়ার ভেদ করতে পারবে না। চোখদুটো খুবই ছোট ছোট, কানদুটো খুব বড়ো, সারা শরীরটা বেশ গোলগাল, দেহের পেছনদিকটা ক্রমশ উঁচু হয়ে বেশ একটা খিলানের মতো আকার নিয়েছে। গায়ের রঙ বেশ ঘন, চামড়ায় অসংখ্য লম্বাটে দাগ। মুখের ভেতর দুদিকের চোয়ালে চারটি করে দাঁত, চিবোনোর জন্য; আর সামনের দিকে দুটি লম্বা দাঁত দুপাশ থেকে বাইরে বেড়িয়ে এসেছে। ছেলে হাতির দাঁতগুলি পুরু ও মজবুত আর মেয়ে হাতিদের দাঁতদুটি ছোটো এবং ছুঁচোলো। ছেলে বা মেয়ে উভয়েই, যে দাঁতটা তীক্ষ্ণ সেটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আর যেটা একটু ভোঁতা মতো, সেটা দিয়ে গাছপালা উপড়ে নেয় খাবে বলে। পুরুষ হাতিদের দাঁত কখনো কখনো দশফুট পর্যন্ত লম্বা হয় আর একেকটার ওজন কম করে তিনশ পাউন্ড। মেয়ে হাতিদের দাঁত সে তুলনায় কম কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান। প্রতি দশ বছরে হাতি তার দাঁত ফেলে দেয় এবং দাঁত পড়ে গেলে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। মনে হয় হাতিরা ভাবে পাছে মানুষ খুঁজে পেয়ে যায়! হাতির জিভ লম্বায় ছোটো কিন্তু বেশ চওড়া। হাতির পা গুলি গোলাকার ও যথাযথ, নমনীয় এবং ভাঁজ করা যায়। কপাল বড়ো ও উন্নত। লেজটা পুঁচকে, শুয়োরের লেজ মনে পড়ে যাবে দেখলে। প্রাণীটির রক্ত যেকোনো প্রাণীর চেয়েই ঠান্ডা।১ আর সবচেয়ে বিচিত্র ও বৈশিষ্টপূর্ণ হোলো এর শুঁড়। সাতফুট লম্বা, তিনফুট ব্যাসার্ধের এই অঙ্গটি হাতির দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও রোমহর্ষক বলে মনে করি। শুঁড়ের ডগার দিকটা ক্রমশ সরু, আর গোড়ার দিকে নাকের কাছটায়, দুটি পথ, একটা মাথার দিকে অন্যটা মুখের ভেতর গিয়েছে। প্রথমটা দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস, দ্বিতীয়টা খাবার খাওয়ার কাজে লাগে। শুঁড় হাতের কাজ করে খাবার সময় আবার অস্ত্রের কাজ করে আত্মরক্ষার সময়। হাতি এতই শক্তিশালী যে বিপুল ওজন অনায়াসেই তুলে ফেলতে পারে। আবার এত সুক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী যে সহজেই মাটিতে পড়ে থাকা পয়সা শুঁড়ে তুলে নিতে পারে। জল পেলে ভীষণ খুশি হয় আর সাঁতারেও ওস্তাদ।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে হাতি ধরা হয় কৌশল করে। মূলত এরা যখন পাহাড়ি এলাকা থেকে নেমে আসে নদী বা ঝিলের ধারে জল খাবার জন্য। হাতি শিকারীরা, যারা বুনো হাতি ধরায় পারদর্শী, হাতিদের যাতায়াতের পথে গভীর গর্ত খুঁড়ে ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখে। জল খেতে নেমে আসার পথে হাতিরা এই বিপদের কথা টেরও পায় না। ফলে গর্তে এসে পড়ে। কখনো কখনো এই দুঃসাধ্য কাজে প্রাণের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হয় না এই কুশলী হাতি ধরিয়েরা। বয়স্ক হাতিগুলো কোনমতে নিজেদের এই জাল থেকে ছাড়িয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বয়েসি হাতিগুলো ধরা পড়ে; তাদের বেশ কিছুদিন ওভাবেই না খেতে দিয়ে ফেলে রাখে হাতি ধরিয়েরা। ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এলে গর্তে নামার একটা সোজা পথ বানিয়ে হাতিদের গলায় শিকলি পড়িয়ে কুনকি২ হাতি দিয়ে তাদের কাছাকাছি শহরে বা গ্রামে নিয়ে আসা হয়। এমনিভাবে বেশ অনেকগুলি হাতি ধরার পর হাতিওয়ালারা কয়েকদিন ধরে এদের পোষ মানায় তারপর নবাব বা রহিস লোকেদের কাছে বিক্রি করে। হাতিগুলি বুড়ো হয়ে গেলে যখন আর বড়োমানুষদের মনোরঞ্জনের যোগ্য থাকে না, বা অন্য কাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে,

তখন তাদের কেবলমাত্র মালপত্র বইবার কাজেই লাগানো হয়। হাতিদের এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয় যাতে সে প্রায় সবরকম কাজেই পারদর্শী হয়ে ওঠে। এককথায় ইউরোপে বিখ্যাত ও দক্ষ ঘোড়সওয়ারেরা যেভাবে ঘোড়াদের নিয়ন্ত্রণ করে এখানে মাহুতেরাও৩ ঠিক সেভাবেই হাতিদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

এই সূত্রেই একটা ঘটনা বলি। এক লোকের দুধের শিশু দোলনায় শুয়ে কাঁদছিল। দুধ খাবার জন্য। বাড়িতে মা-বাপ নেই। বাড়ির পোষা হাতিটি তাকে আলতো করে তুলে দুধ খাইয়ে যথাস্থানে আবার যত্ন করে শুইয়ে দিলে। বিরাট প্রাণীটি এমনই স্নেহপ্রবণ! এমন স্নেহ মানুষের মধ্যে তো দেখাই যায়; পোষা হাতির মধ্যেও হাতির মালিকের স্নেহমাখা ব্যবহার অনায়াসে প্রবেশ করেছে।



হাতির আকার অনুযায়ী এর দাম নির্ধারণ হয়। যেগুলো কমবয়েসি আর ভালো মত শিক্ষিত সেগুলো ‘১৫০ টাকা হাত’ দামে বেচা হয়। হাত মাপা হয় মাথা থেকে লেজ অবধি, হাতি সাধারণত সাত হাত খানেক লম্বা হয় আর এই হিসেবে একেকটা হাতির দাম দাঁড়ায় ১০০ পাউন্ড স্টার্লিং৪ এর ওপর।

হাতির পরই, আকারে ও বিশালতায়, গন্ডারের স্থান। ভারতে একে আবাদু বলে ডাকে। বন্য শুয়োরের মতোই প্রায় তবে অনেকটা বড়ো, পাগুলো আরো মোটা, জগদ্দল শরীর। সারা গায়ে কালো রঙের শক্ত চৌকো চৌকো আঁশের মতো জিনিসে ঢাকা, চামড়া থেকে একটু উঠে আছে সেগুলো, একেবারে কুমীরের কথা মনে পড়ে যাবে। বিশাল মাথার পেছনের দিকটা ঘোমটার মতো ঢাকা, মুখটা ছোটো, চোয়ালের দিকে অনেকটা বিস্তৃত। মাথার ওপরে লম্বা শক্ত

একখানা খড়্গ। অন্য জানোয়ারের কাছে এটাই ভীতিপ্রদ। জিভখানা বেশ খসখসে, আর চামড়া দুপাশে ঝুলে পেটটা ঢাকা যেমন বাদুরদের ডানা ঝোলে দুপাশে অমনি।

প্রাচ্যদেশে উটের মতো কার্যকরী প্রাণী আর একটিও নেই। মালবহনই বলুন আর যাতায়াতের বাহনই হোক। কিছু কিছু উটতো হাজার মাল পিঠে নিয়ে ঘন্টায় প্রায় সাত আট কিলোমিটার বেগে চলতে পারে। নীচের চোয়ালে ও পেছনের দিকে একসার দাঁত ছাড়া আর দাঁত নেই। এরকম কদাকার বিরাট প্রাণীটির মতো বিপুল খেতে পারে এমন আর একটিও নেই। পিঠে মাল চাপানোর সময় নিচু হয়ে পা মুড়ে পেট দিয়ে বসে আর সবসময়েই কেবল চালকের মুখের কথায় নিয়ন্ত্রিত হয়। মেরে ধরে দৌড় করানোর দরকার নেই। পশুগুলি এমনিতেই ভীতু প্রকৃতির, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল।

(অনুবাদকঃ ১। হাতি স্তন্যপায়ী ও উষ্ণরক্ত বিশিষ্ট রক্তের উষ্ণতা থাকে ৯৭-৯৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে। ২। কুনকি হাতি হল পোষ মানানো হাতি, যাকে দিয়ে বুনো হাতি ধরে পোষ মানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। ৩। মাহুত - হাতি চালক। এদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ওপর হাতিদের চালনা করা নির্ভর করে। ৪। পাউন্ড স্টার্লিং - ইংরেজদের মুদ্রা, পাউন্ড স্টার্লিং কে সংক্ষেপে শুধু পাউন্ড বলে)

ক্রমশ

সীমান্তের অন্তরালে



সমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলন ও সম্পাদনা—শ্রীমতী স্বপ্না লাহিড়ী

কুদরৎ খাঁ গিরিপথ ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পাহাড়ের চূড়া লক্ষ করে এগিয়ে চললেন কখনও বুকে হেঁটে কখনও হামাগুড়ি দিয়ে। পাহাড়ের শিখর অতিক্রম করে বিপরীত দিকে একটি ছোট উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছলেন। বেলা তখন পড়ে এসেছে। উপত্যকাটির তিন দিক পাহাড়ে ঘেরা, দক্ষিণদিকে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে একটি শুকনো পাহাড়ি নদী। উপত্যকায় অজস্র ঝোপঝাড় আর গাছপালা, গাছপালার ভিতর থেকে একটি ছোট ঝর্না বেরিয়ে খানিক দূরে গিয়ে আবার ঝোপঝাড়ের ভিতর অদৃশ্য হয়েছে। কুদরৎ খাঁ ঝর্নার জলে হাত মুখ ধুয়ে নমাজ পড়লেন, তারপর ঝর্নার উৎসের কাছে বসে তাঁর চাদরের খুঁটে বাঁধা রুটি বার করে খেতে আরম্ভ করলেন। কয়েক গ্রাস খাওয়ার পর খুব হাল্কা একটা শব্দ শুনে সেইদিকে চোখ ফেরাতেই দেখলেন একটি ঝোপের ভিতর থেকে একটি রাইফেলের নল এবং তার লক্ষ কুদরৎ খাঁর বক্ষস্থল। ঝোপের ভিতর থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে নির্দেশ এল "রিভলবার বার করবার চেষ্টা কোরো না, দু'হাত মাথার ওপর তোলো।" কুদরৎ দেখলেন শুধু একটি নয়, গোটা ছয় রাইফেলের নল তাঁকে লক্ষ করে ঘিরে আছে। তিনি দেখলেন যে সেই বেড়াজাল থেকে তাঁর নিস্তার নেই, তিনি নির্দেশমত মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ালেন। দুজন লোক ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর পোশাকের তল্লাশি নিয়ে তাঁর রিভলবার আর সেই সিলমোহর করা লেফাফাটি হস্তগত করল। তারপর ছ'জন সশস্ত্র শত্রু তাঁকে রাইফেলের লক্ষের মধ্যে রেখে হাঁটতে বাধ্য করল পারাচিনারের দিকে। কুদরৎ খাঁ তাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন, অনেক মিনতি করলেন তাঁকে মুক্তি দিতে ও লেফাফাটি ফেরত দিতে কিন্তু তাঁর শত্রুরা কোনও কথা কানে তুলল না আর জানিয়ে দিল যে তাদের ওপর হুকুম আছে কুদরৎ খাঁকে জীবন্ত অবস্থায় তাদের মনিবের সামনে হাজির করতে, অন্যথা অনেক আগেই কুদরৎ খাঁর মৃতদেহ ওই ঝর্নার পাশে লুটিয়ে পড়ত।

সুতরগর্দন গিরি সংকটের উত্তরে সফেদ কোহ পর্বতশ্রেণীর প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু যে পাহাড়টি দাঁড়িয়ে আছে সেটি ওই অঞ্চলের অন্যান্য রুক্ষ পাহাড়গুলির চাইতে ভিন্ন রকমের। খাড়া পাহাড়টির গায়ে ফার জাতীয় গাছের বেশ ঘন জঙ্গল আছে, কয়েকটি ছোট ছোট ঝর্ণাও গড়িয়ে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে মাঝে মাঝে। এক জায়গায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি বড় গুহা আছে যার অস্তিত্ব একেবারে গুহার মুখে না পৌঁছলে জানতে পারা যায় না। গুহার প্রবেশপথের চারধারে প্রায় মাইলখানেক ব্যাসের মধ্যে জঙ্গল অত্যন্ত নিবিড়। সেই গুহার ভিতর মাঝরাতে আলেফ সাহেবের কাছে হাজির হল দুজন অনুচরকে। অনুচরদ্বয় আলেফ সাহেবকে কুদরৎ খাঁর ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের হাতে বন্দি হওয়ার খবর জানাল আর পরামর্শ দিল একটি ছোট কিন্তু শক্তিশালী যোদ্ধৃদল পাঠিয়ে সত্বর কুদরৎ খাঁকে এজেন্টদের কবল থেকে উদ্ধার করতে।

আলেফ সাহেব সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তিনি বললেন বলপ্রয়োগ দ্বারা কুদরৎ খাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা সঙ্গত হবে না, কারণ তাহলে কুদরৎ খাঁর এবং কয়েকটি বিশিষ্ট কর্মীর আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাতে আমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোনও সুবিধা হবে না এবং ভবিষ্যতে আমাদের কর্মপন্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে পড়বে। কুদরৎ খাঁর ওপর আমার অতল বিশ্বাস আছে, সে নিজেই এ অবস্থা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে। অবশ্য জার্মান এজেন্টদের হাতে ধরা পড়লে আমরা কুদরৎ খাঁকে যে কোনও উপায়ে হোক উদ্ধার করে আনতাম।

পরদিন বমাল অর্থাৎ সেই সিলমোহর করা লেফাফাটি সমেত ব্রিটিশ কর্তাদের কাছে কুদরৎ খাঁকে হাজির করা হল। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এর দুজন অফিসারও সেখানে ছিলেন। কুদরৎ খাঁকে সোজাসুজি অভিযুক্ত করা হোল প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার নকশা প্রভৃতি চুরি করে ব্রিটিশ শত্রুশক্তির কাছে পাচার করার অপরাধে। প্রমাণস্বরূপ তখনই সেই সিলমোহর করা লেফাফাটি খোলা হোল কুদরৎ খাঁর সামনেই। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, লেফাফাটির ভিতর থেকে বেরোল এক গোছা কাগজ যাতে টাকাপয়সার হিসাব লেখা – মালেক গুল এর মোটর লরিতে মিলিটারি ঠিকাদার শাহ্ আলম খাঁর যত মাল বহন করা হয়েছে এবং তাঁর কাছে ঐ কাজ বাবদ পাওনার হিসাব।

ইন্টেলিজেন্স বিভাগের ধুরন্ধরেরা হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁদের ধারনা যে তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন প্রতিরক্ষার প্ল্যান প্রভৃতির নকল এই লেফাফার ভিতর ছিল আর সেটা দেওয়া হয়েছিল কয়েকজন স্থানীয় মালেকদের যোগসাজসে কুদরৎ খাঁকে শত্রুপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে। সেই মুহূর্ত থেকে কুদরৎ খাঁকে এক পলকের

জন্যেও চোখের আড়াল করেনি ইন্টেলিজেন্স এজেন্টরা, কাজেই কুদরৎ খাঁ লেফাফাটি হস্তান্তর করার সুযোগ পাননি। কোথায় যে গলদ হল তা ইন্টেলিজেন্স ধুরন্ধররা বুঝতে অক্ষম। পলিটিক্যাল বিভাগের কর্তারা বিরক্ত হয়ে টিটকারি দিলেন ইন্টেলিজেন্স বিভাগেকে তাদের অকর্মণ্যতার জন্যে। কুদরৎ খাঁ নিজেই সাফাই স্বরূপ বললেন যে তিনি প্রতিরক্ষার নকশা বা সেগুলি চুরির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। প্রতিরক্ষার নকশা কথাটি তিনি এই প্রথম শুনলেন। তিনি পেওয়াড়ের দিকে যাচ্ছিলেন ঠিকাদার শাহ্ আলমের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মাল বহন করার হিসাব বুঝিয়ে দিয়ে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য। কুদরৎ খাঁকে বেকসুর খালাস করা হোল, তিনি বিদায় নেবার সময় তাঁর লেফাফাটিও চেয়ে নিলেন।

কুদরৎ খাঁ গত দু তিন দিনের ধকলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই স্থির করলেন কাছেই শালোজান গ্রামে সলমার পিতৃগৃহে দিনটা বিশ্রাম করবেন। শালোজান গ্রামে পৌঁছে প্রথমেই দেখা হল সলমার সঙ্গে। সলমাকে সেখানে দেখে আপাতদৃষ্টিতে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। দুজন পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করার পর তাঁরা চলে গেলেন সলমার পিতৃগৃহে, সেখানে আহারাদি করে নিভৃত ঘরে কুদরৎ খাঁ সলমাকে তাঁর গত দু দিনের অভিজ্ঞতা আর দুর্যোগের কথা জানালেন আর জিজ্ঞাসা করলেন সলমা কোনও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন কী না। উত্তরে সলমা বললেন তাঁকে কোনও ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়নি। আসল লেফাফাটি তিনি যথাসময়েই পেয়েছিলেন এবং যখন ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এর এজেন্টরা কুদরৎ খাঁর পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত ছিল সেই সময়ে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার নকশা প্রভৃতি আলেফ সাহেবের হাতে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

মোহম্মদ জান এর গল্পের সত্য মিথ্যা নির্ধারণের চেষ্টায় রশীদ খাঁ ও কুদরৎ খাঁকে প্রশ্ন করায় তারা শুধু হেসেছিল, কোনও উত্তর দেয়নি। যাক, গল্পটি সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক, জার্মান সৈন্য মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতবর্ষের দিকে এগোতে পারেনি কাজেই পাখতুনিস্তানের গিরিবর্ত্মগুলিতে ব্রিটিশের সঙ্গে তাদের যুদ্ধও হয়নি , অতএব প্রতিরক্ষার প্ল্যান পাখতুন নেতাদের হাতে পৌঁছলেও সে প্ল্যানের নকশা প্রভৃতি তাঁদের কোনও কাজে লাগেনি। বন্ধু রশীদ খাঁ আমাকে পরামর্শ দিল যে অবান্তর গুজব সম্বন্ধে মাথা না ঘামিয়ে আমি যেন পাখতুনদের বিগত দিনের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস বুঝবার চেষ্টা করি। আজকের দিনের পাখতুনদের ও তাদের দেশকে জানতে হলে তাদের বিগত দিনের কাহিনী জানতে হবে আগে। ইউসুফজাইদের আর একটা যুদ্ধের কাহিনী আরম্ভ করল রশীদ খাঁ।

****

ইউসুফজাই উপজাতীয় পাখতুনরা ছড়িয়ে আছে তাদের পাহাড় অঞ্চলে এবং দক্ষিণের সমতলভূমিতে। পাহাড় অঞ্চলের ইউসুফজাইরা ১৮৬৩ সালের যুদ্ধে ইংরাজের কাছে পরাভূত হয়েছিল, কিন্তু সে সময় সমতল ভূমির ইউসুফজাই গোষ্ঠি সে যুদ্ধে যোগদান করেনি। তারা যে ব্রিটিশের কাছে স্বচ্ছন্দে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিল তা নয়, তারা তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দুর্গম পাহাড়ের আড়ালে ব্রিটিশের নজর এড়িয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি করা অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু সমতল এলাকায় ইংরাজের সতর্ক দৃষ্টির সামনে প্রস্তুতির গতি স্বাভাবিকই শ্লথ ছিল।

ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণপূর্ব আফগানিস্তান গ্রাস করার পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৬৮ সালে ইংরাজ এই উপজাতীয় অঞ্চলের আগরোর উপত্যকায় একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করল স্থানীয় পাখতুনদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আগরোর উপত্যকার পাখতুনরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আর চুপ করে থাকতে পারল না। পরাধীনতার শিকল তাদের গলায় পরাবার জন্যে ব্রিটিশ পাকাপোক্ত ব্যবস্থায় এগিয়ে চলেছে। মৌখিক প্রতিবাদে ব্রিটিশকে নিরস্ত করা যাবে না। তারা স্থির করল অসিকে বাধা দিতে হবে অসি দিয়ে। শান্ত আগরোর উপত্যকায় যুদ্ধের অশান্ত আগুন জ্বলে উঠল।

যুদ্ধের প্রথম পর্ব আরম্ভ করলেন স্থানীয় পাখতুনদের অন্যতম নেতা আতা মোহম্মদ খাঁ। তিনি মাত্র পাঁচশ লোকের লশ্কর নিয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঘাঁটি আক্রমণ করে ঘাঁটিরক্ষী ব্রিটিশ সৈন্যকে পরাস্ত করলেন। ইংরাজ

কর্তাব্যক্তিদের ধারনা ছিল যে সমতল ভূমির ইউসুফজাইরা ইংরাজের অনধিকার অগ্রগতিতে বাধা দান করবে না, তাই তাঁরা আগরোর ঘাঁটিতে বৃহৎসংখ্যক ফৌজ রাখেনি। আতা মোহম্মদ খাঁ দ্বারা ব্রিটিশ ঘাঁটি জয়ের খবর পেয়ে তাঁরা সত্বর একটি গুর্খা সৈন্য বাহিনী পাঠালেন সেখানে কর্নেল রডনের অধীনে, এক ব্যাটারি গোলন্দাজ সৈন্যও দেওয়া হল তাঁর সঙ্গে। সংঘর্ষে আতা মোহম্মদ খাঁ পরাস্ত হয়ে বন্দি হলেন কর্নেল রডনের হাতে।

দেশদ্রোহী কুইজলিং এর অভাব কোনও দেশে নেই , পাখতুনিস্তানেও ইংরাজের তল্পিদার ছিল। কর্নেল রডনের সঙ্গে যুদ্ধে আতা মোহম্মদ খাঁর পরাজয়ের সংবাদে উৎসাহিত হয়ে ইংরাজের তল্পিদার এক সামন্ততান্ত্রিক উপজাতীয় প্রধান, আম্বের নবাব তাঁর ইংরাজ মুরুব্বিদের খুশি করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজস্ব লশ্কর নিয়ে আগরোর উপত্যকায় ইউসুফজাইদের দিলরোবি গ্রামের ওপর চড়াও হয়ে গ্রামটি দখল করে নিলেন। আগরোরে কর্নেল রডনের সাফল্যে ও আম্ব এর নবাব কর্তৃক দিলরোবি গ্রাম দখল দেখে ইংরাজ কর্তারা ধরে নিলেন যে আগরোর উপত্যকার উপজাতীয়দের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। ইংরাজ কর্তারা উপজাতীয় নেতাদের কাছে হুকুম পাঠালেন তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণ করতে। ইউসুফজাইরা সে হুকুম অগ্রাহ্য করে পাল্টা দাবি করল যে সর্দার আতা মোহম্মদ খাঁকে মুক্তি দিতে হবে। ইউসুফজাইদের দাবি স্বীকার করে নেবার ইচ্ছে উদ্ধত ইংরাজ কর্তাদের ছিল না, তাঁরা আতা মোহম্মদ কে মুক্তি দেবার কথা কানে তুললেন না, ফলে ইউস্যফদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল আর সেই অসন্তোষ দমন করা স্থানীয় ব্রিটিশ সৈন্যের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

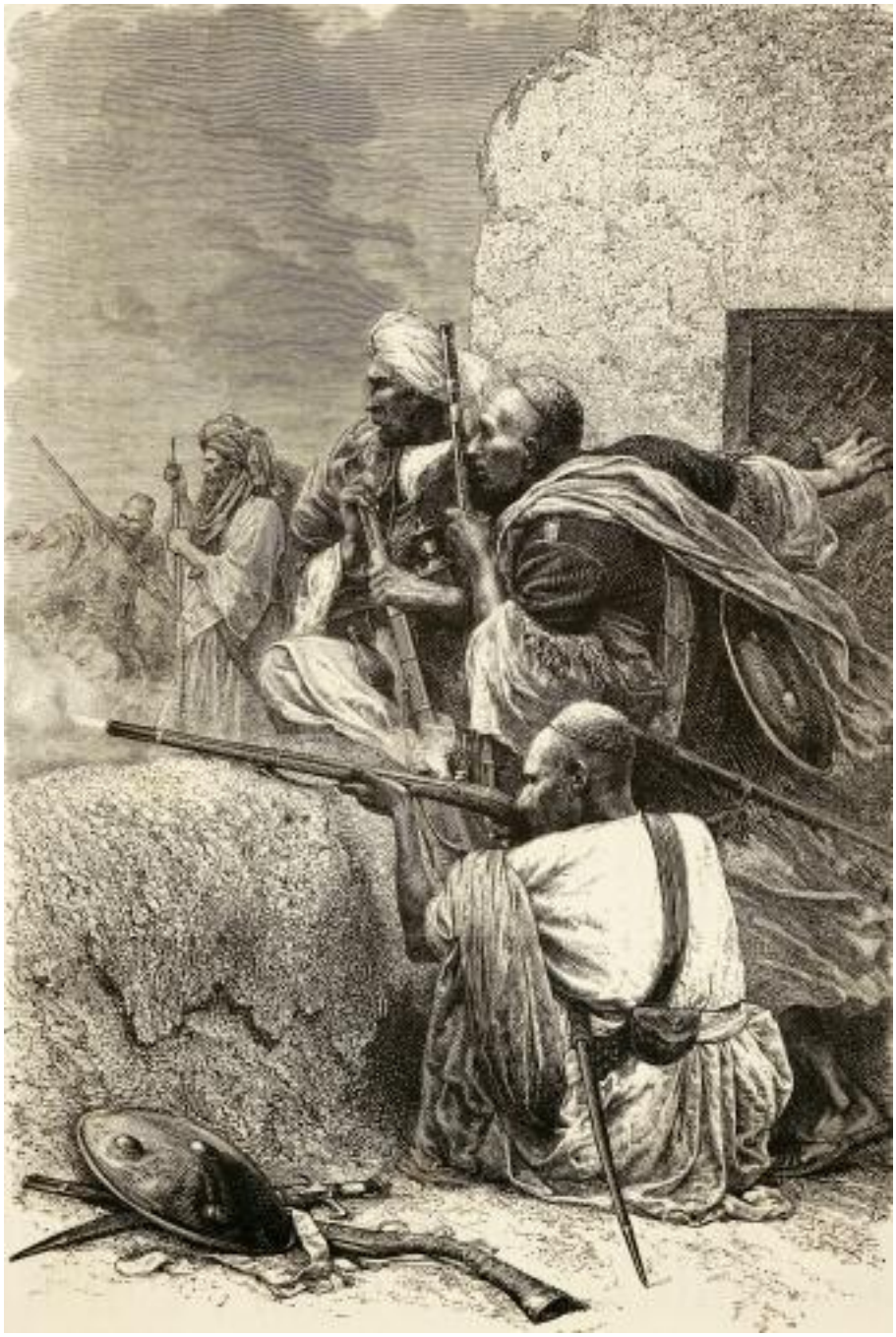
ইউসুফজাইদের মনোবল যে ভেঙে পড়েনি সেটা প্রমান হলো তাদের দিলরোবি গ্রামে আম্ব এর নবাবের সৈন্যকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করায়। আম্ব এর নবাব ব্রিটিশের কাছ সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করায় কর্নেল রডন তাঁর সৈন্য দল পাঠালেন আম্ব এর নবাবের সৈন্যদের উদ্ধার করতে কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্য ইউসুফজাই লস্করের ব্যূহের মধ্যে ঘেরাও হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে তিনটি বড় রকমের উপজাতীয় লশ্কর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এগিয়ে এল। সায়াদ এবং চগরজাই খণ্ড জাতীয় লশ্কর উপত্যকার মধ্যভাগ দিয়ে, হাসানজাই ও আকাজাই লশ্কর বাম দিক দিয়ে নেমে এল ও কর্নেল রডনের সৈন্যদলকে তিন দিক দিয়ে সাঁড়াশি আক্রমণ করল। কর্নেল রডেন সেই সাঁড়াশি আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে নিজের সৈন্য সমেত আগরোর উপত্যকা থেকে পশ্চাদপসরণ করলেন।

আগরোর উপত্যকা থেকে কর্নেল রডনের পিছু হটার সঙ্গে সঙ্গেই পার্বত্য ইউসুফজাইরাও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সমগ্র ইউসুফজাই এলাকায় ইংরাজের শাসন ভেঙে পড়ল, ব্রিটিশ প্রতিপত্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

পার্বত্য ইউসুফজাই অঞ্চলে ১৮৬৩ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতা ইংরাজের স্মৃতিপট থেকে তখনও মুছে যায়নি তাই তড়িঘড়ি কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে একটি প্রভূত শক্তিশালী ব্রিটিশ বাহিনী গঠন করা হল আগে। অভিজ্ঞ সমরবিদ মেজর জেনারেল ওয়াইল্ড এর সেনাপতিত্বে যে বাহিনী পাঠানো হল ইউসুফজাইদের দমন করতে, তাতে ছিল চৌদ্দ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য, দুশো পঁয়ত্রিশ জন অফিসার এবং ছাব্বিশটি দূরপাল্লার কামান ও তাঁর উপযোগী গোলন্দাজ সৈন্য। বিশাল ফৌজটিকে দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগের ভার দেওয়া হল ব্রিগেডিয়ার ভওগানকে এবং অন্যটির পরিচালনা করলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ব্রাইট।

গোলন্দাজ সৈন্য তাদের দূরপাল্লার কামান সব উপজাতীয় গ্রামগুলিকে লক্ষ করে সাজাল। তারপর আরম্ভ হল বিধ্বংসী অগ্নিময় গোলার উদ্গিরণ। গ্রামের পর গ্রাম ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত ছিল, তারা প্রচণ্ড বেগে চার্জ করে আক্রমণ করল। শত শত ইউসুফজাইদের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ইউসুফজাই লশ্কর পশ্চাদপসরণ করে পাহাড়ি এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিল। জেনারেল ওয়াইল্ড তাদের আত্মসমর্পণ করার দাবিতে তারা সাড়া দিল না।

সেই সুসজ্জিত বিরাট ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে ইউসুফজাইদের পক্ষে সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না, তারা গেরিলা যুদ্ধের পথ ধরল। যখনই ব্রিটিশ ফৌজ এগিয়ে যায় তাদের আক্রমণ করতে, উপজাতীয় লশ্কর সব উধাও হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ব্রিটিশ ফৌজ পিছু ফিরলেই লশ্কর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হঠাৎ আক্রমনে ব্রিটিশ বাহিনীর রিয়ারগার্ডের অনেক মরে। এইরকম লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। ইউসুফজাইদের বিরুদ্ধে সেই অভিযান অমিমাংসিত অবস্থার মধ্যেই শেষ করতে হয় ইংরাজকে। কোনও পক্ষই পরাজয় স্বীকার



করতে রাজি ছিল না। একদিকে অস্ত্রবলে বলীয়ান ইংরাজের সাম্রাজ্য বিস্তারের তাগিদ, অন্যদিকে পাখতুনদের স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টায় অটলতা।

আগরোর উপত্যকায় ব্রিটিশ রক্ষীদলকে বর্ধিত ও আরও শক্তিশালী করে জেনারেল ওয়াইল্ড তাঁর বাহিনী নিয়ে ১৮৬৯ সালে ফিরে গেলেন হিন্দুস্থানে। আগরোর উপত্যকা থেকে ব্রিটিশ বাহিনী অপসারণের পরক্ষণেই হাসনজাই, আকাজাই ও সায়াদ (ইউসুফজাই খণ্ডজাতি) লশ্‌কর এসে হানা দিল ব্রিটিশের নবপ্রতিষ্ঠিত ঘাঁটিগুলিতে। তাদের আক্রমণে কয়েকটি ঘাঁটি ধ্বংস হয়ে গেল, ব্রিটিশ রক্ষীদল আক্রমণ ঠেকাতে পারল না। কর্নেল রডনে আবার ছুটলেন আগরোরে একদল সৈন্য নিয়ে ঘাঁটি রক্ষীদের সাহায্য করতে।

উপত্যকায় তখন শীত পড়ে গেছে। ধীরে ধীরে শীতের প্রকোপ বেড়ে চলল আর উপত্যকায় তুষারপাত আরম্ভ হল। চারদিক বরফে ঢেকে গেল এবং সেই সঙ্গে পাখতুন লশ্‌করদের গতিবিধি হ্রাস পেল। কর্নেল রডনে নিশ্চিন্ত হলেন, মনে করলেন যে তাঁর সৈন্যদলের উপস্থিতির দরুন উপত্যকায় ইংরাজের মর্যাদা আবার কায়েম হল।

শীতকাল চিরদিনের জন্য থাকে না, গ্রীষ্মের আমেজ ফিরে আসতেই উপজাতীয় লশ্‌কররা আবার নব উদ্যমে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে ব্রিটিশ সৈন্যকে হয়রান করা আরম্ভ করে দিল। ইউসুফজাইদের লশ্‌কর আলেয়ার মত উদয় হয়ে ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকা ও ঘাঁটিগুলিকে তচ নচ করে দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। কর্নেল রডনে হালে পানি না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন ও অবস্থা কতৃপক্ষকে জানালেন। পেশাওয়ারে ইংরাজের হাইকমান্ডে পরামর্শ সভা বসল সমরবিদ ও কূটনীতিজ্ঞদের নিয়ে। কী কৌশলে অবস্থা আয়ত্বে আনা যায় তাই নিয়ে অনেক

আলোচনার পর স্থির হলো ইউসুফজাইদের প্রতি অল্প কিছুটা বদান্যতা দেখানো আর সেই সঙ্গে তাদের শক্ত হাতে দমন করা।

বদান্যতা হিসাবে বন্দি আতা মোহম্মদ খাঁকে মুক্তি দেওয়া হল আর দমননীতির প্রয়োগ করা হল ইউসুফজাইদের আগরোর উপত্যকায় চাষ-আবাদের কাজ নিষিদ্ধ করে, উপরন্তু যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া গ্রামগুলির পুণর্নির্মাণ করাও অপরাধ বলে ঘোষণা করা হল। বলাবাহুল্য যে, নিষেধাজ্ঞা পালনের তদারকি করার জন্য উপত্যকায় বেশ বড় আর শক্তিশালী সৈন্য দলও মোতায়েন করা হল।

ইংরাজ কর্তারা মনে করেছিলেন যে আতা মোহম্মদকে মুক্তি দেওয়ায় ইউসুফজাইদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজের প্রতি কৃতজ্ঞ হবে আর কতক ইংরাজি ফৌজের উপস্থিতির জন্য শায়েস্তা থাকবে। ইংরাজের সেই বহুমুখি চাল কিন্তু সফল হল না। ইউসুফজাই অঞ্চলে যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল , ইউসুফজাইর কোন না কোনও খণ্ড জাতি প্রায় প্রত্যহ হানা দিত ব্রিটিশ রক্ষীসৈন্যের ওপর। ইউসুফজাই এলাকায় টিঁকে থাকার জন্য ইংরাজকে অভিযানের পর অভিযান চালিয়ে যেতে হয় তাদের বিরুদ্ধে।

রশীদ যথানিয়মে গোটা দুই স্কচের পেগ খেয়ে আরম্ভ করল,

আজ যে গল্প আরম্ভ করব তার মধ্যে কতকগুলি বাইরের ঘটনার অবতারণা করতে হবে। সেগুলি আফগানিস্তানের তথা পাখতুনিস্তান এর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ও যে সব ঘটনার প্রভাব এই দেশের গতি ও ধারার ওপর প্রবল ভাবে পড়েছে।

১৮৪৪ সাল থেকে দোস্ত মহম্মদের শাসন কালে আফগানিস্তানে ব্রিটিশের স্বার্থ বা প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়নি আর পাখতুনিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে ব্রিটিশের ক্রমশ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দোস্ত মোহম্মদ নিষ্ক্রিয়ই ছিলেন। ১৮৬৩ সালে দোস্ত মোহম্মদের মৃত্যুর পর দেশের শাসনভার চলে যায় তাঁর এক পুত্র শের আলির হাতে। সেই সময় রাশিয়ার রাজদরবারে ও ইংল্যান্ডে পার্লামেন্টের নীতির পরিবর্তনের ফলে আফগানিস্তানের তথা পাখতুনিস্তানের আকাশে দুর্ভাগ্যের মেঘ ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠল।

১৮৬৪ সালে রুশ সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স গরশাভক লক্ষ করলেন যে রুশ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিমে মধ্য এশিয়ার ছোট ছোট রাজ্যগুলির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ , ঘুন ধরা কাঠের মত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চলেছে। সে অবস্থায় রুশ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া সম্ভব। প্রিন্স গরশাভক পরামর্শ দিলেন যে সাম্রাজ্যের সীমান্ত সুদৃঢ় করার প্রয়োজনে ওই সব পঙ্গু রাজ্যগুলিকে রাশিয়ার অধিকারে আনা অপরিহার্য।

প্রিন্স গরশাভকের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৬৫ সালে তাশকন্দ ও বছর দুই পরে সমরকন্দ ও আরও কিছু সময়ের মধ্যে খীভা, রুশ সম্রাট অধিকার ও নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলেন। কোনও কোনও ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের মতে রাশিয়ার এই পদক্ষেপ ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষে অশুভ ইঙ্গিত। যাইহোক রুশ সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তারিত হল।

স্যর হেনরি রলিনসন অ্যাংলো আফগান যুদ্ধে সামরিক অফিসার রূপে কাজ করেছিলেন এবং তিনি মধ্য এশিয়া সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সেই সময়। তিনি ছিলেন ঘোরতর রুশবিদ্বেষী ও কট্টর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদি। স্যর হেনরি রাশিয়ার আফগানিস্তানের দিকে গুটি গুটি এগিয়ে আসা দেখে বিচলিত হলেন। তিনি ১৮৬৮ সালে ইংল্যান্ডে ভারত সচিব স্যর নর্থকোটের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন রাশিয়ার এগিয়ে এসে বোখারা অধিকার করায় রুশ সম্রাটের পক্ষে আফগানিস্তানে নিজের প্রভাব কায়েম করা সুনিশ্চিত এবং তার ফলে এশিয়াতে ব্রিটিশ প্রাধান্য খর্ব হওয়া স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় ব্রিটিশের পক্ষে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে রুশ সম্রাটকে আফগানিস্তানে নিরঙ্কুশ প্রভাব বিস্তার করার সুবিধা দেওয়া উচিত হবে না। তিনি পরামর্শ দিলেন যে ইংরাজের স্বার্থরক্ষার তাগিদে বর্তমান আফগান নৃপতি শের আলিকে বশীভূত ও কিছুটা শক্তিশালী করা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু সে সময় ইংরাজের নীতি ছিল রাশিয়ার সঙ্গে বিবাদ বা আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। কাজেই স্যর হেনরি রলিনসন এর পরামর্শ আপাতত বিশেষ আমল পেল না। ভারতের ইংরাজ কর্তারা আমীর শের আলিকে কিছু টাকা খয়রাত করলেন শুধু।

শের আলি চাইছিলেন যে ইংরাজ তাঁর সঙ্গে আফগানিস্তানের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষার অঙ্গীকারস্বরূপ একটি চুক্তি সম্পন্ন করুক। তখন রাশিয়া তাঁর দ্বার দেশে এসে পৌঁছেছে, কাজেই শের আলি ইংরাজের কাছ থেকে শুধুমাত্র কিছু খয়রাতি টাকা নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি ইংরাজের কাছ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে চাইলেন যে রাশিয়া যদি আফগানিস্তান আক্রমণ করে সে ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কী পন্থা অবলম্বন করবে। ভারতের বড়লাট ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এর তরফ থেকে শের আলিকে জানিয়ে দিলেন যে ইংরাজের সঙ্গে রুশ সম্রাটের চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া আফগানিস্তানের স্বাধীনতা খর্ব না করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ। শের আলি তাঁর প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর ইংরাজের কাছ থেকে পেলেন না, অথচ তাঁর সিংহাসন নিরাপদ রাখার জন্য দুই দৈত্যের ,(রাশিয়া ও ইংরাজ) মধ্যে যে কোনও একটিকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে প্রয়োজন।ইংরাজের কাছে কোনও প্রতিশ্রুতি না পেয়ে ১৮৭৫ সালে শের আলি রাশিয়ান তুর্কিস্তানের গভর্নর জেনারেল কফম্যানের দ্বারস্থ হলেন। অনিবার্য ভাবে শের আলির সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হল।

ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডে গ্ল্যাডস্টোনের পার্টির পরাজয় ঘটায় ইংল্যান্ডের শাসন ভার চলে গেল ডিজ়রেলির হাতে ও সেই সঙ্গে আফগানিস্তান সম্বন্ধে ইংরাজের নীতিরও পরিবর্তন হল।আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির অবসান হল। নতুন নীতি হল আফগানিস্তানের দিকে অগ্রগতি ও সেখানে ইংরাজের অপ্রতিহত প্রভাব ও প্রতিপত্তি কায়েম করা। নতুন নীতির সমর্থক লর্ড এডওয়ার্ড রবার্ট লিটনকে পাঠানো হল ভারতে রাজপ্রতিনিধি ও বড়লাটের পদে। লর্ড লিটন আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান চালানো মনস্থ করলেন শের আলির সঙ্গে রাশিয়ার আঁতাত চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে।

আফগানিস্তানে সাফল্যের সঙ্গে অভিযান চালাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন যোগাযোগ রক্ষা ও রসদ প্রভৃতি চলাচলের জন্য ভালো সড়ক এবং দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতি পাখতুনদের আয়ত্বে রাখা। কোহাট গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে যে সড়ক পেশাওয়ার এর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত সেটা গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত ছিল না , শুধু মালবাহী খচ্চর প্রভৃতি সে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারত। সংকীর্ণ সড়কের দু পাশে সব খাড়া পাহাড়ের সারি চলে গেছে কোহাট গিরিসংকট থেকে পেশাওয়ার পর্যন্ত। সীমান্তের সড়কগুলিকে প্রশস্ত করে খচ্চরচালিত মালবাহী গাড়ি ও ভারি কামানের গাড়ি চলার উপযুক্ত করা অবশ্য প্রয়োজন আফগানিস্তান অভিযানের জন্য। ব্রিটিশ সামরিক কর্তারা প্রথমে কোহাট গিরিসংকটের সড়ক সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ করা মনস্থ করলেন।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে ও নিরুপদ্রবে সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন ওই অঞ্চল সমূহের আফ্রিদি খণ্ডজাতিগুলির সম্মতি ও সহযোগ। কোহাট গিরিসংকটের আশেপাশে যে খণ্ডজাতির লোকেরা বাস করত তাদের বোঝাবার চেষ্টা করা হল যে তারা যদি রাস্তা তৈরি করার কাজে বাধা না দেয় তাহলে তাদের প্রভূত মঙ্গল হবে। সড়ক তৈরির কাজে তারা অর্থ উপার্জন করতে পারবে ও ভবিষ্যতে সড়কের কল্যাণে তাদের ব্যবসাবাণিজ্যের পথ সুগম হবে।

স্থানীয় আফ্রিদিরা ইংরাজের পরামর্শ কানে তুলল না, ইংরাজের বার্তাবহকে তারা রূঢ় ভাষায় অসম্মতি জানিয়ে বিদায় দিল। এরপর ব্রিটিশ কর্তাদের পক্ষে আর আফ্রিদি খণ্ড জাতিটির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সেজে থাকা গেল না। ইংরাজ অধিকারি স্থানীয় আফ্রিদিদের নির্দেশ দিলেন তাদের প্রতিনিধি জির্গা কোহাট ব্রিটিশ হেডকোয়ার্টার্সে পাঠাতে ও সড়ক তৈরিতে কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি না করার অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করতে। আফ্রিদিরা সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করল এবং তারা যে ইংরাজের তাঁবেদার নয় সে কথাটা বুঝিয়ে দেবার জন্য কোহাট গিরিসংকটের প্রবেশ পথে যে ব্রিটিশ ওয়াচ টাওয়ার ছিল সেটা ধ্বংস করে দিল। ফলে কোহাট সামরিক অধিনায়ক স্থির করলেন আফ্রিদি খণ্ডজাতিটিকে শায়েস্তা করার জন্য তাদের পেটে মারতে হবে। খণ্ডজাতিটির এলাকা অবরোধ করা হল ঘেরাও করে ব্যবস্থা করা হল তাদের খেতের ফসল থেকে তাদের বঞ্চিত করার। লেফটেন্যান্ট কর্নেল রজার্সকে পাঠানো হোল সেই বর্বরোচিত কাজ সমাধা করতে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল রজার্স রওনা হলেন কোহাট পাস এর দিকে। তাঁর সঙ্গে ছিল এক ব্যাটালিয়ান পদাতিক সৈন্য, কিছু অশ্বারোহী সৈন্য ও এক কোম্পানি সশস্ত্র স্যাপার্স, এ ছাড়া কিছু ভাড়াটে লোকও ছিল খেতের ফসল কাটার জন্য। কর্নেল রজার্সের সৈন্যবাহিনী আফ্রিদি গ্রামগুলির নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই আফ্রিদিদের

রাইফেলের গুলি অতর্কিতে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ল ব্রিটিশ সৈন্য দলের ওপর। সৈন্যদলের অনেক হতাহত হওয়ায় রজার্স সাহেব আর এগোতে পারলেন না। তিনি সেদিনকার মত রণে ভঙ্গ দিয়ে কোহাট হেডকোয়াটার্সে ফিরে গেলেন। পর দিন সৈন্য পুণর্গঠন করে তিনি আবার চড়াও হলেন কোহাট পাস এ, এবার তাঁর সঙ্গে দুটি কামানও ছিল। তিনি আফ্রিদিদের রাইফেলের পাল্লার বাইরে তাঁর সৈন্য সাজালেন ও গোলন্দাজদের হুকুম দিলেন আফ্রিদিদের ওপর গোলাবর্ষণ করতে।

কামানের গোলায় আফ্রিদি খণ্ড জাতির যোদ্ধারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারপর পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণে তাদের খেতের সমস্ত ফসল লুণ্ঠন করা হল। কর্নেল রজার্স বুক ফুলিয়ে সেই সব ফসল নিয়ে কোহাটে চলে গেলেন। এলাকায় অবরোধের ফলে আফ্রিদি জাতিটির পক্ষে বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা অসম্ভব, অথচ তাদের ফসল ইংরাজ লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে , কাজেই তাদের স্ত্রীলোক শিশুরাও অনশনে দিন কাটাতে লাগল। তাদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠলো। অনন্যোপায় হয়ে তারা তাদের এলাকায় সড়ক তৈরি করায় সায় দিল।

ইংরাজের স্যাপাররা চলল সড়ক তৈরি করতে করতে, কোথাও পাখতুনদের খেতখামার দলিত করে কোথাও পাহাড়তলি ডিনামাইটের বিস্ফোরণে ভেঙে দিয়ে। যে দেশে পায়ে হাঁটা দুর্গম পথ ছাড়া কিছু ছিল না সেখানে প্রশস্ত সড়ক তৈরি হল ব্রিটিশের রনসম্ভারবাহী গাড়ি যাতায়াতের জন্য।

এমনি করে ব্রিটিশের সশস্ত্র স্যাপাররা পৌঁছল আফ্রিদিদের আর একটি ছোট খণ্ডজাতির গ্রাম আয়মলচুরাতে। এই খণ্ডজাতিটি রুখে দাঁড়াল স্যাপারদের সামনে। তারা ইংরাজকে তাদের এলাকায় প্রবেশ করতে দেবে না আর এলাকার ভিতর রাস্তাও তৈরি করতে দেবে না এ কথা জানিয়ে দিল। স্যাপার দলের অধিনায়ক দেখলেন যে তাঁর দলের পক্ষে জবরদস্তি সড়ক তৈরির কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় , অস্ত্র ও লোকবলে গ্রামবাসীদের পাল্লা বেশ ভারি। তিনি সড়ক তৈরির কাজ বন্ধ করে পিছিয়ে গেলেন।

দু'দিন পরের ঘটনা। অন্ধকার রাত, অন্ধকারকে আরও নিবিড় করে রেখেছে আসে পাশের পাহাড়। দু'চার জন প্রহরী বাদে সমস্ত গ্রাম ঘুমন্ত , সেই সময় ভীমগর্জনে ব্রিটিশের কামান গর্জে উঠল। গ্রামবাসীরা ঘুমচোখে উঠে কোনওমতে ছুটল নিজের নিজের জাজয়েল নিয়ে গ্রামের মিনারের দিকে, কিন্তু সকলে সমবেত হবার আগেই শুনতে পেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাউক্রাফট এর মেগাফোন মারফত গুরুগম্ভীর আদেশ " অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দাও এবং আত্মসমর্পণ কর।"

গ্রামপ্রধান সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের বললেন গ্রামের সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশুদের দ্রুত উত্তরদিকের পাহাড়ের কোলে আশ্রয়ের জন্য পাঠিয়ে দিতে এবং তারা পাহাড়ের ভিতর নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেলে পুরুষ মানুষেরা যেন জাজেয়েলের গুলিতে ব্রিটিশকে উত্তর দেয়। কিন্তু স্ত্রীলোক ও শিশুরা গ্রাম ছাড়ার পূর্বেই রাউক্রাফটের সৈন্য দল গ্রাম ঘিরে ফেলল। তখন গ্রামবাসীদের পক্ষে অস্ত্র পরিহার করা ছাড়া অন্য কোনও পথ থাকল না। তারা সড়ক তৈরিতে বাধা দান না করার অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করল। ইংরাজের স্টিমরোলার পাখতুনিস্থান এর বুকের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

কর্নেল রাউক্রাফট কিন্ত আয়মলচুরাবাসীদের লিখিত অঙ্গীকারপত্র নিয়েই সন্তুষ্ট হলেন না, তিনি খণ্ডজাতিটির সাতশ জন লোককে নিয়ে গেলেন বন্দি করে তাদের অঙ্গীকার পূরণের জামিনস্বরূপ আর তাদের সমস্ত খেতখামারের পাকা ফসল নষ্ট করে দিয়ে গেলেন।

কোহাট গিরিবর্ত্মের রক্তপিপাসা বড়ই নিষ্ঠুর। ইংরাজের সড়ক প্রস্তুতকারি স্যাপাররা আয়মলচুরা গ্রাম থেকে এগিয়ে পৌঁছল আফ্রিদিদের আর এক জাতি জোয়াকিদের গ্রামে। এবার স্যাপারদের থমকে দাঁড়াতে হল। তাদের সামনে সারি সারি জোয়াকিদের রাইফেল আর তাদের বজ্রগম্ভীর হুঙ্কার ' আর এক পা এগিয়ো না , রক্তপাত যদি না চাও তাহলে ফিরে যাও।'

কিছুক্ষণ পরেই জোয়াকিদের রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ হয়ে স্যাপারদের ও রক্ষী পদাতিক সৈন্যদলকে আচ্ছন্ন করে দিল। তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। ইংরাজ সরকারের তরফ থেকে জোয়াকি নেতাদের কাছে জবাব তলব করা হল আর দাবি করা হল তাদের অপকর্মের (?) খেসারত। উত্তরে জোয়াকিরা ইংরাজের সদ্যস্থাপিত

টেলিফোন লাইন সব নষ্ট করে দিল, একটি ব্রিটিশ রসদবাহি লরির কনভয় লুঠ করল আর কোহাট-খুশালগড় রাস্তার মাঝখানের সেতুটি ধ্বংস করে দিল। জোয়াকিরা অন্যান্য আফ্রিদি খণ্ডজাতির তুলনায় অধিক শক্তিশালী। দেখা গেল যে কাছাকাছি যে ব্রিটিশ সৈন্য দল মোতায়েন আছে, তাদের দিয়ে জোয়াকিদের দমন করা অসম্ভব। অথচ সড়ক সম্প্রসারণের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ না করতে পারলে আফগানিস্তানে যুদ্ধাভিযান সুষ্ঠুভাবে চালানো সম্ভব নয়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আফগানিস্তানকে তিন দিক থেকে যুগপৎ আক্রমণ করার কথা।জেনারেল স্যাম ব্রাউন এর বাহিনী খাইবার পাস এর পথ হয়ে জালালাবাদ ও কাবুলের ওপর , জেনারেল রবার্টস এর বাহিনী গজনির ওপর এবং জেনারেল স্টুয়ার্ট এর বাহিনী কোয়েটা হয়ে কান্দাহার এর ওপর। তিনটি বাহিনী একই সময় আক্রমণ করতে না পারলে অভিযান পণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কাজেই সড়ক তৈরির কাজ চটপট করার তাগিদে জোয়াকিদের দমন করার জন্য কর্নেল মোকাটার অধিনে একটি শক্তিশালী সৈন্যদল পাঠানো হল সত্বর। তাদের সঙ্গে পেশাওয়ার এর কমিশনার সাহেবও ছিলেন। মোট কোথা, এক হাতে অস্ত্রের ঝনঝনা আর এক হাতে কূটনীতির ঝুলি। কর্নেল মোকাটার সৈন্য দলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হল। প্রথম ভাগটিকে নির্দেশ দেওয়া হল সরাসরি জোয়াকি এলাকায় প্রবেশ করতে। দ্বিতীয় ভাগটি সেই সময় ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ করে জোয়াকি যোদ্ধাদের তাদের এলাকার সীমানায় ব্যস্ত রাখতে , যাতে তারা টের না পায় যে ব্রিটিশ সৈন্য দলের একটি শক্তিশালী অংশ তাদের এলাকার অভ্যন্তরে ক্রমাগ্রসর হচ্ছে। সৈন্য দলের তৃতীয় অংশটিকে পাঠানো হল জোয়াকিদের পিছন দিক আগলাবার জন্য যাতে জোয়াকিরা পশ্চাদপসরণ করে পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করতে না পারে।

এই অঞ্চলের জোয়াকিরা ব্রিটিশের রণকৌশল বুঝতে না পেরে ফাঁদে পা দিল। জোয়াকি লশ্করটি তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করল ব্রিটিশের দ্বিতীয় কলম এর সঙ্গে যুদ্ধে। ইতিমধ্যে প্রথম ও তৃতীয় কলম এগিয়ে গেল তাদের নির্দিষ্ট লক্ষের দিকে। দ্বিতীয় কলমটি কিছুক্ষণ ছোট ছোট আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ করার পর তাদের আর্টিলারি গোলাবর্ষণ আরম্ভ করল। জোয়াকি লশ্করটির ব্যুহ ভেদ হয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ব্রিটিশ সৈন্য দলের প্রথম ও তৃতীয় কলমের সঙ্গে জোয়াকিদের আর একটি লশ্করের মোকাবেলা হল জোয়াকি এলাকার অন্তর্দেশে তুরকাই নামক গ্রামে। গ্রামটি ছিল একটি ছোট উপত্যকার মধ্যে সমতলভূমিতে, ব্রিটিশ অশ্বারোহী সৈন্যের চার্জ করার জন্য অনুকূল জায়গা। অশ্বারোহী সৈন্য দলের তীব্র আক্রমণের সামনে জোয়াকি লশ্করটি টিকে থাকতে পারল না।

যুদ্ধের ফলাফল কর্নেল মোকাটার পক্ষে খুবই সন্তোষজনকভাবে শেষ হল। জোয়াকিরা দুটি খণ্ডযুদ্ধেই ব্রিটিশ সৈন্য দলের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। সড়ক তৈরির কাজ এগিয়ে চলল এবং কর্নেল মোকাটা কিছু পদাতিক সৈন্য নিয়ে সেখানে রেখে বাকি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন জোয়াকি এলাকার আরও অভ্যন্তরে। রওনা হবার আগে নির্দেশ দিয়ে গেলেন যে পদাতিক সৈন্যদল যেন তুরাকাই গ্রামটি ঘিরে রাখে আর কোনও গ্রামবাসীকে গ্রামের বাইরে যেতে না দেওয়া হয়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে একটি লোক চুপিসাড়ে ব্রিটিশ সৈন্যের বেড়াজালকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল উত্তরদিকের পাহাড়ের মধ্যে। তার লক্ষস্থল পাহাড়ের আড়ালে জোয়াকিদের অন্য একটি ছোট গ্রাম। সেখানে পৌঁছে সে সেই গ্রামের নেতা বাবর খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল।

বাবর খাঁ এর সম্বল মাত্র শ'খানেক লোক। তিনি তাদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন রাতের অন্ধকারে তুরাকাই গ্রামের দিকে। তাঁর যোদ্ধারা নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ল গ্রামের চারদিকের পাহাড়গুলিতে। তারা কেউ পাহাড়ের ফাটলে, কেউ বা বিরাটকায় পাথরের আড়ালে তাদের জাজয়েল নিয়ে দিনের আলোর অপেক্ষা করতে লাগল। ব্রিটিশ সৈন্য দলটি তখন টহল দিচ্ছে গ্রামের চারদিক ঘিরে।

বাবর খাঁ এর যোদ্ধা সংখ্যা অল্প হলেও তারা প্রত্যেকেই দক্ষ মার্ক্সম্যান অর্থাৎ অব্যর্থ লক্ষভেদী। রোশন খাঁ তাদেরই একজন। তাঁর ওপর ভার পড়ল সংকীর্ণ সর্পিল পথটি আগলাবার , যেটি গ্রামের পাশ থেকে উঠে গেছে পাহাড়ের একটি চূড়া পর্যন্ত।

ভোরের আবছা আলো গ্রামের ওপর পড়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে পাহাড়ের একদিক থেকে জাজয়েলের কয়েকটি ফায়ারের শব্দ হল। টহলদার ব্রিটিশ সৈনিকরা প্রথমটা সেই আকস্মিক ফায়ারের শব্দ শুনে অবাক হয়ে

গেল , তারপর বেয়নেট চড়ানো রাইফেল উঁচিয়ে ছুটল সে দিকে কিন্তু জাজয়েলের ফায়ার তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। টহলদার সৈন্যের দলপতি চোখে দুরবিন লাগিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন পাহাড়ের দিকে, কিন্তু শত্রুর কোনও হদিশ পেলেন না। টহলদার সৈনিকরা তাদের দলপতির নির্দেশে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ করল। সেই সময় বিপরীত দিকের পাহাড় থেকে একটিমাত্র ফায়ার হল আর টহলদার দলপতি মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। দলের অন্যান্য সৈনিকরা সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের গায়ে শুয়ে পড়ল আত্মরক্ষার জন্য কিন্তু পাহাড়ের এদিক সেদিক থেকে একটি করে ফায়ার হয় আর এক একজন টহলদার গুলিবিদ্ধ হয়ে চিরতরে নিশ্চল হয়ে যায়।

এবার গ্রামের পাশে মূল সৈন্যশিবির থেকে সব ব্রিটিশ সৈন্য নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জাজয়েল ফায়ারের শব্দ শুনে। তারা টহলদারদের অবস্থা দেখে ছুটল পাহাড়ের দিকে তাদের সেই মৃত্যুজালের ভিতর থেকে উদ্ধার আর শত্রুদের খুঁজে বার করার উদ্দেশ্যে। ব্রিটিশ সৈন্যদল ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগল কিন্তু যে জোয়াকিদের জাজয়েলের পাল্লার ভিতর গিয়ে পড়ে, চোরা ফায়ার এর গুলি তাকেই বিদ্ধ করে।

এমনি করে ইংরাজ সৈন্য দলের বেশ কিছু লোক হতাহত হওয়ায় তাদের কম্যান্ডার অদৃশ্য শত্রুর পিছনে ধাওয়া করার চেষ্টা ত্যাগ সেনাধ্যক্ষ কর্নেল মোকাটার কাছে বার্তা পাঠালেন যে জোয়াকি পাখতুনদের একটি বড় ও শক্তিশালী লশ্কর তুরাকাই গ্রামে ব্রিটিশ রক্ষী সৈন্যদলকে আক্রমণ করেছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র কর্নেল মোকাটা তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হলেন তুরাকাই গ্রামের দিকে।

কর্নেল মোকাটা সৈন্যবাহিনী সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে তাদের হুকুম দিলেন গ্রামের চারদিকের পাহাড়ে উঠে শত্রুর সন্ধান করে তাদের শেষ করে দিতে। কিন্তু পাহাড়ের খানাখন্দ থেকে অব্যর্থ গুলির নিশানার বিরুদ্ধে তাদের অগ্রগতি অত্যন্ত শ্লথ হয়ে পড়ল। অদৃশ্য শত্রুর সম্ভাব্য আত্মগোপনের স্থলগুলি লক্ষ করে ঝাঁকে ঝাঁকে মাসকেটের গুলিবর্ষণ করা হয় আর উত্তরে এদিক সেদিক থেকে কয়েকটি করে শত্রুর ফায়ার শোনা যায় আর প্রত্যেকটি ফায়ারের গুলিতে একটি করে সৈনিক ধরাশায়ী হয়। বার বার ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েও পাখতুন যোদ্ধাদের চোরা গুলির ব্যূহ ভেদ করে পাহড়ের ওপরে উঠতে পারল না ব্রিটিশ সৈন্যদল। একমাত্র ল্যান্স কর্পোরাল উডস্ একটি সংকীর্ণ সর্পিল পথ ধরে নিপুণতার সাথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

ল্যান্স কর্পোরাল উডস্ যখন প্রায় শিখরের কাছে পৌঁছেছে তখন একটা মোড় ঘুরে একটু গাছের আড়ালে গিয়ে পড়ল একেবারে রোশন খাঁর সামনে। রোশন খাঁ তার জাজেয়েল উডস্ এর বুকের কাছে তুলে ট্রিগার টানল কিন্তু শুধু খট করে একটা শব্দ হল, ফায়ার হল না। তাঁর জাজায়েলে তখন গুলি শেষ হয়ে গেছে। রোশন খাঁ তার জাজেয়েল ফেলে দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে কোমরবন্দ থেকে ছোরা বার করল, ঠিক সেইক্ষণে উডস তার মাস্কেটে লাগানো বেয়নেট রোশন খাঁর পেটে আমূল বিদ্ধ করে দিল। প্রায় একই সময়ে রোশন খাঁ তার ছোরা চালাল উডস এর পেটে। দুজনেই প্রায় একই সঙ্গে ধরাশায়ী হল পাশাপাশি। দুজনেরই পেট থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে চলেছে, যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর মোচড় দিয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে দুজনেরই চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল আর সেইসঙ্গে জাগল প্রচণ্ড জল পিপাসা। ল্যান্স করপোরাল উডস তার দুর্বল ও নিস্তেজ হাতে নিজের জলের ক্যানটিনটা টেনে নিয়ে মুখে দিল। জল দেখে রোশন খাঁ ক্ষীণ স্বরে ‘ উবও’ (জল) বলে তার কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিল।

“ শত্রু, শত্রুকে জল কোন মতেই দেব না” এ কথাটি উডস এর মনে উদয় হতেই তার ভিতর থেকে আর একজন যেন বলে উঠল ‘এই বিদেশী আমার শত্রুকোন যুক্তি অনুসারে ? এর সঙ্গে তো আমার ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নেই ? আমি এসেছি নিজের দেশ ও স্ত্রী পুত্র কন্যা ছেড়ে আমাদের সাম্রাজ্যবিস্তার করবার কাজে , কিন্তু কার সাম্রাজ্য ? কিছু সংখ্যক বণিকের স্বার্থ বই ত নয়। এই বণিকরাই কি আমাদের দেশে আমাদের মত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র লোকের রক্ত শোষণ করছে না ? সেই বণিকদের স্বার্থের খাতিরে আমরা এসেছি অপরের দেশ লুণ্ঠন করতে, এই সব দেশের মানুষকে পদানত করতে ও তাদের গলায় দাসত্বের জঘন্য শিকল পরাতে যাতে আমাদের অর্থশালী বনিক সম্প্রদায় মানুষের রক্তস্রোত ছেঁকে আরও সম্পদ রত্ন ঘরে তুলতে পারে। আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় বড় বড় ভূয়ো আদর্শ , শোনানো হয় বড় বড় বুলি- ইংরাজের সাম্রাজ্য , ইংরাজের সিংহাসন, ইংরাজের গৌরব। কার

সাম্রাজ্য, কার সিংহাসন , কার গৌরব'? উডস এর ঠোঁটের কোনে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল, সে তার জলের ক্যানটিনটা কম্পিত হাতে রোশন খাঁর মুখের কাছে তুলে ধরল। রোশন খাঁ দু ঢোক জল খেল, তারও ঠোঁটের কোনে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল, তার পর কষ গড়িয়ে জল পড়ে রক্তের সঙ্গে মিশে গেল। তাদের দুজনেরই চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার, আর কোনও যন্ত্রণা নেই শুধু গলায় একটু ঘড় ঘড় শব্দ। দুজনের রক্ত এক ধারায় মিশে গড়িয়ে চলেছে একটা মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে। জলের ক্যান্টিনটা পড়ে গেছে মাটিতে, একজনের হাত অন্যজনের হাতের ওপর তখনও মৃদু মৃদু কম্পিত হচ্ছে। দুজনের শেষ নিঃশ্বাস এক সঙ্গে মিশে চলে গেল মহাসৃষ্টির কোন সুদূর নীহারিকায়।

কর্নেল তুরাকাই গ্রাম ছেড়ে পশ্চাদপসরণ করলেন।বাবর খাঁও নিজের লশ্কর গুটিয়ে নিয়ে ফিরে গেলেন। সেই পাহাড়ের গায়ে এক দুর্গম যায়গায় পড়ে রইল ল্যান্স করপোরাল উডস ও রোশন খাঁ , যাদের শত্রুতা মৃত্যুর আলিঙ্গনে অনন্ত কালের জন্যে পরম বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে।

কর্নেল মোকাটা আপাতত রণে ভঙ্গ দিলেও ইংরাজের দূরপ্রসারি কায়েমি স্বার্থের তাগিদে জোয়াকিদের বিরুদ্ধে নিস্পত্তিমূলকভাবে যুদ্ধ করতে হবে। নিখুঁত ভাবে আফগানিস্তানে অভিযান চালাবার জন্য চাই সুষ্ঠু যোগাযোগের ব্যবস্থা, চাই রসদ ও সৈন্য চলাচলের জন্য প্রশস্ত সড়ক। কিন্তু জোয়াকিদের মেরুদণ্ড ভাঙতে না পারলে তারা পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলবে। জোয়াকিরা যে ইংরাজের পোষ মানতে নারাজ , সেটা তারা প্রমাণ করে চলছিল। কর্নেল মোকাটার জোয়াকি এলাকা থেকে পশ্চাদপসরণ করার কয়েকদিনের মধ্যেই তারা ব্রিটিশের খাস এলাকায় প্রবেশ করে ব্রিটিশ সৈন্যের বেশ কিছু সংখ্যক মালবাহী উট লুট করে নিয়ে গেল। ব্রিটিশ অধিকৃত শাদিপুরে একটি সশস্ত্র কন্সটাবিউলারি পোস্ট ধ্বংস করে দিল। মেজর ল্যান্স নামক এক ইংরাজ অফিসারকে গুলি মেরে আহত করল, আর কয়েকটি ছোট ছোট সৈন্য দল আক্রমণ করে কিছু সোলজার হতাহত করল।

অতএব জোয়াকিদের দমন করার জন্য ফের একটি ফৌজ গঠন করা আরম্ভ হল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কিজ় এর অধীনে। কিন্তু জোয়াকি ছাড়া আরও কয়েকটি আফ্রিদি খণ্ডজাতি বাস করে জোয়াকি এলাকার আশেপাশে। ইংরাজের আশঙ্কা যে জোয়াকিদের বিরুদ্ধে বড়রকম অভিযান চালালে ঐ খণ্ডজাতিগুলি জোয়াকিদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ইংরাজ কর্তারা ঐ খণ্ডজাতিগুলির সর্দারদের আমন্ত্রণ জানালেন পেশাওয়ারে ব্রিটিশ কর্তাদের সঙ্গে সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। বিনা রক্তপাতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ নিস্পত্তিতে পাখতুনদের আপত্তি ছিল না। কাজেই খণ্ডজাতিগুলির সর্দাররা এসে উপস্থিত হলেন পেশাওয়ারে ব্রিটিশ হেড কোয়ার্টারসে। সর্দাররা পৌঁছনমাত্রই তাদের গ্রেপ্তার করে অবরুদ্ধ করলেন ব্রিটিশ করতৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট খণ্ডজাতিগুলিকে এই ভাবে নেতৃহীন করার পর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কিজ় এর ফৌজ যাত্রা করল জোয়াকি এলাকা অভিমুখে।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কিজ় এর বাহিনীতে ছিল দু ব্যাটারি গোলন্দাজ, একটি অশ্বারোহী ক্যাভালরি ও দু হাজারের ওপর পদাতিক সৈন্য। কিজ় এর অধীনে তিনজন সেনাপতি, কর্নেল মোকাটা, কর্নেল গারর্ডিনার, কর্নেল উইলিয়ামস। প্রত্যেকে বাহিনীর এক তৃতীয় অংশ পরিচালনার ভার নিয়ে তিন দিক দিয়ে জোয়াকিদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি পায়া গ্রাম আক্রমণ করতে রওনা হলেন।

৭

বন্ধু রশিদ খাঁ এর সঙ্গে পরিচয় পর্বটা এইখানে একটু বলে নিই। রশিদ খাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল থাল্ রেল স্টেশানে পদার্পন করতেই। খাঁ আমাকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন- করমর্দন করে বলেছিলেন "আই ওয়েলকাম ইউ টু আওয়ার ল্যাণ্ড, দি ল্যণ্ড অফ দি পাখতুন্স্।" সুন্দর সুঠাম চেহারা, ছ-ফুটের ওপর লম্বা, পেশীবহুল শরীর, ফর্সা রং, চোখের তারা নীলাভ, বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। তাঁর বেশভূষা আধা পাখতুনি আধা ইংরাজি- মাথায় কুল্লার ওপর পাগড়ি,পরনে সালওয়ার পায়ে চপ্পল কিন্তু গায়ে শার্ট, কোট ও গলায় নেকটাই। তিনি নিজের মাতৃভাষা

পশ্তোর(পাখ্তো) মতই উর্দু ও ইংরাজি অনর্গল বলতে পারতেন। আমার ধারনা ছিল যে পাখতুনরা সবুজ চা অপেক্ষা কড়া কোনও পানীয় ব্যবহার করে না কিন্তু দেখলাম যে রশিদ খাঁ স্কচ্ হুইস্কির বিশেষ ভক্ত। সাধারনত রসিক তবে স্বল্প-ভাষী কিন্তু কয়েক পেগ্ স্কচ্ পেটে পড়লেই তিনি বাগারম্বরপূর্ণ হয়ে পড়তেন যদিও তাঁর মনের গভীরতম দেশে পৌঁছান অসম্ভব ছিল। স্কচের প্রভাবে আবেগময় হয়ে মাঝে মাঝে ইংরাজি ও উর্দু কবিতা আউড়াতেন। তিনি ইংরাজবিদ্বেষী ছিলেন অথচ ইংরেজ সরকারের চাকরি করতেন আর তাঁর বিরুদ্ধে কাজে অবহেলা বা নিয়মানুবর্তিতার অভাবের অভিযোগ শোনা যায়নি। তাঁর চরিত্র আমার কাছে প্রহেলিকাময় লাগত। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে একজন পাক্কা পাখতুন হওয়া সত্বেও স্কচ্ হুইস্কির ভক্ত কেন, পাখতুনদের ভূষণ রাইফেল ছেড়ে কলম ধরেছেন কেন, আর ইংরেজবিদ্বেষী হয়েও ইংরেজ সরকারের চাকরি করেন কেন। রশিদ খাঁ হেসে উত্তর দিয়ে ছিলেন, "ভাই সাহেব, আপনি দেখছি দু'মিনিটে আমার অন্তস্থলে পৌঁছাতে চান , অনায়াসে পাখতুন চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিফ্ হাল হতে চান। ধীরে বন্ধু ধীরে, ধৈর্য ধরে বুঝতে চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে হয়ত পাখতুন চরিত্র কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। কিন্তু আমাদেরকে পুরোপুরি চেনা ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব নয়।"

বাদামা থেকে ফিরে যখন সাদ্দায় পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। থালে যেতে হলে আরও চল্লিশ মাইল রাস্তা নো-ম্যান্স্-ল্যান্ডের ভিতর দিয়ে পাড়ি দিতে হয় আর সেটা করার চেষ্টা মূর্খতা, কাজেই সে রাতটাও আমার আতিথ্য রশিদ খাঁ এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

রশিদ খাঁ সাহেব তো আমার প্রস্তাব শুনে ভারি খুশি। রাতের বেলা সেই নড়বড়ে টেবিলটা টেনে নিয়ে রশিদ খাঁ আবার হোয়াইট হর্সের বোতলটা নিয়ে বসলেন। আমি বললাম, কী রশিদ সাহেব বাদলের রঙ কি রোজই বদলায় নাকি? আমি এ পর্যন্ত আর কোনও পাখতুনকে মদ খেতে দেখিনি , আপনি এই দেশের লোক হয়ে হুইস্কি ধরলেন ক্যান ? তিনি বললেন ' যে দিন রাইফেল ছেড়ে কলম ধরেছি হাতে ,আমার পাঠানত্বের বিসর্জন তো সেই দিনই হয়ে গেছে। কলম যখন ধরলাম তখন হুইস্কিই বা কী দোষ করেছে? একটা কথা কিন্তু মানতেই হবে স্যার যে ইংরাজরা রাইফেল আর হুইস্কি এই দুটো জিনিসই তৈরি করে একেবারে লা জবাব। আই টেক অফ মাই কূল্লা (হ্যাট তো পরি না) টু দেম। যাঃ আপনি তো হাত গুটিয়ে বসে রইলেন দেখছি। আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে না , আমি তো আকণ্ঠ ডুবে আছি, আপনাকে একটি ছোট্ট পেগ মাত্র দিয়েছি , পেয়ালার অপমান করবেন না।

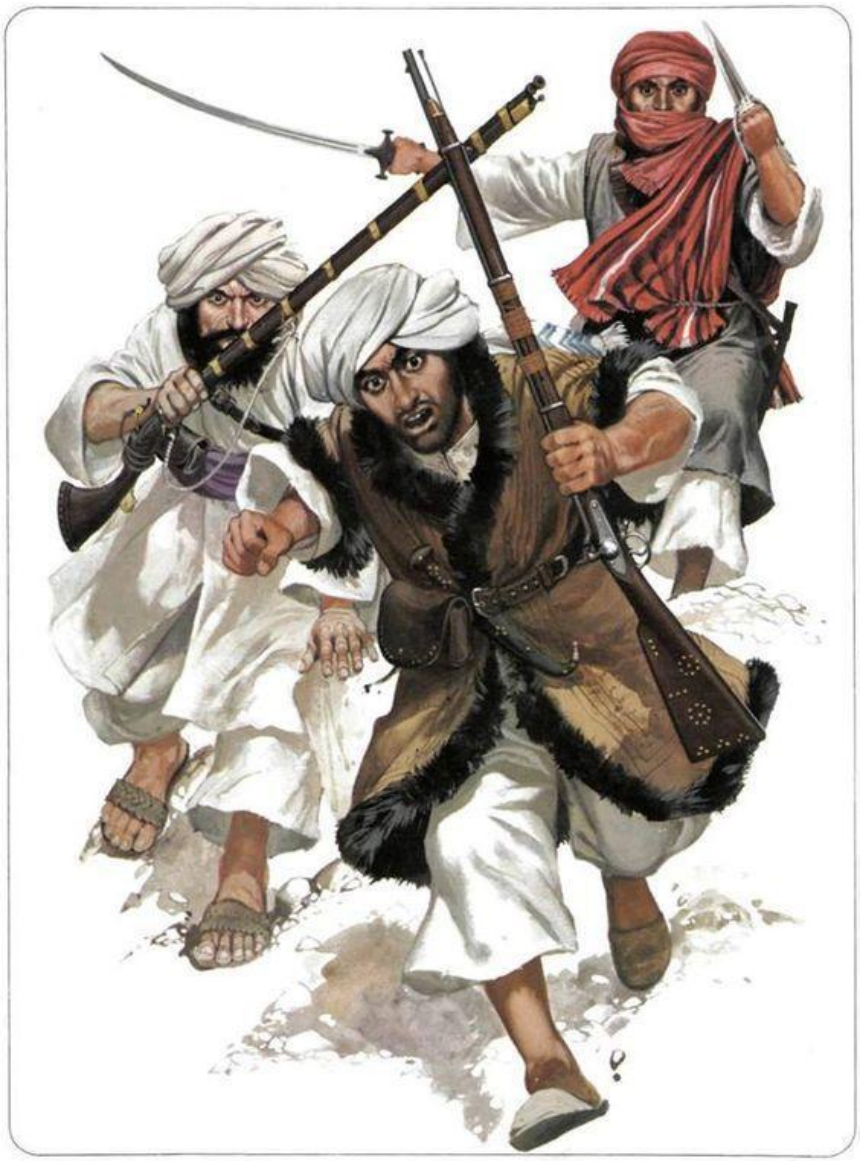
"আমার ওয়াজিরি ভাই-বেরাদররা বলেন যে আমি ইংরাজি লেখাপড়া শিখে আর হুইস্কিতে ডুবে কাফের বনে গিয়েছি। কিন্তু চিরকাল কী শুধু রাইফেল নিয়েই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় ? রাইফেলের সঙ্গে কলমও দরকার। জানেন তো যে, আমরা শুধু বর্তমানটাই জানি, পিছনপানে আমরা তাকাই না, বিগত দিনের কথা জানি না বা জানবার উপায়ও নেই কারণ আমাদের যথার্থ ইতিবৃত্ত কেউ লিখে যায় নি। কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন আমাদের বিগত দিনের ইতিহাস জানবার প্রয়োজন হবে সামনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা জোগাবার জন্য। আপনারাও মনে করেন যে রশীদ ইংরাজের সরকারি অফিসে বসে শুধু 'উইথ রেফারেন্স টু ইওর লেটার নাম্বার' ইত্যাদি লিখেই নিজের কাজ শেষ করে। কিন্তু তা নয় লাহিড়ী সাহেব, আমি হুইস্কি খাই আর লিখে যাই ইংরাজ শাসনের অত্যাচার আর পাখতুনদের বীরত্বের কাহিনী, পাখতুনদের সুখ দুঃখের কাহিনী, পাখতুন রাষ্ট্রজীবনের জোয়ারভাঁটার কাহিনী। আগামি দিনের আত্মবিস্মৃত পাখতুনদের প্রাণে আলোড়ন আনবে তাদের বিগত দিনের ইতিহাস আর তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়বে গোটা পাখতুনিস্তানে -The echoes shall roll from soul to soul , and grow for ever and ever,'

"কোহাট পেশাওয়ার রাস্তাটা দেখেছেন তো ? আজকাল মজবুত আর মসৃণ রাস্তা তৈরি করতে তার ওপর পীচ ঢালা হয়, কিন্তু কোহাট- পেশাওয়ার রাস্তাটা বলতে গেলে পাখতুনদের রক্ত ঢেলে তৈরি করা হয়েছে। শোনা যায় পুরাকালে ইংরাজরা যেখানে নিজেদের রাজ্যবিস্তার করবার মতলব করতেন সেখানে তাঁরা বাইবেল হাতে পাদ্রিদের পাঠিয়ে দিতেন আগে , সৈন্যসামন্ত পাঠাতেন পরে। কিন্তু পাখতুনিস্তানে তাঁদের পাদ্রিরা দাঁত ফোটাতে পারবে না দেখে সেখানে পাঠানো হোল স্যাপারদের। স্যাপারদের কাজ , তারা পাখতুন এলাকার ভিতর দিয়ে রাস্তা গড়বে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ইংরাজদের এক ঘাঁট থেকে আর এক ঘাঁটি। এমনি করে গোটা পাখতুনিস্তানে

সড়কের জাল বিছিয়ে দেবে,আর সেই জালের ভিতর জড়িয়ে ধরা পড়বে গোটা পাখতুন জাতি। পাখতুনরা কিন্তু ইংরাজের ফন্দি বুঝতে পেরে প্রত্যেক যায়গায় রাস্তা তৈরি করায় বাধা দিতে লাগলো আর সেই অজুহাতে ইংরাজ সরকার বড় বড় সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন বাধাদানকারি পাখতুনদের শায়েস্তা করতে। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়া হল, হাজার হাজার পাখতুনদের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর আর তাঁদের ওপর দিয়ে ইংরাজের সড়ক চলল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক ঘাঁটি থেকে আর এক ঘাঁটি , যা আজও চলছে নির্মম নির্দয়ভাবে। কোহাট পাসের ঠিক ওপিঠেই আছে একটি আদম- খেল। আফ্রিদিদের গ্রাম। এই গ্রামের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে পায়েহাঁটা রাস্তা, দুসারি পাহাড়ের মধ্যে দর্রা হয়ে পেশওয়ার পর্য্যন্ত। আফ্রিদিদের অস্ত্রশস্ত্রের একটা বেশ বড় রকম অংশ তৈরি হয় এই দর্রার পাহাড়ের গুহায় ছোট ছোট কামারশালে।

"যে সময়টার কথা বলছি তখন কোহাট পাস এ তৈরি করা কোনও পাকা রাস্তা ছিল না। প্রকৃতি নিজের খেয়ালখুশি মত যেটুকু পথ করে দিয়েছিল আফ্রিদিরা তাতেই সন্তুষ্ট ছিল। এ পথটি এতই অপ্রশস্ত ছিল যে পাশাপাশি দুজন লোক পাস এর ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে পারত না। তার ওপর পাস পর্য্যন্ত পৌঁছতে হোলে পাক্কা দু মাইল খাড়া পাহাড়ের চড়াই। কাজেই এ অঞ্চলের আফ্রিদিরা মনে করত তারা অভেদ্য দুর্গের মধ্যেই বাস করছে। কোহাটের ময়দান থেকে যদিও ইংরাজ আফ্রিদিদের উৎখাত করে ছাউনি গড়তে আরম্ভ করেছে কিন্তু আফ্রিদিদের ধারনা ছিল যে, কোহাট পাসে এর মধ্যে ঢুকে ইংরাজ তাদের স্বাধীনতায় হাত দিতে পারবেনা। কিন্তু এই ভুল ধারনা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

"১৮৫০ সালের এপ্রিল মাস। শীত নিজের নিষ্ঠুর সাদা হাত ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছে, যদিও দূরের পাহাড়গুলির চূড়া তখনও বরফে ঢাকা। আফগানিস্তানের ওপর থেকে যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া শীতকালভর বয়েছে, তার ছুঁচ বিঁধানো তীব্রতা আর নেই , বরং হাওয়াতে একটু আরামের আমেজ এসে গেছে।এই সময় একদিন সকালবেলা কোহাট পাস এর আফ্রিদিদের ঘুম ভেঙে গেলো পাহাড়ের নীচে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে। দেখা গেল ইংরাজ স্যাপাররা পাহাড়ের গায়ের অতিকায় সব পাথর টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে বিস্ফোরণ করিয়ে, রাস্তা তৈরি করতে করতে এগিয়ে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে কোহাট পাস এর দিকে। গ্রামের মিনারে বেজে উঠলো দূম দূম দূম শব্দে "চীগা",পাখতুনদের রণবাদ্য। গ্রামের লোক সব ছুটে এলো ঢালতলওয়ার আর গাদা বন্দুক নিয়ে মিনারের তলায়। তারপর তারা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে, গেল কোহাট পাহাড়ের মাথায়। পাস এর দক্ষিণ দিকের দলটি পরিচালনা করছিলেন বৃদ্ধ গ্রামপ্রধান সমীর খান আর উত্তর দিকের দলের নেতৃত্বের ভার ছিল গ্রামের ওস্তাদ মিস্ত্রি সিকন্দর খান এর ওপর। থাল গ্রামের কুদরৎ খানকে বোধহয় আপনি চেনেন, সিকন্দর ছিলেন কুদরৎ এর প্রপিতামহ। সিকন্দর খান ছিলেন ওস্তাদ মিস্ত্রি, তাঁর হাতের তৈরি তলওয়ার আর গাদা বন্দুকের খ্যাতি ছিল গোটা পাখতুনিস্তানে। বুদ্ধিতে ছিলেন তিনি বিচক্ষণ আর চেহারা ছিল অ্যাপোলোর মত সুন্দর, শরীরে শক্তি আর মনে উৎসাহ ছিল অফুরন্ত।



"সমীর খান বয়সে বৃদ্ধ হলেও প্রাণ প্রাচুর্যে ছিলেন ভরা। যৌবনের উদ্দাম চঞ্চলতা তখনও তাঁর মধ্যে বর্তমান। তিনি নিজের দলটি নিয়ে খোলা তলওয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কোহাট পাসের নীচে স্যাপারদের অ্যাডভান্স পার্টির ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাডভান্স পার্টির কতক স্যাপাররা সমীর খান এর দলের হাতে প্রাণ দিল, আর কতক পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

"অ্যাডভান্স পার্টির স্যাপারদের হটিয়ে দিয়ে তিনি কিন্তু ফিরলেন না, তাজা রক্তমাখা তলওয়ার নিয়ে দলশুদ্ধ ছুটে গেলেন পাহাড়ের নীচে স্যাপারদের প্রধান ঘাঁটির দিকে। স্যাপারদের মাসকেটের পাল্লার মধ্যে পৌঁছেই সমীর খান নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, কিন্তু তখন আর ফিরবার উপায় ছিল না - স্যাপারদের মাসকেট থেকে তখন মৃত্যুবৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। কয়েকজন আফ্রিদি যারা তখনও মাসকেটের গুলির নাগালের মধ্যে পৌছয়ইনি, সমীর খান চিৎকার করে তাদের ফিরে গিয়ে সিকন্দর খানকে খবর দিতে বললেন। তারপর মাসকেটের গুলি অগ্রাহ্য করে দলশুদ্ধ ঢুকে পড়লেন স্যাপারদের মধ্যে। এদের তলওয়ারের সামনে যে পড়ল সে আর উঠল না, কিন্তু স্যাপারদের মাসকেটের সামনে বেশিক্ষণ তারা টিকে থাকতে পারল না, একে একে ধরাশায়ী হল। সমীর খানের গোটা দলটি নিঃশেষ হয়ে গেল।

"স্যাপাররা কিন্তু জয়ের নেশায় ঠিক সেই ভুলই করে বসল যা সমীর খান করেছিলেন। সমীর খান আর তাঁর দলকে ধরাশায়ী করে তারা এগিয়ে গেল পাহাড়ের গা বেয়ে সরাসরি কোহাট পাসের দিকে।

সমীর খানের মৃত্যুতে গ্রামরক্ষার দায়িত্ব পড়ল সিকন্দর খানের ওপর। তিনি তাঁর দলের লোকদের নিয়ে পাসের দক্ষিণ দিকের ওপর নিঃশব্দে উঠে বসে রইলেন। স্যাপাররা যখন মাসকেটের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পাসের প্রায় তিনশ গজের মধ্যে এসে গেছে তখন তিনি আক্রমণের আদেশ দিলেন। স্যাপাররা আতঙ্কবিহ্বল চোখে দেখল রাশি রাশি বড় বড় পাথর সাক্ষাত মৃত্যুরূপ ধরে তাদের দিকে পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে। মৃত্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা পাবার প্রয়াসে তারা ছুটল পাহাড়ের নীচের দিকে কিন্তু কেউই পৌঁছতে পারল না। কেবলমাত্র

স্যাপারদের কমান্ডার আর তার কয়েকজন সেপাই যারা পাহাড়ের নীচেই ছিল, প্রাণ নিয়ে কোহাট ছাউনিতে ফিরতে পেরেছিল এই বিপর্যয় এর খবর নিয়ে।

"তারপর এক সপ্তাহ কেটে গেল ,ইংরাজদের দিক থেকে আর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। অনেকের ধারনা হল যে ইংরাজের যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে, তারা আর কোহাট পাসের দিকে পা বাড়াবে না। কিন্তু বিচক্ষণ সিকন্দর বোঝেন যে এই থমথমে ভাবটা প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বলক্ষণ মাত্র। ইংরাজ এই খণ্ডযুদ্ধে তাদের পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাদের অজস্র সৈন্যসামন্ত আছে, গোলাগুলি আর রসদের অভাব তাদের নেই, তাছাড়া তারা তীক্ষ্ণধার এবং কূটবুদ্ধি সম্পন্ন। তারা একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনে পাখতুনদের চূর্ণ করে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এ সত্যটা সিকন্দর খান অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনিও নিজের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন আসন্ন ঝড়ের মোকাবেলা করার জন্য।

"সিকন্দর অবিরাম কাজ করে যান নিজের কামারশালে। ঠক ঠক তাঁর হাতুড়ি চলে লাল টকটকে লোহার ওপর। তৈরি হয় ইংরাজদের মাসকেটের অনুরূপ মাসকেট। দূরদূরান্তে পাখতুনদের গ্রামে গ্রামে পাঠানো হবে সেই ম্যাসকটের নমুনা যাতে ক্রমে ক্রমে গোটা পাখতুনিস্তানে তৈরি হতে পারে উন্নত ধরনের মাসকেট। প্রস্তুতির জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন , তা পাওয়া যাবে কী ? এই কথাই ভাবেন সিকন্দর।

"সিকন্দর এর কামারশালে তাঁর কাজে সমানে সাহায্য করে যান তাঁর স্ত্রী গুলশন। তাঁদের শিশুপুত্র আমীন ঘুম চোখে দেখে এই নতুন ধরনের মাসকেট তৈরির কাজ আর মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে কামারশালের এক কোনে। সিকন্দর খানের চেহারার তুলনা যদি অ্যাপোলোর সঙ্গে করা হয়, তবে গুলশনের সৌন্দর্যও ভেনাস এর সঙ্গে তুলনীয়। তাঁরা স্বামীস্ত্রী শুধু চেহারাতেই মানিকজোড় ছিলেন না, গুলশনও তাঁর স্বামীর মতই বিচক্ষণ, কর্মঠ এবং দেশপ্রেমিক ছিলেন। সিকন্দরের সমস্ত উদ্যম আর উৎসাহের উৎস ছিলেন গুলশন। এই মহীয়সী রমণীর কথা কোন ঐতিহাসিক লিখে যাননি।"

৮

"থাল ফোর্ট। কর্মমুখর দুর্গের ভিতর সেদিন বিকেল বেলায় হঠাৎ নিস্তব্ধতা নেমে এল , তারপর সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে বিউগলে লাস্ট পোস্টের বিষাদ সুর কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ল দিগন্তে। একটি ছোট ব্রিটিশ রক্ষিদল ' প্রেসেন্ট আর্মস ' করে শেষ অভিবাদন জানাল চীরনিদ্রায় শায়িত মেজর রলিন্সকে। পেশওয়ারে 'উইক এন্ড' এর অবসর উপভোগ করার পর মেজর রলিন্স এবং তাঁর ইংরাজ বন্ধু লেফটেন্যান্ট ও তাঁর বেয়ারা ফিরছিলেন মোটরগাড়িতে। পেশওয়ার থেকে দু সারি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলেছে আফ্রিদি উপজাতি অঞ্চলের দর্রা হোয়ে কোহাট, আর কোহাট গিরিবর্ত অতিক্রমণ করে ওয়াজিরি উপজাতি এলাকার গা ঘেঁসে থাল পর্যন্ত। অগণিত পাখতুনদের রক্তে সিঞ্চিত এই রাস্তা বৃটিশ শক্তির হৃদয়হীন দম্ভের পরিচয় নিয়ে এঁকে বেঁকে চড়াই উতরাই বেয়ে এগিয়ে চলেছে। উপজাতীয় পাখতুনরা কিন্তু এই সড়কের ওপর বৃটিশের একাধিপত্য কখনও মেনে নেয়নি।

মেজর রলিন্সের গাড়ি রাস্তার বিপদজনক অংশগুলি পেরিয়ে প্রায় থালে এর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে - সামান্য খানিকটা রাস্তা অতিক্রম করতে পারলেই একটা রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং, তার অনতিদূরেই বিমান অবতরণের ল্যান্ডিং স্ট্রিপ, আর কিছু দুরেই থাল ফোর্ট, সবশুদ্ধ মাত্র মিনিটদশেকের পথ মোটরে। হঠাৎ মেজর রলিন্স গাড়ির ব্রেকে চাপ দিলেন। গাড়িটি এক ঝাঁকানি দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে থেমে গেল লেভেল ক্রসিং এর বন্ধ ফাটকের সামনে। মেজর রলিন্স ও তাঁর বন্ধু হতভম্ব হয়ে গেলেন। লেভেল ক্রসিং এর গেট তো সে সময়ে বন্ধ থাকবার কথা নয় ! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। রলিন্স ভাবছিলেন যে গাড়ি থেকে নেমে অসময়ে লেভেল ক্রসিং বন্ধ থাকার কারণ অনুসন্ধান করবেন, ঠিক সেই সময় রাস্তার ধারের একটি ছোট্ট পাহাড়ের দিক থেকে কড়কড় শব্দে একঝাঁক গুলি এসে পড়ল তাঁর গাড়ির ওপর। মেজর রলিন্স ও তাঁর বন্ধু তৎক্ষণাৎ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে বুকে হেঁটে কাছেই একটা কালভার্টের নীচে আশ্রয় নিলেন। জায়গাটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, কালভার্ট এর দেয়াল শত্রুর

রাইফেলের গুলি থেকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য তাঁদের বাঁচাতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হল, রলিন্স সাহেবের বেয়ারা তো গাড়ি থেকে বেরোতে পারেনি! রলিন্স সাহেব আবার ছুটে ফিরে গেলেন নিজের গাড়িতে। তাঁর বন্ধু কালভার্টের আড়াল থেকে গুলিবর্ষণ করে রলিন্সকে ফায়ার কভার দিলেন। গাড়ির পিছনের সিটে তখন বেয়ারার কষ গড়িয়ে রক্ত পড়ছে , বুকের নীচে কাপড় চোপড় রক্তে ভিজে গেছে।রলিন্স সাহেব তাঁর বেয়ারাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ছুটলেন কালভার্টের দিকে। কাঁধে একজন মানুষের ভার নিয়ে শত্রুর গুলিবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা মোটেই সহজসাধ্য নয় , তথাপি রলিন্স সাহেব সেই গুরুভার কাঁধে নিয়ে পৌঁছে গেলেন কালভার্টের প্রায় মুখের কাছে। আর দু'পা এগোতে পারলেই কালভার্টের নিরাপদ আশ্রয়। রলিন্সের বন্ধুও কালভার্ট থেকে বেরিয়ে এলেন বন্ধুকে সাহায্য করতে।

ঠিক তখন কড়াক কড়াক শব্দ করে আবার শত্রুর রাইফেল গর্জে উঠল। ক্ষণিকের জন্য রলিন্সের মনে হল যেন বুকে সামান্য একটু ধাক্কা লাগল। তার পর সব অন্ধকার, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর লেফটেন্যান্ট বন্ধুর পায়ের একটু মাংস কেটে বেরিয়ে গেল আর একটি গুলিতে। কিছু দূরের একটি পাহাড়ের চুড়ায় ব্রিটিশ সামরিক পিকেট থেকে হেলিওগ্রাফে খবর পেয়ে থাল ফোর্ট একটি সশস্ত্র দল গিয়ে মৃত এবং আহতদের উদ্ধার করে ফোর্টে নিয়ে এল। ডাক্তাররা রলিন্সকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন ও তাঁর বেয়ারার জখমে অস্ত্রোপচার করা হল , কিন্তু সে-ও কিছুক্ষণ পরে মারা গেল। রলিন্সের বন্ধুর আঘাত সামান্যই ছিল।

এই হত্যাকাণ্ডে ফোর্টের ব্রিটিশ অফিসাররা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ব্রিগেড কম্যান্ডার এর হুকুমে তৎক্ষণাৎ এক ব্যাটারি গোলন্দাজ ও এক ব্যাটালিয়ান পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত হল এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার জন্য। কিন্তু পলিটিক্যাল কর্তাদের নির্দেশে সৈন্যদল ব্যারাকে ফিরে গেল আর তার বদলে পাঠানো হল একদল সশস্ত্র ফ্রন্টিয়ার কন্সটিবিউলারি ও এক ব্যাটালিয়ান কুরম মিলিশিয়া। এই দুটি আধা সামরিক দল থাল এর আশেপাশে দশ মাইল ব্যাসের মধ্যে কোনও উপজাতীয় লশ্কর যোদ্ধার দলের অস্তিত্ব খুঁজে পেল না। সন্ধ্যার দিকে তারা রিপোর্ট দিল যে উপজাতীয় লশ্কর প্রতিঘাতের ভয়ে সে অঞ্চল ছেড়ে অনেক দূরে পাড়ি দিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা, সূর্যদেব আফগানিস্তানের সুলেমান পর্বত শ্রেণীর পিছনে ডুব দিয়েছেন কিন্তু গোধুলির ক্ষীণ আলো তখনও ছড়িয়ে রয়েছে কুরম উপত্যকার ওপর। দূরে কুরাম নদী দেখা যায় পাহাড়ের গা ঘেঁসে কালনাগিনীর মত এঁকেবেঁকে চলেছে, তার ধারেই থাল গ্রামের বাড়িগুলির আবছা আকৃতি তখনও দেখা যাচ্ছে। ফোর্টের ভিতর একখানি দোতলা ব্যারাকে আমার ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে মনে মনে ভাবছিলাম , দিনের বেলার ওই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কথা। মেজর রলিন্স ও তাঁর বেয়ারার অহেতুক প্রাণহানির কথা ভেবে মনটা যদিও কিছুটা বিষাদগ্রস্ত ছিল কিন্তু কতকটা নিশ্চিন্তও হয়েছিলাম খবরটা শুনে যে, উপজাতীয় লশ্কর থাল থেকে অনেক দূরে পাড়ি দিয়েছে। মনে করলাম যাক এখন কয়েকদিন কার্যোপলক্ষে ফোর্টের বাইরে গেলে উপজাতীয় স্নাইপিং এর আশঙ্কায় ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না।

ক্রমশ

প্যারীচরণ সরকার

অতনু প্রজ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায়



উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়টা পার হয়ে গিয়েছে তখন। কোলকাতার আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির অনেকেই ডিরোজিও সাহেবের আলোয় ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টে সামিল হয়েছে। ডিরোজিও সাহেব এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে গেলেও তাঁর দীক্ষিত নব্য বঙ্গ যুবসম্প্রদায় রমরম করছেন প্রচলিত সবকিছুর বিরোধীতা করে, চলতি গোঁড়ামিকে উড়িয়ে দিয়ে। সে এক রেনেসাঁসের মুখোমুখি নগর কোলকাতা। প্রেসিডেন্সি কলেজের মেধাবী ইংরেজি শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় তখন মদ্যপান, গো মাংসভক্ষণ, হিন্দু আচার-আচরণের আদ্যোপান্ত বিরোধীতা ইত্যাদি নানাপন্থায় উগরে দিচ্ছে মনের মধ্যে পুষে রাখা বিষবাষ্প, ওলোটপালট করে দিতে চাইছে চলতি সবকিছুকে।

ঠিক তখন একজন মেধাবী, মিতভাষী, উচ্চশিক্ষিত মানুষ, কোনোরকম হুজুগে না মেতে উঠে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন সমাজটাকে গড়ে তোলায় নিজের মত করে ভূমিকা নিতে। মানুষটির নাম প্যারীচরণ মিত্র। স্কুল শিক্ষক হিসেবে জীবন শুরু করে বেশ কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজে কাটিয়ে দিয়েছেন এরই মধ্যে। আর বুঝে গিয়েছেন স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার না হলে সমাজের অন্ধ গোঁড়ামি ঘোচা অসম্ভব।

বেথুন স্কুল তখনও স্থাপিত হয়নি। প্যারীচরণ তখন বারাসাত স্কুলের হেডমাষ্টারমশাই। বারাসাতের দুই ভাই নবীনকৃষ্ণ মিত্র আর কালীকৃষ্ণ মিত্র এই হেডমাষ্টারমশাইকে বললেন ওঁরা মেয়েদের স্কুলের জন্য টাকাপয়সা দিতে পারেন যদি উনি স্কুল প্রতিষ্ঠায় দায়িত্ব নেন। প্যারীচরণ যথারীতি দায়িত্ব নিলেন এবং ১৮৪৭ সালে চালু হল সে স্কুল।

কিন্তু নগর কোলকাতার রেনেসাঁস থেকে দূরে থাকা বারাসাত ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত। উচ্চশ্রেণীর মানুষ ক্ষেপে উঠলেন মেয়েদের এমন শিক্ষাদীক্ষার আয়োজন দেখে। গুজব উঠল, জমিদারেরা নাকি টাকাপয়সা দিয়ে লোক লাগিয়ে প্যারীচরণকে খুন করার চেষ্টা করছেন।

এসব শুনে বেথুন সাহেব এগিয়ে এলেন। পাশে দাঁড়ালেন প্যারীচরণের। আর বারাসাতের সেই মেয়েদের বিদ্যালয় দেখে এতটাই মুগ্ধ হলেন যে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বেথুন স্কুল। হেদুয়ার পশ্চিমে ছিল বেথুন সাহেবের এই বিদ্যালয়টি।

কিন্তু সেখানেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বালিকাদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। পন্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার নিজের মেয়েকে সেই বেথুন স্কুলে পাঠিয়ে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন। প্যারীচরন বুঝেছিলেন শুধু বেথুন স্কুলে হবে না। শহর কোলকাতার বিভিন্ন ভদ্রপল্লীতে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কিছুতেই হবে না। সেইমত নিজের খরচে ভদ্রাসন বাড়িতে 'চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করলেন। এছাড়াও এমন অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সরাসরি অংশ নিতে শুরু করলেন।

ইতিমধ্যেই নানা ইংরেজি স্কুলে প্যারীচরণ সরকারের 'ফার্ষ্ট বুক অফ রিডিং', 'সেকেন্ড বুক অফ রিডিং', 'থার্ড বুক অফ রিডিং' আর 'ফোর্থ বুক অফ রিডিং' পাঠ্যসূচিতে স্থান পেয়ে গেছে। বই ও লেখকের মেধার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শিক্ষক হিসেবে প্যারীচরণের নাম শিক্ষিত মহলে ততদিনে সর্বজনবিদিত।

এই সময় তাঁর জীবনের আরেকটি বাঁক। প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দিলেন তিনি ১৮৬৩ সালে। নতুন এই অধ্যাপক খুবই প্রিয় হয়ে গেলেন ছাত্রদের কাছে। মধুরভাষী এই শিক্ষক যে আদ্যপান্ত শিক্ষা ও ছাত্র অন্তপ্রাণ, এ বুঝতে সময় লাগল না কারো। অল্প কিছুদিন পরে প্যারীচরন ব্যথিত হলেন ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের উছৃঙ্খল মদ্যপানে। কিন্তু এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকার মানুষ উনি নন। মেধাবী ছাত্রদের মদ্যপানের উগ্রতা থেকে ফিরিয়ে আনতে উনি প্রতিষ্ঠা করলেন মদ্যপান-নিবারণী সভা। আমৃত্যু ছিলেন এই সভার সম্পাদক।সম্ভবত তাঁর পূর্বে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে আর কেউ মদ্যপান বিরোধী এমন কার্যকলাপ করেননি। সাধারন মানুষের মনে এই কার্যকলাপের খুব প্রভাব পড়েছিল। সে'সময় কোলকাতার রাস্তাঘাটে একটি গান খুব প্রচারিত হয়েছিল এ নিয়ে।

"মধু পান আর কোরো না।
প্যারীচাঁদ করেছে মানা
ইয়ং বেঙ্গল আর বাঁচবে না
খাড়া বড়ি থোড়ের নাড়ি
তাতে হলে বাড়াবাড়ি
অগ্নি যাবে যমের বাড়ি, কালবিলম্ব আর সবে না"।

(সংস্কৃতে মধু শব্দটি মদ্য অর্থে ব্যবহৃত। এগানেও সে অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছিল)।

বছর বারো মদ্যপানের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের ফল বৃথা যায়নি এই শিক্ষকের। মদ্যপান বিরোধী একটি চিন্তাধারাও কোলকাতাও স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে।

পঞ্চাশোর্ধ বয়েসে তাঁর হাতে একটি ক্ষত দেখা দেয়। সেই ক্ষতটিই এই মহান চিন্তাবিদের প্রাণ কেড়ে নিল। ১৮৭৫ এর জুলাই মাসে প্যারীচরণ সরকারের মৃত্যু হল। কলকাতার ছাত্র যুব শিক্ষাবিদ সমাজই শুধু নয়, সাধারন মানুষও চোখের জল ফেলেছিল এই মহান মানুষটির শেষযাত্রায়।

কান্‌হোজি আংরে

উমা ভট্টাচার্য



১৯৬৯ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি। বাংলার দুই দুঃসাহসী যুবক একটি সাদামাঠা নৌকায় কোলকাতা জেটি থাকে যাত্রা শুরু করলেন। বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গ ভেঙে এই সাধারণ নৌকায় করে ১০০০ মাইল জলপথ পাড়ি দেওয়াই উদ্দেশ্য তাঁদের।এই দুই যুবক হলেন পিনাকীরঞ্জন চ্যাটার্জী আর জর্জ অ্যালবার্ট ডিউক। তাঁদের নৌকাটি কেমন ছিল জান?শুনলেই বোঝা যাবে কতটা দুঃসাহসী আর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ছিলেন দু'জন।নৌকাটি ছিল কুড়ি ফুট লম্বা, সাড়ে পাঁচ ফুট চওড়া আর উচ্চতায় ছিল মাত্র সাড়ে চার ফুট।উচ্ছল তরঙ্গবহুল সমুদ্রে পালছাড়া নৌকার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য দু'ধারে বেঁধে নিয়েছিলেন দুটি বায়ুপূর্ণ কাঠের বাক্স। ৬ই মার্চ তাঁরা ১০০০মাইল পথে পাড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছে সেই ঐতিহাসিক সমুদ্রযাত্রা শেষ করে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন।তাঁদের সম্বল ছিল প্রবল আত্মবিশ্বাস, আর নীতি ছিল 'ডু অর ডাই'- তাই তাঁদের নৌকার নাম দিয়েছিলেন তাঁদের মতই দৃঢ়চেতা, দুঃসাহসী, সফল মারাঠা অ্যাডমিরাল কান্‌হোজি আংরের নামে। তাঁদের অভিযানের বাহনটির নাম ছিল 'কান্‌হোজি আংরে'।

কান্‌হোজি আংরে ছিলেন শিবাজির পুত্র শম্ভাজির সময়ের মারাঠা নৌসেনাধ্যক্ষ।আরব সাগরের তীরে শিবাজি স্থাপিত বিখ্যাত সুবর্ণ দুর্গের সামান্য একজন কর্মচারী থেকে নিজের সাহস, দক্ষতা আর কৌশলে তিনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিলেন এক বিখ্যাত সমুদ্রপুরুষ। ভারতের পশ্চিম উপকূলের তটরেখা ধরে ঔপনিবেশিকদের আগ্রাসন প্রতিরোধকারী এক সৈনিক। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ থেকে তাঁর জীবিতকালে তিনিই ছিলেন ভারতের সর্বপ্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি একসঙ্গে টক্কর দিয়েছিলেন জলপথে আসা ইউরোপীয় দুর্ধর্ষ সামুদ্রিক আগ্রাসনকারীদের সঙ্গে,অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে দখলদার ইংরেজ আর মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে। জীবনে তাঁর কোন অভিযান অসার্থক হয়নি। জলপথে তিনি যুদ্ধ করেছেন পর্তুগিজ,ডাচ,ও বৃটিশের বিরুদ্ধে। জলপথে যারা ছিল অত্যন্ত সফল তাঁদের স্বার্থহানি ঘটাতে তিনি তৈরি করেছিলেন এক সুদক্ষ নৌবহর- মারাঠা নেভি। এর আদর্শেই পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকেরা বোম্বাইতে স্থাপন করেছিলেন ইন্ডিয়ান নেভি-ভারতীয় নৌসেনাবিভাগ।

ঔপনিবেশিক ইংরেজের যে অপূরণীয় ক্ষতি তিনি করেছিলেন তার জন্য ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশী শত্রুরা তাঁকে জলদস্যু আখ্যা দিয়েছিল।তিনিই আধুনিক ভারতের প্রথম সফল নৌব্যক্তিত্ব যিনি আরবসাগরের বুকে বিদেশীদের আধিপত্য,ও দখলদারি ক্ষুন্ন করেছিলেন।

মহারাষ্ট্রের পুণে থেকে ছ'মাইল দূরে অংগারওয়াদি গ্রামের এক শঙ্কপাল ক্ষত্রিয় পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল ১৬৬৯ সালে।'বীর রাণা শঙ্ক' নামে এক ছোট রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। ১৬৭৪ সালে শিবাজির রাজ্যাভিষেকের পর থেকে কান্‌হোজির পিতা তুকোজি ছিলেন

সুবর্ণ দুর্গের দুর্গপাল,তাঁর অধীনে ছিল ২০০ সেনা।ছেলেবেলাটা কেটেছিল বাবার সঙ্গে সুবর্ণ দুর্গে, আর জলপথে বাবার নানা অভিযান দেখে।পরে এখানকারই কর্মী হয়েছিলেন তিনি প্রথমে।

প্রাচীন ভারতের রাজারা ও তাঁদের আনুগত্যপ্রাপ্ত বণিকেরা জলপথকে ব্যবহার করতেন প্রধানত বাণিজ্যবিস্তার ও ধনাগমের জন্য।(যদিও ব্যতিক্রম ছিলেন চোল রাজারা)।জলপথে যুদ্ধের প্রয়োজনের ভাবনা তাঁদের চিন্তাতেই ছিল না। তাই নৌবাহিনীও ছিল না। দাক্ষিণাত্যের মুসলিম শাসকেরা বা মুঘল শাসকেরাও নৌবাহিনী গঠনের চিন্তা করেননি। মুঘলরা এসেছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে স্থলপথে।

চিত্রটার বদল হতে শুরু করল পর্তুগিজদের ভারতে আগমনের পর,পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো জলপথেই প্রথম দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন।পর্তুগিজরা ক্রমে জলপথের উপর আধিপত্য কায়েম করে,ব্যাবসাবাণিজ্য করতে লাগল,ভারতের পশ্চিম সমুদ্রতট ধরে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করল।পরে এল অন্যান্য ইউরোপীয়রা, এল প্রবল ইংরেজ।

পশ্চিম ভারতের স্বাধীনচেতা শিবাজি মহারাজ প্রথম একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ১৬৫৪ সালে মহারাষ্ট্রের কল্যাণ জেলার কাছে সমুদ্রের এক খাড়ির মধ্যে একটি রণতরী রাখার ব্যবস্থা করলেন।তটরেখা ধরে বেশ কিছু নৌকেন্দ্র স্থাপনের চিন্তা করলেন। প্রথমে দুটি নৌবহর স্থাপন করলেন- নৌপ্রধান মৈনাক ভাণ্ডারী,ও দৌলত খান নামে দু'জনের অধীনে।মারাঠা নৌসেনাদের বেশির ভাগই ছিল কোঙ্কনী নাবিক। এছাড়াও ছিল ভাড়াটে সৈন্য। এদের বেশির ভাগই ছিল আবিসিনীয় ক্রীতদাস,যারা 'সিদ্দি' বলে পরিচিত ছিল।আর ছিল পর্তুগিজ ভাড়াটে সেনা। সিদ্দিরা একসময় মুঘল সম্রাটদের প্রশ্রয়ে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।কালে মারাঠদেরও সিদ্দিদের সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে হয়েছিল।শিবাজি পর্তুগিজদের যুদ্ধকৌশল রপ্ত করবার জন্য একজন পর্তুগিজ সেনানায়ককে ভাড়া করেছিলেন।পর্তুগিজদের কাছ থেকেই তাঁদের নৌবিদ্যার কারিগরি জ্ঞান ও কৌশল শিখেছিল মারাঠা নৌসেনারা। বিদেশী দক্ষ যোদ্ধাদের মাইনে দিয়ে রাখার রেওয়াজ চালু হওয়াতে মারাঠা সেনাবাহিনী স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের নানা নতুন কৌশল রপ্ত করেছিল।১৬৬৪ সালের সুরাটের যুদ্ধে মারাঠারা স্থলবাহিনীর সঙ্গে এই নৌবাহিনীও ব্যবহার করেছিল। শিবাজি ১৬৭৯ সালে খান্দেরি জয় করেছিলেন।পরিণামে সিদ্দিরা ও ইংরেজরা মারাঠাদের আক্রমণ করেছিল।ব্রিটিশ,সিদ্দি ও মুঘলরা বুঝেছিল শিবাজি শুধু স্থলে নয় জলযুদ্ধেও সমান পারদর্শী।শিবাজির অভিষেকের সময় শিবাজির নৌবহরে ছিল ৮৫টি 'গ্যালিভ্যাট' বা রণতরী(নৌকা),আর ৩টি 'গুরাব'বা পালতোলা যুদ্ধজাহাজ।

শিবাজির মৃত্যু হল ১৬৮০ সালের ৩রা এপ্রিল,রাজা হলেন জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভাজি।শক্তিশালী হলেও রাজ্যের সুশাসন অপেক্ষা বিলাসব্যসন, নৃত্যগীত, আমোদপ্রমোদ আর অত্যধিক পানপ্রিয়তা ছিল তাঁর দুর্বলতা। এছাড়া অত্যন্ত রুক্ষ স্বভাব,আর ক্রূঢ় প্রকৃতির ছিলেন। থাকতেন অধিকাংশ সময়ে রায়গড়ের দুর্গে আরামে।পারিবারিক দ্বন্দ্ব সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দিচ্ছিল।

তখন মুঘল সম্রাট আওরংজেব।তাঁর সঙ্গে আগে থেকেই শিবাজির বিবাদ ছিল। শিবাজির মৃত্যুতে মুঘল সরকারী নথিদার কাফি খাঁ লিখলেন,'পার্বত্য ইঁদুরটা নরকে গেল'। শুরু হল মারাঠা সাম্রাজ্যর ওপর নানা আক্রমণ।কান্হোজি তখন কোথায়?এগারো বছরের বালক তখন নিজেদের গ্রামের এক সংস্কৃত অধ্যাপকের গৃহে গুরুগৃহবাসী ছাত্র।সারা সকাল নিরম্বু উপবাস করে চলছে বৈদিক শাস্ত্রশিক্ষা,পুজাপাঠ,নিরর্থক অবোধ্য মন্ত্রপাঠে দেবার্চনা। নিত্যকার আহার্যে আমিষ বা তেল মশলার বালাই নেই, কৃচ্ছসাধনের চূড়ান্ত। মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠছেন স্বাধীনচেতা বালক,অধীর হয়ে ওঠেন প্রায়ই। মাঝেমাঝে বাবা আসেন দেখে যেতে, বাবার কাছে শোনেন রাজ্যের অবস্থা। চারদিকে দেশী ও বিদেশী শত্রু মারাঠা রাষ্ট্রশক্তিকে শেষ করতে উদ্যত। বাবারও নিরাপত্তা নেই।মারাঠা রাজ্যের যে চরম দুর্দিন সেকথা বোঝেন।মুঘলের আক্রমণ আর সিদ্দিদের আক্রমণে মারাঠাদের দুর্দিনে নিরপেক্ষ থেকে ইংরেজ ও পর্তুগিজরা লাভক্ষতির অঙ্ক কষে চলেছে।দুবছর কেটে গেল, বাবার শরীর ভালো নেই,অবসর নেবেন।মুঘলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মারাঠাশক্তি পর্তুগিজদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।এই সময় একদিন তের বছরের বালক কান্হোজি

রায়গড় চলে গেলেন,শম্ভাজির কাছে সেনাদলে যোগ দেবার আবেদন করলেন। কিশোর বালকের আর্জি মঞ্জুর হল।তবে সেনাদলে নয়,সুবর্ণ দুর্গের দুর্গরক্ষকের অধীন কর্মচারী হিসাবে কাজে যোগ দিলেন।

আওরঙজেব শম্ভাজিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনলেন না।বিজাপুরের সুলতানকে পরাজিত করে,মুখ ঘোরালেন মারাঠা রাজ্যের দিকে। শিবাজির রাজ্যের অনেকটাই ছিল বিজাপুরের সুলতানের থেকে দখল করে নেয়া।

মারাঠাদের দুর্বল প্রতিরোধ সহজেই দমন করলেন মুঘল সম্রাট।তিনি গুণে গুণে সব মারাঠা দুর্গগুলির দখল নিতে অগ্রসর হলেন।সুবর্ণ দুর্গ দখল করতে মুঘলের সহকারী সিদ্দিরা তিনদিক থেকে দুর্গকে ঘিরে অবরোধ করে রাখল।দুর্গ থেকে জল বা স্থল কোন পথেই বাইরে যাবার বা রসদের যোগান আনবার অবস্থা রইলনা।দুর্গাধ্যক্ষ অচলজি মোহিতে প্রতিরোধে না গিয়ে আপসের বার্তা পাঠালেন,সিদ্দিদের হাতে দুর্গ তুলে দেবার ব্যবস্থা হল।সাহসী, কৌশলী,উচ্চাকাঙ্খী ২০বছরের যুবক কান্‌হোজি সব দেখলেন। সেই মুহূর্তটা তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত মর্মবিদারক।

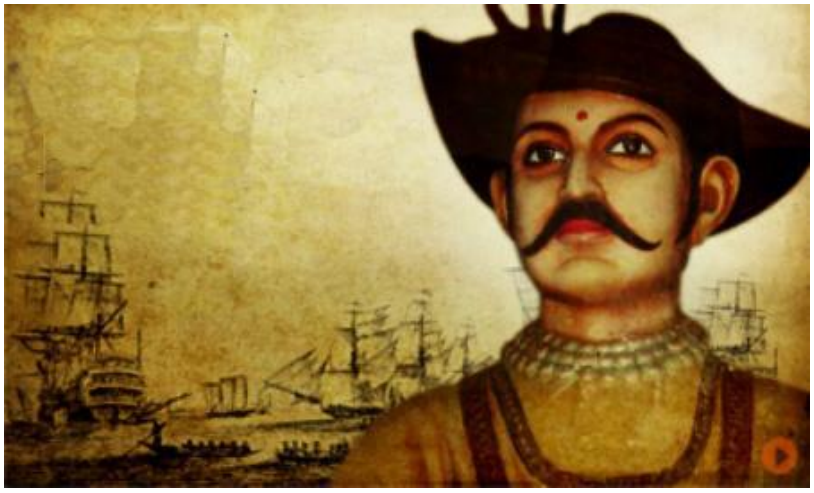
বিশ্বস্ত অনুচর, বাল্যবন্ধু বালাজি বিশ্বনাথ আর এক হিতাকাঙ্খী পণ্ডিত ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীকে দিয়ে গোপনে সুবর্ণ দুর্গ হাতছাড়া হবার খবর আর অচলজির আসন্ন আত্মসমর্পণের খবর পাঠালেন রাজা শম্ভাজির কাছে,রায়গড় দুর্গে। দুর্গরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার অনুমতি চাইলেন।তিনদিনের মধ্যে অনুমতি এল, রাতারাতি এক সেনাঅভ্যুত্থান ঘটল, অচলজি বন্দি হলেন,দুর্গের ভার চলে এল তাঁর হাতে।তাঁর অনুচর বালাজি ছিলেন চিপলামে সিদ্দিদের নিমক মহলের কেরানি, সেই সুবাদে সিদ্দিদের গতিবিধির সব খবরই পেয়ে যেতেন কান্‌হোজি। এমনই কৌশলী আর গোপন সংগঠক ছিলেন এই যুবক।

১৬৯৮ সালেই অবশ্য সাতারা দুর্গের প্রধান তাঁকে সরখেল বা দরিয়া-সারেঙ অর্থাৎ অ্যাডমিরাল নিযুক্ত করেছিলেন।তখন থেকেই তিনি আরবসাগরের তটরেখা ধরে বোম্বাই থেকে ভেঙ্গুরলা পর্যন্ত জলভাগের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠেছিলেন। শম্ভাজির মৃত্যু হ'ল ১৬৯০ সালে।মারাঠা নৌবহরের দায়িত্ব পুরোপুরি চলে এল কান্‌হোজির হাতে।এরপর থেকে চলল তাঁর নেতৃত্বে জলে স্থলে মারাঠা শক্তির উত্থান।যদিও কেন্দ্রীয় মারাঠা রাজত্ব তখন ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে।একা কুম্ভের নকল বুঁদির গড় রক্ষার মত কান্‌হোজি একাই রক্ষা করে চললেন পশ্চিম সমুদ্রের দখলদারি।

কাজটা খুবই জটিল ছিল। তাঁকে একসঙ্গে সিদ্দি,মুঘল আর ইংরেজ এই ত্রিশক্তির জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হয়েছে। কখনও হারতে হয়নি তাকে। তিনি প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বানিজ্যপোতগুলিকে আক্রমণ করতে শুরু করেন, সেগুলির সামগ্রীর দখল নিতেন, নাহলে বিপুল অর্থ আদায় করে সেগুলি ছাড়তেন।অনেক বিদেশী শত্রুকে দাবিয়ে রাখতেন তিনি।এদের মধ্যে ইংরেজদের ঘাঁটি ছিল বোম্বাইতে,পর্তুগিজদের ঘাঁটি ছিল গোয়াতে,জাঞ্জিরাতে ছিল সিদ্দিদের ঘাঁটি,ডাচদের ঘাঁটি ছিল ভেঙ্গুরলাতে।তিনি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন ইংরেজ বানিয়াদের। ক্রমে সকল বিদেশীরাই তাঁকে মান্য করতে শুরু করেছিল।

একের পর এক জলপথে তাঁর জয়,বিদেশী শক্তিকে পর্যুদস্ত করা,তাঁদের স্বার্থহানি ঘটানো আর মারাঠাদের সম্পত্তি দখলে রাখা,আদিকাল থেকে ভারতের সামুদ্রিক কার্যকলাপের ইতিহাসে এ এক নতুন ঘটনা।গল্প,কাহিনীর মত।

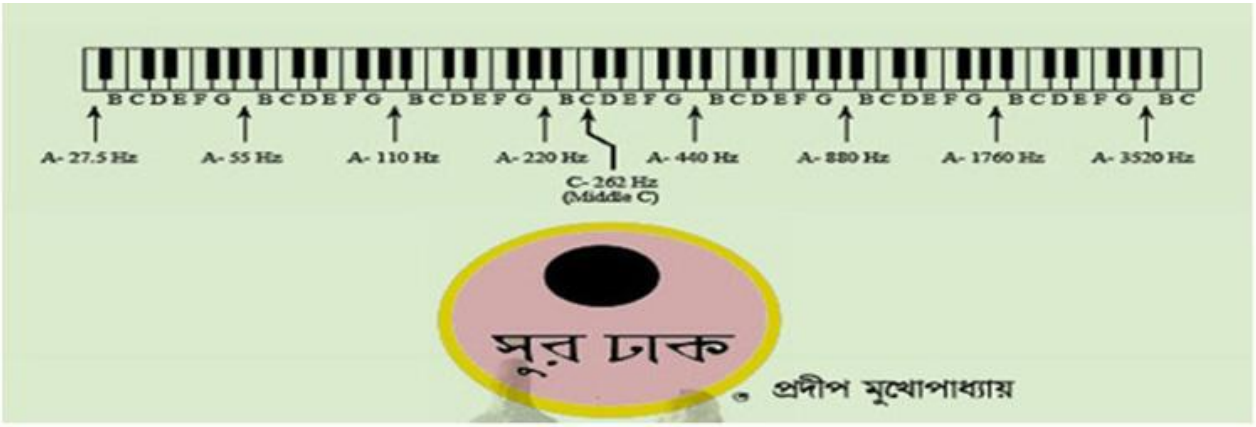
আংরে তাঁর শ্রেষ্ঠ নৌবহরের দায়িত্বে রাখতেন রণকুশল ইউরোপীয়দের-প্রধানত ডাচদের।লোক চিনতে ভুল করতেন না তিনি। একজন সুদক্ষ জামাইকান ও জেমস প্লানটেন নামে এক জলদস্যুকেও নিযুক্ত করেছিলেন নিজের সেনাদলে।তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন-প্রধান গোলাবাজের দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। কান্‌হোজির দখলে থাকা কান্ধেরি দ্বীপের দখল নিতে বিফল হয়েছিলেন বলে যে ম্যানুয়েল দ্য ক্যাস্ত্রোকে ইংরেজরা বিশ্বাসঘাতক বলে বিতাড়িত করেছিল তাঁকেই তিনি নিজের বহরে কাজে লাগিয়েছিলেন।



১৬৯৮ সালে বিজয়গড় তালুকে বিজয়দুর্গে প্রথম সামরিক ঘাঁটিটি স্থাপন করেন তিনি। কোলাবাতে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। বন্দরে আসা সমস্ত বিদেশী বাণিজ্যতরী থেকে কর আদায় শুরু করেছিলেন আলিবাগ নৌঘাঁটি থেকে। ১৭২৪ সালে মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলায় পুরন্দরগড় নামে একটি বন্দর স্থাপন করেছিলেন,যেখান থেকে জলসীমানা পাহারা দেয়া হত।

১৭০২ সালে প্রথম ছয়জন ইংরেজসহ একটি ছোট জাহাজ আটক করেন কোচিন বন্দরে।এরপর থেকে ১৭২৯ সাল পর্যন্ত ১৪টি সফল অভিযান করেছেন বিদেশীদের বিরুদ্ধে, আগ্রাসনকারী বানিয়াদের জাহাজ আটক করেছেন,আদায় করেছেন বহু অর্থ যা দিয়ে শক্তিশালী করেছেন দেশে জলসীমা সুরক্ষার ব্যবস্থা।দেশের আয় বৃদ্ধি করেছেন।ঔপনিবেশিক ইংরেজদের জলেস্থলে নাস্তানাবুদ করেছেন আমৃত্যু। তাঁর বিজয়রথ থেমেছে ১৭২৯ সালে পালগড় দুর্গ জয় করে। ১৭২৩ সালে বোম্বাইয়ের ইংরেজ গভর্নর বুন ব্রিটেনে ফিরে যাওয়ার পর থেকে ইংরেজ ও আংরের মধ্যে সম্পর্ক খানিকটা শান্ত হয়েছিল, যা বজায় ছিল ১৭২৯ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত।

আরবসাগর কাঁপানো এই মহানৌবীরের সমস্ত কার্যকলাপের ধারাবিবরণী দিতে গেলে অনেক লিখতে হবে। তবে মারাঠার সেই দুর্দিনে বিদেশী শক্তির শোষণ থেকে ভারতের পশ্চিমদ্বার রক্ষায় তাঁর যে ভূমিকা ছিল তা একজন দেশপ্রেমিকেরই হতে পারে, একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। তাঁর একক প্রচেষ্ঠার কাহিনী পাঠ করলেই এই বীরের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যাবে। পিনাকী চ্যাটার্জীরা তাঁর নামে নিজেদের অভিযানের নৌকার নাম দিয়েছিলেন-সে নাম দেওয়া সার্থক,কান্হোজি সারা জীবনে কোন অভিযানে হারেননি।তাঁর পিতৃদত্ত নাম হয়ত কাহ্নাজী (তা থেকেই উচ্চারণ ফারাকে হয়েছে কান্হোজি)-অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু মারাঠীতে আংরে কথার অর্থ নাও বা নৌকা। সত্যি চলন্ত নৌকার মতই তিনিও জলেই চলেছেন আজীবন।



হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের দশটি ঠাট নিয়ে আলোচনা করার সময় মনে রাখতে হবে ঠাটগুলির প্রত্যেকটির নামে এক একটি রাগ থাকলেও রাগ ঠাটের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটি সাঙ্গীতিক রূপ। ঠাটের সাথে পাশ্চাত্যের স্কেলের মিল থাকলেও সেই একই ঠাটের একই নামের রাগের সাথে পাশ্চাত্যের ওই তুলনীয় স্কেলের মিল খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত। এই আসাবরী ঠাটের আসাবরী রাগের ব্যাপারেই দেখ যদিও ঠাট বা স্কেল অনুযায়ী শুধু আরোহণ পর্বে এর চরিত্র হল সা, রে, জ্ঞা (কোমল গা), মা, পা, দা(কোমল ধা), ণি(কোমল নি) র্স। এটুকুকে বড়জোর আসাবরী রাগের কাঠামো বলা যেতে পারে যার অস্তিত্ব পাঠ্য বইয়ের বাইরে কোথাও নেই। সাথে দেওয়া লিঙ্ক-এ এই ঠাটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ই-ফ্ল্যাট মেজর স্কেলটি শুনে দেখ। আসাবরী রাগ পরিবেশনের সময় স্বর প্রয়োগ হয় রে থেকে সোজা মা - তে, তারপর নেমে আসে কোমল গা-তে, আবার আরোহণের সময় কোমল নি(ণ) কে ছুঁয়ে স্বর নামে পা -তে, আবার তার(চড়া) সা-তে পৌঁছে বারবার নেমে আসে কোমল ধা(দ) বা পা স্বরে। এইভাবে আরোহণ আর অবরোহণের বিশিষ্ট ছকটি এই রাগটিকে স্কেল বা ঠাটের ধারণা থেকে, এমনকি একই স্বর লাগে এমন অন্যান্য রাগ থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। এটা সব রাগের ক্ষেত্রেই সত্যি। আরও একটু গভীরে গেলে দেখা যাবে স্বরপ্রয়োগের ছক এক হওয়া সত্বেও একটা রাগ আর একটা রাগ থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে কোন কোন স্বরের শ্রুতিস্বরের তারতম্যে - যে তফাৎ এখনকার অনেকেরই অজানা আর পাশ্চাত্য স্কেল নির্ভর কোন বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে তা প্রকাশ করাও প্রায় অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে বারবার বলা সত্বেও আবার বলতে হয় হারমোনিয়ম জাতীয় অনড় কম্পাঙ্কের বাদ্যযন্ত্রের সাথে ভারতীয় রাগসঙ্গীত পরিবেশন করতে হলে গায়ক বা বাদককে এই অপূর্ণতাটি মেনে নিয়েই চলতে হয় আর তাতে রাগের প্রতি, আর যাই হোক, অনুরাগ প্রকাশের কোন উপায় থাকে না।

আসাবরী ঠাটের জনক বা আশ্রয় রাগ আসাবরী। এই ঠাটে গা ও নি বর্জিত স্বর। দিনের দ্বিতীয় প্রহরে (সকালের দিকে একটু বেলায় - ৯টা থেকে ১২ টা) পরিবেশণযোগ্য এই রাগটির আরোহে জ্ঞ ও দ স্বর দুটি বর্জিত থাকায় আরোহণে পাঁচটি স্বর আর অবরোহণে সাতটি স্বর প্রয়োগ হয়। তাই এটি ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতির রাগ।

আরোহণ - স, র, ম, প, দ, র্স

অবরোহণ - র্স, ণ, দ, প, ম, জ্ঞ, র, স।

রাগটির বাদী স্বর - কোমল ধা (দ), সম্বাদী স্বর- কোমল গা (জ্ঞ)।

পকড় - র ম প, ণ দ প ।

ম প দ প, জ্ঞ র স।

কর্ণাটকি পদ্ধতির নটভৈরবী রাগম্ এর আরোহণ সা, র২, গ২, ম১, প, ধ১ ন২ র্স, আর অবরোহণ -র্স, ন২, ধ১, প, ম১, গ২, র২, স। এর সাথে আসাবরীর মিল সাথের লিঙ্ক-এ শুনে দেখ।

রাগটি বেশ প্রাচীন। শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকরেও উল্লেখ আছে এই রাগটির। আসাবরীর আরেকটি রূপ কোমল ঋষভ আসাবরী (যাতে শুদ্ধ রে'র বদলে শুধুমাত্র কোমল রে ব্যবহার হয়) ভৈরবী ঠাটের অন্তর্গত। এটিই এই রাগের প্রাচীন রূপ। আবার রে স্বরটির শুদ্ধ ও কোমল দুটিই প্রয়োগ হয় এমন একটি রূপও এর আছে। আমরা যে রূপটি নিয়ে আলোচনা করছি, সেটি শুধু শুদ্ধ রে সম্বলিত রূপ। এই আসাবরী ভাতখন্ডেজী গোয়ালিয়র ঘরাণার হদ্দু খাঁ হস্সু খাঁ এবং নত্থু খাঁর গায়ন থেকে সংগ্রহ করেছেন। আলাউদ্দিন খাঁ একবার বলেছিলেন উনি ওয়াজির খাঁ সাহেবের দুই নি ব্যবহার করা আসাবরী শুনেছেন।

আরোহণে কোমল ণ প্রয়োগে এটি জৌনপুরীর মত লাগবে। এই কারণে অনেকে আসাবরী কে শুদ্ধ ঋষভ আসাবরীও বলে থাকেন। তবে আসাবরী (শুদ্ধ ঋষভ) আর জৌনপুরীর মধ্যে পার্থক্যও আছে এরকম –

আসাবরী	জৌনপুরী
আরোহে জ্ঞ ও ণ বর্জিত তাই ঔড়ব-সম্পূর্ণ	শুধু জ্ঞ বর্জিত বলে ষাড়ব-সম্পূর্ণ
ন্যাস স্বর -পঞ্চম (পদ মপ জ্ঞ-রস, রমপ)	ন্যস স্বর -মধ্যম (পদ, মপরম)
ধীর স্থির গতি	দ্রুত গতি, বক্র চলন
পূর্বাঙ্গপ্রধান	উত্তরাঙ্গপ্রধান
কোমল নিষাদের মৃদু প্রয়োগ	কোমল নিষাদ বেশ জোরদার
বিষাদের ভাব প্রধান	উচ্ছলতা প্রধান
কোমল ধৈবতের আন্দোলিত প্রয়োগ	কোমল ধৈবতে আন্দোলন নেই

রাগটির নামের উৎপত্তি নিয়ে কয়েকটি ভিন্ন মতের একটি হল এটি আশা ও ওরি(ভরি) অর্থাৎ প্রিয়জনের আসার অপেক্ষার সময়কার মনের ভাবের ছবি। আরেকটি হল অসি(সাপ) ও অরি (শত্রু) অর্থাৎ সাপুড়ের সুর। এই দ্বিতীয় মতটির প্রতিফলন দেখা যায় মধ্যযুগের কিছু মিনিয়েচার ছবিতে - যার একটি এই লেখার সাথে দেওয়া হল।

পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ভাতখন্ডে'র 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি - ক্রমিক পুস্তক মালিকা'য় কল্পদ্রুমাঙ্কুর, চন্দ্রিকাসার, রাগমঞ্জর্য়াম ইত্যাদি প্রাচীন বইগুলিতে সর্বজনপ্রিয় এই রাগটির বর্ণনা অনুযায়ী এটি মৃদুগামিনী, আরোহণে জ্ঞ, ণ বর্জিতা, অবরোহণে পূর্ণা, দ ও জ্ঞ বাদী সম্বাদী, চলন - রম পণ দপ দর্স, ণদ পম পজ্ঞ রস।

সাথে দেওয়া অডিও লিঙ্ক এ প্রথমে 'বড়ি বহেন' সিনেমায় ১৯৪৯ সালে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'চলে যানা নেহি নয়না মিলাকে', তারপরে ১৯৬৬ তে 'দো বদন' ছবিতে গাওয়া 'লো আ গয়ি উনকি ইয়াদ', কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত 'কার বাঁশী নিশিভোরে'র পর একটি কর্ণাটকি গীতের অংশ, তারপর ই-ফ্ল্যাট মেজর স্কেল ও ওই স্কেলে বিঠোফেন-এর টেন্থ স্ট্রিং কোয়ার্টেট ও শ্যুবার্ট এর পিয়ানো ট্রায়ো। এরপর DAW সফ্টওয়্যারে বাজানো ত্রিতাল মধ্যলয়ে ভাতখন্ডেজীর বইটি থেকে নেওয়া স্বরলিপি অনুযায়ী 'আঁখিয়া লাগি রহত নিশদিন'। শেষ অংশে গোয়ালিয়র ঘরাণার আখতার আলি খাঁ ও জাকির আলি খাঁর বিলম্বিত খেয়াল ও আলি আকবর খাঁর সরোদে রাগ আসাবরী।

https://drive.google.com/open?id=0BxIqBj86OOMtMzhmNlo4Y2F6elk

https://drive.google.com/open?id=0BxIqBj86OOMtd2UtZTJSRkRvb1E

https://drive.google.com/file/d/0BxIqBj86OOMtMzhmNlo4Y2F6elk/view?usp=sharing

'আঁখিয়া লাগি রহত নিশদিন' র পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর ভাতখন্ডেজীর স্বরলিপি নীচে দেওয়া হল।

আঁখিয়া লাগি রহত নিশদিন
প্যারে তিহারে দেখন কাঁহি।
ঘড়িপল ছিন মোহে যুগসী বীতত
নিশদিন চটপটি লাগ রহত মহিঁ।

ত্রিতাল মধ্যলয়

স্থায়ী

+	২	৩	৪	২	৬	৭	৮	০	১০	১১	১২	৩	১৪	১৫	১৬
												ণম	প	প	ণস
												আঁ	খি	য়াঁ	-
ণধ	-	প	-	ণদ	ম	মদণদ	পমপ	মজ্ঞ	-	ঋর	স				
লা	-	গি	-	র	হ্	ত	নি	শ	-	দি	ন				

												জ্ঞর	স	স	র
												প্যা	-	রে	তি
নধ	-প	স	-	মর	-ম	মদণদ	পমপ	মজ্ঞ	-	ঋর	-স				
হা	-	রে	-	দে	-	খ	ন	কাঁ	-	হি	-				

অন্তরা

+	২	৩	৪	২	৬	৭	৮	০	১০	১১	১২	৩	১৪	১৫	১৬
												ণম	প	নধ	নধ
												ঘ	ড়ি	প	ল
স	স	স	স	র	গ	ঋর	-স	ণস	-রণ	ধ	প	মপ	পগ	সর	স
ছি	ন	মো	হে	য়ু	গ	সী	-	বী	-	ত	ত	নি	শ	দি	ন
র	স	ণধ	প	ম	-প	ণদণদ	পমপ	মজ্ঞ	জ্ঞ	ঋর	স				
চ	ট	প	টি	লা	-	গ	র	হ্	ত	ম	হি				

স্বরমালিকা

স্থায়ী

+	২	৩	৪	২	৬	৭	৮	০	১০	১১	১২	৩	১৪	১৫	১৬
												র	ম	প	পণ
ণদ	দ	প	প	ম	প	দ	প	মজ্ঞ	-	র	স				
												র	স	ণদ্	প্
ম্	প্	দ্	স	র	ম	প	দ	মজ্ঞ	-	র	স				

অন্তরা

+	২	৩	৪	২	৬	৭	৮	০	১০	১১	১২	৩	১৪	১৫	১৬
												ম	প	ণদ	-
র্স	-	র্র	স	ণদ	-	র্স	র্জ্ঞ	র্র	র্স	ণদ	প				
												প	পর্জ্ঞ	র্র	র্স
র্র	র্স	ণদ	প	ম	প	দ	প	মজ্ঞ	-	র	স				

রাগ আসাবরীর একটি চিত্ররূপ



অসাধারণ একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি [কৃতজ্ঞতা - রাজন পাররিকার আর্কাইভ]



Group photograph with Indian President Rajendra Prasad (c. 1950)
Front row, sitting (l-r): Unknown, Nissar Hussain Khan, Ahmad Jan Thirakhwa, Hafiz Ali Khan, Mushtaq Hussain Khan, Omkarnath Thakur, Rajendra Prasad (First President of India), Kesarbai Kerkar, Allauddin Khan, Kanthe Maharaj, rest in the row unknown.
Second row (l-r): Ghulam Mustafa Khan, unknown, unknown, Keramatullah Khan, Radhika Mohan Moitra, Illayaz Khan, Bismillah Khan, Kishan Maharaj, unknown, Ravi Shankar, Ali Akbar Khan, Vilayat Khan, Narayanrao Vyas, Vinayakrao Patwardhan, D.V. Paluskar.
Third row (l-r): First four not known, Ghulam Sabir Khan, S.N. Ratanjankar, Gyan Prakash Ghosh, next four unknown.
Fourth row (l-r): Unknown, Vinaychandra Maudgalya, next three unknown.

লিজে মাইটনার

উমা ভট্টাচার্য



লিজে মাইটনার ছিলেন একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ,যাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে আমেরিকার মানহাটান প্রজেক্টের বিজ্ঞানীরা এ্যাটম বোমা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন,আর বিশ্ব রাজনীতির ক্ষমতার চিত্রটাই পাল্টে গিয়েছিল।পরমাণু বোমার আঘাতে ছোট্ট দেশ নিপ্পনের গুরুত্বপূর্ণ আর বর্ধিষ্ণু শহর হিরোশিমার মৃত্যু হয়েছিল, আর সেই সঙ্গে শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামক প্রলয়কান্ড। যে ব্রহ্মাস্ত্রের বিপুল ধ্বংসাত্মক সাফল্য দেখে নোবেল কমিটি তড়িঘড়ি ১৯৪৪ সালের জন্য নির্দিষ্ট রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার ১৯৪৫ সালে তুলে দিয়েছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী অটো হানের হাতে।কিন্তু বাদ পড়েছিলেন তাঁর দীর্ঘদিনের সহগবেষক,পরামর্শদাত্রী ও পরমাণু বোমা তৈরির ফর্মুলা আবিষ্কারক লিজে মাইটনার।

হ্যাঁ এমন অবিচারই ঘটেছিল নোবেলের ইতিহাসে। যে আবিষ্কারের জননী ছিলেন জন্মসূত্রে ইহুদি অস্ট্রিয়ান মহিলা বিজ্ঞানি লিজে মাইটনার, তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার থেকে।অবশ্য তাঁর অপরাধ ছিল তিনি ছিলেন জন্মসূত্রে ইহুদি, হিটলারের বর্ণবিদ্বেষী জার্মানিতে তিনি ছিলেন অপাংক্তেয়। তিনি ভিয়েনায় থেকে তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য ১৯০৮ সালে নিজের ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।তবুও বাঁচতে পারেননি নাৎসিদের হাত থেকে। ১৯০৫ সালে পি এইড করার পর থেকে ত্রিশ বছর তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বার্লিনের গবেষণাগার যেখানে শেষ চার বছর ধরে অটো হানের সঙ্গে যুগ্মভাবে পরমাণু নিয়ে সফল গবেষণা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দির তিনের দশকে জার্মানি অস্ট্রিয়া দখল করে অস্ট্রিয়াকে জার্মান আইনের আওতায় নিয়ে এসেছিল আর সমস্ত বর্ণইহুদিদের জীবনযাত্রা অসহনীয় করে তুলেছিল।এই অবস্থায় অর্ধসমাপ্ত কাজ ফেলে রেখে বাধ্য হয়েই তিনি চলে গিয়েছিলেন স্টকহোমের গবেষণাগারে।এদিকে বার্লিন গবেষণাগারে লিজে মাইটনারের অনুপস্থিতে অটো হান আর তাঁর অধস্তন গবেষক স্ট্রাসম্যান বুঝতেই পারছিলেন না যে তাঁরা কী আবিষ্কার করছেন বারবার। স্টকহোম থেকেই প্রায় প্রত্যহ চিঠি লিখে হান-স্ট্র্যাসমান জুটিকে গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন মাইটনার।অবশেষে অটো হান তাঁর সাথে গোপনে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন সেই পরীক্ষার বিষয়টি বুঝে নিতে।আর সেই সাক্ষাৎকারে লিজে মাইটনার তাঁকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন

গবেষণার প্রক্রিয়াটিকে,যা অটো হান ধরতে পারছিলেন না। সেই পরামর্শের মধ্যেই মিলেছিল অটো হানের সাফল্যের সূত্র, আবিষ্কার হয়েছিল পরমাণু বোমা।কিন্তু তখন তো মাইটনার আর বার্লিন গবেষণাগারের সদস্য গবেষক নন।

লিজে মাইটনারের নোবেল না পাওয়ার পিছনে আর একটি বড় কারণ ১৯৩৯ সালে যখন মানহাটান প্রজেক্ট-পরমাণু বোমার সূতিকাগারে তিনি একজন বিজ্ঞানী হিসাবে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন বিজ্ঞানের এত বড় একটা আবিষ্কারকে গণহত্যার অস্ত্র বানানোর কাজে লাগাতে তিনি রাজি নন। জনকল্যানমকামী মাইটনার সেই প্রজেক্টে যোগ দেবার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নোবেল পেয়েছিলেন বিজ্ঞানী অটো হান। তিনি সগর্বে তা গ্রহণ করেছিলেন ও লিজে মাইটনারের অবদান বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করেছিলেন।বলেছিলেন এই আবিষ্কারের সময় মাইটনার আর বার্লিন গবেষণাগারের সদস্য ছিলেন না। তাছাড়া মাইটনার তো পদার্থবিজ্ঞানী,পরমাণু বোমার সূত্র আবিষ্কারে পদার্থবিদ্যার অবদান নগণ্য। নোবেল কমিটিও বুঝতে ভুল করেছিলেন যে পরমাণু বোমা আবিষ্কারে পদার্থবিদ্যার অবদান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।সেই সূত্র আবিষ্কার শুধুমাত্র কেমিস্ট্রির বিষয় নয় বরং ব্যাপারটি ইন্টারডিসিপ্লিনারি-পরস্পরনির্ভর সহযোগী। গবেষণার শুরু কেমিস্ট্রি দিয়ে, পরীক্ষানিরীক্ষায়-এক্সপেরিমেণ্টে কেমিস্ট্রির ভূমিকা মুখ্য হলেও তার চরিত্র বুঝতে দরকার পদার্থবিদ্যার, সে কাজটিই করেছিলেন মাইটনার ও তাঁর বোনপো বিজ্ঞানী অটো রবার্ট ফ্রিৎজ।

নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে কী এমন কাজ করেছিলেন লিজে মাইটনার? তার আগে দেখা যাক আবিষ্কার কাকে বলে? মাইটনারের প্রতি অবিচার হয়েছিল একথা যেমন বিজ্ঞানীদের জানা তেমনি আবিষ্কার বলতে কী বোঝায় এই প্রশ্নটিও তাঁদের ভাবিয়েছিল।বিজ্ঞান জগতে নতুন কোন জিনিস বা বিষয়ের খোঁজ পাওয়া গেলেই কি তাকে আবিষ্কার বলা চলে?নাকি সেই জিনিস,বিষয় বা ঘটনা আসলে কী,সেটার ধাপগুলিকে বুঝতে পারাকে আবিষ্কার বলে? আগে বোঝা তারপর সেটিকে কাজে লাগানোর প্রশ্ন।কোন ঘটনা ঘটানো হল, অথচ সেটা কী, কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পারছেন না গবেষক তখন তাকে আবিষ্কার বলা চলে না। কারণ না বুঝতে পারলে সেই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগানোর প্রশ্নই ওঠে না। এমনটিই হয়েছিল অটো হানের গবেষণার ক্ষেত্রে। তিনি দীর্ঘদিনের সহগবেষক লিজে মাইটনারের পরামর্শমত পরীক্ষাগারে গবেষণা চালিয়ে যা আবিষ্কার করেছিলেন তা কী সেটা অটো হান বা তাঁর সহকারী বুঝতে পারেন নি। সেই প্রশ্নের সমাধান করে দিলেন অসাধারণ মেধার তাত্ত্বিক পদার্থবিদ লিজে মাইটনার।বার্লিনের গবেষণাগারে এক্সপেরিমেন্টের সময় উদ্ভূত নানা জটিল সমস্যার(পাজ্‌লের)সমাধানও তিনিই করতেন।

মাইটনার, অটো হানদের পরীক্ষালব্ধ বিষয়ের প্রক্রিয়াটির নাম দিলেন ‘ফিশন’। তিন অক্ষরের একটি শব্দ, জীববিদ্যার শব্দকোষ থেকে ধার করে নেওয়া।যার অর্থ নিউক্লিয়াসের কোষ বিভাজনের প্রক্রিয়া। জীববিদ্যায় সেই প্রক্রিয়ার ফলে প্রাণীকোষ বিভাজিত হতে থাকে এক থেকে দুই,দুই থেকে চার, চার থেকে আট এই নিয়মে আর বস্তুটির প্রসারণ ঘটে। পরমাণু গবেষণার ক্ষেত্রে এই ‘ফিশন’বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত করে।নিউট্রাল চার্জ বিশিষ্ট নিউট্রন কণা দিয়ে নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট ইউরেনিয়ামকে আঘাত করলে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন ঘটে।এই প্রক্রিয়াকে লিজে মাইটনার বললেন ‘ফিশন’(নামটি অবশ্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন লিজের বোনপো বিজ্ঞানী ফ্রিৎজ’)।মাইটনার বললেন ‘ফিশন’ আঘাতের ধাক্কার সরাসরি ফল নয়, নিউট্রনের ধাক্কায় ইউরেনিয়ামের ভিতরকার পজেটিভ চার্জবিশিষ্ট নিউক্লিয়াসের অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়,এই অস্থিরতা বৃদ্ধির পরিণাম হচ্ছে ‘ফিশন’। এর ফলে ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াসটি দু’ভাগে ভেঙে যায়,সে সময় বিপুল পরিমাণে শক্তি নির্গত হয়,আর সামান্য পরিমাণ পদার্থ বিনষ্ট হয়।পরমাণু থেকে শক্তি মানুষের হাতে তুলে দিল ‘ফিশন’,আবিষ্কৃত হল পরমাণু বোমা যা ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হল আর আবিষ্কৃত হল পারমাণবিক বিদ্যুৎ যা মানুষের কল্যাণে লাগতে পারে।

বার্লিনের গবেষণাগারে বারবার এক্সপেরিমেন্ট করে আবিষ্কারটি ঘটালেও কেন এমনটি হচ্ছে সে বিষয়টি বুঝতেই পারেননি হান।তাঁর কাছে যে বিষয়টি সমস্যাজনক ছিল আগের চিঠিতে তিনি তা লিখেছিলেন লিজে মাইটনারকে। তাঁরা নিউট্রন কণা দিয়ে ইউরেনিয়ামকে আঘাত করে দেখেছিলেন যেখানে ভারী মৌল নির্গত হওয়ার কথা সেখানে নির্গত হচ্ছে অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা বেরিয়াম,যা কেমিস্ট্রির নিয়মে তাঁরা মানতে পারছেন না।চিঠি লিখে এই সমস্যার যথাযোগ্য সমাধান চেয়েছিলেন মাইটনারের কাছে ।তখন মাইটনার আল্পস পর্বতের এক স্কি-রিসর্টে ছুটি কাটাচ্ছেন,সঙ্গী বিজ্ঞানী বোনপো অটো রবার্ট ফ্রিৎজ।তাঁকে এ বিষয়ে নিজের ভাবনা জানালেন।নিউট্রনের

আঘাতে ইউরেনিয়ামের পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙে তার কাছাকাছি ওজনের মৌল তৈরি করছে না,বদলে দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে।একটা বেরিয়াম আর একটা ক্রিপ্টন। কীভাবে ইউরেনিয়ামের পরমাণুর নিউক্লিয়াস দু'টুকরো হচ্ছে সে ব্যাখ্যাতেও পৌঁছুলেন তিনি।নীল্‌স্‌ বোরের আবিষ্কৃত (পরমাণুর নিউক্লিয়াসের)'লিকুইড ড্রপ' নামক গাণিতিক মডেলের সাহায্য নিলেন।চলার পথেই এক টুকরো কাগজ কুড়িয়ে নিলেন রাস্তা থেকে, রাস্তার পাশে এক গাছের তলায় বসেই সমাধান কষলেন সেই সমস্যার।ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে তুলনা করলেন গোলাকার তরল বিন্দুর সঙ্গে।সমাধানে লিখলেন ইউরেনিয়ামের পরমাণু নিউট্রনের আঘাতে সম্প্রসারিত হয় ও ঘটনাক্রমে ইউরেনিয়ামের গোলাকার নিউক্লিয়াসটি দুটি অপেক্ষাকৃত 'ছোট্ট ফোঁটায়' ভেঙে যায়।সেটাই হয়েছিল অটো হানের এক্সপেরিমেন্টে। সেখানেও ইউরেনিয়ামের পরমাণু ভেঙে যাচ্ছিল অতি হাল্‌কা বেরিয়াম ও ক্রিপটন পরমাণুতে, আর খানিকটা নিউট্রন ও বিপুল পরিমাণে শক্তি নির্গত হচ্ছিল, পরিবর্তে নগণ্য পরিমাণ পদার্থের ক্ষয় হচ্ছিল। মাইটনার ভাবলেন, কি করে এত অল্প পদার্থের ক্ষয়ে এত বিপুল শক্তির নির্গমণ ঘটছে?এই বিষয়টাও ধরতে পারেন নি অটো হান ও তাঁর সহকারী।মাইটনার এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে সাহায্য নিলেন আইনস্টাইনের যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক ফর্মূলা বা সমীকরণের।$E=mc^2$ অর্থাৎ সামান্য পদার্থ=বিপুল শক্তি এই সমীকরণ অনুসারে অতি সামান্য পরিমান পদার্থের ক্ষয়ে উৎপন্ন হচ্ছে বিপুল পরিমাণ শক্তি বা এনার্জি।মিলে গেল পরমাণু বোমা আর পারমাণবিক বিদ্যুৎ তৈরির ফর্মূলা।পদার্থের এই শক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়ার নাম দিলেন 'ফিশন'।তিনি চিঠিতে অটো হানকে নির্দেশ দিলেন পরীক্ষাগারে পরীক্ষাটি আবার করে দেখতে। এবারেও তাঁদের মিলল বেরিয়াম।চিঠিতে জানালেন মাইটনারকে তাঁদের পরীক্ষায় এক ভয়ঙ্কর ফল মিলেছে,যার ব্যাখ্যা চান। দেখা করতে চাইলেন মাইটনারের সাথে।ততদিনে মাইটনার সমস্যাটির সমাধান করে ফেলেছেন।

১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি সময়। মাইটনার তখন থাকেন নিরপেক্ষ দেশ সুইডেনের স্টকহোমে। ইহুদি বিজ্ঞানী মাইটনারের সঙ্গে অতি গোপনে দেখা করতে এলেন অটো হান,কারণ জার্মান বিজ্ঞানীর এই সাক্ষাতের বিষয়টি হিটলারের চরেরা জানলে আর রক্ষা থাকবে না। ১৩ই নভেম্বর ১৯৩৮ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে অটো হান দেখা করতে এলেন। বিজ্ঞানী নীলস্‌ বোরের গবেষণাগারের কনফারেন্স রুমে, অতিশয় গোপনে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। অটো হান জানালেন তাঁর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলের কথা।মাইটনার বললেন ওঁদের অনুমানে ভুল আছে।তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন নিজের ব্যাখ্যা। অটো হান ফিরে এলেন বার্লিনের গবেষণাগারে। এবারের পরীক্ষায় ইপ্সিত ফল মিলল। ১৯৩৮ সালেই 'নেচার' পত্রিকায় লিজে মাইটনার ফিশন নিয়ে তাঁর গবেষণার ব্যাখা বিস্তৃতভাবে লিখেছিলেন।'ফিশন' যে বিপুল পরিমাণ শক্তির উৎস তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা না করলেও তার আভাস দিয়ে রেখেছিলেন তাঁর লেখা সেই পেপারে।তিনি লিখেছিলেন ১ গ্রাম ইউরেনিয়ামের ফিশন যে পরিমাণ তাপ(শক্তি)নির্গত করবে,তা পেতে ১০,০০০ কিলোগ্রাম কয়লা পোড়াতে হবে।এ সব জানার পরেও নোবেল কমিটি ভুল করেছিল নাকি ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে এ প্রশ্ন আজ আর করে লাভ নেই।

আমেরিকায় তখন চলছিল পরমাণু বোমা বানানোর ভাবনা।মানহাটান প্রজেক্টের কর্তৃপক্ষ লুফে নিলেন অটো হানকে।১৯৪৩ সালে 'ফিশন' প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে আমেরিকা যখন অ্যাটম বোমা বানানোর প্রকল্প তৈরি করেছে তখন সেই প্রকল্পে যোগ দিতে তাঁরা ডেকেছিলেন লিজে মাইটনারকে, কিন্তু মানুষের অকল্যাণের জন্য আহুত এই যজ্ঞে তিনি যোগ দিলেন না,লিখলেন "বিজ্ঞানের এমন চমৎকার আবিষ্কারকে ঘৃণ্য কাজে ব্যবহারে আমার সায় নেই।"

ইউরোপ ও আমেরিকার নানা গবেষণাগারে সে সময় পরমাণুর অন্তরস্থিত নিউট্রন, প্রোটন, ইলেক্ট্রন, আর আইসোটোপ-তেজস্ক্রিয় মৌল নিয়ে নানা গবেষণা চলছিল। লিজ্‌ ও হানের কাজও চলছিল পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে। যে সাফল্য এল লিজে মাইটনারের আবিষ্কারে, যে আবিষ্কারের ফলে পরমাণু রূপান্তরিত হল পরমাণু বোমায়, যার হাত ধরে ১৯৪৪ সালের জন্য নির্দিষ্ট নোবেল পুরস্কার পেলেন অটো হান, ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা নাগাসাকি ধ্বংসের পর। সেই আবিষ্কারের সম্মান লাভে বঞ্চিত হলেন লিজে মাইটনার। পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিদূষী নারী আবার বঞ্চিত হলেন ন্যায্য পাওনা থেকে।১৯৪৫ সালে নোবেল প্রাপকের তালিকায় যেখানে অটো হান-এর নামের সঙ্গে তাঁর নামও একসঙ্গে উচ্চারিত হতে পারত সেখানে তাঁর নামটি ঠাঁই পেয়েছিল ফুটনোটে।

লিজ মাইটনারের মত বিজ্ঞানী নোবেল পেলেন না সেটা তো একটা অবিচার বটেই,কিন্তু সবচেয়ে অবমাননাকর বিষয় হল,অটো হানের বিবৃতি।তিনি ও স্ট্রাসম্যান নিজেদের এক্সপেরিমেন্ট বর্ণনা করে (১৯৩৯

সালে)একটি পেপার লিখেছিলেন 'ডাই নাচুরওয়াইজেন স্কাফতেন' নামক জার্নালে, যেখানে তাঁরা মাইটনারের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। দূরে স্টকহোমে বসেও মাইটনার যে অটো হান ও স্ট্রাসমানের এক্সপেরিমেণ্টকে লাগাতার নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাঁদের এক্সপেরিমেন্টের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁদের সঠিক পথে এগিয়ে দিয়েছেন, সে সব কথাই চেপে গেলেন অটো হান। তিনি হয়ত নাৎসীদের হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে একজন ইহুদি মহিলা বিজ্ঞানীর সহযোগিতার কথা স্বীকার করেননি। কিন্তু হানের সহকারী স্ট্র্যাসমান একথা মানেননি। তিনি স্বীকার করেছিলেন তাঁদের এ কাজের সাফল্যে প্রধান ভূমিকা ছিল লিজে মাইটনারের।

মাইটনার কিন্তু ভেঙে পড়েছিলেন এই ঘটনায়। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারিতেই নিজের ভাইকে চিঠিতে লিখেছিলেন,"...আমাদের যৌথ গবেষণাকে ভিত্তি করে অটো হান কিছু ফলাফল প্রকাশ করে সদ্য একটি পেপার লিখেছে...যদিও বিজ্ঞানের বিচারে ও ব্যক্তিগতভাবে অটো হানের সাফল্যে আমি খুশি, তবু বিজ্ঞানজগতে চারপাশের সবাই ভাববে এই আবিষ্কারে আমার কোনও অবদানই নেই- আমি খুবই হতাশ।"

১৯৪৫ সালে নোবেল পাওয়ার পর থেকে অটো হান আজীবন বলে গেছেন যে তিনিই 'ফিশন' আবিষ্কারের জনক, আবিষ্কারের একমাত্র দাবিদার।মাইটনার একসময়ের সহকর্মী গবেষক বিজ্ঞানীর এই মর্মবিদারক ব্যবহারকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন-"অটো হান ইজ সিম্পলি সাপ্রেসিং দ্য পাস্ট(ইন নাৎসি জার্মানি),আই অ্যাম পার্ট অফ হিজ সাপ্রেস্ড পাস্ট"।

১৯৪৫ সালে নোবেল প্রাইজ ঘোষণার পর মহিলা বিজ্ঞানী ব্রিজিট ব্রুম আমিনফকে এক চিঠিতে লিজ যা লিখেছিলেন, তার মর্মার্থ ছিল এই-'রসায়নে হান নোবেল পেয়েছেন, সেটা সঠিক, তিনি নোবেলের যোগ্য বিজ্ঞানী। কিন্তু যে কাজের জন্য একমাত্র হান নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তা ভুল। 'ফিশন' প্রক্রিয়াটির বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে পরমাণু বোমা বানানো যেত না। 'ফিশন' কীভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে তিনি ও তাঁর বোনপো বিজ্ঞানী অটো রবার্ট ফ্রিৎজ যা করেছিলেন তা কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফিশনের উৎস কী,ফিশন থেকে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়,সেসব অটো হান ঘুণাক্ষরেও টের পাননি। সেটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর(মাইটনারের) ব্যাখ্যার পর। তাই খবরের কাগজে তাঁকে যে হান-এর অধস্তন সহকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা তাঁর বেমানান বলে মনে হয়েছে।এটা অন্যায় হয়েছে।

লিজে মাইটনার ছিলেন অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহরের এক ইহুদি পরিবারের সন্তান। ভাইবোনের মধ্যে তৃতীয় লিজের জন্ম ১৮৭৮ সালের ৭ই নভেম্বর। লেখাপড়ারও সেখানেই শুরু হয়েছিল।কিন্তু সে সময়ে অস্ট্রিয়ার সমাজে চৌদ্দ বছরের বেশি বয়সের মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুলে পাঠাতে পারতেন না অভিভাবকেরা। সমাজের বারণ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই লিজে গণিত ও বিজ্ঞানে অত্যন্ত ভালো হওয়া সত্বেও তাঁর স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁর অভিভাবকেরা ছিলেন আধুনিক মনের মানুষ। মেয়েদের লেখাপরা শেখানোর প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বুঝতেন। তাই তাঁরা সমাজের চোখ এড়িয়ে গৃহশিক্ষক রেখে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও বাড়িতেই শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।বাড়িতে পড়াশুনা করেই তিনি এন্ট্রান্স পাশ করেছিলেন আর ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯০৫ সালে পদার্থবিদ্যায় পি এইচ ডি করেছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনিই ছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পি এইচ ডি প্রাপক মহিলা।

১৯০৭ সালে ২৮বছর বয়সী লিজে মাইটনার গবেষণার জন্য চলে গেলেন বার্লিনে। যোগ দিলেন রসায়নবিদ অটো হান-এর গবেষণাগার 'কাইজার উইলহেল্ম ইনস্টিটিউট ফর কেমিস্ট্রি'তে। দুজনেরই গবেষণার মূল বিষয় ছিল মৌলের তেজস্ক্রিয়তা। এরপর তাঁদের একসাথে দীর্ঘপথ চলা। উভয়ের কাজ ছিল পরস্পরের পরিপূরক। লিজে মাইটনার ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিলেন পরমাণুবিদ্যার একজন পথপ্রদর্শক। তাঁর অনেক আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে পরমাণু মৌলের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার ও বোনপো অটো রবার্ট ফ্রিৎজ-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে 'নিউক্লিয়ার ফিশন' আবিষ্কার।অটো হানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার সময় তিনি অনেকগুলি আইসোটোপ-তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন 'অগার এফেক্ট'-তেজস্ক্রিয় বস্তুর পৃষ্ঠতল থেকে ইলেকট্রন বিকিরণের কারণ। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে গবেষণা ক্ষেত্রে হান-মাইটনার জুটি আন্তর্জাতিকভাবে প্রথম শ্রেণীর দু'জন গবেষক হয়ে উঠেছিলেন। এরপরই শুরু ইতিহাসের প্রহসন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি, নাৎসি জার্মানির উত্থান, ইহুদি নির্যাতন, লিজে মাইটনারের বার্লিন ত্যাগ। পরের ঘটনা শুরুতেই লেখা হয়েছে।

নোবেল প্রাইজ থেকে বঞ্চিত হলেও তিনি সম্মানিত হয়েছেন এক চিরস্থায়ী বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারের। বিজ্ঞানের খাতায় ১০৯ নম্বর মৌলটিকে তাঁর নামে নামাঙ্কিত করে সেটির নাম দেওয়া হয়েছে, 'মাইটনেরিয়াম'- যতদিন বিজ্ঞানের ইতিহাস চলমান থাকবে ততদিন মৌলের তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে উচ্চশক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট 'মাইটনেরিয়াম' মৌলটির নাম উল্লেখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাইটনারের নামটি মনে করা হবে। যেখানে পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ীদের নাম স্মরণ করতে জিজ্ঞাসুদের বই খুলে দেখতে হবে।



ভারতের মানুষ ও না মানুষদের গল্প

জন লকউড কিপলিং
অনুবাদ পিয়ালী চক্রবর্তী

গাধা(দ্বিতীয় পর্ব)

বসন্তের দেবী শীতলার বাহন হবার জন্য গাধার যে কলঙ্ক সে তো আগেই বলা হয়েছে। হয়ত নিম্নসম্প্রদায়ের আদিবাসী হওয়ার জন্য এই দেবী দুর্গা বা ধ্বংসাত্মক কালীর দশটি রূপের একটি না হলেও,এর দেবীত্বকে ভীষণ আতঙ্কজনক ভাবা হয়। একে সবাই ভয় করে,বসন্তের মহামারী হলে একে কখনই পুজো করা হয় না,আর যেটুকু হয় তা শুধু মহিলা বা শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

তারা হয়ত কখনও গাধার দিকে একটু শস্যদানা ছুঁড়ে দেয়,কিন্তু আদপে হতভাগ্য গাধা শীতলার বাহন হবার জন্য কোন সম্মানই পায় না। অথচ ষাঁড়কে দেখ,শিব বা মহাদেবের বাহন তো,তাই তার কত খাতির, ত পুজো,খাওয়াদাওয়া,আর এইসব করে বেশি হিন্দু ভিখারীরা, যারা ওকে 'নন্দী' বলে ডাকে। এর মানে 'যে খুব খুশি।'

আসলে হিন্দু মন্দিরের সামনে যে পাথরের ষাঁড়ের মূর্তি থাকে অথবা ছোট ধাতব মূর্তি, যেগুলো পারিবারিক শিবমূর্তির সামিয়ানার অবলম্বন হিসেবে থাকে,তাদের এই 'নন্দী' নাম দেওয়া হয়।

মিস্টার ইব্বেস্টন তাঁর 'আউটলাইনস অফ পাঞ্জাব এথনোগ্রাফি' বইটিতে লিখেছেন, "এইসব দেবীদের (রোগের) কোন পুরুষ কখনও পূজা নিবেদন করেন না, শুধুমাত্র মহিলারা এবং শিশুরাই করে, এবং তারা অনেকেই শীতলার থানে বিখ্যাত সপ্তমী পুজোতে অংশ নেয়। সব গ্রামেই এমন এক একটি শীতলার থান থাকে। আর সেখানে যা নৈবেদ্য দেওয়া সব হল অশুদ্ধ। শীতলার বাহন হল গাধা, তাই গাধার এবং তার মালিক কুমোরের দিকে শস্য ছুঁড়ে দেওয়া হয় শিশুদের মাথার ওপর থেকে। পাখি, শূকর, ছাগল ইত্যাদি ভেট হিসাবে দেওয়া হয়, কালো কুকুর খাওয়া হয়, সাদা মোরগকে দুলিয়ে দুলিয়ে দেওয়া হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক যার গুটিবসন্ত সবে সেরেছে, তাকে একটা শূকর দিতে হবে নাহলে তার আবার গুটিবসন্ত সংক্রমণের আশঙ্কা থাকবে। কিন্তু সংক্রমণের সময় কেউ তাকে পূজা করে না, যদি গ্রামে মহামারীও হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা ঠিক হচ্ছে, ততদিন দেবীর পূজা হয়না। তাই যতক্ষণ না এই দেবী তার হাত উপুড় করে কিছু না দিচ্ছে, ততক্ষণই সব ভাল। এইসবের জন্য শীতলা, ভারতীয় মায়েদের কাছে এক বিভীষিকা।'

আগেকার দিনে, ভীষণ বদরাগী কাজিরা, অপরাধীদের একধরণের শাস্তি দিত। তাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে, মাথা ন্যাড়া করে, গায়ে কালি মাখিয়ে গাধার ওপর বসিয়ে ঘোরান হত। গাধার লেজের দিকে মুখ করে বসে থাকতে হত আর গলায় ঝোলান থাকত জুতোর মালা। আমার এক শিখ বন্ধু এইসব নিজের চোখে দেখেছিল। আর যদি সে চোর হয় তাহলে তো হাত, কান বা নাক কাটা যেত। একেবারে পশ্চিমের মুসলিম দেশগুলিতে এখনও এই প্রথার প্রচলন আছে। এমনকি ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামেও একজন বদমাশ লোককে এই শাস্তি দেওয়া হয়, আবার তার সাথে জোরে জোরে ঢোল, করতাল বাজান হয়।

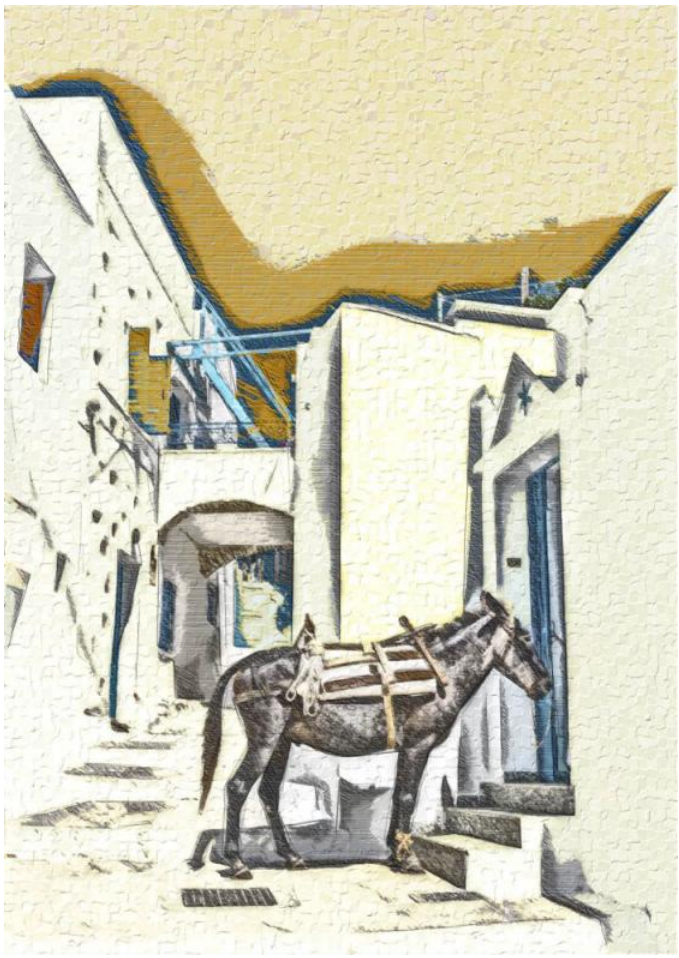
টমাস হার্ডির 'মেয়র অফ ক্যাস্টারব্রিজ'এ দক্ষিণ ইংল্যান্ডে এরকম 'গাধায় চাপা'র বর্ণনা আছে। এমনকি গাধার পিছনে এদের প্রতিকৃতি অব্দি রেখে দেওয়া হত। তবে অপরাধীগুলোও কিছু কম নির্লজ্জ হত না, তারা এই অবস্থায় গোটা গ্রাম ঘোরার পর আবার গাধাটাকে উপরি পাওনা বলে চেয়ে নিত। লোককথায় আছে যে, প্রতারক স্ত্রীদের নাক কেটে এরকম গাধার পিঠে চাপিয়ে দেওয়া হত। হিতোপদেশের সময়েও দাম্পত্য সমস্যার এই একটাই শাস্তি ছিল। আর একটা সপ্তাহও এমন কাটত না, যেখানে বিচার সভায় কারুর এই শাস্তি হত না। আর সব শাস্তিই ছিল স্ত্রীদের জন্য, তাদের তো নাক যেতই, কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, এই নারকীয় ব্যাপারগুলো কখনও আলোয় আসেনি, সবসময় অন্তরালে থেকে গেছে।

একটা অত্যন্ত অপমানজনক প্রথা আছে, যেটা প্রমাণ করে সরল গাধাকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়। যদি এমন কোন জমি থাকে যেটা কোন হিন্দুধর্মের কোন অলঙ্ঘনীয় কারণের জন্য চাষের অযোগ্য, এখানে চাষ-আবাদ করতে হলে গাধাকে দিয়ে হাল টানানো হয়। কিন্তু যখন একে পুনরায় শোধন করানোর দরকার হয়, তখন ভগবানের অবতার হিসাবে হাতিকে নিয়ে আসা হয় হাল টানাতে। "তোদের জমি যেন গাধায় চাষ করে" এ হল হিন্দুসমাজে প্রচলিত অভিশাপ।

গাধাকে জাতি-ধর্মের চিরকালীন দ্বন্দ্বের মধ্যেও ব্যবহার করা হয়, যা চিরকাল ভারতকে নানাভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ইংরেজ শাসনের আগে, উত্তর পশ্চিমে যেখানে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল, সেখানে হিন্দুদের পূর্ণদৈর্ঘ্যের পাগড়ি পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল এমনকি তাদের শুধুই গাধার পিঠে চাপার অধিকার ছিল। আবার কচ্ছ ভুজ রাজ্যে, যেখানে হিন্দুদের বাস বেশি, সেখানে মুসলিম বোরাদের ঘোড়ার পিঠে চাপতে দেওয়া হতনা, এই অক্ষমতাকে ১৮৯০তে অপসারণ করা হয়েছিল। বোরাদের প্রতি এই যে অবিচার, যতটা ভাবা হয়, অতদিন চলেনি, কিন্তু তাও নিচু জাত বলে তাদের রেয়াত করা হত না, যদিও তাদের মধ্যে বম্বে প্রেসেডেন্সিতে বেশ কিছু বুদ্ধিমান, প্রখ্যাত ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা অনেক বেশি অত্যাচারী ও অসহিষ্ণু। এইসময় মরক্কোর কিছু অংশে জিউদের ওপরও এইরকম আদেশ ছিল, তারা লেজের দিকে মুখ করে গাধার পিঠে চাপত আর জুতো পরতে পারত না।

ছোটখাট জায়গায় উঁচু জাতের মানুষের মধ্যে একটা জাতিগত গর্ববোধ থাকে। চামড়া পরিহিত উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা, স্বভাবতই একটু নিম্নবর্ণের বলে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু যখন আমাদের সম্প্রদায়ের এক মহিলা, এইরকম একজন মানুষের কাছ থেকে তার ছোট্ট ছেলের জন্য গাধা চেয়েছিল, তাকে তার সহিসের কাছ থেকে যা জবাব পেতে হয়েছিল, শুনলে আশ্চর্য লাগে। "না মহাশয়া, আমার ছেলে গাধার ওপর বসে অপেক্ষা করবে না, আপনি বরং কুমোরের কাছ থেকে নিয়ে আসুন, আর সেই গাধা যেন আমাদের আস্তাবলের ধারেও না আসে।"

এই পূর্বের দেশগুলোই হয়ত বাকি সব দেশকে শিখিয়েছে যে গাধা নামটার মধ্যেই একটা ভর্ৎসনা লুকিয়ে আছে। 'গাধা' শব্দটা লোকের মুখে মুখে ফেরে। 'লেজবিহীন গাধা' বলা তো অভ্যেসের ব্যাপার। কোন এক বোকা যদি আরেকজন বোকার প্রশংসা করে, তখন সবাই বলে 'গাধা গাধাকে খোঁচাচ্ছে'। এমনকি গার্হস্থের ফন্দিফিকির বোঝাতেও এই কথাই বলা হয়। বোকাদের মাথায় যেটা ঢোকে না, সেটা সম্বন্ধে বলতে হলে বলা হয় 'গাধাকে



যতই চান করাও, তাকে বাছুর বানাতে পারবে না' অথবা 'হামানদিস্তায় পিষলেও গাধা কখনও ঘোড়া হবে না'। মুসলমানরা বলে 'যিশুর গাধা মক্কায় গেলেও গাধা হয়েই ফেরত আসবে'।

আফগান লোককথার একটা গল্প অনুযায়ী, পাঞ্জাবে ফেরিতে ওঠার জন্য অনেক মানুষ আর পশুরা এসে জড়ো হয়েছে। নৌকা এসে ভিড়েছে, সবাই নির্দ্বিধায় উঠে পড়ল, শুধু গাধা অনড়। তার চালক চেষ্টা করছে, মাঝি ডাকছে, কিন্তু গাধা আর নড়ে না। সেইসময় ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল এক আফগান, বার করল তার ছোরা, আর খচ করে কেটে দিল গাধার গলা। তারপর বলল "এরকম অবাধ্যতা একজন আফগান করলে মানায়, কিন্তু একটা গাধা করলে, কক্ষণও না।"

আবার আফগানদের প্রতিবেশী বালোচদের মধ্যে গাধার একটা সম্মান আছে। সেখানে পুত্রসন্তান জন্ম নিলে, গাধার খোঁড়া জল, তলোয়ারের মুখ থেকে একফোঁটা জল ওই শিশুর মুখে ফেলা হয় স্তন্যপানের আগে। এটা পিতৃতন্ত্রের একটা প্রকাশ। যারা 'ভারতের মানুষ' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শুধু একতার কথা বলে, তারা আসলে জাতিগত বিদ্বেষের ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যায়। যেমন একজন হিন্দুস্তানী, একজন পাঞ্জাবী সম্পর্কে বলবেন 'একটা দেশী গাধা যে পাঞ্জাবীতে ডাকে'। আবার পাঞ্জাবীও প্রতিহিংসা দেখিয়ে বলবে 'গাধাটা ঠিক পূর্বদেশীয়দের মত নিস্তেজ'। আবার বাঙালিবাবুরা, যারা ভীষণভাবে ইংরেজদের ভাষা আর কায়দা অনুকরণ করে, তারা বলবে 'একটি পার্বত্য ইংরেজ গাধা'।

জানোয়ারটার কোন কদর না থাকলেও তার দুধের পুষ্টিগুণ যথেষ্ট। কুমোরের পরিবার গাধার শাবক বেচে ভালই লাভ করে, অথচ উচ্চজাতের হিন্দুরা এমন একটা ভান করে যেন ব্যাপারটা খুব জঘন্য। তেলুগু সাহিত্যের জনপ্রিয় প্রবক্তা সাধু ভেমানার উক্তি হল "এক চামচ গরুর দুধ যথেষ্ট, কিন্তু একপাত্র গাধার দুধের কী ব্যবহার?"

অনেক হিন্দুরা বলে থাকেন যে যেকোন পরিস্থিতিতে এই তরলের ব্যবহার অসম্ভব। কিন্তু এইখানে বাদ সাধল চিকিৎসাবিজ্ঞান, জাতপাত সরিয়ে রেখে তারা আবিষ্কার করল গাধার দুধের ওষধি গুণ। গাধার দুধ মিশিয়ে তৈরি হল অনেক যৌগ যা রোগ প্রতিরোধী। ইংরেজ ওষুধ প্রস্তুতকারকরা এর গুণাবলী ব্যাখ্যা করেছেন। গাধার দুধ থাইসিসের মত রোগ প্রতিরোধে ব্যবহার হয়, যদিও খুব বেশি দেরি হয়ে গেলে আর কিছুই কাজে লাগে না।

কিন্তু কিছু জায়গায় গাধারও বেশ সম্মান আছে দেবী শীতলার বাহন হিসাবে। অনেক জায়গায় নবদম্পতি তাদের বিয়ের যাত্রা শুরু করার সময়, একটুখানির জন্য হলেও গাধার পিঠে চাপেন দেবী শীতলাকে তুষ্ট করতে। কিন্তু কথায় বলে এটা নাকি একধরণের সহমর্মিতা দেখানো হয়। 'গাধার সৌন্দর্য' নিয়ে কিছু ইটালিয়ান আর ফ্রেঞ্চ প্রবাদে বলে ' একটি স্ত্রী গাধাও সুন্দর হয়, যখন সে অল্পবয়সী থাকে'। তার পায়ের জোর নিয়ে এমনও বলা হয়

‘একটি গাধা পাহাড়কেও জীর্ণ করে দিতে পারে যদি তুমি একটি পাখির কান চিরে দিতে পার।’ কিন্তু এই হতভাগ্যকেই সব কাজ হয়ে গেলে অবহেলায় সরিয়ে দেওয়া হয়। তাই তার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা প্রচলিত আছে। ‘গাধাকে হয়ত মেরে মেরে আঘাত দেওয়া হয়, শীতলার বাহন হওয়ার জন্য অনেক মানুষের রোষের শিকার হতে হয়, কিন্তু অন্তত তাকে দড়ি দিয়ে বা শক্ত বাঁধনে বাঁধা হয় না’। এই দীন-হীন হতভাগ্য জন্তুটার জীবনে এই একটাই স্বস্তি।

প্রাচীন ধ্যানধারণার সাথে লোকজীবনের চিন্তাভাবনার অনেক মিল পাওয়া যায় গাধার ক্ষেত্রে। এটি যত অবহেলিত জীবই হোক না কেন, যথেষ্ট উপকারী। কিছু কিছু জায়গায় একে হাল চালানোর কাজেও লাগানো হয়। যদিও এর প্রধান কাজ হল, ধোপার জামাকাপড় বয়ে নিয়ে যাওয়া। জ্বলন্ত বা নিভন্ত চুন, কুমোরের, নির্মাতার, ঠিকাদারের জন্য পাথর বওয়া। পশ্চিমে বড় বড় কাজ করেছে সব শক্তিশালী মানুষেরা, কিন্তু ভারতে রেলের কাজ, নদীর বাঁধ তৈরির কাজ, বড় বড় রাস্তা তৈরির কাজ সবই করানো হয় কুলি-মজুর মহিলাদের আর ছোট্ট গাধাকে দিয়ে। সভ্যতার চিহ্ন বহন করে যেসব শান্তিপূর্ণ সৌধগুলি, সেখানে হয়ত গাধার পায়ের চিহ্নই প্রথমবার পড়েছে, কিন্তু তার পিঠের বোঝা বহন করার সাধ্য নেই তার দুর্বল পায়ের। তার কর্কশ ডাক, তার প্রতিবাদকে ভাবা হয়েছে যেন সে জ্বালাতন করবে বলে মতলব আঁটছে, আর তাকে তখনই বারবার আহত করা হয়েছে। লাঠির গায়ে বারবার তাকেই শহীদ হতে হয়েছে, আর যখনই তার জোর কমে গেছে, তাকে নির্লজ্জের মত পরিত্যাগ করা হয়েছে।

একটা দেশীয় গল্পও আছে, অনেকটা লংফেলোর ‘টেলস অফ ওয়েসাইড ইন’ এর গল্পের মতই, যেখানে বলা হয় এক ভারতীয় রাজা নাকি গাধাদের ব্যাপারে খুব সহৃদয় ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর নাকি তার সিংহাসনের সাথে একটি ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখতেন, যাতে যে কেউ কোন ভুলের বিচারের জন্য সেটির দড়ি ধরে নাড়ালে তিনি শুনতে পান। একবার দেখা গেল এক গাধা, সেই দড়ির ওপর প্রবলভাবে মাথা ঘষছে আর ঘন্টা বাজছে। গাধাকে সিংহাসনের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে তার মালিককে খুঁজে আনার জন্য লোক পাঠানো হল। এক ধোপা এসে উপস্থিত হল আর সে স্বীকার করল যে এই বুড়ো গাধাকে অনাহারে মরার জন্য সে ছেড়ে দিয়েছে। তাকে তার নিষ্ঠুরতার গভীরতা বোঝান হল এবং বলা হল তার এই অনুগত ভৃত্যকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ভাল করে খাইয়ে, ভরণপোষণ করে কিছুদিন পর রাজসভায় নিয়ে আসতে। কিছুদিন পর সুস্থ, মোটা হয়ে গাধা এল বর্ষার মরসুমে। কিন্তু এই শিক্ষাতেও লাভ কিছু হল না, বরং এই নিষ্ঠুরতাকে ‘গাধার সমাধি’ বলেছিলেন প্রফেট জেরিমিয়া, যিনি নিজেও একইভাবে দীর্ঘদিন অনাহারে থেকে মারা যান।

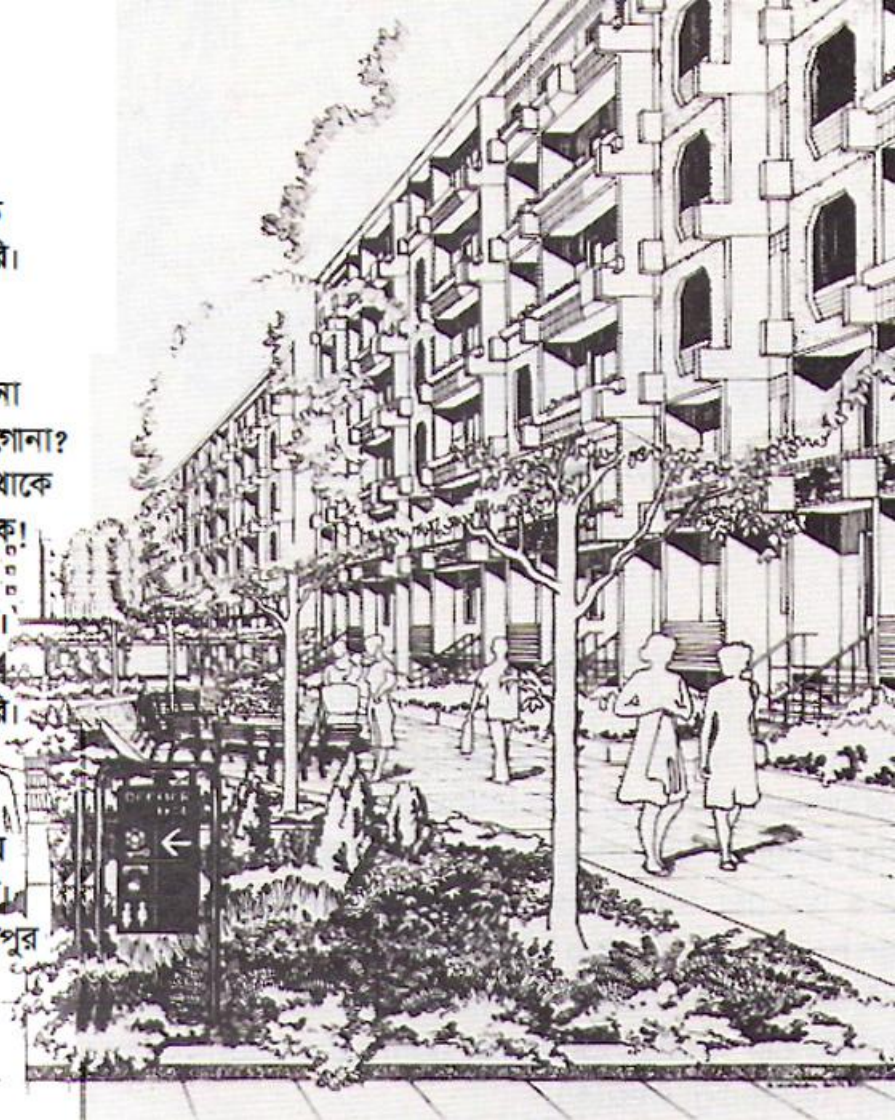
ক্রমশ

জয়ঢাক	**বসন্ত ২০১৭**	**দ্বিতীয় খণ্ড**--সূচিপত্র
ছড়া	ফ্ল্যাটবাড়ি	রুচিস্মিতা ঘোষ
জাতক	মুষিক জাতক	নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়
অভিযান	কন-টিকি অভিযান	থর হেয়ারডাল, অনুঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিযান	এভারেস্ট	এরিক শিপটন, অনুঃ বাসব চট্টোপাধ্যায়
অভিযান	অন্নপূর্ণা	মরিস হারজগ,অনুঃতাপস মৌলিক
ক্যামেরার পেছনে	ওয়ান টু থ্রি ক্লিক	শম্পা গুহমজুমদার
বইপড়া	নতুন বই দিলীপ রায়চৌধুরী রচনাসমগ্র	তাপস মৌলিক
বইপড়া	নতুন বই ডাইনীঃ দীপঙ্কর চৌধুরী	মৌসুমী রায়

ফ্ল্যাটবাড়ি

রুচিস্মিতা ঘোষ

একদিকে চেয়ে আছে একতলা বাড়ি
সামনেই ফ্ল্যাটবাড়ি, গাড়ি সারি সারি।
গেটের সামনে বসে এক দারোয়ান
চুপচাপ বসে আছে , মুখভরা পান।
গেট খুলে লোকেদের চলে আনাগোনা
কত লোক যায় আসে, যায় কিগো গোনা?
ওঠানামা করে লিফ্‌ট , সিঁড়ি চেয়ে থাকে
ঘন ঘন কলবেল, কে যে কাকে ডাকে!
একতলা বাড়িটির বাগানেতে মালী
নানা রঙা কত ফুলে ভরা তার ডালি।
মৌমাছি ফুলে ফুলে মধু করে চুরি
প্রজাপতি পাখা মেলে করে ঘোরাঘুরি।
গালিচা বিছানো ঘাস যেন মখমল
আঙিনায় ভরা রোদ করে ঝলমল।
এক কোণে মেনি ঐ রোদ মেখে গায়
দুটি শিশু করে খেলা, লুটোপুটি খায়।
আলো, হাওয়া, হাসি-গান, প্রাণ ভরপুর
একতলা বাড়ি, আহা! স্নিগ্ধ মধুর!
মাথা উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি। দম্ভে সে চূর
ব্যস্ত জীবন হায়! শুধুই বেসুর।



মূষিক জাতক



নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়

জঙ্গলের ধারে সে এক বিশাল মাঠ। ধূ ধূ করা তেপান্তরের মাঠ যেন। তার এক ধারে ইঁদুরদের বাসা।মাঠটা যেমন বিশাল ,ইঁদুরদের দলটাও তেমনি।কাজেই দলের রাজাকে সবসময়ি চিন্তায় থাকতে হয়।কারণ ইঁদুর বেচারাদের কি শত্রুর শেষ আছে? গাছের উপরে কাক-চিল তো মাটিতে বিড়াল-সাপ-শেয়াল,আরো কতো কী। ইঁদুরের মাংস পেলে এদের যেন আর কিছুই চাইনা। তাই ইঁদুর-রাজকে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে চারদিকে চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হয়।তবে হ্যাঁ,রাজার যেমন বুদ্ধি,চেহারাখানাও তেমনই। একেবারে রাজার মতই।

মাঠের ঐ প্রান্তে ,ঠিক জঙ্গলের কিনারায় আছে এক শেয়ালের বাসা।অনেকদিন ধরেই তার নজর পড়েছে ইঁদুরদের উপর।কিন্তু বেচারা একটা ইঁদুরকেও বাগে পায়না!তবে অনেক ভাবনা চিন্তা করে এবার সে এমন একটা ফন্দি এঁটেছে,যাকে বলে একেবারে ওস্তাদের মার!দেখা যাক এবার কী করে বাছাধনেরা রক্ষে পায়?

*****

সে দিন সকালে ইঁদুরেরা গর্ত থেকে বেরিয়েছে খাবারের খোঁজে। কিছুদূর গিয়েই তো সবার চোখ গোল গোল। ওটা কী? একটা শেয়াল না? কিন্তু অমনভাবে একপায়ে সূর্যের দিকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

ইঁদুর-রাজ শেয়ালের কাছে গিয়ে নমস্কার করে জানতে চাইলেন, “আপনি কে?”

শেয়াল গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, “আমার নাম ধার্মিক।”

“কিন্তু আপনি এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কষ্ট হচ্ছে না?”

শেয়াল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “কী করবো বলুন? কপাল! চারটে পা মাটিতে ফেললে আর দেখতে হবেনা।আমার ভারে পৃথিবীটাই উল্টে যাবে।”

“ও বুঝলাম।কিন্তু ওরকম হাঁ করে সূর্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন যে?”

“বুঝতে পারলেন না? সূর্যকে প্রণাম করছি তো।আর হাঁ না করে কী উপায় বলুন? আমি তো হাওয়া ছাড়া আর কিছুই খাইনা!” শেয়ালের চোখে-মুখে যেন এক অপার্থিব দীপ্তি।

শেয়ালের এই কঠোর তপস্যা দেখে ইঁদুর-রাজ মুগ্ধ। সেই থেকে সকাল-সন্ধে দুবেলা তিনি তাঁর দলবল

নিয়ে শেয়ালকে প্রণাম করে যেতেন।এমন একজন তপস্বীকে হাতের নাগালে পাওয়া কি কম ভাগ্যের?

******

ইঁদুরদের দলটা এত বড়ো যে কদিন আগেও বাসায় একেবারে ঠাসাঠাসি করে থাকতে হত। কিন্তু এখন হঠাৎ বাসাটা যেন বড়ো হয়ে গেছে। সবাই বেশ হাত-পা খেলিয়ে থাকতে পারছে। ব্যাপারটা কী হল? ইঁদুরদের দলে একটা সাড়া পড়ে গেল। হিসেব নিয়ে দেখা গেল কদিন ধরেই মিন্তিপিসির ছোটোমেয়ে, খেন্তিমাসির ভাসুরপো,প টলদাদুর বড়ো নাতি--এরকম অনেকেই বেপাত্তা। না বলেকয়ে এতজন তো একসঙ্গে উধাও হতে পারে না! ব্যাপারটা সবার কাছেই গোলমেলে ঠেকতে লাগল।

ইঁদুর-রাজের কিন্তু সন্দেহটা পড়ল শেয়ালের ওপর। ও আসার পর থেকেই গন্ডগোলটা শুরু হয়েছে। অন্যান্যদিন ইঁদুর-রাজ যখন বেরোয় তখন সে থাকে সবার সামনে। সেভাবেই শেয়াল-তপস্বীকে প্রণাম করতে যায়। আজ কিন্তু প্রণাম সেরে রাজা সবাইকে এগিয়ে দিয়ে নিজে রইলেন সবার শেষে। ইচ্ছে করেই যেন ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে লাগলেন রাজা।

শেয়ালও আছে তক্কে তক্কে। তার মনটা আজ একটু বেশি খুশি। অন্যদিনের থেকে আজকের ইঁদুরটার চেহারাখানা বেশ ভালো! যেমন নাদুস-নুদুস,তেমনই বড়োসড়ো। আহা! দেখে যেন মনে হয় ছোটোখাটো শুয়োরছানা একটা! শেয়ালের জিভ দিয়ে টসটস করে জল গড়ায়। উঃ! আর অপেক্ষা করা যায় না! সুড়ুৎ করে জিভের জলটাকে ভিতরে টেনে নেয় শেয়াল। আর তারপরেই এক থাবা।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা তো অন্যদিনের মতো হল না। এ ইঁদুরটা তো উল্টে ঘাড়ে উঠে পড়ল। ওরে বাবা! দাঁতের কী ধার! প্রথমেই লোভে পড়ে এই গাঁট্টাগোট্টাটাকে ধরাটাই ভুল হয়েছে।অন্যদিন ইঁদুরগুলোকে স্রেফ থাবা দেবার অপেক্ষা। এক থাবাতেই শেষ হয়ে যায়।আর তারপর খেয়েদেয়ে মুখ মুছে আবার ভেক ধরে দাঁড়াতে কতক্ষণ ই বা লাগে!

ইঁদুর-রাজের সঙ্গে শেয়াল যেন আজ এঁটে উঠতে পারছে না। ধারালো দাঁতে শেয়ালের সারা গায়ের মাংসে যেন লাঙল চালাচ্ছে। ফালা ফালা করে দিচ্ছে একেবারে। গলাটাকে কিছুতেই ছাড়ছে না। আঃ,দম শেষ হয়ে যাচ্ছে শেয়ালের। ইঁদুরটাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে যে পালাবে,সে জো কি রেখেছে? যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই থিক থিক করছে ইঁদুরবাহিনী। শেয়ালের হেনস্থা দেখছে আর ফূর্তির যেন ফোয়ারা উঠছে সেই দেখে! একে আজ সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি, তারপর এই যুদ্ধ,সারা গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। অথচ প্রথম যখন ইঁদুরটা লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়ল শেয়াল তখন মনে মনে হেসে প্রাচীন প্রবাদ আউড়েছিল--'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে'। কিন্তু এই নরুণদাঁতীগুলোর দাঁতে যে এমন জোর কে জানত?

সূর্যের তেজ ক্রমশ বাড়ছে । গায়ের ক্ষতগুলো চিড়বিড় করছে। ইঁদুর-রাজ ও হাঁপিয়ে উঠেছিল। অতবড়ো একটা জন্তুর সাথে সমানতালে টক্কর দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা? কিন্তু যতই ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন ওর গলাটা ছাড়া যাবে না। আজ ওকে চরম শিক্ষা দিতেই হবে। এতদিন ধরে এতজন ইঁদুরকে ঠকিয়ে এনে সাবাড় করার ফল একে পেতেই হবে।

শেয়ালটা প্রাণপণে এমন গা ঝাড়া দিচ্ছে যে প্রতি মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। একবার তো প্রায় পড়েই গিয়েছিল। কোনোমতে শেয়ালটার কান কামড়ে ধরে আবার ঘাড়ে চড়েছে ইঁদুর-রাজ। আজকে বাছাধন একেবারে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এতদিনের বদমাইশির ফল।আর আজ ইঁদুর-রাজ যদি মরেও যায় তবেও কি এই পাজি শেয়ালটা রক্ষে পাবে? সঙ্গের হাজার হাজার ইঁদুর ওর বারোটা বাজাবে। ইঁদুর-রাজ তো ওদের এখনো ডাকেইনি। একবার ডাকলেই ঝাঁকে ঝাঁকে সব ঝাঁপিয়ে পড়বে হতভাগাটার উপর।

ইঁদুরের পিঠটাও শেয়ালের নখের আঁচড়ে চিড়ে গিয়েছে। তাতে কী? ইঁদুর-রাজের এখন একটাই লক্ষ্য,কোনোমতে ওর গলার নলীটা কুচ্ করে কেটে দেওয়া। আর শেষ পর্যন্ত সুযোগটা এসেও গেল। শেয়ালের পিঠের উপর দিয়ে গিয়ে লেজ ধরে ঝুলে পড়েছিল ইঁদুর। বোকা শেয়ালটা যেই না ঘুরে কামড়াতে গেছে ইঁদুরকে, ইঁদুর সঙ্গে সঙ্গে আর দেরি না করে ওর গলা ধরে ঝুলে পড়েছে। আর তারপরেই সরু সরু ধারালো দাঁতে গলার

নলীটা দিল কেটে। ব্যস, শেয়ালের সব জারিজুরি শেষ! ইঁদুর-রাজ তখন বলল, “ছল করে ধর্মের ভেক ধরে মাংস খাবার সাধ এবার মিটল তো?”

বেচারা শেয়াল! তার আর কিছুই করার ছিল না,করুণ চোখে চেয়ে থাকা ছাড়া।

******

এই ইঁদুর-রাজ কে ছিলেন বুঝতে পারলে তো?।হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ। সে জন্মে বোধিসত্ত্বই ছিলেন ইঁদুরদের রাজা।এই ভাবে শক্তি, বুদ্ধি ও সাহসের দ্বারা তিনি তাঁর প্রজাদের রক্ষা করে ছিলেন।

কন-টিকি অভিযান



থর হেয়ারডাল

(অনুবাদঃ ইন্দ্রনাথ)

আগের কথা

কীভাবে মানুষেরা এসে পৌঁছলো এই দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলোতে তা নিয়ে নানান মতবাদ চালু ছিল, কিন্তু কোনোটাই জুৎসই আর জোরালো ভাবে প্রমানিত হয়নি। থর হেয়ারডাল এইবারে উঠে পড়ে লাগলেন। নিজের গবেষণার জন্য সংগৃহীত যাকিছু সব কিছু যাদুঘরে দান করে দিলেন। মা বাবা তো বটেই বন্ধুরাও অবাক হল। কিন্তু তিনি লক্ষে স্থির। পরবর্তী সময়ে চলল পড়াশোনা আর তথ্য সংগ্রহ। ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছিল বিশ্বাসের ভিত। মনোযোগ কেড়ে নিল ইনকাদের প্রাচীন কাহিনী। মিলে গেল দেবতা ‘‘টিকি’’-র হদিশ। পেরু-র প্রধান সূর্যদেবতা আর দ্বীপভূমির সূর্যদেবতায়, শেষমেষ দেখা গেল, কোনো প্রভেদ নেই। এসব তথ্য জমা হতে হতেই লেগে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

(৩)

একটি অভিযানের শুরু

তো শুরুটা করে দিল বৃদ্ধ টেটুই, দক্ষিণ সাগরের এক নির্জন দ্বীপে আগুনের পাড়ে বসে স্রেফ উস্কে দিল ব্যাপারটা। আর তার বেশ কয়েক বছর বাদে আমি নিউ ইয়র্কের এক যাদুঘরের ওপরতলায় আরেক বৃদ্ধের অন্ধকার অফিসঘরে বসে।

আমাদের চারপাশে সুদৃশ্য কাচের শোকেসে প্রাচীনকালের মাটির পাত্রের ভগ্নাবশেষ। যেগুলির সূত্র ধরে হয়তো অতীতের আবছায়ায় পৌঁছনো যায়। দেওয়াল জোড়া বই আর বই। তার কিছু একজন মানুষেরই লেখা আর বড়োজোর দশটি লোকের পড়া। বুড়ো লোকটার এ সমস্ত বইই পড়া, আর কিছু আবার ওনারই লেখা। এই মুহূর্তে আমার উল্টোদিকে সাদা দাড়িওয়ালা রসিক লোকটা নিজের কাজের টেবিলে বসে। কিন্তু এখন বিলক্ষণ মনে হচ্ছে আমি তার পা-খানা মাড়িয়ে দিয়েছি, কেননা যেভাবে চেয়ারের হাতল খামচে ধরে আমার দিকে চাইলেন, যেন তার একলার তাসখেলা ভন্ডুল করে দিলাম সবেমাত্র।

‘‘নাঃ’’ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, ‘‘কক্ষণো নয়।’’

আমার মনে হল সান্তাক্লজকে কেউ যদি বলত যে পরের ক্রিসমাসটা জুনের চব্বিশে পড়েছে তার মুখের চেহারাটাও অনেকটা এইরকম হত।

“ডাহা ভুল করছ তুমি, এক্কেবারে নিশ্চিতভাবেই ভুল,” মাথা নাড়তে নাড়তে আমার ভাবনাটা উড়িয়ে দিলেন তিনি।

‘‘কিন্তু আপনি তো এখনো আমার যুক্তিগুলো পড়েও দেখেননি!’’ আমি টেবিলের ওপর আমার পান্ডুলিপিটার দিকে দেখালাম।

‘‘যুক্তি-তক্কো!’’ আবার বললেন তিনি, ‘‘একটা নৃতাত্ত্বিক সমস্যাকে গোয়েন্দা গল্পের সমস্যা সমাধান পেয়েছ?’’

‘‘কেন নয়?’’ আমি পাল্টা বলে উঠি, ‘‘ আমি আমার সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজস্ব পর্যবেক্ষণ আর বৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই নিয়েছি।’’

“বিজ্ঞানের কাজ স্রেফ অনুসন্ধান, ব্যস, সোজা সাপটা,” ঠান্ডা মাথায় যোগ করেন ভদ্রলোক, “ওসব এটা সেটা প্রমাণ করে বেড়ানো তার কাজ নয়!” না পড়া পান্ডুলিপিটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েন উনি।

‘‘এটা সত্যি যে দক্ষিণ আমেরিকাতে কিছু প্রাচীন আশ্চর্য সভ্যতা ছিল, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না; তারা কারা, আর ইনকারা ক্ষমতায় আসার পর তারা উবেই বা গেল কোথায়? কিন্তু একটা কথা আমরা নিশ্চিত করেই জানি যে এদের মধ্যে কেউই দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উজিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে আসেনি।’’

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু খুঁজছিলেন ভদ্রলোক, ‘‘কেন জানো? খুব সহজ কথা। তারা ওখানে পৌঁছতেই পারত না। তাদের কোনো নৌকোই ছিল না।’’

‘‘কিন্তু ভেলা ছিল তাদের,” আমি বাধা দিয়ে ইতস্তত করে বলি, “আপনি তো বালসা কাঠের ভেলার কথা জানেন।’’

বুড়ো হাসলেন, তারপর শান্তস্বরে বললেন, ‘‘ভালো। পেরু থেকে একবার তাহলে ভেলায় চেপে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে পৌঁছনোর চেষ্টা করেই দ্যাখ!”

কী বলব ভেবে পেলাম না। দেরি হয়ে যাচ্ছিল। দুজনেই, অতএব, উঠে পড়লাম। অগ্রজ বৈজ্ঞানিকটি আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন আর বল্লেন, প্রয়োজনে যেন তাঁর কাছেই আসি। আর হ্যাঁ, ভবিষ্যতে হয়

পলিনেশিয়া অথবা আমেরিকা এই দুটোর একটার ওপর গবেষণা চালাই, দুটো নৃতাত্বিক জায়গাকে একত্রে মিশিয়ে নয়। ভদ্রলোক আবার নিজের টেবিলে ফিরে গেলেন।

''এটা ভুলে যেও না,'' উনি আমার পান্ডুলিপিটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম আমার লেখার শিরোনামটির দিকে, ''পলিনেশিয়া এবং আমেরিকা – একটি প্রাগৈতিহাসিক সম্পর্ক।'' পান্ডুলিপি বগলে খটাখট সিঁড়ি বেয়ে নেমে দ্রুত বাইরের রাস্তার ভিড়ে মিশে গেলাম।

সেই সন্ধ্যায় গ্রিনিচ ভিলেজের একপ্রান্তে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম। যখনই গোলমেলে সমস্যায় ঘেঁটে গেছি, এখানেই এসেছি। বেঁটে গোলগাল লম্বা নাকের লোকটা দরজা অল্প ফাঁক করে আমায় দেখে একগাল হাসি হেসে দরজা হাট করে খুলে আমায় ভেতরে ডেকে নিল। তারপর আমায় নিয়ে সোজা ওর ছোট্ট রান্নাঘরে। যথারীতি থালা, বাটি, চামচ, এসব বাসনপত্র এগিয়ে দেবার কাজে জুটে গেলাম। ও ততক্ষনে গ্যাসের উনুনে যেটা ফুটছিল, জানি না সেটা কী তবে চমৎকার গন্ধ বেরোচ্ছিল, তার পরিমাণটা দ্বিগুণ করে দিল।

''ভালো করেছ চলে এসেছ। তারপর, কী খবর?''

''আর খবর! কেউই পান্ডুলিপিটা পড়তে রাজি নয়।''

ইতিমধ্যে ও খাবার বেড়ে নিল। আমরা খেতে শুরু করলাম।

''ব্যাপারটা কী জানো,'' ও বলল, ''যাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে সবাই ভাবছে এটা তোমার একটা স্রেফ চলতি ভাবনা ছাড়া আর কিছু নয়। আমেরিকাতে লোকে কতরকম উদ্ভট ভাবনা নিয়ে আসে জানো?''

''আমারটাও তেমনি, তাই তো!'' আমি বলি।

''ঠিক তাই,'' ও বলে, ''তোমার ধরণটাই তো অমনি। আরে বাবা তেনারা সক্কলে বিশেষজ্ঞ! সব্বাই। আর তাঁরা কেউই এরকম কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশ্বাসই করেন না যাতে উদ্ভিদবিদ্যা থেকে শুরু করে নৃতত্বের তত্ত্ব একযোগে কাজে লাগানো যায়। তারা কেবল নিজেদের সীমার মধ্যে আরো গভীর অনুসন্ধানের পক্ষে, আরো বেশি মনোযোগী, যাতে অনেক তথ্য উঠে আসে। আধুনিক গবেষণা চায় যে প্রত্যেক বিষয় তার নিজের পরিসরেই খননকার্য চালাক। নিজের নিজের গর্ত থেকে বেরিয়ে সব বিষয়কে একত্রে নিয়ে কাজ করাটা তো আধুনিকতার নিরিখে অস্বাভাবিক, তাই না?'

ও উঠে একটা তাড়া কাগজের পান্ডুলিপি নিয়ে এলো, ''দ্যাখো! আমার শেষ কাজ এটা। চীনদেশীয় কুটিরশিল্পের এমব্রয়ডারির[১] পাখিদের নকশা নিয়ে। সাত বছর লেগেছে ঠিকই, কিন্তু প্রকাশের জন্য মনোনীত হল তৎক্ষণাৎ। সকলেই এখন নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর গবেষণাই চায়।''

কার্লই ঠিক। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের এই সমস্যাটাকে চারদিক থেকে আলো ফেলে না দেখলে, ব্যাপারটা ঠিক হবে না, অন্তত আমার কাছে তো সেটা একরঙের টুকরো দিয়ে ছবি-ধাঁধা সমাধান করার সমান হবে। টেবিল পরিষ্কার করে আমি বাসন ধোয়ার কাজে হাত লাগালাম।

''শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় কিছু জানাল?''

''নাঃ।''

“কিন্তু তোমার পুরোনো বন্ধু, ওই যে মিউজিয়ামে, সে কী বললে?”

“সেও তেমন গা করল না। উলটে আমাকে বলল যে যেহেতু ইন্ডিয়ানদের কেবলমাত্র ভেলাই ছিল সুতরাং তারা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলো আবিষ্কার করেছে এমন ভাবাটা খুবই কষ্টকল্পনা।”

কার্ল হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। খুব জোরে জোরে বাসনগুলো ধুতে আরম্ভ করল, “হ্যাঁ। সত্যি বলতে কী তোমার তত্ত্বের বিরুদ্ধে আমারও ওই একই মত।”

আমি মুষড়েই পড়লাম কার্যত, কেননা এই ছোটোখাটো নৃতাত্বিক ভদ্রলোকটিই আমার একমাত্র ভরসার জায়গা ছিল।

“আমায় ভুল বুঝো না”, কার্ল বলে চলে, “একদিক থেকে দেখলে তুমি ঠিকই বলছ মনে হয়, কিন্তু অন্যদিক থেকে এত অসম্ভব! নক্সার ওপর আমার কাজটা কিন্তু তোমার তত্ত্বকেই সমর্থন করে।”

“কার্ল!” আবারও আমি মুখ খুলি, “আমি নিশ্চিত যে ইন্ডিয়ানরা ভেলায় চড়ে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়েছিল। আর সেই কারণে আমি একইরকম একটা ভেলা তৈরি করে সাগর পাড়ি দেব ঠিক করেছি, তাতেই প্রমাণ হবে যে এমনটা সম্ভব।”

“তুমি পাগল!”

আমার বন্ধু ব্যাপারটাকে ঠাট্টা ভেবে খুব হাসতে থাকল, খানিকটা ব্যোমকেও গেছিল আমার এরকম ভাবনা-চিন্তায়।

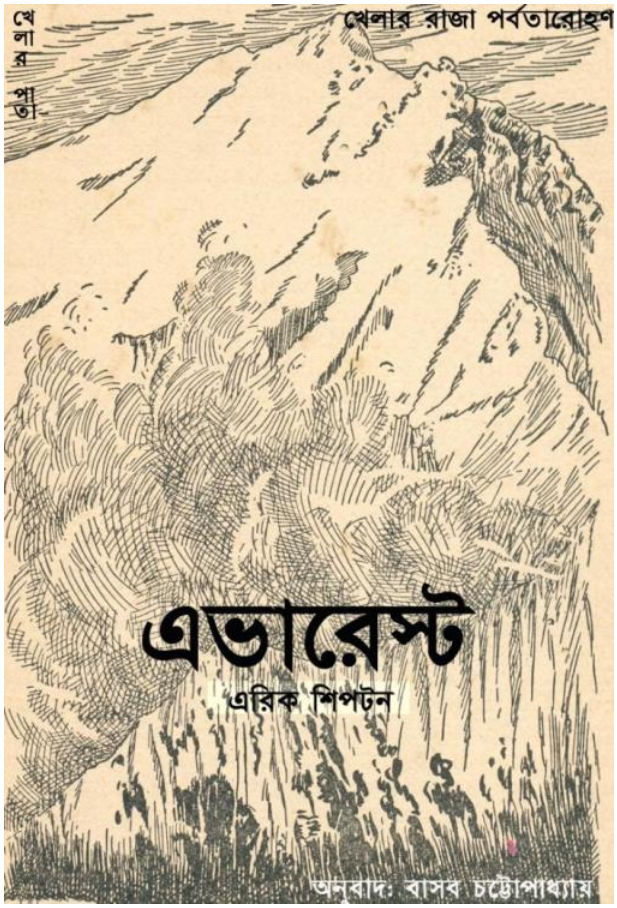
“পাগল তুমি! ভেলায় চড়ে?”

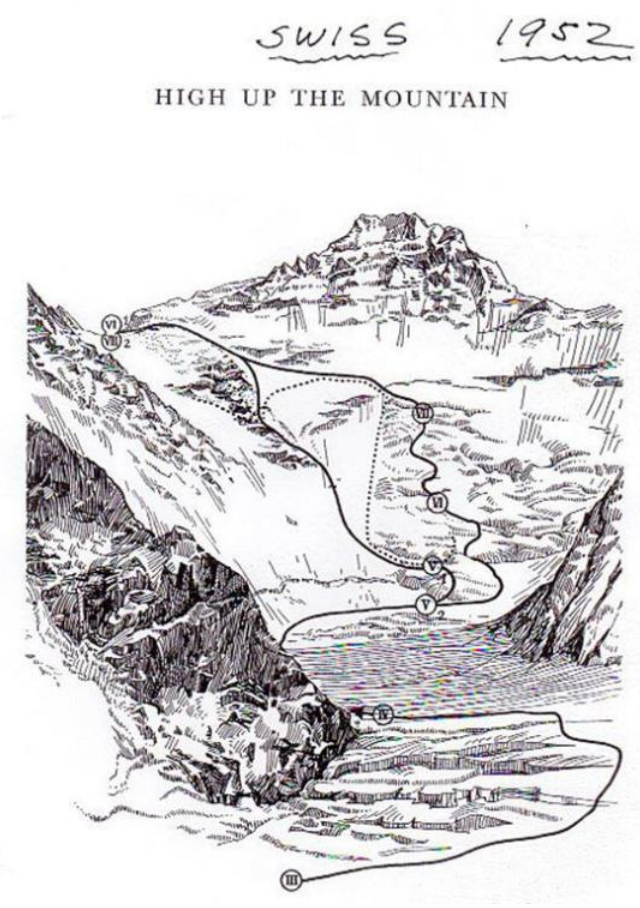
কার্ল ভেবে পেল না কী বলবে। অদ্ভুত জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। ভাবছিল আমি হেসে বলব, হ্যাঁ সত্যি সত্যিই ঠাট্টা করছি।

কিন্তু তা হল না। আমি স্পষ্ট দেখছিলাম আমার তত্ত্বটাকে বাস্তবিক কেউই গ্রহণ করতে পারছিল না তার কারণ পলিনেশিয়া আর পেরুর মাঝের দুস্তর সাগর।আর সেটাকে আমি কি না পার হতে চাইছি একটা প্রাগৈতিহাসিক ভেলায় চড়ে!

প্রসঙ্গ এড়াতে কার্ল বলল, চলো একটু পানশালায় ঘুরে আসা যাক। তো আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

১ চীনদেশের শিল্প ও সংস্কৃতিতে এমব্রয়ডারির স্থান খুবই বিশিষ্ট। রেশমকীট পালন ও তা থেকে রেশম তৈরির ইতিহাসের সমসাময়িক এই সূচীশিল্প, খৃষ্টজন্মেরও প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে। বিভিন্ন রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এর ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থেকেছে আধুনিক কাল অবধি। চীন দেশের অন্যতম চারিত্রিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট হিসেবে একে উল্লেখ করা যায়।





অবশেষে কঠিন পরিশ্রমে বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করে পশ্চিম CWM এর প্রবেশপথের কাছেই তৃতীয় শিবির স্থাপিত হল। সমস্যার সমাধান করেও পরবর্তী দূর্গমতম পথ এবং আইসফল অঞ্চল সেরপারা নিরাপত্তা বন্দনীতে সন্তর্পণে অগ্রসর হতে থাকল।

West CWM এর অন্তবর্তী আবহাওয়া তেমন প্রতিকূল ছিল না। সব সদস্যদেরই তৃতীয় শিবিরে নিয়ে আসা হয়েছিল, ফলে CWM -এ আরো একটি শিবির স্থাপিত হল। শুধু তাই নয় সাউথ কলের ঢালের নিচেও স্থাপিত হল পঞ্চম শিবির।

২৫ শে মে শৃঙ্গ আরোহণের জন্য সকলেই প্রস্তুত। Rene Ditter's পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হল শৃঙ্গের উদ্দেশ্যে প্রথম দলে থাকবেন Lambart, Flory, Aubert এবং সাতজন শেরপা। একদিনেই সাউথ কলে ষষ্ঠ শিবির স্থাপন করে তাদের মধ্যে তিনজন শেরপা ফিরে আসবে নিচের শিবিরে। ঐ দিনই বাকি শেরপাদের সহযোগিতায় অধিকতর উচ্চতায় দক্ষিণ-পূর্ব রিজ বরাবর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গা নির্বাচন করে একটি শিবির স্থাপিত হবে, যেখান থেকে শৃঙ্গ জয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবেন অভিযাত্রীরা। কিন্তু পরিকল্পনায় ছিল গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি, প্রথম লোটসে গাত্র আরোহণের সময় অভিযাত্রীরা অন্তবর্তী শিবির স্থাপন করেছিলেন। সে অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা একদিনেই সাউথ কল পৌঁছবেন প্রতিজ্ঞা করলেন। এই ভুল সিদ্ধান্তের ফলে অভিযাত্রীদের সাউথ কল পৌঁছনোর আগেই দূর্গমতম এবং কঠিনতম পথে খোলা আকাশের তলায় রাত কাটাতে হল (BIVOUAC)। সাউথ কল যখন অতিক্রম করলেন, অভিযাত্রীদের শরীর তখন ক্লান্ত অবসন্ন।

অভিযানে ব্যবহৃত অক্সিজেন ব্যবহারের যন্ত্রপাতি ছিল শৌখিন কিন্তু পূর্বে অপরীক্ষিত। ফলে ন্যুনতম সুবিধাও আরোহীদের ভাগ্যে জুটল না।

২৭ শে মে Lambert, Aubert, Flory এবং শেরপা তেনসিং দক্ষিণ গাত্র বরাবর অগ্রসর হলেন। সাথে একটি তাঁবু ব্যতীত কোনো আরোহণের সাজসরঞ্জাম বহন করেননি আরোহীরা। সিদ্ধান্ত হল (রিজ বরাবর) তাঁবু স্থাপন করে পরের দিন ফিরে আসবেন আরোহণের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ২৭৫০০ ফুট উচ্চে পৌঁছে Lambert স্থির করলেন একমাত্র শেরপা তেনসিং-কে সাথে নিয়ে ঐ শিবিরে রাত কাটাবেন। বাকী সদস্য ফিরে যাবেন নীচের কলে।

এটা একটি সাহসী সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও, আমি ভালো করেই বুঝতে পারছিলাম কতটা দ্রুততায় Lambert এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারণ উচ্চ হিমালয়ের প্রতিটা পদক্ষেপে চরম সংগ্রাম। নিচে নামার সুযোগ পেলে পুনরায় এই উচ্চতায় আসার তিক্ত অভিজ্ঞতা অভিযাত্রীদের যেন না ঘটে। এই দলভুক্ত একজন অভিযাত্রী শৃঙ্গজয়ের তীব্র বাসনায় যত দ্রুত সম্ভব আরোহণ করতে থাকলেন। শুধু তাই নয় ২৭০০০ ফুট উচ্চতায় স্লিপিং ব্যাগ এবং রান্নার স্টোভ ছাড়া রাত্রিযাপন একজন পর্বতারোহীর পক্ষে কতটা বিপজ্জনক তা অনুভব করা সম্ভব। এ হেন পরিস্থিতিতে যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু অভিযাত্রীরা সেই ভয়াবহ রাতে একে অপরকে বুকে জড়িয়ে উষ্ণতা বিনিময়ের দ্বারা শীতের প্রকোপ থেকে নিজেদের প্রাণপনে রক্ষা করলেন। পরের দিন ২৮০০০ ফুট উচ্চতায় না পৌঁছনো পর্যন্ত বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে এগিয়ে চললেন আরোহীরা।

৩০ শে মে Lambert এবং তেনসিং এর উল্লেখযোগ্য আরোহণ দক্ষতার পরিচয় দিলেন। অন্য দিকে সাউথ কলে শিবিরে থাকলেন Dittert, Chevalley, Asper, Hofstetter, Roch এবং দুজন শেরপা। আগামী তিন দিন এবং তিনরাত্রি ঝোড়ো হাওয়ার প্রকোপে অভিযাত্রীরা শিবিরবন্দী হয়ে রইলেন। ফলে সব অভিযাত্রী দলই শৃঙ্গ জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ১৯৫২ সালে নেপাল কর্তৃপক্ষের কাছে পাওয়া অনুমতির ভিত্তিতে সুইস অভিযাত্রীরা বর্ষার শেষে অভিযান শুরু করলেন। আট সদস্যের সেই দলের নেতৃত্বে (যাদের মধ্যে সাতজন অভিজ্ঞই পথপ্রদর্শক) Dr. Chevalley ছাড়াও ছিলেন Lambert।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই অভিযাত্রীরা বুঝেছিলেন এভারেস্ট অভিযানের অনুকূল সময় বর্ষাকাল। শীতের মরসুম জুড়ে প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার প্রকোপ থাকে। কিন্তু কোন কারণে সেই প্রবণতা যদি বসন্তকাল পেরিয়েও বন্ধ না হয় তাহলে উচ্চ হিমালয়ে বর্ষার মরসুমেও অভিযান অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি বর্ষা শেষ হয়। অক্টোবর মাসের অভিযানে ২৫০০০ ফুট উচ্চতায় তীব্র শীতের দংশন সহ্য করতে হয় আরোহীদের।

সুতরাং পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটিয়ে সুইস অভিযাত্রীদল ঝোড়ো হাওয়া ও তীব্র ঠান্ডা সহ্য করেও অগ্রসর হতে থাকলেন। কিন্তু সাউথ কলের দূর্ঘটনায় এক শেরপা সদস্যের মৃত্যুতে অভিযানে বিলম্ব ঘটল। অভিযাত্রীদের অগ্রগতি নভেম্বরের মাঝামাঝিও সম্ভব হল না।

সেইসময় তাঁরা CWM এর শীর্ষে এবং সাউথ কলের অন্তর্বর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করেছিলেন। ফলে পূর্ববর্তী অভিযানের অগ্রগতি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ১৯ শে নভেম্বরের অভিযানে সেই শিবির স্থানান্তরিত করে সাউথ কলে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন Peiss, Lambert এবং তেনসিং। শিবিরে ঘটেছিল তাঁদের এক ভয়ানক রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা। কষ্ট সহ্য করার অপরিসীম ক্ষমতা এবং দৃঢ়তার প্রমাণ দিতে হয়েছিল অভিযাত্রীদের। তীব্র ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে কোনো মানুষের পক্ষেই দীর্ঘক্ষণ জীবিত থাকা সম্ভব নয়। অবশেষে প্রকৃতির কাছে অভিযাত্রীরা পরাজয় স্বীকার করলেন।

ক্রমশ

সুইস অভিযানের অ্যালবাম





THE SWISS HEROES RETURN

The eleven-man Swiss expedition to the Himalayas returns to civilisation with a 'triple crown': despite illness and bad weather, they made the first-ever ascent of Mount Lhotse, then climbed Everest — twice in two days.

Photographed by MARC RIBOUD

ONE MAN AND HIS UMBRELLA AND HIS DOG. *Following at the heels of Albert Eggler, leader of the expedition, is the Tibetan Terrier presented him by the Lama of a Buddhist monastery at the foot of Everest.*

JURG MARMET, *one of four men from the expedition to reach the summit of Everest, weighs a Sherpa's load on his portable scales.*

IN THE FORESTS BELOW EVEREST—*everybody carried umbrellas. The Swiss mountaineers brought their own, the Sherpas had to improvise with straw matting. Higher up they found, and ate, stores of chocolate left by Sir John Hunt's expedition. Bad weather delayed the start, then one man developed appendicitis, and another caught pneumonia. Finally they conquered Mount Lhotse, fourth highest mountain in the world, which had defeated four expeditions since 1950. Within a week they'd climbed Everest twice — just three years after Hillary and Tenzing.*

MANY EXPEDITIONS *have passed through this Nepalese town, but all of them, carried unbroken, only one of them returned in triumph.*

AT 15,000 FEET *Fritz Luchsinger (left) developed appendicitis. But he recovered without an operation and helped conquer Mount Lhotse (27,890 feet). Ernst Schmid (centre) partnered Marmet on the first ascent of Everest.*

Continued overleaf


gettyimages
JARNOUX Maurice
162734254





অন্নপূর্ণা

মরিস হারজগ
অনুবাদঃ তাপস মৌলিক

উচ্চতার হিসেবে অন্নপূর্ণা (৮০৯১ মিটার) বিশ্বের ১০ নম্বর পর্বতশৃঙ্গ। ১৯৫০ সালে ৮০০০ মিটারের চেয়ে উঁচু প্রথম শৃঙ্গ হিসেবে অন্নপূর্ণা জয় করেন মরিস হারজগের নেতৃত্বে এক ফরাসী অভিযাত্রী দল। আটহাজারি শৃঙ্গগুলিতে মোট ২২টি বিফল অভিযানের পর তাদের এই সাফল্য সারা বিশ্বে হৈচৈ ফেলে দেয়। জয়ঢাকে ধারাবাহিকভাবে চলছে সেই অভিযান নিয়ে হারজগের লেখা রুদ্ধশ্বাস কাহিনী। এবারে একাদশ পর্ব।

শীর্ষচিত্রঃ ৫৩০০ মিটার উচ্চতা থেকে দেখা অন্নপূর্ণা উত্তরগাত্র, ফোটোঃ অন্নপূর্ণা অভিযান

সেই বিপুল বিস্তীর্ণ শুভ্র তুষারক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের বেচারা ছোট্ট দু'নম্বর ক্যাম্প অন্তহীন মহাসমুদ্রের মাঝে একফোঁটা ডিঙিনৌকোর মতো হারিয়ে গেল। চারপাশে দূর দূর থেকে অবিরাম তুষারধ্বসের আওয়াজ কানে আসছিল, কিন্তু ঠিক কোথায় যে ধ্বস নামছে কিছু বুঝতে পারছিলাম না। মোটামুটি নিরাপদ জায়গাতেই তাঁবু ফেলেছি এই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। কনকনে ঝোড়ো হাওয়া আর তুষারের ঝাপটার মধ্যে আইসঅ্যাক্স দিয়ে তাঁবু ফেলার মতো ছোটো একটু জায়গা সমতল করে নিয়ে টেন্ট খাটাতে ঘন্টাখানেক সময় লেগেছিল, তারপরই তড়িঘড়ি সবাই তাঁবুর ভেতর স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণ আরামে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

আমি আর শ্যাজ যে তাঁবুটায় ছিলাম সেটা ছিল এই অভিযানের জন্য বিশেষভাবে তৈরি তাঁবুগুলির মধ্যে প্রথম পরীক্ষামূলক তাঁবু, এটাকে নমুনা করেই বাকি চৌদ্দটা তাঁবু তৈরি হয়েছিল। সুবিধে হচ্ছে এই তাঁবুটা অন্যগুলোর চেয়ে সামান্য বড়ো। শ্যাজ বলল তাঁবুর প্রবেশপথের উল্টোদিকে মাথা রেখে শুলে নাকি ঘুম ভালো হবে, কিন্তু ওরকম বিচ্ছিরি রাত আমি কখনও কাটাইনি। একটু পরপরই মনে হচ্ছিল যেন দম বন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছি, আর ঘুমের তো দফারফা! জীবনে আর কোনওদিন তাঁবুর দরজার উল্টোদিকে মাথা রেখে শোব না। দরজার দিকে মাথা রাখলে চেনটা মাঝেমধ্যে অল্প ফাঁক করে ভেতরে একটু হাওয়াবাতাস খেলানো যায়। এমনিতে অবিশ্যি

শ্যাজের মতো সঙ্গীর জুড়ি নেই। দিব্যি আরাম করে স্লিপিং ব্যাগের ভেতর শুয়ে শুয়ে দেখলাম শ্যাজ রান্না চড়াল, যত্ন করে মেসটিনে ডিনার সার্ভ করল, আমি স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে আধশোয়া অবস্থাতেই খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম, একটু উঠতে অবধি হল না।

এদিকে আমরা যখন দু'নম্বর ক্যাম্পে যতটা পারি আরামে থাকার চেষ্টা করছি, নিচে এক নম্বর ক্যাম্পে টেরের অবস্থা তখন সঙ্গিন। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে সে অর্ধেক রাত জেগেই বসে রইল, তারপর যখন দেখল তুষার পড়ে পড়ে তার মাথা অবধি প্রায় ঢেকে ফেলেছে, বরফের ইগলুর ভেতর মমি হয়ে থাকা একটা মানুষের মতোই লাগছে নিজেকে, তখন যা হয় হবে ভেবে সরকির স্লিপিং ব্যাগটার মধ্যে মাথা- টাথা ঢুকিয়ে চেন বন্ধ করে দিল। দম বন্ধ হলে হবে 'খন, আগে তো ঘুমোনো যাক! ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে ঘুম নেমে আসতে দেরি হল না, ওইভাবেই সে বাকি রাত কাটিয়ে দিল।

পরদিন ১৯,৩৫০ ফিট উচ্চতায় দু'নম্বর ক্যাম্পে বেলা ন'টার সময় যখন ঘুম ভাঙল আমাদের তখন সূর্যের আলোয় চারপাশ যথেষ্ট গরম হয়ে উঠেছে। তাঁবুর ক্যানভাসের কাপড় ভেদ করে আসা সোনালি আলোয় ভেতরটা মায়াবী লাগছে। কিন্তু পায়ে জুতো গলাতে গিয়ে সবার একেবারে নাজেহাল অবস্থা – দেখি বরফে, ঠান্ডায় জুতোগুলো এক- একটা শক্ত থান ইটের মতো হয়ে গেছে। এরপর থেকে আমি সবসময় আমার জুতোজোড়া নিজের স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে নিচের দিকে রাখতাম।

তাঁবুর দরজা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দেখি - আকাশ ঘন নীল, অসাধারণ দৃশ্য চারদিকে, যেদিকেই তাকাই একের পর এক তুষারশৃঙ্গ আর সুউচ্চ সব গিরিশিরা, শৃঙ্গগুলির বেশিরভাগই ২৩,০০০ ফিটের চেয়েও উঁচু। আমাদের খুব কাছেই মাথার ওপরে অন্নপূর্ণার সেই ভাঙাচোরা গিরিশিরাটা, উত্তর- পশ্চিম উপগিরিশিরা ধরে আমরা আগে যে পথে ওঠার বৃথা চেষ্টা করেছিলাম। এখান থেকে ওই গিরিশিরা বরাবর আগাগোড়া পথটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সে পথের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র আমরা এগোতে পেরেছিলাম। তাছাড়া, অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলাম, ভাঙাচোরা গিরিশিরাটা চূড়ো অবধি গিয়েছে বটে, কিন্তু তার মাঝপথে এক বিশাল দুর্লঙ্ঘ্য ফাঁক, ও পথে শৃঙ্গজয়ের সমস্ত সম্ভাবনায় জল ঢালার পক্ষে যা যথেষ্ট। উপগিরিশিরার পথ থেকে আমায় আর টেরেকে যে ফিরে আসতে হয়েছিল, সে ব্যাপারে আর কোনও আপশোশ রইল না তাই।

দূর পশ্চিমে একটি স্বচ্ছ স্ফটিকখন্ডের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ধৌলাগিরি শৃঙ্গ, অপেক্ষাকৃত কাছে গর্বিত ভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দুর্গম নীলগিরি। তার ডাইনে, আমাদের লিলিপুট ক্যাম্পের ওপর মাথা উঁচু করে অন্নপূর্ণা হিমালের সেই দৈত্যাকার তুষারপ্রাচীর, খাড়া নেমে গেছে মিরিস্তি খোলা নদীর গিরিখাতে। তারও ডানদিকে এক বিশাল হিমবাহের পরে সেই সুদৃশ্য কালো ত্রিকোণাকৃতি শৈলচূড়াটি যাকে আমরা পূর্ব তিলিচো পাস থেকে দেখেছিলাম। ঘুরে দাঁড়ালাম। চোখের সামনে এক বিশাল তুষারাবৃত পর্বতগাত্র সূর্যালোকে ঝকমক করছে, এখানে সেখানে তার বড়ো বড়ো বরফের চাঁই ঝুলে আছে, ফাটলে ফাটলে আকীর্ণ তার গা। সেই পর্বতগাত্র বরাবর তাকালে অনেক ওপরে, এত ওপরে যে দেখতে হলে পেছনদিকে ঘাড় হেলাতে হয়, চারপাশের এই সবকিছুর – এ বিশ্বসংসারের সর্বময়ী কর্ত্রীর মতন বিরাজ করছেন দেবী অন্নপূর্ণা।

চিন্তিত মুখে সেই তুষারাবৃত পর্বতগাত্রের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আমি। এ পথেই আমাদের উঠতে হবে! তার সামনে আমাদের সাজসরঞ্জাম আর ক্ষমতাকে নেহাতই তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছিল। কীভাবে এগোনো যায় ভাবছিলাম। কত কী যে মাথায় রাখতে হবে আমায়! দলের সকলের স্বাস্থ্য, যন্ত্রপাতি- সাজসরঞ্জামের সীমাবদ্ধতা, বিঘ্ন- বিপদ এবং আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকা, আর সবার ওপরে সময়। সময় নেই হাতে একদম! ভাবতে বসলে মাথায় জট পাকিয়ে যায়। কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেলেছি, যাই হোক না কেন এগিয়ে যাব। আবহাওয়া যেরকমই হোক না কেন, একের পর এক ক্যাম্প স্থাপন করে এগোতে থাকব, একটানা তুষারঝড় শুরু না হলেই হল।

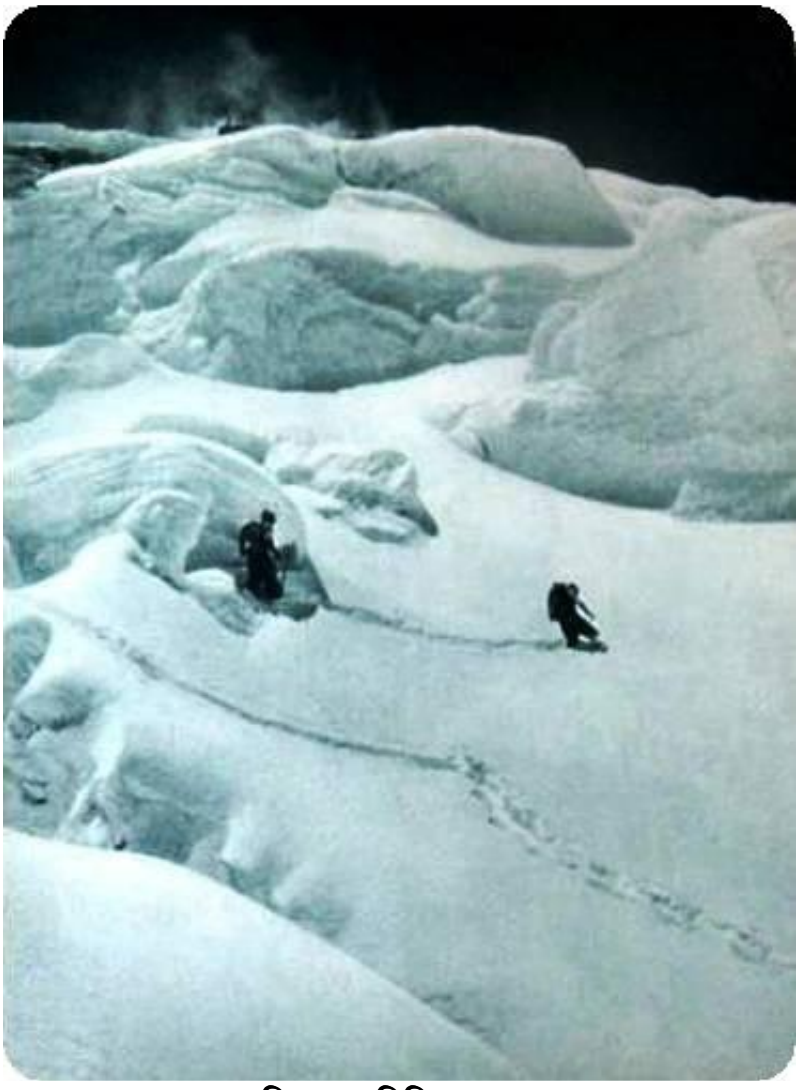
নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে ব্যাপারটা একটা গাণিতিক সূত্রের মতো – প্রতিদিন যত বেশি সম্ভব রসদ এবং সাজসরঞ্জাম যতটা সম্ভব ওপরে তুলে নিয়ে গিয়ে ডাঁই করা, সেইসঙ্গে খেয়াল রাখা শৃঙ্গজয়ের লক্ষ্যে চূড়ান্ত অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় যথেষ্ট শক্তি যেন সদস্যদের শরীরে সঞ্চিত থাকে। অভিযানের এই পর্যায়ে এত উচ্চতায় সবারই শক্তিক্ষয় হতে বাধ্য; খেয়াল রাখতে হবে শরীর যেন খুব ভেঙে না পড়ে, দরকারের সময় শরীর ও মনের সঞ্চিত শক্তি ও প্রতিজ্ঞার শেষ বিন্দুটুকু অবধি যেন আমরা নিংড়ে বার করে আনতে পারি। এখান থেকে নেমে যে আমাদের ফিরে যেতে হবে সে কথাও ভুলে গেলে চলবে না।

সকালে দেখলাম গতকালের প্রচণ্ড পরিশ্রমের কথা শরীর বেমালুম ভুলে গেছে, দিব্যি ঝরঝরে লাগছে। এই সুন্দর ঝকঝকে আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে আরও ওপরে উঠে তিন নম্বর ক্যাম্প স্থাপন করার জন্য সবাই প্রস্তুত। বুটের ওপর গেইটার চাপিয়ে সবাই হালকা ক্র্যাম্পন বেঁধে নিলাম। এখান থেকে প্রায় সবসময়ই আমাদের ক্র্যাম্পন ব্যবহার করতে হয়েছে। একটা তাঁবু আমাদের সঙ্গে নিলাম, একটা তাঁবু যেরকম আছে রইল, তার ভেতর কিছু খাবারদাবারও রাখা থাকল। একেকজনের বোঝার ওজন দাঁড়াল প্রায় ২২ পাউন্ড। ক্যাম্প ছাড়ার আগে সেই সুবিশাল পর্বতগাত্রটি আরেকবার ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। অগুন্তি খাড়া খাড়া বরফের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে কী করে এগোব তা আগেভাগেই একটু ছকে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, কেননা একবার ওই গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়লে সামনে পঞ্চাশ গজের বেশি দৃষ্টি চলবে না।

কাল রাতে তাঁবুতে যে যার পার্টনার ছিলাম সেভাবেই দুটো টিমে ভাগ হয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিলাম, ল্যাচেনাল আর রেবুফত এক দড়িতে, দ্বিতীয় দড়িতে শ্যাজ আর আমি। প্রায় দশটা বাজে, আর দেরি করা ঠিক নয়। দু'নম্বর ক্যাম্পে রেখে যাওয়া তাঁবুটা ভালো করে বন্ধ-টন্ধ করে আমরা রওনা দিলাম। কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে শৃঙ্গের একদম কাছাকাছি এক ঢাল থেকে নেমে আসা একটা তুষারধ্বসপ্রবণ বিপজ্জনক নালা, ধ্বস নেমে নেমে তার পায়ের কাছে বিশাল এক তুষারের ঢিবি হয়ে আছে। ওই ঢিবি অবধি রাস্তায় ফাটল খুব একটা নেই, তাই সরাসরি সেদিকে এগোতে শুরু করলাম। তুষারে পা ফেলতেই ঠান্ডায় পা প্রায় জমে যাওয়ার যোগাড়, অথচ বাতাস এত গরম যে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্যাকেট-ফ্যাকেট সব খুলে ফেলতে হল। ক্রমশ কঠিন বরফ আর তুষারে ঢাকা সেই উঁচু উঁচু দেওয়ালগুলোর চক্রব্যূহে ঢুকে পড়লাম। বাঁদিকে একটা গিরিশিরা দেখে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম; পুরো গিরিশিরাটা বিশুদ্ধ কঠিন বরফ দিয়ে গড়া, একেবারে স্বচ্ছ নীল; সকালের সূর্যের তেরচা আলোয় প্রায় কাচের মতো লাগছে। আর ডানদিকে দুধের মতো সাদা অন্নপূর্ণার সেই এবড়োখেবড়ো উত্তর-পশ্চিম গিরিশিরা যেন আমাদের সঙ্গে মজা করছে, "দেখি তো আমার মতো উঁচুতে উঠতে পারো কিনা!!" এ এক অদ্ভুত জগত! এখানে সবকিছুই যেন উল্লম্ব, আকাশ তাক করে খাড়া উঠে গেছে! মাঝে মাঝে ভারসাম্যের বোধটাই কেমন ওলটপালট হয়ে যায়। দূর থেকে দেখে এ দুনিয়ার তাজ্জব ব্যাপারস্যাপার বিন্দুমাত্র আঁচ করা সম্ভব নয়।

একঘন্টা চলার পর আমরা সবে নালার পাদদেশে সেই তুষারের স্তূপটার কাছে পৌঁছতে পারলাম। হাজার হাজার টন বরফ সেখানে ধ্বসের সঙ্গে নালা বেয়ে নেমে তালগোল পাকিয়ে আছে। খাড়া নালাটার যত কাছে এগোলাম চড়াই তত কঠিন হল। এই নালাটা বেয়ে অনবরত তুষারধ্বস নেমে চলে। মাঝে মাঝেই বরফের বড়ো বড়ো চাঁই ভেঙে পড়ার আওয়াজে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। এটা আমাদের পেরোতে হবে ভাবলেই তো প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হয়ে যাচ্ছে! খুঁজে খুঁজে বার করা গেল কোথায় নালাটা সবচেয়ে সরু, সেখান দিয়ে পেরোলে ধ্বসের আশঙ্কায় কাটানো সময়টা অন্তত কমবে। অন্নপূর্ণার এই পর্বতগাত্রের ওপরদিকের ঢাল থেকে যে তুষারধ্বসই নামুক না কেন তা এই নালা বেয়েই নামতে বাধ্য। তবে এই মুহূর্তে কিছু নামছে না! ল্যাচেনাল প্রথমে পেরিয়ে গেল। তারপর

তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে একে একে অন্যদের পালা। একজন করে পেরোয়, বাকিরা উত্তেজনায় টানটান হয়ে দম বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে। আমাদের পারাপারের রাস্তার ঠিক ওপরে একটা মস্ত কঠিন বরফের খন্ড তাকের মতো নালার একপাশ থেকে খানিকটা বেরিয়ে আছে, ছায়াতে থাকায় স্বচ্ছ সবুজ একটা মার্বেলখন্ডের মতো লাগছে সেটা। তাকটা ছাদের মতো কিছুটা হলেও আমাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে, তবে ওপর থেকে সত্যিই ধ্বস নেমে এলে ওতে কতটা আটকাবে বলা মুশকিল।



তিন নম্বর শিবিরের পথে

সব ঠিকঠাকই চলল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নালাটা পেরিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উল্টোদিকে উঠে এলাম সবাই। বিশ্রাম নেবার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, কারণ এদিকের ঢালটা এতই খাড়া যে নরম তুষার ধরে রাখতে পারেনি, পুরোই শক্ত বরফ। এগিয়ে চলা ছাড়া গতি নেই। ল্যাচেনাল আর রেবুফত আইসঅ্যাক্স দিয়ে চটপট ছোট্ট ছোট্ট ধাপ কেটে এগিয়ে গেল, এতই ছোটো ধাপ যে ক্র্যাম্পনের শুধু সামনের দুটো কাঁটাই ওতে রাখা যায়। বরফ প্রায় কাচের মতো; কঠিন, স্বচ্ছ। আইসঅ্যাক্সের ফলার আঘাতে তীক্ষ্ণ আওয়াজে ভেঙে গিয়ে ছোটো ছোটো টুকরোগুলো বিদ্যুৎগতিতে যেন নিচে মহাশূন্যের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। পর্বতগাত্র থেকে বেরিয়ে থাকা বিশাল বিশাল বরফখন্ডের নিচ দিয়ে দিয়ে আমরা ডানদিকে এগিয়ে চললাম। তারপর এক সঙ্কীর্ণ স্নো- ব্রিজ পেরিয়ে তুষারে ঢাকা একটা ছোট্ট চাতালে উপস্থিত হলাম। অবশেষে বিশ্রাম নেবার মতো একটা জায়গা পাওয়া গেল! ভাগ্য ভালো আজ আবহাওয়া এখনও অবধি চমৎকার। পেঁজা তুলোর মতো কয়েকখন্ড সাদা মেঘ ঘন নীল আকাশে আলগোছে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আমাদের পায়ের তলায় এখন সেই সুবিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্র দু'নম্বর ক্যাম্পকে বুকে নিয়ে পড়ে আছে। ছোট্ট তাঁবুটা প্রথমে খুঁজেই পাচ্ছিলাম না, শেষে আমাদের উঠে আসার পদচিহ্ন অনুসরণ করে দেখতে পেলাম। ওপরে, আমাদের রাস্তার পরবর্তী পর্যায় খুব একটা সুবিধের নয়। একটা চড়াই তুষারঢাল বেয়ে দেড়শ ফিট মতো উঠলে পরে এক্কেবারে খাড়া এক বিশাল কঠিন বরফের দেওয়াল পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, ডানদিক বাঁদিক কোনওদিক দিয়েই এগোনোর রাস্তা নেই। আরোহণের এই পর্যায়েই যদি এরকম সব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, আরও ওপরে না জানি কী হবে!

শ্যাজ আর আমি তেড়েফুঁড়ে তুষারঢাল ধরে এগিয়ে গেলাম। দেখি কোমর অবধি তুষারে ডুবে গেছি, আর নরম তুষারের নিচে কঠিন পেছল বরফে পা হড়কে ফের নিচে নেমে আসছি। দু'হাত দিয়ে একটা পা টেনে তুললাম আমি, তারপর আইসঅ্যাক্সটা যতটা সম্ভব ওপরে গেঁথে ওটা ধরে টেনে পেছনের পা-টা ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম – পিছলে গিয়ে ফের যেখানে ছিলাম সেখানেই! ওদিকে পরিশ্রমের চোটে বুক তখন হাপরের মতো ওঠানামা করছে। শেষমেশ নরম তুষার দু'পাশে সরিয়ে চলার মতো সরু একটা নালা কাটতে হল। ওই দেড়শ ফিট এগোতেই আমাদের এক ঘন্টা লেগে গেল। বিশাল বরফের দেওয়ালটার কাছে পৌঁছে ওই চড়া রোদ্দুরেও ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছিলাম আমরা। দেওয়ালটা খুঁটিয়ে দেখা গেল। একটা চওড়া তুষারে ঢাকা ফাটল, প্রায় একটা সরু গলির মতো, দেওয়ালটা বেয়ে উঠে গেছে। ফাটলটার মাথায় একটা বিশাল বরফখন্ড ওভারহ্যাং অবস্থায় অর্থাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। প্রথমে ফাটলটা ধরে ধাপ কেটে কেটে ওঠা চলতে পারে, তারপর ওভারহ্যাং টপকে দেওয়ালের ওপরে কীভাবে পৌঁছব সেটা দেখা যাবে। ল্যাচেনাল আর রেবুফতকে বললাম, এ পথে ওভারহ্যাং পেরিয়ে দেওয়ালটার মাথায় পৌঁছতে অন্তত দু'ঘন্টা সময় লাগবে; আমি আর শ্যাজ চেষ্টা করি, ততক্ষণ ওরা খুঁজে দেখুক ডানদিক বাঁদিক দিয়ে দেওয়ালটা এড়িয়ে ওপরে ওঠার কোনও সহজতর রাস্তা পাওয়া যায় কিনা।

আমার স্নো গগলসটা ঘাম আর তুষারকুচি-গলা জলে ঝাপসা হয়ে গেছিল। রুমাল দিয়ে মুছব বলে ওটা খুলতেই চোখ একদম ধাঁধিয়ে গেল। অনন্ত এই তুষারের রাজ্যে প্রখর সূর্যালোকের প্রতিফলনে যে প্রচণ্ড ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি হয় খালি চোখে তা সহ্য করা যায় না। বহুদূরে নিচে সবুজ উপত্যকায় চোখ রেখে ক্ষণিকের আরাম পাওয়া গেল। রোদচশমা ফের পরে নিয়ে কোমরের দড়িটা একবার দেখে নিলাম ঠিকঠাক বাঁধা আছে কিনা, কতগুলো আইস পিটন (শক্ত বরফে গাঁথার গজাল) আছে গুণে নিলাম, পিটন পোঁতার হাতুড়িটা কোমরে ঝুলছে কিনা দেখলাম, তারপর শ্যাজ বিলে করার জন্য তৈরি আছে দেখে বললাম, "এগোচ্ছি আমি, একটু একটু করে দড়ি ছাড়ো।"

শ্যাজ শক্ত করে ওর আইস অ্যাক্সটা বরফে পুঁতে আমাদের দু'জনের কোমরে বাঁধা দড়িটা তাতে বেড় দিয়ে নিয়েছে। একটু ঢিল দিয়ে বলল, "এগোও।"

এই উচ্চতায় যে কোনওরকম শারীরিক কসরত এক ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। আইসঅ্যাক্স দিয়ে এক একটা ঘা মারি আর হ্যা হ্যা করে হাঁপাই, এভাবে কোনওরকমে ফাটলের নিচের অংশটা প্রথমে পরিষ্কার করলাম। খাড়া বরফের দেওয়ালের গা বেয়ে ফাটলটা তেরচাভাবে ওপরদিকে উঠে গেছে। ফাটলের ভেতর জমে থাকা তুষারও যথেষ্ট শক্ত আর জমাট ছিল। শেষমেশ তিন ফিট লম্বা আর ফুটখানেক গভীর একটা অংশ পরিষ্কার করে তার ভেতরে নিজেকে গুঁজে দিলাম, তারপর ফাটল ধরে ঘষটে ঘষটে এগোতে শুরু করলাম। প্রথম কয়েক গজ প্রায় অনুভূমিকভাবে এগোতে হল, তারপর ফাটলটা ওপরদিকে উঠতে শুরু করল, সেই সঙ্গে ক্রমশ সরু ও অগভীর হতে থাকল। যতটা ওপরে হাত যায় আইসঅ্যাক্স গেঁথে সেটা ধরে শরীরটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে টেনে ওপরে তুলে ফাটলের একেবারে ওপরের প্রান্তে পৌঁছে গেলাম, আমার মাথা গিয়ে ঠেকল সেই ওভারহ্যাং হয়ে থাকা বরফখন্ডটায়। সেখানে ফাটলটার গভীরতা এতই কম যে পুরো শরীরটা ভেতরে সেঁধিয়ে রাখা মুশকিল, বাইরের দিকে গড়িয়ে পড়ার ভয় সবসময়। উপুড় হয়ে শুয়ে ডানহাতে দেওয়ালে গেঁথে রাখা আইসঅ্যাক্সটা

ধরে কোনওরকমে ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছিল। আমার বাঁহাত ফাটলের ভেতরদিকে, সেদিকে ধরার কিছু নেই। এবার মাথার ওপরের ওই বরফের চাঁইটা টপকাতে হবে। খুব সাবধানে, ব্যালেন্স বজায় রেখে, ডানহাতের আইসঅ্যাক্সটা দেওয়াল থেকে খুলে নিয়ে সেটা দিয়ে ছোটো ছোটো ঘা মেরে বরফখন্ডটার তাকের মতো বেরিয়ে থাকা অংশটুকু ভাঙতে শুরু করলাম। বাঁ হাতে কিছু ধরা নেই, তাই জোরে ঘা মারতে পারছিলাম না। ছোটো ছোটো বরফের টুকরো আলগা হয়ে নিচে শ্যাজের মাথায় ঝরে পড়তে লাগল, সে তখন হাতের দড়িটা ধরে উত্তেজনায় টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাতে আমি পড়ে গেলে সামলাতে পারে। এভাবে কিছুটা ভাঙার পর তাকটার ঠিক নিচে আইসঅ্যাক্স দিয়ে মেরে বাঁ হাতে ধরার জন্য একটা খাঁজ বা হোল্ড কাটলাম, তারপর ডানহাতে আইসঅ্যাক্সটা ওপরে গেঁথে সেটা ধরে শরীরটা ধীরে ধীরে হেঁচড়ে তুলে বাঁ হাতে খাঁজটা ধরে ফেললাম। এবারে বাঁ হাতে অবলম্বন পেয়ে গেছি, তাই ডান হাতের আইসঅ্যাক্স দিয়ে তাকটার ঠিক কিনারায় বাঁ হাতে ধরার জন্য বেশ ভালো করে একটা খাঁজ বানালাম, তারপর অ্যাক্সে ভর দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে শরীরটা তুলে সেই খাঁজ ধরে ঝুলে পড়লাম। পেছন থেকে আমার শরীরের ওপর শ্যাজের একাগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি যেন স্পর্শের মতো অনুভব করতে পারছিলাম। এবার বাঁ হাতে ঝুলে ঝুলে তাকটার ওপরদিকে দুটো ধাপ কাটলাম, যাতে ওভারহ্যাং টপকাবার পর সেখানে পা রেখে কিছুটা সময় অন্তত বিশ্রাম নিতে পারি। কিন্তু এখনই তাকটা টপকে ওপরে উঠে যাওয়া ঠিক নয়, কারণ দড়িতে কুলোবে কিনা আমি নিশ্চিত নই। ওপরে ঠিকঠাক নিরাপদভাবে দাঁড়িয়ে বিলে করার মতো জায়গা কত দূরে পাওয়া যাবে জানা নেই। ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে হয় না, তাই ফের সেই ফাটলে আগের জায়গায় নেমে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে রেল ইঞ্জিনের মতো খানিক হাঁপালাম, তারপর ডানহাতের আইসঅ্যাক্সটা খাড়া বরফের দেওয়ালে পেরেকের মতো অনেকটা গেঁথে ওতে দড়িটা গলিয়ে শ্যাজকে হাঁক দিলাম উঠে আসার জন্য। গিরগিটির মতো শ্যাজ ফাটল বেয়ে উঠে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর মাথা এসে ঠেকল আমার পায়ের নিচে। আমি ওপরে উঠে যাওয়ামাত্র ও আমার জায়গায় উঠে এসে আমার আইসঅ্যাক্সটার সাহায্যে আমায় বিলে করবে, আর ওর অ্যাক্সটা বাড়িয়ে দেবে আমাকে।

শ্যাজ উঠে আসা অবধি কিছুক্ষণ বিশ্রাম পাওয়া গেছিল, এবার ফের আমার পালা। গেঁথে রাখা আইসঅ্যাক্সটার ওপর পা রেখে উঠে আমি বাঁ হাতে তাকের খাঁজটা ধরে ঝুলে পড়লাম। আমার হাতে অ্যাক্স নেই, তাই নিরাপত্তার জন্য ডান হাতে কোমর থেকে খুলে পিটন গাঁথার হাতুড়িটা নিয়ে নিয়েছিলাম, যদিও ওতে আইসঅ্যাক্সের কাজ হয় না। পরিকল্পনামাফিক শ্যাজ আমার ছেড়ে আসা জায়গায় উঠে এসে বিলে করার জন্য তৈরি হয়ে নিল, আর ওর অ্যাক্সটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমি পেছনদিকে না তাকিয়েই ডান হাতে অ্যাক্সটা নিয়ে নিলাম, তারপর 'হেঁইয়ো মারি জোরসে' বলে ঘুরিয়ে যথাসম্ভব জোরে কয়েক ফিট ওপরে অ্যাক্সের ফলাটা গেঁথে ফেললাম। পা দুটো তখন শূন্যে ঝুলছে আমার। তারপর দু'হাতের জোরে প্রাণপণ চেষ্টায় ইঞ্চি ইঞ্চি করে শরীরটা ওপরে টেনে তুলতে লাগলাম। কতক্ষণ লাগল জানি না, মনে হল এক যুগ পরে, ডান হাঁটুটা ওভারহ্যাং টপকে আগে থেকে কেটে রাখা দুটো ধাপের নিচেরটায় পৌঁছতে পারলাম। ওফফফ... কিছুটা স্বস্তি!! এরপর শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে এক ঝটকায় হাঁটুর জায়গায় ডানপায়ের বুটটা নিয়ে গেলাম... কিন্তু ক্র্যাম্পনের কাঁটাগুলো ঢুকল কি? না। কাঁটাগুলো বরফে গেঁথে না গেলে পায়ে ভর দিয়ে উঠব কী করে? পিছলে যাবে যে!! দুটো কাঁটা ঢুকলেও চলবে... মারো চাপ... একটা ঢুকেছে... আবার চেষ্টা করি... হ্যাঁ... এবারে দুটো ঢুকেছে... হেঁইয়ো মারি জোরসে... উঠে পড়লাম ওপরে!! এরপর আর এক হ্যাঁচকায় বাঁ পাটাও গেঁথে দিলাম আগে থেকে কেটে রাখা দ্বিতীয় ধাপটায়।

"উফফফ... উঠে পড়েছি!! যাচ্ছেতাই ব্যাপার... এ একটা রুট হল??"

শ্যাজ অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিল, অবশেষে আমার গলা পেয়ে বলল, "বাহ, দারুণ মরিস, ওয়েল ডান।"

"তুমি নড়ো না এখনও, দড়িটা এক গজ ছাড়ো।"

জায়গাটা ঠিকঠাক ভারসাম্য রেখে দাঁড়াবার পক্ষে একেবারেই জুতসই নয়, তাই একমুহূর্তও না থেমে কঠিন বরফে ধাপ কেটে কেটে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে চললাম। কয়েকগজ দূরে ঢালটা সহজ হয়ে এল, নরম তুষারে এসে পড়লাম। বেশ বড়ো একটা ধাপ কেটে দু'পায়ে ভালো করে দাঁড়িয়ে শ্যাজের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললাম, "আরেকটু অপেক্ষা করো। আরও দশ ফিট দড়ি ছাড়ো, একটা পিটন পুঁতে দড়িটা অ্যাংকর করে দি।"

হাওয়ার জোর ক্রমশ বাড়ছে। নিচ থেকে শ্যাজের উত্তর আবছা ভেসে এল, "ঠিক আছে।"

অমানুষিক পরিশ্রমে বুকটা এমন ধ্বক ধ্বক করছিল যে মনে হচ্ছিল এই বুঝি ফেটে যায়। ওই ঠান্ডাতেও কপাল আর ঘাড় বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছিল। আইসঅ্যাক্সে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট চোখ বন্ধ করে রইলাম, তারপর ফের ধাপ কেটে কেটে এগিয়ে চললাম। বরফ এখানে দানা দানা হয়ে জমাট বেঁধে আছে, কাচের মতো নিরেট নয়, তাই খুব বেশি পরিশ্রম করতে হল না। ওভারহ্যাং- এর বাধাটা তো পেরিয়ে এসেছি, সে তুলনায় এ পথ কিছুই নয়। আর এক গজ এগোলেই সোজা হয়ে দু'পায়ে দাঁড়াবার একটা দুর্দান্ত জায়গা পেয়ে যাব। অ্যাক্স দিয়ে কঠিন বরফের ছোট্ট সমতল জায়গাটা পিটন পোঁতার জন্য পরিষ্কার করে নিলাম। বরফের গুঁড়ো আর তুষারকুচি ওভারহ্যাং বরফের চাঁইটা বেয়ে নিচে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়তে লাগল। শ্যাজ এখনও সেই ফাটলে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, কী ভাবছে কে জানে! চেঁচিয়ে বললাম, "আর এক মিনিট।"

আমার কোমরে মাছ ধরার বঁড়শির মতো দেখতে প্রায় এক হাত লম্বা এক বিশাল আইস পিটন ঝোলানো ছিল, তার অর্ধগোলাকৃতি হুকটার ভেতরে আবার খাঁজ খাঁজ কাটা। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে সেটা বরফে পুরো গেঁথে ফেললাম। বরফ এখানে খুব একটা শক্ত নয়, ভয় হল হুকটা খুলে বেরিয়ে আসবে না তো? অবশ্য হুকের গজালটার চারপাশের বরফ ফের জমে গিয়ে শক্ত করে ধরে রাখবে ওটা। এরপর আমার অতিরিক্ত দড়িটা বার করলাম। শুকনো পরিষ্কার সাদা দড়িটা থেকে ছুরি দিয়ে ছ'ফিটের একটা টুকরো কেটে হুকের সঙ্গে ফাঁসের মতো আটকে দিলাম, তারপর বাকি প্রায় ষাট ফিট লম্বা দড়িটা সেই ফাঁসে বেঁধে নিচে ঝুলিয়ে দিলাম। ওভারহ্যাং বরফখন্ডটার ওপর দিয়ে দড়ি নিচে ঝুলে পড়ল – আমাদের অভিযানের প্রথম ফিক্সড রোপ।

আগে একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত এটা। ঝুলে পড়লাম দড়িটা ধরে, কিছুটা নেমে দড়ি ধরে ফের উঠে এলাম আগের জায়গায়। নাঃ, ঠিকই আছে!

হাঁক দিলাম, "শ্যাজ, এবার উঠে আসতে পারো তুমি।"

"ঠিক আছে। রওনা হওয়ার সময় জানাচ্ছি।"

শ্যাজ রুকস্যাকটা ফাটলের ভেতর খুলে রেখেছিল, সেটা কাঁধে চাপিয়ে তৈরি হয়ে নিল। একটু পরেই তার গলায় পর্বতারোহীদের চেনা কমান্ড শোনা গেল, "আই অ্যাম কামিং।"

আমি শক্ত করে কোমরের দড়িটা ধরে বিলে করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম।

শ্যাজ ফিক্সড রোপ ধরে ঝুলে পড়ল। কিছুক্ষণ বেশ ঘষটাঘষটির আওয়াজ পেলাম, তারপর ওভারহ্যাং বরফখণ্ডটার কিনারা থেকে একটা নোংরা টুপিপরা মাথা উঁকি দিল, তারপর রোদে পোড়া কালো একটা মুখ। একেকজনের মুখের যা ছিরি হয়েছে আমাদের! বাড়ির লোকে চিনতে পারলে হয়! ক্র্যাম্পন আর আইসঅ্যাক্স বরফে গেঁথে গেঁথে দড়ি ধরে শ্যাজ চলে এল আমার পাশে; ওভারহ্যাং পর্ব খতম হল ভালোয় ভালোয়।

হঠাৎই সূর্যটা ঢাকা পড়ে গেল মেঘে, ঠান্ডা হাওয়া ছাড়ল একটা। তাড়াতাড়ি উইন্ডচিটার গায়ে চাপিয়ে হুডে মাথা ঢেকে ফেললাম দু'জন। কিন্তু আমাদের বাকি দু'জনের কী হল? হাঁক পাড়লাম ওদের নাম ধরে।

"আমরা এখানেই আছি," নিচ থেকে গলা পাওয়া গেল ল্যাচেনাল আর রেবুফতের। জানা গেল খাড়া বরফের দেওয়ালটার ডানদিক- বাঁদিকে খোঁজ করে লাভ হয়নি বিশেষ, ওদিকে কোনও রাস্তা নেই, আমাদেরটাই একমাত্র রুট। দুই মক্কেল তাই দিব্যি নিচে বসে দেখছে আমরা কী করি! পনেরো মিনিটের ভেতর ওরাও উঠে এল আমাদের কাছে।



লুই ল্যাচেনাল



গাসটন রেবুফত



লায়োনেল টেরে

ফের সামনে এগোনো শুরু করা গেল। শুভ্র তুষারসমুদ্রের মধ্য দিয়ে মন্থর কষ্টকর এক যাত্রা। আবহাওয়াও খারাপ হয়ে এল, শুরু হল তুষারপাত। পর্বতগাত্রের ঢালে আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ এগোতে এতই পরিশ্রম করতে হচ্ছিল যে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। পুরো রাস্তাই যদি এভাবে এগোতে হয় তবে কোনওদিনই হয়তো শৃঙ্গশীর্ষে পৌঁছতে পারব না আমরা। অন্যরাও আমার থেকে খুব বেশি আশাবাদী বলে মনে হল না। দিনের বেলা প্রতিদিন এই ভারী তুষারপাতটা শুধু যদি বন্ধ হত তাহলে রাত্রে তুষার জমে কঠিন হয়ে উঠত, এগোনোও সহজ হত অনেক। কিন্তু প্রতিদিনই দেখা যায় দুপুরের পর আবহাওয়া খারাপ হয়ে আসে, তুষারঝড় শুরু হয় নয়তো ভারী তুষারপাত, ফলে বারো থেকে আঠারো ইঞ্চি পুরু নতুন তুষারের আস্তরণ ঢেকে ফেলে চারদিক। পরদিন একই রুটে চলতে হলেও ফের নতুন করে ধাপ কেটে কেটে রাস্তা তৈরি করে এগোও! বিরক্তির একশেষ! এ অবধি যেটুকু এগিয়েছি আশা করি সে রাস্তা তুষারপাতে পুরো মুছে যাবে না, খুঁজে পাওয়া যাবে ফের। এই রুটই আমাদের অন্তিম আশাভরসা, এও কি শেষে মরীচিকার মতো ধোঁকা দেবে আমাদের?

আকাশ থেকে ভাসতে ভাসতে নেমে আসা হালকা তুষারকুচির ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম সামনে একটা ধূসর ছায়ার মতো শ্যাজের দেহটা, নরম তুষারে রাস্তা তৈরি করতে করতে এগিয়ে চলেছে। আমায় কিছুটা রেহাই দিয়ে এখন সামনে এগিয়ে গেছে ও। শনশন হাওয়া বয়েই চলেছে, সামনে পঞ্চাশ ফিটের বেশি দেখার জো নেই। ঢালটা এখানে প্রচণ্ড খাড়াই, তাঁবু খাটাবার মতো কোথাও কোনও জায়গার চিহ্ন নেই। অবশ্য তিন নম্বর ক্যাম্প আরও কিছুটা ওপরে স্থাপন করলেই ভালো হয় আমাদের। অল্টিচিউড মেপে দেখা গেল ২১,৬৫০ ফিট। পরে অবশ্য জানা গেছিল আমরা মোটে ২১,০০০ ফিট উচ্চতায় ছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছিল প্রায় স্বর্গের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি।

অনবরত তুষারপাত হয়ে চলল। নরম তুষার সরিয়ে সরিয়ে রাস্তা তৈরি করে এগোনো ভয়ঙ্কর পরিশ্রমের একটা কাজ। যাই হোক, এক পা এক পা করে শম্বুকগতিতে এগিয়ে চললাম আমরা। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শৃঙ্গের দিকে যে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছি সে কথা ভেবে খুব তৃপ্তি হচ্ছিল। পাহাড়ের ঢালে একফালি চাঁদের মতো দেখতে একটা বড়সড় বরফের চাঁই পাওয়া গেল। ঠিক হল, অনেক হয়েছে, আর নয়! এখানেই তিন নম্বর ক্যাম্পের জিনিসপত্র মজুত করে নেমে যাওয়া যাক এবারে। তাঁবু, সাজসরঞ্জাম আর খাবারদাবার সেই বরফের চাঁইটার গোড়ায় পিটন পুঁতে বেঁধে রাখা হল। কিছুটা ওপরে চাঁইটার গায়ে শক্ত বরফ কেটে একটা খোঁদল বানিয়ে একটা লাল রঙের ফ্লাস্ক

ভালো করে গুঁজে দেওয়া হল সেখানে। ফ্লাস্কটা নিচে অনেকদূর থেকে দেখা যাবে, পরে অন্যদের জায়গাটা খুঁজে পেতে সুবিধে হবে।

নামাটা যে ওঠার তুলনায় কত সোজা সেটা ফের মালুম হল। এবার ল্যাচেনাল আর রেবুফত সামনে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা নিচে কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। তুষারপাত আরও প্রবল হল। আমি শ্যাজের আগে আগে নামছিলাম, একটা ছোটো খাড়া বরফের ধাপ সামনে পেয়ে সোজা নিচে লাফিয়ে পড়লাম। আমার আর শ্যাজের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী কোমরে বাঁধা দড়িটার দৈর্ঘ্য হিসেবে রাখতে তাড়াহুড়োয় বেমালুম ভুলে গেলাম। শ্যাজের কোমরে লাগল এক জোর ঝটকা। সে মোটেই তৈরি ছিল না। হ্যাঁচকা টানে ভারসাম্য হারিয়ে বরফের ঢাল বেয়ে দুরন্ত বেগে পিছলে নামতে লাগল শ্যাজ, চিৎকার করতে করতে পাশ দিয়ে আমায় পেরিয়ে আরও নিচে গড়িয়ে চলল। ভাগ্যি ভালো, ঢালের ওপর পড়ে থাকা নরম তুষারের পুরু আচ্ছাদনে বাধা পেয়ে ধীরে ধীরে তার গতিবেগ কমে এল, শেষে একজায়গায় পুরোপুরি থেমে গেল সে। এই নরম তুষারকেই কিনা এতক্ষণ গাল দিচ্ছিলাম আমরা! অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে মাতালের মতো টলমল পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল শ্যাজ, ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে গেছে সে, তবে চোট লাগেনি কোথাও। এরপর শ্যাজ আগে আগে চলল, আমি পেছন পেছন দড়িটা ছোটো করে নিয়ে টান করে ধরে আমাদের উঠে আসার পথ অনুসরণ করে সেই তুষারপাত আর ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে নেমে চললাম। সেই বিপজ্জনক নালাটা পেরোবার মুখে ল্যাচেনাল আর রেবুফত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। শ্যাজের টালমাটাল পদক্ষেপ দেখে ওরা বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল, কাছে কাছে রইল তার, কড়া নজর রেখে সাবধানে নালাটা পার করিয়ে দিল। দ্বিতীয়বার কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই আমরা নালাটা পেরিয়ে এলাম। এরপর আমাদের দলের নানা সদস্যকে বহুবার নালাটা পারাপার করতে হয়েছে, কিন্তু অসীম ভাগ্যই বলতে হবে, একবারও কেউ তুষারধ্বসের কবলে পড়িনি।

মেঘলা গুমোটের জন্যই হোক কিম্বা কিছুটা নিচে নেমে এসেছি বলে, ঠান্ডা অনেক কম লাগছিল। এত তুষারপাত হয়েছে এর মধ্যে যে মাঝে মাঝে প্রায় কোমর অবধি নরম তুষারে ডুবে যাচ্ছি। মেঘ আর কুয়াশায় দু'নম্বর ক্যাম্পের কোনও চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজে আন্দাজেই এগোতে হচ্ছিল তাই। মাঝে মাঝে অবিশ্যি যে রাস্তায় উঠেছি সেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম, তুষারপাতে পায়ের ছাপ মুছে এসেছে প্রায়। হাওয়ার জোর বাড়ল আরও, মুখ আর গগলসের ওপর তুষারকুচির তীব্র ঝাপটা আছড়ে পড়তে লাগল। মাথার হুডটা ভালো করে বেঁধে নিয়ে কুঁজো হয়ে কোনওমতে নেমে চললাম। কিছুটা উৎরাই গ্লিসেড করে হড়কে নেমে কয়েকটা পায়ের ছাপ আর একটা ফাটল দেখে মনে হল দু'নম্বর ক্যাম্প খুব কাছাকাছিই হওয়া উচিত। চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি ডাইনে কয়েক পা দূরেই তুষারে ঢাকা আমাদের তাঁবুটা দাঁড়িয়ে আছে! পুরো তাঁবুটাই তুষারে চাপা পড়ে গেছে প্রায়; একফালি লাল রঙের কাপড় শুধু দেখা যাচ্ছিল, তাই খুঁজে পেলাম। কী করা যায় এখন? এই একটা তাঁবুতে তো আমাদের চারজনের জায়গা হবে না! তার চেয়ে সবাই মিলে নেমে গেলে নিচ থেকে আরও মালপত্র ওপরে বয়ে নিয়ে আসা যাবে। সুতরাং, এগিয়ে চলো ফের।

বেলা পড়ে এসেছে। এক নম্বর ক্যাম্পের দিকে নামতে নামতে দৃশ্যমানতা আরও কমে এল। গাঢ় কুয়াশায় দিক ভুল করে ফেলার প্রবল সম্ভাবনা, তাই চারজন পরপর কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় এক লাইনে চলে মোটামুটি সোজা নামার চেষ্টা করছিলাম। ক্যাম্প ওয়ানের কাছাকাছি প্রচুর ফাটলে ভর্তি একটা জায়গা আছে জানতাম। মাকড়শার জালের মতো ছড়িয়ে থাকা ক্রিভাসগুলির মধ্য দিয়ে নামার একটাই মাত্র রাস্তা আছে, সেটা ছোটো ছোটো নুড়িপাথর দিয়ে কতগুলি স্তূপ বা কেয়ার্ন বানিয়ে চিহ্নিত করা ছিল। কেয়ার্নগুলোর একটাও এখন খুঁজে পাচ্ছি না। রেবুফত বলল আমাদের বাঁদিক ধরে নামা উচিত। ল্যাচেনাল বলল, না, ডানদিকে গেলে তবেই সে রাস্তা মিলবে। আমার মতে আমরা

ঠিকই এগোচ্ছিলাম, এভাবে সোজা এগিয়ে গেলেই হবে। এই আবহাওয়ায়, আধো অন্ধকার আর ঘন কুয়াশায় একেকজন যে একেকদিকে এগিয়ে দেখব সে ঝুঁকিও নেওয়া ঠিক না। তাই ঠিক হল, প্রথমে রেবুফতের কথামতোই এগোনো যাক। দেখা গেল, বাঁ দিক দিয়ে নেমেই সে রাস্তা পাওয়া গেল যেটা একেবারে সোজা এক নম্বর ক্যাম্পে নেমে গেছে।

কুয়াশা ক্রমে গাঢ় থেকে আরও গাঢ় হচ্ছে। দু'পাশে দুটো ফাটলের মাঝখান দিয়ে নামছিলাম আমরা, হঠাৎ দেখি সামনে ফাটলদুটো জোড়া লেগে এক হয়ে গেছে! আর এগোনোর রাস্তা নেই। ফের পিছু হটতে হল। আগের জায়গায় ফিরে গেলাম আবার, তারপর ফাটলে ভরা অংশটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে নামার জন্য ডানদিকে এগোতে শুরু করলাম। দিনের শেষে পরিশ্রান্ত অবস্থায় এই উটকো ঝামেলা, এই ঘুরপথ, একেবারে নাকাল করে ছাড়ল আমাদের। কিছুটা নেমে মনে হল এক নম্বর ক্যাম্প আর খুব দূরে হওয়ার কথা নয়, তাই গলা চড়িয়ে হ্যালো হ্যালো করে ডাক ছাড়লাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দূর থেকে মৃদু কিন্তু স্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেল, "এদিকে, এদিকে!" টেরের গলা।

ল্যাচেনাল বলে উঠল, "কী, বলেছিলাম না ডানদিক দিয়ে নামতে হবে আমাদের?"

কিছুক্ষণের মধ্যেই কুয়াশা ফুঁড়ে টেরে উদয় হল। বলল, এক নম্বর ক্যাম্পে সে ছাড়া পানসি, আয়লা আর আজীবা আছে, আমাদের সবার জায়গা সেখানে হবে না। অতি অল্প কিছু সাজসরঞ্জামই ক্যাম্প ওয়ানে আনা গেছে আপাতত, খাবারদাবার যা মজুত করা হয়েছে তাও ওপরের ক্যাম্পগুলিতে পাঠাবার জন্য। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম, দিনের শেষ আলোটুকুর সুযোগ নিয়ে আমি, ল্যাচেনাল আর রেবুফত নিচে বেস ক্যাম্পে নেমে যাব। নামার পথে পড়ে যাবার মানসিক ধাক্কাটা শ্যাজ এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ও এখানে বিশ্রাম নিক।

টেরে গত রাত্রে তার খোলা আকাশের নিচে কাটানোর অভিজ্ঞতা সাতকাহন করে বলতে শুরু করল। ল্যাচেনাল অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে গজগজ করতে লাগল, "খালি হিরোগিরি! যত্ত সব!"

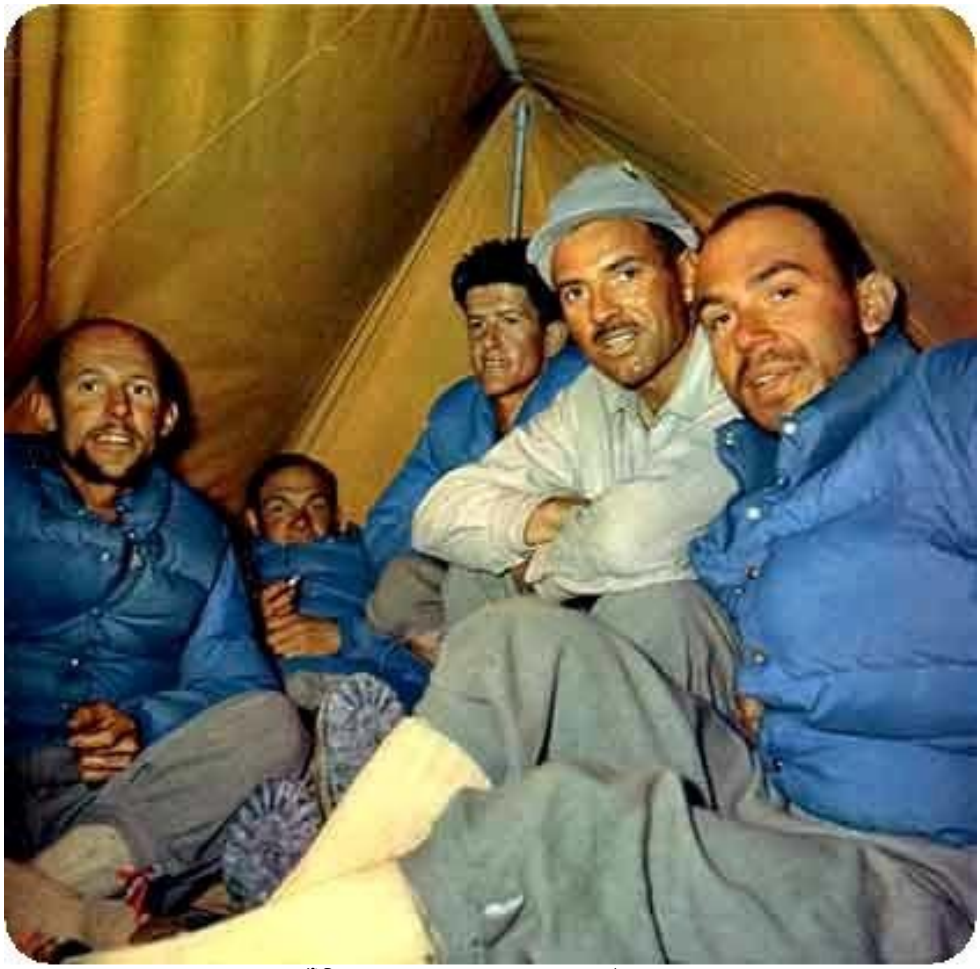
আমরাও আমাদের গল্প বললাম। একফালি চাঁদের মতো যে বরফখন্ডটার নিচে তিন নম্বর ক্যাম্পের জিনিসপত্র ডাঁই করে এসেছি তার রাস্তা মোটামুটি বুঝিয়ে দেওয়া গেল।

"কাল ভোরবেলাই পানসি আর আয়লাকে নিয়ে ওপরে উঠে যাব আমি," বলল টেরে, "এদিকে আজীবা বেস ক্যাম্প আর ক্যাম্প ওয়ানের মধ্যে রুটিনমাফিক তার ফেরি সার্ভিস চালিয়ে যাবে।"

আজীবা খুব শক্তপোক্ত ছেলে, আর এই ফেরি সার্ভিসে ও একেবারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিন দু'বার করে বেস ক্যাম্প থেকে এক নম্বর ক্যাম্পে মালপত্র বয়ে আনত সে। শয়ে শয়ে পাউণ্ড মাল এভাবে ও একাই তুলে এনেছে ক্যাম্প ওয়ানে। একঘেয়ে কাজটা মোটেই তেমন চটকদার নয়, কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এরকম নিঃস্বার্থ কিছু কাজের জন্যই অভিযানে সাফল্য আসে।

সুতরাং টেরে, শ্যাজ, পানসি আর আয়লা এক নম্বর ক্যাম্পে রইল। আমি, ল্যাচেনাল আর রেবুফত আজীবার সঙ্গে নিচে নামতে শুরু করলাম। আলগা ছোটো ছোটো নুড়িপাথরের ঢাল অর্থাৎ স্ক্রি জোন বেয়ে সড়সড় করে স্লিপ খেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার ফিটেরও বেশি নেমে গেলাম আমরা। তারপর, উত্তর হিমবাহের হিমপ্রপাতের তলায় পৌঁছে নিচের বিস্তীর্ণ মোরেন অঞ্চলে আমাদের বেস ক্যাম্পের খোঁজে চেয়ে দেখি, ওমা! কোথায় সেই ছোট্ট একখানা তাঁবু! এ যে তাঁবুর মেলা বসে গেছে!! কিছুক্ষণ আগেই আইজ্যাক আর অডট প্রচুর কুলি আর বাকি শেরপাদের নিয়ে তুকুচা থেকে এসে পৌঁছেছে সেখানে। যাক, আজ আর কারও স্লিপিং ব্যাগের অভাব হবে না! খাওয়াদাওয়ার তো অঢেল ব্যবস্থা! এমনকি এর মধ্যেই সবুজরঙা বিশাল এক মেস টেন্টও খাটিয়ে ফেলা হয়েছে, কুলিরা সব গিয়ে জড়ো হয়েছে তার নিচে, কারণ বাইরে তখনও হালকা তুষারপাত হয়ে চলেছে।

অবশেষে তাহলে তুকুচা বেস ক্যাম্পের সঙ্গে আমাদের অগ্রবর্তী দলের যোগাযোগ স্থাপিত হল! এবার আমাদের রোখে কার সাধ্যি?



বেস ক্যাম্পে আড্ডা; বাঁদিক থেকে ল্যাচেনাল, অডট, রেবুফত, হারজগ, শ্যাজ

(এরপর আগামী সংখ্যায়)



শম্পা গুহমজুমদার

ডকুমেন্টেশন (Documentation)

আজকের দিনে ফেসবুক খবর আদানপ্রদান ও যোগাযোগের সবথেকে উপযুক্ত একটি মাধ্যম। সাধারণত বেড়ানোর ফোটো আমরা ফেসবুকে পোস্ট করি। নিজের পছন্দমতন বিষয় সবাই শেয়ার করে ও নানাধরণের জ্ঞান আহরণও করে থাকে। নিজের আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী পছন্দের গ্রুপও তৈরি হয়ে যায়। সবাই সবার ফোটো দেখে ও মন্তব্যও করে।

তোমরা যারা ফোটো তুলতে ভালবাসো তোমাদের গ্রুপে অনেক ফোটোগ্রাফার বন্ধু আছে নিশ্চয়ই। একটু ভাবনাচিন্তা করে ফোটো তুলে তা সুন্দরভাবে পরিবেশনও করা যেতে পারে। আর একই বিষয়ের ফোটোগুলিকে ঘটনা-পরম্পরায় সাজিয়ে ফেসবুক বা অন্য ওয়েবপেজে পোস্ট করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা যায়। ৫,৮ বা ১০ টা ফোটোকে সাজালে একটি গল্পের জন্ম দেওয়া যেতে পারে।

একটি ফোটোতে যা সম্পূর্ণ বলা যায় না। একেই ডকুমেন্টেশন বলা হয়ে থাকে। খুব সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনাকেও ছবির মধ্যে দিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করা যায়। একটা ছোট্ট পতঙ্গের নানা ভঙ্গিমার ছবি পোকার জীবনকাহিনী হতে পারে, সেইরকম কোন অখ্যাত জায়গার ছবিও সাজানোর গুণে একটি গল্প তৈরি করতে পারে।

এটাই আমি বোঝাতে চাইছি যে ভ্রমণের গল্প বলার জন্য কোন বিখ্যাত জায়গাতেই বেড়াতে যেতে হবে তা কিন্তু নয়। যে বিষয়েই তোমার ইন্টারেস্ট থাকুক না কেন সব বিষয়ের উপরেই গল্প তৈরি করা যাবে। বিষয় সাধারণ হলে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সাধারণ বিষয়কে কিভাবে আকর্ষনীয় করে তুলতে হবে তা ফোটোগ্রাফারের উপর নির্ভর করছে, উদ্ভাবনী-ক্ষমতা একটু তো থাকতেই হবে। ভিডিওতে টুকরো টুকরো ঘটনা জুড়ে গল্প তৈরি হয়।

স্টিল পিকচারের ক্ষেত্রে ঘটনাকে তুলে ধরা একটা কঠিন কাজ। কারণ এগুলি স্থিরচিত্র। তাই ছবি কিভাবে সাজাবে এটা তোমাকে একটু ভাবতে হবে। একটি উদাহরণ দিঃ

ধরে নিলাম তোমার মানুষের ছবি ও পোর্ট্রেট তুলতে ভাল লাগে। তুমি বাড়িতেই ছবি দিয়ে গল্প তৈরি করার খেলা শুরু করতে পারো। বাড়িতে বয়স্ক কেউ থাকলে তো আরো ভাল;তাঁর ছবি শ্যুট করতে পারবে। দিনের নানা সময়ে তিনি কী করেন,সেই ফোটো তুলতে পার। সব বয়স্ক মানুষ এরই অবসাদ ও নিঃসঙ্গতা থাকে। এই

দিকটাও তুলে ধরা যায়। মা -বাবা-ভাই- বোনেদের ও সাবজেক্ট বানাতে পার। কিন্তু ওই যে বললাম সাবজেক্ট পছন্দ করার সময়ে বৈশিষ্ট্য থাকলে আপনাআপনিই ফোটো ইন্টারেস্টিং হবে।

আমি এখানে কলকাতার মল্লিকবাজারের কিছু ছবি দিলাম। হাওড়াব্রিজের নীচে গঙ্গার মল্লিকঘাটের পাশে এই পাইকারি ফুলের বাজার বেশ নামকরা। কিন্তু সাধারণ মানুষ এখানে বেড়াতে যায়না। খুবই নোংরা আর সঙ্কীর্ণ পথ ভিড়ে ঠাসাঠাসি। তার মধ্যেই গাড়ি ট্রাক চলছে। একেবারেই হইহট্টগোলে ভরপুর। সারা পৃথিবী থেকে ফোটোগ্রাফাররা কিন্তু এখানে আসেন ছবি তুলতে। এখান থেকেই কলকাতা ও তার আশেপাশের বাজারে ফুলের সরবরাহ যায়। হয়তো ছবিগুলো খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা অসাধারণ নয়। তাই সেট থেকে যেকোনো একটা ছবিকে বেছে নিলে এমনকিছু ইন্টারেস্টিং লাগবে না। এবারে ভাবতে হবে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি ছবিগুলোকে সাজাবে । উজ্জল ফুলের পসরার পাশেই পচা আবর্জনার স্তূপ ? কয়েকটি ছবির মাধ্যমেই বৈপরিত্যের দিকটি তুলে ধরতে চাও ? যার অন্তর্নিহিত অর্থও হয়তো প্রকাশ পাবে। আবার প্রাত্যহিক জীবনে এর এক ঝলক দেখানো উদ্দেশ্য হতে পারে। এই সেটটিতে দশটি ছবি আছে। গল্প তৈরির ক্ষেত্রে ছবিগুলি ঠিক কিভাবে সাজাবে,এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর কোনো নিয়ম নেই,এটা ঠিক শেখানোও যায়না। ফটোগ্রাফারের নিজস্ব স্বাধীনতা আছে সে কেমন ভেবেছে তা দেখাবার। তবে একটা ছবির সঙ্গে পরের ছবিটার সামঞ্জস্য বা মিল থাকতে হবে। এখানে প্রথম ছবিটি লঙ্গশটে পুরো বাজারটাই দেখাচ্ছে। তারপর রাখা হয়েছে বাজারের ক্লোজ আপ। চার নং ও পাঁচ নং এর ছবিটি দেখ। ৮ নং এ কেউ আবার মাথায় ঝুড়ি নিয়েছে। পরের ছবিটি মাথার ঝুড়ির ক্লোজ আপ। এভাবে একটা ছন্দ তৈরি হয় যা একটা গল্প তৈরি করে। শেষের দুটি ছবিতেও একটা মিল আছে। কাঁধে করে ফুলের বোঝা নেওয়ার ই দুটি আলাদা ছবি। এত রঙের মধ্যেও কিন্তু লুকিয়ে আছে খেটে খাওয়া মানুষের নির্বিকার হাবভাব। তাই রঙের পাশে রঙহীন জীবনের এক ঝলক চিত্র হয়তো তুলে ধরা গেছে। অন্যভাবে ভাবলে, ফুল মানুষের জীবনে রঙ রূপ আনন্দ ও ভালবাসার অঙ্গ। । আবার এই ফুল কিছু মানুষের কাছে বর্ণহীন জীবনযাত্রার পাথেয়। এই ডকুমেন্টেশন এর নাম দিলাম "Colour of **Crowd** ", বা জীবনের রঙ হতে পারে। গল্পের নামের মধ্যেই যেন স্রষ্টার চিন্তার ছাপ থাকে।

ছবিতে গল্প যে সবসময়ে একই জায়গায় একই বিষয় হতে হবে তাও নয়। ফুলের বাজারের সঙ্গে ফলের পাইকারি বাজার,সবজির বাজারও দেওয়া যেতে পারতো। তাহলে বাজার শিরোনামে বিভিন্ন বাজারকেও দেখানো যেতে পারতো। প্রাকৃতিক নিসর্গ,ভ্রমণ-চিত্র,বনের জীবজন্তুর ছবি,সবকিছুর উপরেই ডকুমেন্টেশন করা সম্ভব। বিষয়টা একটু অন্যরকম হলে,ছবি সাধারণ হলেও গল্পটা জমে যাবে। তাই ছবিতে গল্প বলার সময়ে ছবির বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ফেসবুকে ভ্রমণের উপরে খুব ভাল ভাল ছবি দেখা যায়। অনেক তথ্যও পাওয়া যায়। তাই তোমরা এবারে ছবি ছোট ছোট গল্পের আকারে সাজিয়ে পোস্ট করো আর বিভিন্ন বিষয়কে সুন্দরভাবে বন্ধুদের কাছে তুলে ধরো।











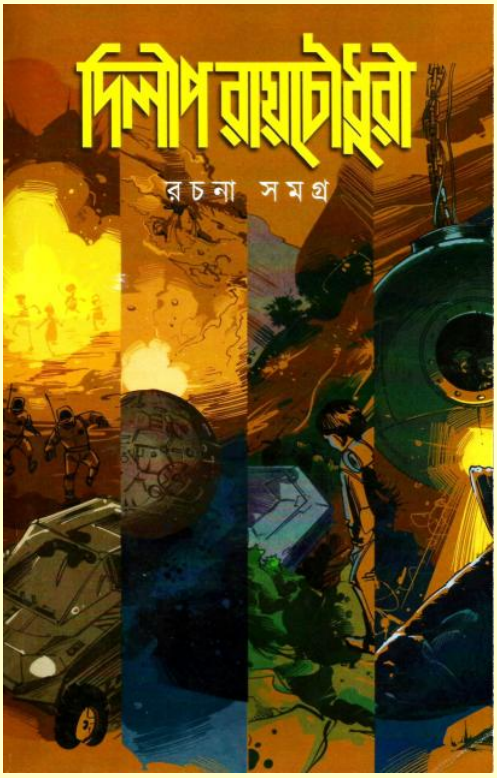






দিলীপ রায়চৌধুরী রচনা সমগ্র

আলোচনাঃ তাপস মৌলিক



বইঃ দিলীপ রায়চৌধুরী রচনা সমগ্র
লেখকঃ দিলীপ রায়চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ সুমিত রায়

প্রকাশকঃ হ য ব র ল
www.hajabarala.com
হাল্যান, বাগনান, হাওড়া ৭১১৩১২

দামঃ ২৯৯ টাকা
প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭

বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের দুনিয়ায় দিলীপ রায়চৌধুরী একটি উজ্জ্বল নাম। গত শতকের ছয়ের দশকে ক্ষণপ্রভ ধূমকেতুর মতো লেখক হিসেবে তাঁর আবির্ভাব এবং মাত্র কয়েক বছর পরেই অত্যন্ত দুঃখজনক অকালপ্রয়াণ। আলোচ্য সংকলনে গ্রন্থিত হয়েছে তাঁর প্রকাশিত- অপ্রকাশিত সমস্ত রচনা। লেখাগুলির বেশিরভাগই প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময়ের ‘আশ্চর্য!’, ‘তরুণ তীর্থ’, ‘প্রথম প্রয়াস’ ইত্যাদি পত্রিকায়। পত্রিকাগুলি এখন আর প্রকাশিত হয় না, তাদের পুরোনো সংখ্যাগুলি সংগ্রহ করে পড়াও সাধারণ পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। আন্তর্জালে দিলীপ রায়চৌধুরীর কিছু কিছু গল্প পড়ার সুযোগ পাঠকের হয়েছে, তাতে এরকম একটি রচনাসমগ্রের জন্য প্রত্যাশা এবং সাগ্রহ প্রতীক্ষা বেড়েছে। অবশেষে এ বছরের কলকাতা বইমেলায় হযবরল প্রকাশন থেকে সেই বহুপ্রতীক্ষিত বইটি পাওয়া গেল। এ জন্য পাঠকের তরফ থেকে, বিশেষ করে বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রকাশকের পাওনা।

ডক্টর দিলীপ রায়চৌধুরীর জন্ম ১৯২৮ সালে কলকাতায়, শৈশব কেটেছে বহরমপুরে দাদু-দিদিমার কাছে, সেখানেই স্কুল শেষ করে কলেজে রসায়ন নিয়ে বি এস সি পাস করেন তিনি, তারপর কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর। কিছুদিন খড়গপুর আই আই টি- তে গবেষণা করার পর ১৯৫৩ সালে দিলীপ উচ্চতর গবেষণার জন্য পাড়ি দেন আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫৭ সালে দেশে ফিরে কেমিস্ট হিসেবে যোগ দেন বহুজাতিক সংস্থা আই সি আই- তে, যাদের কারখানা ছিল রিষড়ায়। এই সময়েই শুরু হয় তাঁর লেখালেখি এবং সমাজসেবামূলক কাজকর্ম, গড়ে তোলেন নিজের সংস্থা ‘তরুণ তীর্থ’, লিখতে শুরু করেন অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা ‘আশ্চর্য!’ এবং নিজের সংস্থার ‘তরুণ তীর্থ’ পত্রিকায়। একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর কল্পবিজ্ঞানের

গল্প এবং বিজ্ঞানবিষয়ক ও অন্যান্য রচনাগুলি। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প, আর ১৯৬৬- র সেপ্টেম্বরে এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মাত্র দু'দিনের মধ্যে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয় তাঁর। তখন তাঁর বয়স সবে সাঁইত্রিশ। বাংলা কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের জগৎ হারায় সৃষ্টিশীলতার শিখরে থাকা এক প্রতিভাবান সাহিত্যিককে।

আলোচ্য বইটিতে সিদ্ধার্থ মজুমদারের ভূমিকার পর রয়েছে দিলীপ রায়চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে লেখা তাঁর কন্যা যশোধরা রায়চৌধুরীর মূল্যবান একটি রচনা। তার থেকে দিলীপের জীবন সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত জানতে পারি আমরা। সংক্ষিপ্ত সাহিত্যজীবনে দিলীপ কল্পবিজ্ঞানকে আধার করে লিখেছিলেন একটি উপন্যাস এবং আটটি ছোটোগল্প। এগুলি ছাড়া এ বইয়ে রয়েছে ছোটোদের জন্য লেখা বিজ্ঞানবিষয়ক তিনটি রচনা, দুটি ছোটো ভ্রমণ আলেখ্য, একটি ছোটো নাটিকা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে লেখা একটি বড়ো গল্প।

বইটি সম্পর্কে সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেছেন – 'আজ থেকে প্রায় পাঁচ দশক আগে লেখা এই গল্পগুলি, যা এখানে গ্রন্থিত হয়েছে, পড়ে চমকে উঠতে হয়। কী সাবলীল এই ভাষা, কী প্রাঞ্জল এই গল্পবলা আর বর্ণনা। একই সঙ্গে গভীর আর রসোত্তীর্ণ, সতথ্য আর চিত্তাকর্ষক। বাংলা ভাষায় এমন গল্প, যেখানে পরতে পরতে রয়েছে বিজ্ঞানের কথা, তা যে কত সহজ, স্বচ্ছন্দ আর সরস ভঙ্গিতে বলা যায়, তারই এক উজ্জ্বল নিদর্শন এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি। আধুনিক বিজ্ঞানের নানান বিষয়ের দুরূহ কথা সহজ করে বলবার ম্যাজিক জানেন যেন লেখক, তাই প্রতিটি গল্পের প্রথম থেকে শেষ অবধি আবিষ্ট করে রাখে পাঠককে। রসায়ন বিজ্ঞান থেকে পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে ভূবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান থেকে জীববিজ্ঞান – এইভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের নানান বিষয় নিয়ে এই বইয়ের একেকটি গল্প। সাহিত্যের নান্দনিকতা ও লালিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের তত্ত্ব, রোমান্স আর উপলব্ধির এক অনবদ্য মিশেল প্রতিটি লেখাকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র ও স্বমহিম।'

'...কাহিনির মাধ্যমে বিজ্ঞানের কোনও ধারণা, তথ্য বা তত্ত্বের কথা উপস্থাপিত করে পাঠকের ভাবনার আঁচকে উসকে দিয়ে উৎসাহিত করে তোলার কাজটি করেন কল্পবিজ্ঞান লেখক। আর এই উসকে দেওয়ার ক্ষেত্রে কল্পনার যে আয়োজন থাকে, তা অবশ্যই বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হয়। রং চড়ানো, কল্পনার ফানুস ওড়ানো কোনও অবাস্তব গল্পকে আর যাই হোক, কল্পবিজ্ঞান বলা যায় না।... (দিলীপ রায়চৌধুরীর) প্রত্যেকটি লেখা বিষয়বস্তু কিংবা মেজাজে ভিন্ন হলেও, যে একটি বিষয়ে মিল, তা হল বিজ্ঞানের তথ্য বা ভাবনার অবিকৃত থাকা। লেখার রোমাঞ্চকর বস্তুর প্রয়োজনে বিজ্ঞানবিরোধী কোনও জিনিস অন্তর্ভুক্ত হয়নি কোনও গল্পে। এভাবেই ডক্টর রায়চৌধুরীর প্রত্যেকটি লেখা সার্থক কল্পবিজ্ঞান কাহিনি হয়ে উঠেছে। আসলে কোনও লেখাকে রোমাঞ্চিত করার প্রয়োজনে যে বিজ্ঞানবিরোধী কোনও ভাবনা আনার প্রয়োজন পড়ে না, তা একজন কৃতবিদ্য রসায়নবিদ হিসেবে ডক্টর রায়চৌধুরী সম্যক জানতেন। বিজ্ঞান যে নিজেই অত্যন্ত রোমাঞ্চকর আর রোমহর্ষক, তাই লেখার মধ্যে আলাদা করে এসব আরোপ করার প্রয়োজন পড়ে না, সে কথা দিলীপের মতন একজন আদ্যোপান্ত বিজ্ঞানী খুব ভালো করেই বুঝতেন।'

বইটি পড়ার পর সিদ্ধার্থবাবুর বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত, তাই হুবহু তুলে দিলাম এখানে। কল্পবিজ্ঞানের গল্প যাদের ভালো লাগে তাদের কাছে এ বই এক ঝলক টাটকা হাওয়ার মতো, প্রতিটি গল্প পঞ্চাশ বছর পেরিয়েও একেবারে সতেজ- সজীব, শুরু করলে শেষ না করে উপায় নেই। গল্প- উপন্যাসগুলির মধ্যে আমার নিজের সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'ক্যুগেল ব্লিৎস' নামে গল্পটি, এ ছাড়াও দুর্দান্ত লেগেছে উপন্যাস 'অগ্নির দেবতা হেফেস্টাস', গল্প 'শিলাকান্থ', 'নেরগাল' এবং বাংলার এক ছোটো শহরে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা বড়ো গল্প 'চিত্ত ভাবনাহীন'। সব গল্পই ভালো – কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলি! তবে 'সৌর- ঝঞ্ঝা' গল্পটি কেমন অসম্পূর্ণ মনে হল; গল্পটি লেখকের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, হয়তো তিনি ঠিকঠাক শেষ করে যেতে পারেননি।

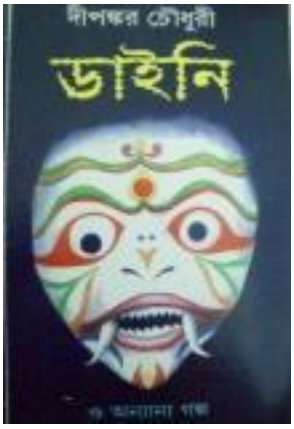
বইটির প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ খুবই ভালো, ছাপা ঝকঝকে। তবে বইয়ের পেছনে অর্থাৎ ব্যাক কভারে সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি, লেখকের একটি ছবি এবং বইটি সম্পর্কে দু'চার কথা থাকলে বেশ হত। শিল্পী সুমিত রায়ের আঁকা অসাধারণ অলঙ্করণের কথা আলাদা করে বলতে হয়, এ রকম দুর্দান্ত ছবি সঙ্গে থাকলে গল্পের আকর্ষণ বহুগুণ বেড়ে যায়।

দিলীপ রায়চৌধুরী নামটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাঁর লেখা বিখ্যাত 'সবুজ মানুষ' গল্পটির সূত্রে। আকাশবাণীর 'সাহিত্য বাসর' অনুষ্ঠানের জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন, দিলীপ রায়চৌধুরী এবং সত্যজিৎ রায় - চারজন দিকপাল কল্পবিজ্ঞান লিখিয়ে মিলে লিখেছিলেন 'সবুজ মানুষ' – একই নামের চারটি আলাদা গল্প। ১৯৬৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আকাশবাণীতে 'সবুজ মানুষ' প্রথম সম্প্রচারিত হয়, চার লেখক নিজকন্ঠে নিজের নিজের গল্প পড়েন। পরে আরও অনেকবার অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচারিত হয়েছে, আমরা ছোটোবেলায় রেডিওয় শুনেছি। এই সমগ্রে দিলীপ রায়চৌধুরীর সেই 'সবুজ মানুষ' গল্পটি আশা করেছিলাম, যেমন সত্যজিৎ রায়ের গল্পটি সংকলিত আছে 'পিকুর ডায়রি ও অন্যান্য' বইতে। না পেয়ে খুব আপশোশ হয়েছে।

এ ছাড়া বইটির অনেক লেখায় ছোটোখাটো কিছু ছাপার ভুল চোখে পড়েছে, গল্পের টানে মন সে সব অগ্রাহ্য করতে চায়, তবু খুঁতখুঁত করে। কল্পবিজ্ঞানের গল্প- উপন্যাসগুলি ছাড়া সংকলিত অন্যান্য লেখায় লেখকের মূল রচনার বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, তার কারণও আমার মাথায় ঢোকেনি! পুরো বইটাই এখনকার বানানরীতি অনুযায়ী সম্পাদনা করলে চোখের হোঁচট খাওয়া কমত বলে মনে হয়। আশা রাখি দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশক ওপরের ব্যাপারগুলির দিকে নজর দেবেন যাতে বইটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

———

ডাইনী ও অন্যান্য গল্পঃ লেখক: দীপঙ্কর চৌধুরীঃ আলোচনা করলেনঃ মৌসুমী রায়
প্রকাশক: দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানী, প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ রাহুল মজুমদার, মূল্যঃ একশত কুড়ি টাকা



নয়ডার এক হাউসজিং কমপ্লেক্সে বেশ কিছু বাঙালি পরিবারের বাস।সবাই চাকরিসূত্রে প্রবাসী।তাঁদের মধ্যমণি বিজুদা।শ্রী বিজনবিহারী সরকার।পোশাকি পরিচয়ের বাইরে এক অসামান্য গল্পবলিয়ে।তাঁর মুখে বলা ছ'টি গল্পের সঙ্কলন এই বইটি। ই-পত্রিকা পরবাসের পাতায় বিজুদা সিরিজের এই গল্পগুলো প্রথম প্রকাশ পায়।পরে বই আকার নেয় ২০১১ সালে।

গল্পগুলোর নাম ডাইনী,কুম্ভক,নখদর্পণ,কামাখ্যা,কায়েন-বায়েত ও সিদ্ধেশ্বরী।নাম শুনেই বুঝতে পারছ যে এরা সেইসব অলৌকিক রহস্য রোমাঞ্চকর শ্রেণীর গল্প,যা পড়লে গা শিরশির করে,চোখ কপালে ওঠে আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যখানের পর্দাটা কেমন করে জানি বেপাত্তা হয়ে যায়।

গল্পগুলোর সময়,প্রেক্ষাপট আর যুগের মধ্যে অনেক বৈচিত্র।লেখক সেইসব বৈচিত্রের মশলা দিয়ে রসসমৃদ্ধ করে চমৎকার একএকটি গল্পসৃষ্টি করেছেন, যা চেখে চেখে না পড়ে উপায় নেই।

"কুম্ভক" গল্প শুরু হয়েছে রণজিত সিংহ এর দরবারে এক আশ্চর্য ফকিরের খেল দিয়ে, শেষ হয়েছে মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে এসে বিংশ শতাব্দীতে।

"কামাখ্যা" গল্পে কামরূপ-কামাখ্যার বশীকরণের সূত্র গিয়ে মিলেছে সেই পুর্ব জার্মানির ঠুরিঙ্গিয়ার এক প্রাশান প্রাসাদের অদ্ভুত বাসিন্দাদের গভীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে।

"কায়েন-বায়েত"এর পটভূমি তো আরো আশ্চর্য! বরাহনগরের সাবেকি বাড়ির রহস্যময় মানুষ মহীবাবু আর প্রয়াত ডাঃ তারকনাথের যাত্রাপথ সেই সুদূর শ্যামদেশের ঈসান প্রদেশ,মধ্যে আছে অলৌকিকত্বের নানা মশলার ঠাসবুনুনি।

আর "সিদ্ধেশ্বরী" গল্পে বিজুদা নিজে আর তাঁর শ্রোতারা সবাই রহস্যে জড়িয়ে গিয়ে একাকার হয়ে গেছেন।বাকি গল্পগুলোর সূত্র আর নাই বা ধরে দিলাম।নিজেরাই বইটি জোগাড় করে পড়ে ফেলো।

বইটি এক দমে পড়ে ফেলার মতন।গল্পেরা এত বৈচিত্রময় ও জমজমাট যে মনে হয় বিজুদার মুখে আরো অনেক গল্প শুনি।লেখকের কাছে আশা রাখি বিজুদা আরো গল্প বলবেন।

ছাপার ভুল চোখে পড়েনি।প্রচ্ছদ চমৎকার।বইএর সাইজ ও বাঁধানো বেশ।বইটি সবার জন্য সুখপাঠ্য।